সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

২০তম খন্ড

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ



আল কোরআন একাডেমী লন্ডন



সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

২০তম খন্ড
সূরা আর রাহমান
থেকে
আত্ তাহরীম

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক



আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

(২০তম খন্ড সূরা আর রাহমান থেকে সূরা আত তাহরীম)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
১২৪ হোয়াইটচ্যাপল রোড (দোতলা) লন্ডন ই১ ১জে ই, ইউকে
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭৬৫০ ৮৭৭০; ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৫৩৯ ২২৪ ৯২৫, ০৭৯৫৬ ৪৬৬ ৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট, দোকান নং ২১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬
১০ম সংস্করণ
সফর ১৪৩২ জানুয়ারী ২০১১ মাঘ ১৪১৭

কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত টাকামাত্র

Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'

Author
Syed Qutb Shaheed
Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed

20th Volume
(Surah Ar Rahman to Suhra At Tahreem)

Published by
Khadija Akhtar Rezayee
Director Al Quran Academy London
124 Whitechapel Road (1st Floor) London E1 1JE, UK
Phone & Fax : 0044 020 7650 8770, 020 7274 9164 Mob : 07539 224 925, 07956 466 955

Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526
Sales Centre: 507/1 (362) Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)
38/3 Computer Market Stall No- 215, Bangla Bazar, Dhaka-1100
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1st Edition 19968
10th Edition
Safar 1432 January 2011
Price Tk. 200 .00

E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN NO- 984-8490-20-5

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্‌সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক—এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা ইতিমধ্যেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আঝ ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ–আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহর ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না–এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে–কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❏ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❏ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা—শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না—না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যর সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ক্রটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'

অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও

ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা আর রহমান

আয়াত ৭৮ রুকু ৩

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاۤءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿٧﴾ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ﴿٨﴾ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿٩﴾ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٣﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَاۤنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٦﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. পরম করুণাময় (আল্লাহ তায়ালা), ২. তিনি (তোমাদের) কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন; ৩. তিনি মানুষ বানিয়েছেন, ৪. (ভাব প্রকাশের জন্যে) তিনি তাকে (কথা) বলা শিখিয়েছেন। ৫. সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই নির্ধারিত হিসাব মোতাবেক (অবিরাম কক্ষপথ ধরে) চলছে, ৬. (যমীনে উৎপাদিত যাবতীয়) লতাপাতা ও গাছগাছড়া (সব) তাঁরই সামনে সাজদাবনত হয়, ৭. আসমান— তাকে তিনি সমুন্নত করে রেখেছেন এবং (মহাশূন্যে তার ভারসাম্যের জন্যে) তিনি একটি মানদন্ড স্থাপন করেছেন, ৮. যাতে করে তোমরা কখনো (আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত এই মানদন্ডের) সীমা অতিক্রম না করো। ৯. ইনসাফ মোতাবেক (তোমরা ওযনের) মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করো এবং (ওযনে কম দিয়ে) মানদন্ডের ক্ষতি সাধন করো না। ১০. (ভূমন্ডলকে) তিনি সৃষ্টিরাজির জন্যে (বিছিয়ে) রেখেছেন, ১১. তাতে রয়েছে (অসংখ্য) ফলমূল, (আরো রয়েছে) খেজুর, যা (আল্লাহর কুদরতে) খোসার আবরণে (ঢাকা) থাকে, ১২. (আরো রয়েছে) ভূষিযুক্ত শস্যদানা ও সুগন্ধযুক্ত (ফল), ১৩. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে! ১৪. তিনি মানুষকে বানিয়েছেন পোড়ামতো শুকনো ঠনঠনে এক টুকরো মাটি থেকে, ১৫. এবং জ্বিনদের বানিয়েছেন আগুন থেকে, ১৬. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে!

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

১৭. (তিনি দুই মওসুমের) দুই উদয়াচলের মালিক এবং (আবার দুই মওসুমের) দুই অস্তাচলেরও মালিক। ১৮. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে! ১৯. তিনি দুটি সমুদ্রকে (বয়ে চলার জন্যে) ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন যেন তা একে অপরের সাথে মিশে যেতে পারে, ২০. (তারপরও) তাদের উভয়ের মাঝে (রয়ে যায় এমন) একটি অন্তরাল– যার সীমা তারা কখনো অতিক্রম করতে পারে না, ২১. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে! ২২. (এ) উভয় (সমুদ্র) থেকে তিনি (মহামূল্যবান) প্রবাল ও মুক্তা বের করে আনেন, ২৩. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে! ২৪. সমুদ্রে বিচরণশীল পাহাড়সম (বড়ো বড়ো) জাহাজসমূহ তো তাঁরই (ক্ষমতার প্রমাণ), ২৫. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই মক্কী সূরার একটা বিশেষ বাচনভংগি লক্ষ্য করা যায়।(১) মহাবিশ্বের মুক্ত অংগনে এটি একটি সার্বজনীন ঘোষণা এবং আল্লাহর অতুলনীয় নেয়ামতরাজির একটি পরিচিতি বিশেষ। আল্লাহর এই নেয়ামতরাজি যে জিনিসগুলোর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে, তা হচ্ছে তাঁর চমকপ্রদ ও অনিন্দ্য সুন্দর সৃষ্টি নৈপুণ্য, তাঁর নতুন নতুন ও অভিনব সৃষ্টি বৈচিত্র্য, তাঁর অব্যাহত ও অফুরন্ত অবদানসমূহ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক স্বীয় সৃষ্টিজগতকে পরিচালনা এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের তাঁর প্রতি সবিনয় আনুগত্য ও অভিনিবেশ। এই সূরায় গোটা বিশ্বজগতকে জ্বিন ও মানুষ এই দুই জাতির ওপর সাক্ষী রাখা হয়েছে, এই দুই জাতিকে সমভাবে এই সূরায় সম্বোধন করা হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বজগতের সম্মুখে প্রকাশ্যে বার বার প্রতিটি নেয়ামত বা অবদানের বিবরণ দেয়ার পর জ্বিন ও মানুষ উভয়কে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নেয়ামতগুলো অস্বীকার করার স্পর্ধা

(১) কেউ কেউ একে মদীনায় অবতীর্ণ এবং কেউ কেউ মক্কায় অবতীর্ণ সূরা মনে করেন। আমি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার মতটিকে অগ্রগণ্য মনে করি। কারণ সূরাটির বাচনভংগি ও ভাষাগত বিন্যাসে মক্কী সূরার লক্ষণ সুস্পষ্ট। সামান্য পার্থক্য বাদ দিলে এর শাব্দিক বিন্যাস সূরা রাদের মতো। সূরাটি নিয়ে আলোচনা করার সময় আমি যথাস্থানে একে মক্কী সূরা হিসেবে আখ্যায়িত করেছি এবং তার সুনির্দিষ্ট কারণগুলোও তুলে ধরেছি।

তাদের আছে কিনা। আল্লাহর এই নেয়ামতসমূহ চ্যালেঞ্জের আওতায় শুধু যে গোটা সৃষ্টিজগত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা নয়; বরং আখেরাতও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সূরার গোটা কাঠামোতে, এর তাৎপর্যময় বিরতিতে এবং উচ্চতর ও সুদূরপ্রসারী ধনাত্মক বিস্তৃতিতে উক্ত ঘোষণার সুর ঝংকৃত। ঘোষণা ও পরিচিতি দানের সুর মূর্তমান হয়ে ওঠেছে সূরাটির আলোড়ন সৃষ্টিকারী সূচনাতেও। একটি মাত্র শব্দ 'আর রাহমান' দিয়ে এমন ভংগিতে সূরাটির সূচনা করা হয়েছে যে, শ্রোতা এর পরবর্তী বক্তব্য শোনার জন্যে ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করতে থাকে। 'আর রাহমান' একটি মাত্র শব্দ, যার অর্থের মধ্যে রয়েছে দয়া, কৃপা ও করুণা, আর যার ধ্বনিতে রয়েছে ঘোষণার সুর। এই সূচনার পরেই সমগ্র সূরা জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে আল্লাহর দয়া ও কৃপার বিবরণ এবং দয়াময়ের নেয়ামত ও অবদানসমূহের উপস্থাপনা।

আল্লাহর এই নেয়ামতসমূহের বিবরণ শুরু হয়েছে কোরআন শিক্ষাদানের উল্লেখের মধ্য দিয়ে। এভাবে কোরআন শিক্ষাদানকে মানব জাতির ওপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় দান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমনকি এটিকে স্বয়ং মানুষের সৃষ্টি এবং তাকে বাকশক্তি ও বিশ্লেষণ শক্তি প্রদানেরও আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআনের শিক্ষাদানজনিত অবদানের পরই উল্লেখ করা হয়েছে মানব সৃষ্টি ও মানুষকে সবচেয়ে বড় মানবীয় গুণ বাকশক্তি ও বিশ্লেষণ শক্তি প্রদানের বিষয়টি। এরপর একে একে এসেছে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, তরুলতা, সুউচ্চ আকাশ, সুপ্রতিষ্ঠিত দাঁড়িপাল্লা, পৃথিবী ও তার পৃষ্ঠে উৎপন্ন ফল, ফুল, খেজুর ও ফসলাদি, জ্বিন, মানুষ, দুই উদয়াচল, দুই অস্তাচল, দুই সমুদ্র, যার মাঝখানে অলংঘনীয় ব্যবধান রয়েছে, সমুদ্রের মধ্য থেকে নির্গত মূল্যবান রত্নরাজি এবং তার ওপর দিয়ে চলাচলকারী নৌযানসমূহের বিবরণ।

এ সব প্রধান প্রধান নিদর্শনের উল্লেখের পর উপস্থাপিত হয়েছে এই গোটা সৃষ্টির সার্বিক ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার দৃশ্য। আর গোটা সৃষ্টির ধ্বংসের পর চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী মহান স্রষ্টা আল্লাহর অম্লান অক্ষয় সত্ত্বাকে দেখানো হয়েছে। তাঁরই স্বাধীন সার্বভৌম ইচ্ছার কাছে গোটা সৃষ্টি বিনয়াবনত ও আত্মসমর্পিত।

সমগ্র সৃষ্টিজগতের চূড়ান্ত ধ্বংস ও স্রষ্টার চিরঞ্জীব চির অক্ষয় থাকার বিবরণ দেয়ার পর জ্বিন ও মানব জাতিকে লক্ষ্য করে উচ্চারিত হয়েছে ভীতিপ্রদ হুমকি ও মহাজাগতিক চ্যালেঞ্জ।

'ওহে দুই জাতি (জ্বিন ও মানব), অচিরেই আমি তোমাদের জন্যে একাগ্রচিত্ত হয়ে যাবো, ... হে জ্বিন ও মানব জাতি, তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমারেখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়ে থাকো, তবে অতিক্রম করো। বিশেষ ক্ষমতা ব্যতীত কখনো অতিক্রম করতে পারবে না।'

এরপর থেকে দেখানো হয়েছে সৃষ্টিজগতের ধ্বংস তথা কেয়ামতের দৃশ্য। একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের আকারে তা দেখানো হয়েছে। আকাশের দৃশ্যকে একটি লাল তরল পদার্থের আকারে তুলে ধরা হয়েছে। দেখানো হয়েছে অপরাধীদের আযাবের দৃশ্য এবং অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে আল্লাহভীরুদের উত্তম প্রতিদানের। অবশেষে এই বলে নেয়ামতের বিবরণের উপসংহার টানা হয়েছে, 'তোমার মহামহিম ও মহাপরাক্রমশালী প্রভুর নাম কল্যাণময় হোক।'

গোটা সূরাই যে বিশাল সৃষ্টির উন্মুক্ত প্রান্তরে আল্লাহর নেয়ামতসমূহের বিবরণ ও ঘোষণা স্বরূপ, তা আগেই বলেছি। মহান আল্লাহর সুউচ্চ দরবার থেকেই এ ঘোষণা এসেছে। এ ঘোষণায় গোটা সৃষ্টিজগত প্রতিধ্বনিত হয় এবং সৃষ্টিজগতের সকল প্রাণী ও বস্তু তা প্রত্যক্ষ করে থাকে।

তাফসীর

আয়াত ১-২৫

এবারে সূরাটির ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করছি।

'আর রাহমান' অর্থাৎ পরম দয়ালু।

এই শব্দটির সুদূরপ্রসারী সুরে গোটা সৃষ্টিজগত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। গোটা আকাশ ও পৃথিবী আলোড়িত। প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয় ও কান এতে ঝংকৃত ও উদ্দীপিত।

মানবজাতির শিক্ষার উৎস

এরপর গোটা বিশ্বজগত যেন পরবর্তী বক্তব্য শোনার অধীর প্রতীক্ষায় হয়ে পড়ে নিঝুম নিস্তব্ধ। আর তখনি আসে প্রতীক্ষিত সেই বক্তব্য, যার জন্যে গোটা সৃষ্টির বিবেক ব্যাকুল,

'তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। ... অতপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?'

এ হচ্ছে দয়াময় আল্লাহর নেয়ামতরাজির বিবরণ সম্বলিত সূরার প্রথম অংশ। পূর্বোক্ত ঘোষণার পর এ হচ্ছে তার প্রথম বক্তব্য।

'তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।'

মানব জাতির ওপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে কোরআন। বিশ্বজগতের কাছে প্রেরিত আল্লাহর বাণীসমূহের পূর্ণাংগ ও সঠিক বাহন হচ্ছে কোরআন। কোরআন হচ্ছে পৃথিবীবাসীর জন্যে প্রদত্ত আল্লাহর সেই বিধান, যা পৃথিবীবাসীকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সংযুক্ত করে এবং বিশ্বজগত যে অটল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তার ওপর মানব জাতির আকীদা বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, জীবনপদ্ধতি ও জীবনাচারকে প্রতিষ্ঠিত করে, আর এর মাধ্যমে তাকে দেয় শান্তি, পরিতৃপ্তি এবং বিশ্ব প্রকৃতির সাথে গড়ে তোলে তার সমঝোতা ও সখ্যতা।

যে কোরআন তাদের আবেগ অনুভূতিকে এই মনোরম বিশ্ব প্রকৃতির ওপর উন্মুক্ত ও অবারিত করে দেয়, সেই কোরআন যেন এবারই সর্বপ্রথম তাদের প্রত্যক্ষ করছে এবং তার নিজের সত্ত্বার প্রতি ও তার পারিপার্শ্বিক সৃষ্টির প্রতি মানব জাতির অনুভূতি ও চেতনাকে সজাগ সতেজ করে তুলছে। শুধু তাই নয়, তার পারিপার্শ্বিক প্রতিটি বস্তুকে এমন সক্রিয় ও সজীব করে তুলছে যে, তা মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে ও সাড়া দেয়। ফলে মানুষ এই পৃথিবীতে অবস্থান করা ও চলাফেরার সময় নিজেকে অচেতন পদার্থসমূহের মধ্যে নয়; বরং জীবন্ত সাথী ও বন্ধুদের মধ্যে অবস্থানরত বলে অনুভব করে।

এই কোরআনই তো মানুষের অন্তরে এই অনুভূতির সৃষ্টি করে যে, সে পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি, আল্লাহর কাছে সম্মানিত এবং যে আমানত বহন করতে আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড় পর্বত ভয় পেয়েছিলো, তারা সেই আমানতেরই বাহক। অতপর তাদের শিক্ষা দেয় কিভাবে তাদের মনুষ্যত্বের মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা যায়। কোরআন তাদের একমাত্র উপকরণ ঈমানকে কাজে লাগিয়ে তা উচ্চতম মানে উন্নীত করতে শেখায়। এই ঈমান তাদের আত্মায় আল্লাহর উজ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করে এবং তার সর্ববৃহৎ নেয়ামতকে মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত করে।

এ জন্যেই মানব সৃষ্টির আগে কোরআন শিক্ষাদানের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা কোরআন শিক্ষালাভের পরই মানুষের জীবনে ও সত্ত্বায় প্রকৃত মনুষ্যত্ব বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

মানুষকে কথা বলার ক্ষমতা দান

'তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা শিখিয়েছেন।' এখানে প্রথমে যে মানব সৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখছি। কেননা, কিছু পরেই যথাস্থানে এর আলোচনা আসছে। এখানে মানব সৃষ্টির উল্লেখ করার উদ্দেশ্যই হলো এর অব্যবহিত পরে উল্লিখিত বাকশক্তি ও বর্ণনা শক্তি প্রদান।

মানুষের কথা বলা, কোনো কিছুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা, বর্ণনা দেয়া, সমঝোতা করা, আলাপ বিনিময় করা আমাদের কাছে সুপরিচিত। আমরা অনবরতই মানুষকে কথাবার্তা বলতে দেখে থাকি। দীর্ঘকাল ধরে এটা দেখতে থাকার কারণে আমরা ভুলে গেছি যে, এটা কত বড় একটা দান এবং কত বড় একটা অলৌকিক শক্তি। তাই কোরআন আমাদের এই জিনিসটা নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে বিভিন্ন জায়গায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

এখন প্রশ্ন এই যে, মানুষ কী? তার উৎস কোথায়? কিভাবে তার সৃষ্টির সূচনা হয়েছে এবং কিভাবে তাকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা শেখানো হয়? মানুষের মূল হলো একটি মাত্র জীবকোষ, যার জীবনের সূচনা ও উৎপত্তি ঘটে জরায়ুতে এবং যা এতো ক্ষুদ্র, এতো সূক্ষ্ম এবং এতো নগণ্য যে, শুধুমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েই তা দেখা যায়। শুরুতে তার অবস্থা এমন থাকে যে, তার কথা বলা তো দূরের কথা, সে সহজে দৃষ্টিগোচরই হয় না।

অথচ এই কোষ অচিরেই একটি সজীব দেহের রূপ ধারণ করে। গর্ভস্থ এই মানবদেহ কোটি কোটি কোষের সমষ্টি। এসব কোষ নানা রকমের। কোনোটি কঠিন অস্থি সংক্রান্ত, কোনোটি কোমল অস্থি সংক্রান্ত, কোনোটি মাংস সংক্রান্ত, কোনোটি স্নায়ু সংক্রান্ত এবং কোনোটি চর্ম সংক্রান্ত ইত্যাদি। এ সব কোষ থেকেই উৎপত্তি ঘটে অংগ প্রত্যংগের, ইন্দ্রিয়সমূহের এবং তাদের বিস্ময়কর কাজ যথা শ্রবণ, দর্শন, আস্বাদন, ঘ্রাণ লওয়া, স্পর্শ করা এবং সবচেয়ে অলৌকিক ও বিস্ময়োদ্দীপক কাজ উপলব্ধি করা, বর্ণনা করা বা কথা বলা, অনুভব করা ও প্রজ্ঞা। এসব কিছুই জন্ম লাভ করে এই একটি মাত্র অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য, অদৃষ্টিগোচর ও অবলা কোষ থেকে।

কিভাবে ও কোথা থেকে এটা সম্ভব? একমাত্র পরম দয়ালু (আর রাহমান) আল্লাহর পক্ষ থেকে ও তাঁরই নিপুণ কর্ম দ্বারা এটা সম্ভব হয়ে থাকে।

এবার দেখা যাক, কিভাবে মানুষের কথা বলার বা বর্ণনা করার শক্তির উৎপত্তি ঘটে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের জননীদের উদর থেকে বের করেছেন। সে সময়ে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের জন্যে কান, চোখ ও অন্তর বানিয়ে দিয়েছেন।'

শুধু কথা বলার শক্তি ও অংগ প্রত্যংগ সৃষ্টি করাই এমন এক অপার বিস্ময় যা ভেবে কূল কিনারা পাওয়া যায় না। যে অংগগুলো একত্রিত হয়ে মানুষের কথা বলা ও উচ্চারণ করার কাজটি সম্পন্ন করে তা হচ্ছে, জিহ্বা, দুই ঠোঁট, চোয়াল, দাঁত, গলা, আলা জিহ্বা, শ্বাসনালী ও ফুসফুস। এ অংগগুলো দ্বারা শব্দ উচ্চারণের জটিল যান্ত্রিক কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে মাত্র, যা পরবর্তী পর্যায়ে কান, মগয ও স্নায়ুমন্ডলীর সাথেও সম্পৃক্ত হয়ে থাকে, অতপর বিবেক বা বুদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। এই বিবেক জিনিসটা যে কী, তা আমাদের অজানা। আমরা শুধু এর নামই জানি। এর মূল রহস্য কী জানি না। এমনকি এর কাজ কী এবং কাজের পদ্ধতি কী তাও প্রায় আমাদের অজানা।

কিভাবে একজন মানুষ একটি শব্দ উচ্চারণ করে?

এটি একটি জটিল কাজ। অনেকগুলো স্তর পার হয়ে, অনেকগুলো সরঞ্জাম ব্যবহার করে ও অনেকগুলো তৎপরতা চালিয়ে এ কাজটি সম্পন্ন করা হয়। সেসব স্তর ও সরঞ্জামের অনেকগুলোই এখনো অজানা ও গোপন।

কাজটি শুরু হয় এভাবে যে, প্রথমে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। অতপর এই অনুভূতি বিবেক বা বোধশক্তি বা আত্মা থেকে কার্যকর অনুভব যন্ত্র হিসেবে মস্তিষ্কে স্থানান্তরিত হয়। কিভাবে হয় তা কেউ জানে না। মতান্তরে মস্তিষ্ক স্নায়ুমন্ডলীর মাধ্যমে কাংখিত বাক্যটি বলার আদেশ প্রেরণ করে। এই শব্দটি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই শিখিয়েছেন এবং তিনিই এর অর্থও জানিয়ে দিয়েছেন। এই পর্যায়ে ফুসফুস তার অভ্যন্তরে সঞ্চিত বাতাসের খানিকটা বের করে দেয়। এই বাতাসটুকু শ্বাসনালী দিয়ে কণ্ঠনালীতে ও তার বিস্ময়কর যন্ত্রগুলোতে পৌছে। এই যন্ত্রগুলোর সাথে মানুষের তৈরী কোনো যন্ত্রপাতির তুলনা হয় না। এমনকি শব্দ উচ্চারণে ব্যবহৃত সকল অংগ প্রত্যংগ থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অতুলনীয়। এখানে যে বাতাস পৌছে তা কণ্ঠে এক শব্দের সৃষ্টি করে। অতপর বিবেক নিজের ইচ্ছামত সে শব্দের রূপান্তর ঘটায়। বিবেকই তাকে বিকট, কিংবা ছোট, দ্রুত কিংবা ধীরগতি সম্পন্ন এবং কর্কশ কিংবা সুরেলা শব্দে পরিণত করে। অতপর কণ্ঠনালীর সাথে জিহ্বা, ঠোঁট, চোয়াল ও দাঁত মিলিত হয়ে উক্ত শব্দকে সুনির্দিষ্ট অক্ষরের আকারে উচ্চারিত করে। বিশেষত জিহ্বার বিভিন্ন স্থানে এসে তা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। এ হচ্ছে একটি মাত্র শব্দ তৈরীর প্রক্রিয়া। এরপর রয়েছে বাক্য তৈরী, বিষয় নির্বাচন, ধ্যান ধারণা ও পূর্ববর্তী বা পরবর্তী আবেগ অনুভূতি নির্ণয়ের কাজ। এর প্রতিটিই এক একটা বিচিত্র জগত, যা এই বিস্ময়কর প্রাণী মানুষের ভেতরে জন্ম লাভ করে। এটা একমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ফলেই জন্ম লাভ করে থাকে।

আল্লাহর প্রতি সেজদাবনত মহাবিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টি

এরপর প্রাকৃতিক জগতে দয়াময় আল্লাহর বদান্যতার নিদর্শন স্বরূপ বিভিন্ন নেয়ামতের বিবরণ দেয়া অব্যাহত রয়েছে।

'সূর্য চন্দ্র পরিকল্পনা মোতাবেক অবস্থানে রয়েছে।'

অর্থাৎ এ দুটি জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি ও আবর্তন ক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধনে এমন নিপুণ ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনা প্রতিভাত হয়, যা ভাবলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়।

সূর্য যে আকাশের সবচেয়ে বড় জ্যোতিষ্ক, তা নয়। এই অতলান্ত মহাশূন্যে কোটি কোটি নক্ষত্রও রয়েছে। তন্মধ্যে বহু সংখ্যক নক্ষত্র রয়েছে সূর্যের চেয়েও বৃহত্তর, উজ্জ্বলতর ও উত্তপ্ততর। 'লুব্ধক' নামক নক্ষত্রটি তো সূর্যের চেয়ে বিশ গুণ বড় এবং তার আলো সূর্যের আলোর চেয়ে পঞ্চাশ গুণ বেশী উজ্জ্বল। অনুরূপভাবে 'অগস্ত্য' তারা আকারে সূর্যের চেয়ে আশি গুণ বড় এবং তার আলো সূর্যের তুলনায় আটশ গুণ বেশী উজ্জ্বল। আর 'স্বাতি' নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে আড়াই হাজার গুণ বেশী শক্তিশালী। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে আমরা যারা ক্ষুদ্র পৃথিবী গ্রহের অধিবাসী, তাদের জন্যে সূর্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নক্ষত্র। পৃথিবী ও তার অধিবাসীরা সূর্যের আলো, তাপ ও মাধ্যাকর্ষণের ওপরই টিকে আছে।

অনুরূপভাবে চন্দ্র পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র উপগ্রহ হলেও পৃথিবীর জীবনে তার প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রে জোয়ার ভাটা সৃষ্টিতে চন্দ্র সবচেয়ে কার্যকর উপকরণ।

সূর্যের আকার ও আয়তন, তার তাপমাত্রা, আমাদের থেকে তার দূরত্ব, নির্দিষ্ট আকাশে তার আবর্তন, চন্দ্রের আকার ও আয়তন, তার দূরত্ব ও আবর্তন এ সবকে পৃথিবীর ওপর উ[illegible] প্রভাব

বিবেচনা করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে মহাশূন্যে অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিবেচনা করে এ দুটির অবস্থান পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমাদের পৃথিবী গ্রহের সাথে ও পৃথিবীতে অবস্থানকারী বিভিন্ন জীব এবং জীবনের সাথে সূর্য ও চন্দ্রের সম্পর্ক কতোখানি, সে সংক্রান্ত সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশের একটি দিক এখানে তুলে ধরছি।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯ কোটি ২৫ লক্ষ মাইল। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব যদি এর চেয়ে কম হতো, তাহলে পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতো, অথবা বাষ্পে পরিণত হয়ে শূন্যে বিলীন হযে যেতো। আর যদি তার দূরত্ব এর চেয়ে একটু বেশী হতো, তাহলে পৃথিবীর সব কিছু জমে বরফ হয়ে যেতো। সূর্যের যেটুকু তাপ আমরা পাই, তা তার উত্তাপের ২০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই সামান্য পরিমাণ তাপই আমাদের জীবনের জন্যে উপযোগী ও মানানসই। 'লুব্ধক' নক্ষত্রটি যে তাপ ও আকৃতির অধিকারী, তাতে ওটা যদি সূর্যের স্থানে থাকতো, তাহলে পৃথিবী বাষ্পে পরিণত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেতো।

অনুরূপভাবে চন্দ্রের বর্তমান আকৃতি এবং পৃথিবী থেকে তার দূরত্বের বিষয়টিও ভেবে দেখার মতো। ওটা যদি আরো বড় হতো, তাহলে ওর প্রভাবে এখন সমুদ্রে যে জোয়ার হয়ে থাকে, তা ভয়াবহ বন্যার রূপ নিয়ে পৃথিবীর সব কিছুকে ডুবিয়ে দিতো। অনুরূপভাবে চন্দ্রকে আল্লাহ তায়ালা বর্তমানে যে স্থানে রেখেছেন, তার চেয়ে যদি পৃথিবীর আরো কাছাকাছি কোথাও রাখতেন, তাহলেও একই দশা হতো, কিন্তু আল্লাহর হিসাবে এক চুল পরিমাণও ভুল হয় না।

পৃথিবীর জন্যে সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণ-শক্তি মহাবিশ্বে পৃথিবীর অবস্থান ও সৌরমন্ডলীয় কক্ষপথে তার আবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই কক্ষপথে আমাদের এই সৌরমন্ডল ঘন্টায় ২০ হাজার মাইল বেগে একই দিকে ছুটে চলে। অথচ কোটি কোটি বছর ধরে এভাবে চলা সত্ত্বেও কক্ষপথে কখনো সে কোনো নক্ষত্রের মুখোমুখি হয়নি।

এই বিশাল মহাশূন্যে কোনো নক্ষত্রের কক্ষপথ এক চুল পরিমাণও বাঁকা হয় না এবং কোনো কিছুর আকৃতিতে এবং আবর্তনে সমন্বয় ও ভারসাম্য বিন্দু পরিমাণও ব্যাহত হয় না।

তাই আল্লাহর এ উক্তি, 'সূর্য ও চন্দ্র পরিকল্পিত অবস্থানে রয়েছে' সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব।

'আর নক্ষত্র ও বৃক্ষ সাজদা করে।'

ইতিপূর্বে যা কিছু বলা হয়েছে তা ছিলো মহাবিশ্বের বিনির্মাণে পরিকল্পনা ও হিসাব সংক্রান্ত। আর এখন বলা হচ্ছে মহাবিশ্বের লক্ষ্য ও গন্তব্য সম্পর্কে। এখানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

মহাবিশ্ব তার স্রষ্টার সাথে দাসত্ব ও বন্দেগীর বন্ধনে আবদ্ধ। নক্ষত্র ও বৃক্ষ এরই দুটো দৃষ্টান্ত। এ দুটো দৃষ্টান্ত গোটা বিশ্বের লক্ষ্য ও গন্তব্যের সন্ধান দেয়। তাফসীরকাররা 'নাজম' শব্দটির দু'রকম ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন, এর অর্থ নক্ষত্র। আবার অন্যরা বলেছেন, এর অর্থ লতা জাতীয় গাছ। উভয় ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের মূল বক্তব্য একই দাঁড়ায়। অর্থাৎ মহাবিশ্বের গন্তব্য ও লক্ষ্যই এ আয়াতের বক্তব্য।

মহাবিশ্ব একটি আত্মাবিশিষ্ট জীবন্ত সৃষ্টি। এই আত্মার আকৃতি ও প্রকৃতি এক এক সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক এক রকম। তবে তার মূল স্বরূপ একই।

মানব হৃদয় প্রাচীনকাল থেকেই গোটা সৃষ্টিজগতে কার্যকর এই জীবনের অস্তিত্ব অনুভব করেছে। এও অনুভব করেছে যে, গোটা সৃষ্টি তার স্রষ্টার কাছে বিনয়াবনত। এটাকে সে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেছে। তবে যখনই সে নিজের ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত

অভিজ্ঞতার খাঁচায় বন্দী বিবেক দ্বারা এটাকে বুঝার চেষ্টা করেছে, তখনই তা তার কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে।

সাম্প্রতিককালে সে বিশ্বজগতের উৎপত্তিগত একক সংক্রান্ত সত্যের প্রান্তসীমার কাছাকাছি পৌঁছতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই পন্থায় সে বিশ্বের জীবন্ত আত্মার নাগাল এখনও পায়নি।

আজকের বিজ্ঞান ধরে নিয়েছে যে, পরমাণুই বিশ্বজগতের উৎপত্তিগত একক এবং এই পরমাণু আসলে নিছক আলো ছাড়া আর কিছু নয়। আর গতি হচ্ছে বিশ্বজগতের নিয়ম এবং তার সকল সদস্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

এখন প্রশ্ন জাগে, যে গতি বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য, তার ওপর ভর করে সে কোন্ গন্তব্যের দিকে ধাবমান? কোরআন জবাব দেয় যে, বিশ্ব প্রকৃতি তার আত্মার গতিশীলতা কাজে লাগিয়ে আপন স্রষ্টার দিকে ধাবমান। বস্তুত আত্মার এই গতিই আসল গতি ও আসল তৎপরতা। তার বাহ্যিক গতিশীলতা তার আত্মার তৎপরতারই প্রতীক। এই গতি ও তৎপরতার কথা কোরআনের বহু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত– 'নক্ষত্র ও বৃক্ষ সাজদা করে' অনুরূপ একটি আয়াত। তাছাড়াও রয়েছে সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াত সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং এখানে যা কিছু আছে, সকলে আল্লাহর গুণগান করে, এমন কোনো জিনিস নেই, যা আল্লাহর প্রশংসা সহকারে গুণকীর্তন করে না, তবে তোমরা তাদের গুণকীর্তন করা বুঝতে পারো না।' এবং সূরা নূরের আয়াত 'তুমি দেখোনি যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে এবং সারিবদ্ধ পাখিকুল আল্লাহর তাসবীহ করে? সকলেই নিজ নিজ তাসবীহ ও নামায জেনে নিয়েছে।'

এই সত্যটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে এবং বিশ্ব প্রকৃতি কর্তৃক আল্লাহর তাসবীহ ও এবাদাত পর্যবেক্ষণ করলে মানব হৃদয় এক বিস্ময়কর সম্পদ লাভ করে। তার আশপাশের সব কিছু তার কাছে জীবন্ত, আপন স্রষ্টার অনুগত ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধসম্পন্ন এবং সকল জিনিসকে তার নিজের বন্ধু ও ভাই বলে মনে হয়।

বস্তুত এটি অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথা।

'আকাশকে তিনি উর্ধ্বে তুলেছেন এবং দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন .....'

মহাবিশ্বের বিভিন্ন দৃশ্যের কথা কোরআন অন্যত্র যে রূপ উল্লেখ করেছে, এখানে আকাশের কথাও সেভাবেই উল্লেখ করেছে। এ দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো মানুষের উদাসীন মনকে সচেতন করা। এ বিশ্বের বিশালত্ব, সমন্বয় ও চমৎকারিত্বের প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ এবং যে সত্ত্বা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তাঁর অপার ক্ষমতা সম্পর্কে তাকে অবহিতকরণ।

আকাশ বলতে যাই বুঝানো হোক না কেন, তার উল্লেখ এই কূল-কিনারাহীন মহাবিশ্বের দিকে মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। মহাশূন্যে বিচরণ করে কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র। অথচ একটি নক্ষত্র কখনো অপরটির মুখোমুখি হয় না। একটি নক্ষত্রপুঞ্জ অপর নক্ষত্রপুঞ্জের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। কখনো কখনো এসব নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্রের সংখ্যা হাজার কোটিতে গিয়ে পৌঁছে। উদাহরণস্বরূপ, যে ছায়াপথে আমাদের সৌরমন্ডল অবস্থিত, তার উল্লেখ করা যায়। এখানে সূর্যের চেয়ে ছোট এবং তার চেয়ে হাজার গুণ বড় নক্ষত্রও রয়েছে। তেরো কোটি কিলোমিটারের চেয়েও বেশী যে সূর্যের ব্যাস, সেই সূর্য ছাড়াও এখানে রয়েছে অসংখ্য নক্ষত্র এবং ছায়াপথ। এরা সবাই মহাবিশ্বে অকল্পনীয় দ্রুতগতিতে প্রদক্ষিণ করছে। অথচ এই মহাবিশ্বে বিন্দুর মতো বিচরণশীল এ অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রে কখনো কোনো সংঘর্ষ বাধে না।

এতো বিশাল আকাশকে উর্ধ্বে তুলে ধরার পাশাপাশি মহান আল্লাহ 'দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন।' অর্থাৎ সত্যের মানদন্ড সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাতে ব্যক্তি, ঘটনা ও বস্তুর প্রকৃত মূল্য এবং মান নির্ণয় করা যায়, যাতে এগুলোর মান নিরূপণে বিঘ্ন না ঘটে এবং স্বার্থ মূর্খতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে এগুলোর মান বিপর্যস্ত না হয়। এই দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন মানুষের স্বভাবে এবং কোরআন ও নবীদের আনীত এই বিধানে–

'যেন তোমরা দাঁড়িপাল্লায় বাড়াবাড়ি না করো,' অর্থাৎ সীমা অতিক্রম না করো, উগ্রতা প্রদর্শন না করো। 'ন্যায় সংগতভাবে পরিমাপ করো এবং দাঁড়িপাল্লায় কম মেপো না।' এভাবেই দাঁড়িপাল্লা ন্যায়সংগতভাবে স্থিতিশীল থাকে, বাড়াবাড়ি ও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায় না।

এভাবেই সত্য পৃথিবীতে ও মানব জীবনে বিশ্ব-জগতের গঠন এবং শাসন প্রক্রিয়ার সাথে ও আকাশের সাথে সুসমন্বিত হয়, এই আকাশ থেকেই ওহী নাযিল হয় ও আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হয়।

'আর পৃথিবীকে তিনি মানব জাতির জন্যে স্থাপন করেছেন ......'

আমরা দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর ওপর অবস্থান করার কারণে অনুভব করি না যে, কোন্ শক্তিশালী হাত এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের এর ওপর নিশ্চিন্ত মনে স্থিতিশীল হয়ে বসবাস করতে দিয়েছেন। এই নিশ্চিন্ত অবস্থানের প্রকৃত মূল্য আমরা উপলব্ধি করি কেবল তখনই, যখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা ভূমিকম্প পৃথিবীকে তছনছ করে দেয়।

মানুষের উচিত প্রতি মুহূর্তে এই সত্য উপলব্ধি করা। তদের ভাবা উচিত, যে পৃথিবীতে তারা বসবাস করে, তা আল্লাহর বিশাল মহাশূন্যে সন্তরণরত একটি ধূলিকণার চেয়ে বেশী কিছু নয়। এই ধূলিকণাটি নিজেকে কেন্দ্র করে ঘন্টায় হাজার মাইল এবং সূর্যের চার পাশে ঘন্টায় ষাট হাজার মাইল বেগে ঘুরে। আর এই গোটা সৌরমন্ডল এই মহাশূন্যে ঘন্টায় বিশ হাজার মাইল বেগে আপন গন্তব্যের দিকে ছুটে চলেছে।

মানুষ যদি এ কথা চিন্তা করতো যে, এই সন্তরণরত ক্ষুদ্র ধূলিকণাটির ওপরই তার অবস্থান, তাহলে তার হৃদয় ও চক্ষুদ্বয় এবং অন্তরাত্মা ও দেহের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় এই অনুভূতি জাগতো, একমাত্র মহান আল্লাহ নিজের অশেষ কৃপায় এই পৃথিবীতে তাদের টিকিয়ে রেখেছেন।

আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অথচ পৃথিবী নিজের চার পাশে ও সূর্যের চার পাশে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আবর্তনশীল। শুধু থাকার ব্যবস্থা নয়, তার জীবিকার ব্যবস্থাও করেছেন এখানে। এ প্রসংগে খেজুর বাগানের উল্লেখ করেছেন এবং তার কাঠামোগত সৌন্দর্য এবং ফলের উপকারিতারও উল্লেখ করেছেন। প্রসংগত তিনি এমন সব উৎপন্ন ফসলেরও উল্লেখ করেছেন, যার কোনোটা মানুষের খাদ্য, কোনোটা পশুর খাদ্য, কোনোটা মানুষের জন্যে আরাম ও ভোগের উপকরণ এবং কোনোটা সুগন্ধিযুক্ত।

মানব ও জ্বিন জাতির বিস্ময়কর সৃষ্টি প্রক্রিয়া

এভাবে আল্লাহর অনেকগুলো নেয়ামত যথা কোরআন শিক্ষাদান, মানব সৃষ্টি, তাকে ভাষা ও বর্ণনা শিক্ষাদান, সূর্য ও চন্দ্রকে সুপরিকল্পিত অবস্থানে স্থাপন, আকাশকে উর্ধ্বে স্থাপন, দাঁড়িপাল্লা স্থাপন, পৃথিবী এবং তার ফলমূল ফসলাদি সৃষ্টির উল্লেখ করার পর আল্লাহ তায়ালা জ্বিন ও মানব জাতিকে জিজ্ঞেস করছেন, অতপর তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামত তোমরা অস্বীকার করবে?' বস্তুত এ ক্ষেত্রে জ্বিন ও মানব জাতি কর্তৃক আল্লাহর কোনো নেয়ামত অস্বীকার করার অবকাশ থাকে না।

প্রাকৃতিক নেয়ামতসমূহের বিবরণ দেয়ার পর এবার আল্লাহ জ্বিন ও মানুষের নিজ সত্ত্বার ভেতরে যেসব নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন তার বিবরণ দিচ্ছেন।

'তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুকনো মাটি থেকে, ...।'

বস্তুত সৃষ্টিই হচ্ছে আসল নেয়ামত। অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার মাঝে যে দূরত্ব, তা এতো বড় যে, মানুষের জানা কোনো পরিমাপযন্ত্র দ্বারা তা নির্ণয় করা যায় না। যে সকল পরিমাপযন্ত্র মানুষের আয়ত্তাধীন বা মানুষের বোধশক্তির নাগালের অধীন, তা শুধু অস্তিত্বশীল জিনিসসমূহের পারস্পরিক পার্থক্য ও তারতম্যই নিরূপণ করতে সক্ষম। অস্তিত্বশীল ও অস্তিত্বহীনের মধ্যে যে পার্থক্য তা মানবীয় বিবেকবুদ্ধি বা পরিমাপকযন্ত্র কোনো অবস্থাতেই নির্ণয় করতে পারে না। জ্বিনদের অবস্থাও তথৈবচ, তারাও এমন এক সৃষ্টি, যার হাতে শুধু সৃজিত তথা অস্তিত্বশীল জিনিস পরিমাপ করার যন্ত্রই আছে।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যখন জ্বিন ও মানব জাতির সামনে তাদের সৃষ্টিকে নিজের নেয়ামত বা অবদান হিসাবে উল্লেখ করেন, তখন সেই নেয়ামতটিই উল্লেখ করেন, যা সম্পূর্ণরূপে মানুষের ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত।

অতপর আল্লাহ তায়ালা জ্বিন ও মানুষের সৃষ্টি উপাদানেরও উল্লেখ করেন। এটিও আল্লাহরই সৃষ্টি। 'সালসাল' হচ্ছে এমন শুকনো মাটি, যার একটিকে আর একটি দিয়ে আঘাত করলে শব্দের সৃষ্টি হয়। এটা কাদা মাটি বা সাধারণ মাটি থেকে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মাঝের একটি স্তরবিশেষও হতে পারে। এ দ্বারা একথাও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে যে, প্রকৃতির উপাদানসমূহের মাঝে মানুষ ও মাটির সৃষ্টির উপাদান এক অভিন্ন।

'আল্লাহ ও আধুনিক বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থের আরবী সংস্করণ ১৮০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, যেসব উপাদান দ্বারা মাটির সৃষ্টি হয়েছে, মানবদেহের সৃষ্টিও হয়েছে সেসব উপাদান দিয়েই। মানবদেহ গঠিত হয়েছে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, ম্যাংগানিজ, তামা, কোবাল্ট, জিংক, সিলিকন, এলোমিনিয়াম, আয়োডিন, ফ্লোরাইড ও ক্লোরোফিল দ্বারা। মাটিও ঠিক এই উপাদানগুলো দিয়েই তৈরী। এসব উপাদানের অনুপাতে এক মানুষের সাথে অন্য মানুষের এবং মাটি ও মানুষের মাঝে তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে এগুলোর মাঝে কোনো প্রভেদ নেই।' তাই বলে বিজ্ঞানের প্রমাণিত এই তত্ত্ব হুবহু কোরআনের ব্যাখ্যা বলে আবশ্যিকভাবে মেনে নেয়া যাবে না। কেননা, কোরআনের বক্তব্য দ্বারা বিজ্ঞানের এই তত্ত্বও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে, আবার অন্য কিছুও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। মাটি, কাদা মাটি বা শুকনো মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির বহুসংখ্যক সম্ভাব্য পন্থার মধ্য থেকে অন্য কোনো একটি পন্থাও এখানে বুঝানো হয়ে থাকতে পারে।

আমরা এই কথাটার ওপর বিশেষভাবে জোর দিতে চাই যে, কোরআনের কোনো উক্তিকে কখনোই কোনো মানবীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনের মধ্যে বা কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্র বা তত্ত্বের মধ্যে সীমিত করা যাবে না। কেননা মানুষের যে কোনো তত্ত্ব বা সূত্র বা আবিষ্কার উদ্ভাবন সঠিক বা ভ্রান্ত দুইই হতে পারে এবং মানুষের জ্ঞানের বিস্তৃতি ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যম বা উপকরণের মান উন্নত হওয়া বা সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তার উদ্ভাবিত তত্ত্ব বা তথ্য পরিবর্তিত ও সংশোধিত হতে পারে। কিছু কিছু সরলমনা ও নিষ্ঠাবান গবেষক কোরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণ করার সদুদ্দেশ্য নিয়ে কোরআনের উক্তির সাথে সেসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা আবিষ্কার উদ্ভাবনের মিল

বা সংগতি প্রমাণ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে যান, যা চিন্তা গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে অথবা এখনো নিছক অনুমানের পর্যায়ে রয়েছে। তবে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও তত্ত্বের সাথে মিল বা সংগতি পাওয়া যাক বা না যাক, সর্বাবস্থায়ই কোরআন অলৌকিক ও অকাট্য সত্য। যে সকল আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও তত্ত্ব-তথ্য সর্বদাই পরিবর্তনশীল এবং সংশোধনযোগ্য, এমনকি কখনো ভুল এবং কখনো সঠিক প্রমাণিত হয়ে থাকে এবং হওয়া সম্ভব, তার মধ্যে কোরআনের উক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখা অসম্ভব। কোরআনের উক্তি সর্বদাই এই জাতীয় সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে ও তা থেকে প্রশস্ত। কোরআনের ব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবন দ্বারা কেবল এতোটুকুই উপকৃত হওয়ার অবকাশ আছে যে, প্রকৃতিতে ও মানব সত্ত্বায় বিরাজিত আল্লাহর কোনো নিদর্শনের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কোরআনে রয়েছে, কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে আমরা যখন অবিকল সে জিনিসেরই বাস্তব উপস্থিতির সন্ধান পাই, তখন আমাদের চিন্তা-চেতনায় কোরআনের এ উক্তির অর্থ অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করে, কিন্তু এটা এই নিশ্চয়তা লাভের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত এই তত্ত্ব বা তথ্যই কোরআনের এ উক্তির অনিবার্য অর্থ। এ দ্বারা শুধু এতোটুকু প্রমাণিত হয় যে, বৈজ্ঞানিক তথ্যটি হয়তো বা কোরআনের এই উক্তির অর্থের একটা অংশ।

এরপর আসে অগ্নিশিখা থেকে জ্বিন সৃষ্টির প্রসংগ। এটি মানুষের জ্ঞানের সীমা বহির্ভূত ব্যাপার। এ ব্যাপারে কোরআনই একমাত্র নিশ্চিত জ্ঞানের উৎস। আল্লাহর দেয়া তথ্য অকাট্য সত্য। কেননা, যিনি স্রষ্টা তিনিই তার সৃষ্টি সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভুল ও সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখেন। জ্বিনেরা পৃথিবীতে মানুষের সাথে জীবন যাপনে সক্ষম। তবে জ্বিনেরা কিভাবে জীবন যাপন করে তা আমরা জানি না। তবে এটা নিশ্চিত, কোরআন তাদেরও সম্বোধন করেছে। সূরা আহকাফের আয়াত 'ওয়া ইয্ সারাফনা ইলাইকা নাফারাম মিনাল জিন্নে ....' এর ব্যাখ্যার সময় আমি এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছি। এখানে সূরা আর রাহমানেও স্পষ্ট যে, কোরআন তাদেরও সম্বোধন করেছে।

এখানে জ্বিন ও মানুষ উভয়কে তাদের অস্তিত্ব লাভজনিত নেয়ামত স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যাকে যে জিনিস থেকেই তৈরী করে থাকুন না কেন, দুনিয়ায় তার আবির্ভূত হওয়া ও অস্তিত্ব লাভ করাটাই হলো আসল নেয়ামত। এটাই অন্য সকল নেয়ামতের ভিত্তি। এ জন্যে এটিকে উল্লেখ করে ও এর ওপর সাধারণভাবে সকলকে সাক্ষী রেখে মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'তাহলে তোমরা জ্বিন ও মানুষ জাতি তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করতে পার?' বস্তুত চাক্ষুষ দর্শনের এই পর্যায়ে অস্বীকার করার অবকাশ নেই। (তিনি) উভয় উদয়াচল এবং উভয় অস্তাচলের প্রভু। অতএব, তোমরা আল্লাহর কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?'

এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই মর্মে ইংগিত করা হয়েছে যে, বিশ্বচরাচরের যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক, সর্বত্রই আল্লাহ তায়ালা বিরাজমান। উদয়াচল ও অস্তাচল যেখানেই হোক, সেখানেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রভুত্ব, পরাক্রম, সার্বভৌম ইচ্ছা, আলো ও নির্দেশ সহকারে বিরাজমান আছেন।

দুই উদয়াচল এবং দুই অস্তাচলের অর্থ সূর্য ও চন্দ্রের উদয় অস্তের জায়গা হতে পারে। ইতিপূর্বে সূর্য ও চন্দ্রকে আল্লাহর নেয়ামত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সূত্র ধরে এখানে

উভয়ের উদয় ও অস্তের জায়গাকে বা স্বয়ং উদয়াস্তকে আল্লাহর নেয়ামত হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকতে পারে। আবার এর অর্থ গ্রীষ্ম ও শীতকালে সূর্যের দুটি উদয়াচল এবং অস্তাচলও হতে পারে।

এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, উদয়াচল ও অস্তাচল বা পূর্ব ও পশ্চিম সর্বত্রই আল্লাহ তায়ালা বিদ্যমান, তাঁর হাতেই গ্রহ-নক্ষত্ররাজির আবর্তন বিবর্তনের চাবিকাঠি এবং সর্বত্রই তাঁর আলো ও তাঁর প্রভুত্ব। এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করলে এবং পূর্ব ও পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করলে হৃদয়ে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের যে অনুভূতি জাগে, সেটাই এ আয়াতের মূল মর্মার্থ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এবং উদয়াচল ও অস্তাচলে আল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব এ বিশ্বজগতে আল্লাহর এক অন্য নেয়ামত ও দান। এ জন্যে এখানেও বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? উদয়াচল ও অস্তাচল আল্লাহর নিদর্শন হওয়া ছাড়াও জ্বিন এবং মানুষের ওপর আল্লাহর নেয়ামতও বটে। কেননা, এতে সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এমনকি এ কথা বলাও অত্যুক্তি নয় যে, প্রাণীকুলের জীবন জীবিকাও সূর্য এবং চন্দ্রের উদয়াস্তের সাথে সম্পৃক্ত ও তার ওপর নির্ভরশীল। সূর্য ও চন্দ্রের উদয়াস্ত না হলে প্রাণীকুলের জীবনপ্রবাহ অচল স্তব্ধ হয়ে যেতো।

পানি সম্পদ আল্লাহর এক তুলনাহীন নেয়ামত

মহাবিশ্বের দূরবর্তী বিষয়ের উল্লেখের পর এবার পৃথিবী ও তার পানি সম্পদের উল্লেখ করা হচ্ছে। এই সাথে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, পানি সম্পদকে আল্লাহ সুনির্দিষ্ট মান, সুনির্দিষ্ট ধরনের ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ এবং সুনির্দিষ্ট উপযোগিতা ও উপকারিতায় সমৃদ্ধ করেছেন।

'তিনি পাশাপাশি দুটি দরিয়া প্রবাহিত করেছেন, উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। অতএব, তোমরা কোন্ নেয়ামতকে ......' উল্লিখিত দুটি দরিয়া দ্বারা লোনা পানির দরিয়া ও মিষ্টি পানির দরিয়াকে বুঝানো হয়েছে। প্রথমটির মধ্যে সাগর-মহাসাগর এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে নদনদী, খালবিল ও হ্রদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা এগুলোকে পাশাপাশি চলতে দিয়েছেন, কিন্তু তারা একটি অন্যটির সাথে মিশ্রিত না হয়ে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে। কেউ কারো নির্দিষ্ট সীমা ও নির্ধারিত দায়িত্ব অতিক্রম করে না। উভয়ের মাঝখানে অন্তরাল দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টি করা প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত বিভিন্নতার অন্তরাল বুঝানো হয়েছে।

ভূপৃষ্ঠে পানির এই দ্বিধাবিভক্তি আকস্মিকভাবে ও রাতারাতি হয়নি। এটা এক বিস্ময়কর নিয়মে পরিকল্পিত ও নির্ধারিত হয়েছে। লোনা পানি পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশকে ঘিরে রেখেছে এবং এ সব জলাধারের একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত। আর শুষ্ক এক-চতুর্থাংশকেও কর্মোপযোগী রেখেছে এই লোনা পানির জলাধারসমূহ। এই বিপুল পরিমাণ লোনা পানি পৃথিবীর আবহাওয়াকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখা জীবন যাপনের উপযোগী রাখার জন্যে অপরিহার্য ছিলো।

নিউইয়র্কস্থ একাডেমী অব সাইন্সের প্রেসিডেন্ট সি মরিসন 'মানুষ একা থাকে না' (মূল ইংরেজী নাম লেখক উল্লেখ করেননি- অনুবাদক) আরবী অনুবাদ ঃ আল ইল্মু ইয়াদ্উইলাল ঈমান ('বিজ্ঞান ঈমানের দিকে ডাকে') নামক পুস্তকে লিখেছেন,

'ক্রমাগত গ্যাস- যার অধিকাংশই বিষাক্ত- উত্থিত হওয়া সত্তেও বাতাস কার্যত দূষণমুক্ত রয়েছে এবং মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে যতোটা ভারসাম্যপূর্ণ থাকা জরুরী, ততোটাই ভারসাম্যপূর্ণ রয়েছে। এই ভারসাম্য রক্ষার প্রধান চালিকাশক্তি হলো সেই বিশাল ও প্রকান্ড জলাধার, অর্থাৎ মহাসাগর।'

সূর্য কিরণের প্রভাবে এই সুবিশাল ও সুপ্রশস্ত জলাধার থেকে ক্রমাগত বাষ্প ওপরে ওঠতে থাকে। অতপর এই বাষ্প আবার ফিরে আসে এবং বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয়। এই বৃষ্টি থেকে সকল আকৃতির পানির উৎসগুলোতে মিষ্টি পানি সংরক্ষিত হয়ে থাকে। মিষ্টি পানির সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে নদনদী। মহাসাগরের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি, সূর্যের তাপ, মহাশূন্যের উচ্চতর স্তরসমূহের শীতলতা ও মহাশূন্যের অন্যান্য উপকরণের সমন্বয়ে বৃষ্টি তৈরী হয়, আর সেই বৃষ্টি থেকে সৃষ্টি হয় মিষ্টি পানির ভান্ডার। আর এই মিষ্টি পানির কল্যাণেই টিকে থাকে উদ্ভিদ, মানুষ ও প্রাণীকুলের জীবন।

প্রায় সকল নদনদীই সমুদ্রে পতিত হয়। এই নদনদী পৃথিবীর সকল লবণাক্ততা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা সত্তেও তা সমুদ্রের প্রকৃতি পাল্টে দেয় না এবং নিজের সীমা অতিক্রম করে সমুদ্রের কাজে হস্তক্ষেপ করে না। পক্ষান্তরে নদনদীতে পানির স্তর সাধারণত সমুদ্রের পানির স্তরের উর্ধ্বে থাকায় সমুদ্র তার মধ্যে পতিত হওয়া নদনদীর ওপর আগ্রাসন চালাতে এবং নিজের লোনা পানি দিয়ে নদীগুলোকে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয় না। ফলে সমুদ্র নদনদীর কাজে বাধা দেয়া ও তার স্বভাব প্রকৃতি পাল্টে দিতে সমর্থ হয় না। নদনদী ও সাগর মহাসাগরের মধ্যে এভাবেই আল্লাহ এক অলংঘনীয় প্রাচীর দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। ফলে একটি অপরটির কাজে বাধা দেয় না, বা আগ্রাসন চালায় না। সুতরাং আল্লাহর নেয়ামতসমূহের বিবরণ দান প্রসংগে মিষ্টি পানি ও লোনা পানির উৎস দুটি এবং তাদের মাঝখানের অন্তরালকে উল্লেখ করাটা মোটেই অপ্রাসংগিক বা বিস্ময়োদ্দীপক হয়নি। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা এখানে পুনরায় বলেছেন, 'তাহলে তোমরা জ্বিন ও মানুষেরা তোমাদের প্রভুর কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?'

মুক্তা ও প্রবাল সৃষ্টির তত্ত্ব

এরপর উল্লেখ করা হচ্ছে মনুষ্য জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশিষ্ট সেসব নেয়ামতের কথা, যা উভয় প্রকারের দরিয়ায় পাওয়া যায়।

'সে দুই দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।' মুক্তা আসলে এক ধরনের প্রাণী। 'আল্লাহ তায়ালা ও আধুনিক বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'সম্ভবত মুক্তা সমুদ্রের সবচেয়ে বিস্ময়কর জিনিস, সমুদ্রের সর্বনিনম্নস্তরে নেমে যায় সে একটা ঝিনুকের পেটে আশ্রয় নিয়ে, যাতে ঝিনুক তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করে। তাবত প্রাণীজগত থেকে এই প্রাণীটি আলাদা। তার দৈহিক গঠন প্রণালী ও জীবন যাপন পদ্ধতি ভিন্ন। মাছ ধরা জেলের জালের মতো তার অদ্ভুত সূক্ষ্ম জাল রয়েছে। এই জাল ফিল্টারের কাজ করে। ঝিনুকের পেটের ভেতরে পানি, বাতাস ও খাদ্য প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু পাথরের টুকরো ও বালু ইত্যাদি ঢুকতে পারে না। জালের নীচে থাকে প্রাণীটির চার ঠোঁট বিশিষ্ট অনেকগুলো মুখ। যখনই কোনো বালুকণা, পাথরের টুকরো অথবা ক্ষতিকর প্রাণী ঝিনুকের ভেতরে জোরপূর্বক ঢুকে পড়ে, অমনি প্রাণীটি নিজের ভেতর থেকে এক ধরনের পিচ্ছিল পদার্থ বের করে তা ঢেকে দেয়। তারপর জমাট বেঁধে তাকে মুক্তায় পরিণত করে। মুক্তার আকৃতি ভেতরে প্রবিষ্ট কণাটির আকৃতি অনুপাতে ছোট বা বড় হয়ে থাকে।'

আর প্রবালও আল্লাহর এক আজব সৃষ্টি। এটি সমুদ্রের পাঁচ মিটার থেকে তিনশ মিটার পর্যন্ত গভীরে বাস করে। দেহের নিম্নাংশ দ্বারা পাথর বা ঘাসের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখে। দেহের উর্ধ্বাংশে অবস্থিত তার মুখগহ্বর বহুসংখ্যক উপাংগ দ্বারা সজ্জিত, যাকে সে খাদ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করে। এই সকল উপাংগ যে শিকার ধরে, তা সাধারণত ক্ষুদ্র চিংড়ি মাছ বা অনুরূপ ক্ষুদ্র

জলজপ্রাণী হয়ে থাকে। এই উপাংগসমূহ যখনই শিকারের সংস্পর্শে আসে, তৎক্ষণাত তা অসাড় হয়ে পড়ে এবং তার সাথে যুক্ত হয়। তখন উপাংগগুলো গুটিয়ে আসে এবং মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে। এই সময় শিকার মানুষের অন্ননালী সদৃশ সংকীর্ণ নালীর মাধ্যমে ভেতরে চলে যায়।

এই প্রাণীটির বিপুল বংশ বৃদ্ধি ঘটে থাকে। এর অসংখ্য প্রজনন কোষ বাইরে এসে ডিম্বাণুগুলোকে সন্তানপ্রসূ বানায়। অতপর সেগুলো সন্তানের আকারে জন্ম নিয়ে পাথর বা লতাপাতাকে জাপটে ধরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তা স্বতন্ত্র জীবনে পরিণত হয়। তবে তা আসল প্রাণীর মতোই বাড়তে থাকে।

আল্লাহর অপার সৃজনী ক্ষমতার অন্যতম নিদর্শন স্বরূপ প্রবাল আরো একটি প্রক্রিয়ায় আপন বংশের বিস্তৃতি ঘটিয়ে থাকে। সেটা হচ্ছে একটির সাথে আরেকটি যুক্ত হয়ে বৃহৎ আকার ধারণ। এভাবে প্রবালের বৃক্ষ তৈরী হয়, যার কান্ড খুবই মযবুত ও শক্ত হয়ে থাকে। এর শাখা-প্রশাখাও খুবই মযবুত। প্রবাল বৃক্ষের উচ্চতা প্রায় ত্রিশ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। সমুদ্রের অভ্যন্তরে অনেক রং-বেরংয়ের প্রবাল দ্বীপ দেখা যায়। কোনোটা কমলা হলুদ, কোনোটা লাল খয়েরী, কোনোটা নীল যমররদ রংয়ের, আবার কোনোটা ধূসর রংয়ের হয়ে থাকে।

লাল প্রবাল হচ্ছে এই প্রাণীর জীবন্ত অংশগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর যে কঠিন অংশটি টিকে থাকে, তার নাম। এর পাথুরে কাঠামোগুলো দ্বারা চমকপ্রদ বসত গঠিত হয়।

এই সব বসতির মধ্যে রয়েছে অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত প্রবাল পর্বতমালা, যাকে বৃহৎ প্রবাল প্রাচীর নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই পর্বতমালার দৈর্ঘ এক হাজার ৩৫০ মাইল ও প্রস্থ ৫০ মাইল। এই অতি ক্ষুদ্রকায় প্রাণী দ্বারা উক্ত প্রাচীর গঠিত।'

(আল্লাহ ও আধুনিক বিজ্ঞান, আরবী সংস্করণ, পৃঃ ১০৬-১০৭)

মুক্তা ও প্রবাল থেকে বহু মূল্যবান গহনাপত্র বানানো হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ এই দুটি জিনিসকে তাঁর বিশেষ অবদান হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, 'অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?'

এরপর সমুদ্রে চলাচলকারী পাহাড়ের মত কতো বড় বড় জাহাজের উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

'আর তার জন্যে রয়েছে সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজসমূহ, যা পাহাড়ের মতো।' এই সকল নৌযানকে 'আল্লাহর জন্যে' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই চলাচল করে থাকে। সমুদ্রের অথৈ পানি ও উত্তাল তরংগমালা থেকে একমাত্র তিনিই এগুলোকে রক্ষা করে থাকেন। তিনিই এগুলোকে সমুদ্র পৃষ্ঠে ভাসমান রাখেন। তাই এগুলো তাঁর, এগুলো বান্দাদের ওপর আল্লাহর বৃহত্তম নেয়ামতগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এ দ্বারা তাদের জীবিকা উপার্জন, পরিবহন, ভ্রমণ ও কল্যাণমূলক কাজ এতো বেশী পরিমাণে সম্পন্ন হয়ে থাকে যে, তা উল্লেখ করার মতো এবং কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না। এগুলো এতো বড় ও স্পষ্ট নেয়ামত যে, তা অস্বীকার করা খুবই কঠিন। 'সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?'

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝٢٦ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝٢٧ فَبِاَيِّ
اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٢٨ يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ
شَاْنٍ ۝٢٩ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٠ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۝٣١ فَبِاَيِّ
اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٢ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا
مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝٣٣
فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٤ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا
تَنْتَصِرٰنِ ۝٣٥ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٦ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاۤءُ فَكَانَتْ
وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝٣٧ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٨ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ

রুকু ২

২৬. (যমীন ও) তার ওপর যা কিছু আছে তা সবই (একদিন) বিলীন হয়ে যাবে, ২৭. বাকী থাকবে শুধু তোমার মালিকের সত্তা– যিনি পরাক্রমশালী ও মহানুভব, ২৮. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে! ২৯. এই আকাশমন্ডলী ও ভূমন্ডলে যতো কিছু আছে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজন তাঁর কাছেই চায়; (আর) তিনি প্রতিদিন (প্রতিমুহূর্ত) কোনো না কোনো কাজে তৎপর রয়েছেন, ৩০. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে! ৩১. হে মানুষ ও জ্বিন, (এর মাঝেও কিন্তু) আমি তোমাদের (হিসাব নেয়ার) জন্যে অচিরেই সময় বের করে নেবো, ৩২. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে! ৩৩. হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়, যদি আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলের এ সীমারেখা অতিক্রম করার তোমাদের সাধ্য থাকে তাহলে (যাও! অতপর) তা অতিক্রম করেই দেখো; (কিন্তু আমার দেয়া বিশেষ) ক্ষমতা ছাড়া তোমরা কিছুতেই (এ সীমা সরহদ) অতিক্রম করতে পারবে না, ৩৪. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে! ৩৫. সেদিন তোমাদের উভয় সম্প্রদায়ের ওপর আগুনের স্ফুলিংগ ও ধোঁয়ার কুন্ডলী পাঠানো হবে, তোমরা (কিছুতেই তা) প্রতিরোধ করতে পারবে না, ৩৬. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে! ৩৭. যখন আসমান ফেটে যাবে অতপর তখন তা (লাল) চামড়ার মতো রক্তবর্ণ হয়ে পড়বে, ৩৮. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে! ৩৯. সেদিন কোনো মানুষ ও জ্বিনের (কাছ

ذَنۢبِهٖٓ اِنۡسٌ وَّلَا جَآنٌّ ۚ﴿۳۹﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۴۰﴾ یُعۡرَفُ الۡمُجۡرِمُوۡنَ

بِسِیۡمٰهُمۡ فَیُؤۡخَذُ بِالنَّوَاصِیۡ وَ الۡاَقۡدَامِ ﴿ۚ۴۱﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۴۲﴾

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِیۡ یُکَذِّبُ بِهَا الۡمُجۡرِمُوۡنَ ﴿ۘ۴۳﴾ یَطُوۡفُوۡنَ بَیۡنَهَا وَ بَیۡنَ حَمِیۡمٍ

اٰنٍ ﴿ۚ۴۴﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۴۵﴾

থেকে তার) অপরাধ সম্পর্কে (কোনো) কৈফিয়ত) জানতে চাওয়া হবে না, ৪০. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে! ৪১. অপরাধীরা তাদের (অপরাধী) চেহারা দিয়ে (সেদিন এমনিই) চিহ্নিত হয়ে যাবে, (অপরাধের নথি তাদের ললাটেই এঁটে থাকবে) এবং তাদের কপালের চুল ও পা ধরে ধরে (হাঁকিয়ে) নেয়া হবে, ৪২. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে! ৪৩. (সেদিন তাদের বলা হবে,) এ হচ্ছে সেই জাহান্নাম যাকে (এ) অপরাধী ব্যক্তিরা মিথ্যা বলতো, ৪৪. তারা (সেদিন) তার ফুটন্ত পানি ও জাহান্নামের মাঝে ঘুরতে থাকবে, ৪৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে!

তাফসীর

আয়াত ২৬-৪৫

এবার দৃশ্যমান অস্তিত্ব ও সৃষ্টি জগতের নেয়ামতের প্রদর্শনী সমাপ্ত করে ধ্বংস রাজ্যের নেয়ামতসমূহের প্রদর্শনী শুরু করা হচ্ছে। তাই বলা হচ্ছে,

অবিনশ্বর সত্তা আল্লাহর কাছেই সকল সৃষ্টি মুখাপেক্ষী

'পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। কেবল টিকে থাকবে তোমার প্রতিপালকের সত্ত্বা, যা সম্মানিত ও মহিমান্বিত......'

কোরআনের এই উক্তি উচ্চারিত হওয়া মাত্র শ্বাস প্রশ্বাস ধীর, শব্দ ক্ষীণ ও অংগ প্রত্যংগ শান্ত হয়ে যেতে থাকে।..........সকল প্রাণী ধ্বংসক্রিয়ার আওতায় এসে যায়, সকল তৎপরতা এর প্রভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তীর্ণ দিগন্ত এর প্রভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, আর চিরঞ্জীব মহিমান্বিত সত্ত্বার মহত্ত্ব ও গৌরব সমগ্র সত্ত্বা ও মনকে, স্থান ও কালকে এবং গোটা বিশ্ব নিখিলকে পরিপ্লুত করে।

মানুষের ভাষা এই ধ্বংসের চিত্র পরিপূর্ণভাবে অংকন করতে সক্ষম নয়। কোরআনের উক্তির ওপর কোনো কথা সংযোজন করাও তার সাধ্যাতীত। কোরআনের এ উক্তি মানব সত্ত্বাকে নিঝুম নিস্তব্ধতা, আচ্ছন্নকারী ভাবগাম্ভীর্য ও ভয়াল নীরবতায় নিমজ্জিত করে দেয়। যে বিশ্ব প্রকৃতি এক সময় জীবন ও কর্মতৎপরতায় মুখর ছিলো, তাতে ধ্বংস ও মৃত্যুর নিস্তব্ধতা তুলে ধরে এ আয়াত। আর এরই পাশাপাশি তুলে ধরে চিরস্থায়িত্ব ও চিরঞ্জীবতার তত্ত্ব। চিরঞ্জীবতা ও চিরস্থায়িত্ব কিরূপ তার পরিচয় মানুষ কখনো নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জন করেনি। অথচ কোরআনের এই আয়াতটিতে তার সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।

বিশ্ব প্রকৃতির সব কিছু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, সেদিন আর কিছুই বাকি থাকবে না। একমাত্র মহিমান্বিত আল্লাহর সত্ত্বা চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী থাকবে। এই সত্যকে কোরআন একটি নেয়ামত হিসাবে জ্বিন ও মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করছে এবং একইভাবে প্রশ্ন তুলে ধরছে যে, 'অতপর তোমাদের প্রভুর কোন্ নেয়ামত তোমরা অস্বীকার করবে?'

এটি আসলেই একটি নেয়ামত; বরং প্রকৃতপক্ষে এটি সকল নেয়ামতের ভিত্তি ও উৎস। কেননা, চিরঞ্জীব সত্ত্বা আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন এই সমগ্র জগত, তার যাবতীয় নিয়ম বিধি, স্বভাব প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য। তিনিই নির্ধারণ করেছেন এই বিশ্ব নিখিলের রীতিনীতি, পরিণতি ও কর্মফল। সেই চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্ত্বাই সব কিছু সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন ও তত্ত্বাবধান করেন। তিনিই সব কিছুর হিসাব নেন, কর্মফল দেন এবং তিনিই চিরস্থায়িত্ব ও অমরত্বের সুউচ্চ শিখর থেকে ধ্বংসশীল জগত প্রত্যক্ষ ও পর্যবেক্ষণ করেন। কাজেই চিরস্থায়িত্বের তত্ত্ব থেকেই সকল নেয়ামতের উৎপত্তি হয়ে থাকে। বিশ্বজগত এই তত্ত্বের ও বাস্তবতার ওপর ভর করেই অস্তিত্ব লাভ করে এবং নির্ভুলভাবে পরিচালিত হয়। অন্য কথায় বলা চলে, নশ্বরতা ও ধ্বংসশীলতার আড়ালেই রয়েছে চিরস্থায়িত্ব, চিরঞ্জীবতা ও অবিনশ্বরতার অমোঘ সত্য।

আর এই সত্য থেকে নির্গত হয় আরেকটি সত্য। সেটা হলো এই যে, প্রত্যেক নশ্বর সৃষ্টি আপন অস্তিত্বের চাহিদা পূরণে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ও অভাবহীন মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং তাঁর দরবারে ধর্ণা দিতে বাধ্য।

'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তিনি তো প্রতিদিনই কোনো না কোনো ব্যস্ততায় নিয়োজিত থাকেন। অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?'

আকাশ ও পৃথিবীর সকলে সব কিছু তাঁর কাছেই তো সব কিছু চায়। প্রার্থনা, আবেদন, নিবেদন একমাত্র তাঁর কাছেই তো করা যায়। অন্য কারো কাছে চাওয়া যায় না। কেননা, অন্য সবাই মরণশীল। তাদের কাছে চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সকল সৃষ্টি কেবল তাঁর কাছেই চায়, আর তিনি একাই সকলের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং দেন। তাঁর কাছে যে চায় সে কখনো বিফল হয় না। তাঁর কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে যে চায়, সে ব্যর্থ হতে বাধ্য। এক মরণশীল আর এক মরণশীলকে কী দিতে পারে? এক মুখাপেক্ষী আর এক মুখাপেক্ষীকে কী দেয়ার ক্ষমতা রাখে!

মহান আল্লাহ প্রতিদিনই কোনো না কোনো ব্যস্ততায় থাকেন। এই সীমাহীন ও কূলকিনারাহীন বিশ্বজগত তাঁরই পরিকল্পনাধীন, তাঁরই ইচ্ছাধীন, তিনিই সবাইকে পরিচালনা করেন। মহাবিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি কণা, প্রতিটি অণু পরমাণু, প্রতিটি অংগ প্রত্যংগ, প্রতিটি কোষ তাঁরই নির্দেশে ও ব্যবস্থাপনায় চলে, প্রত্যেককে তিনি সৃষ্টি করেন, প্রত্যেককে তিনি কাজে নিয়োজিত করেন এবং প্রত্যেকের কাজ তিনি তদারক করেন।

প্রতিটি উদ্গত উদ্ভিদ, গাছের ডাল থেকে ভূপাতিত প্রতিটি পাতা, পৃথিবীর অন্ধকারময় স্থানে বিরাজমান প্রতিটি বীজ, প্রতিটি শুকনো কিংবা ভিজা পদার্থ, পানি, প্রতিটি মাছ, ভূগর্ভের প্রতিটি পোকা মাকড়, ঝোপ জংগলের প্রতিটি পশু, গাছের ডালে বাসায় অবস্থানকারী প্রতিটি পাখি, প্রতিটি পাখির ডিম ও ছানা, প্রতিটি পাখা, পালক এবং প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীর দেহের প্রতিটি কোষ তাঁরই একচ্ছত্র পরিচালনা ও কর্তৃত্বের অধীন।

যিনি একচ্ছত্র পরিচালক ও সর্বময় কর্তা, তিনি কখনো এক কাজে ব্যস্ত হয়ে আরেক কাজ ভুলে থাকেন না। তাঁর জ্ঞানের আড়ালে থাকে না কোনো গোপন বা প্রকাশ্য বিষয়।

তাঁর অসংখ্য ব্যস্ততার মধ্যে একটি হচ্ছে পৃথিবীতে জ্বিন ও মানুষের তদারকীজনিত ব্যস্ততা। তাই তিনি এই নেয়ামতটিই জ্বিন ও মানুষের কাছে তুলে ধরে বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?'

মানব ও জ্বিন জাতির প্রতি আল্লাহর সতর্কবাণী

ধ্বংস ও নশ্বরতার আড়ালে চিরঞ্জীবতা ও অবিনশ্বরতা এবং এর ফলশ্রুতিতে একমাত্র চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর সত্ত্বার প্রতি সর্বাত্মক মনোনিবেশ, আত্মসমর্পণ এবং আপন বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ, করুণাবশত তাদের ও গোটা সৃষ্টি জগতের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় আল্লাহর ইচ্ছার প্রয়োগ–এই নেয়ামতগুলোর বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক নেয়ামতের বিবরণ সমাপ্ত করা হয়েছে। এরপর জ্বিন ও মানুষকে সম্বোধন করে আরেকটি নতুন ভাষ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ভাষ্যে কঠোর হুমকি ও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এটি উচ্চারিত হয়েছে পরবর্তীতে আলোচ্য কেয়ামতের ভয়াবহ বর্ণনার ভূমিকা স্বরূপ।

'হে জ্বিন ও মানব, আমি অচিরেই তোমাদের জন্যে একাগ্রচিত্ত ও ব্যস্ততামুক্ত হয়ে যাবো।.....' কী সাংঘাতিক হুমকি! এতো বড় হুমকির মুখে জ্বিন ও মানব, পাহাড়, পর্বত, গ্রহ, নক্ষত্র কোনো কিছুই স্থির থাকতে পারে না। সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ এই দুই দুর্বল সৃষ্টি জ্বিন ও মানবের হিসাব নিকাশ গ্রহণের জন্যে সব ব্যস্ততা পরিত্যাগ করবেন, হিসাব ও প্রতিশোধ নেবেন। এ এক অকল্পনীয় হুমকি ও শাসানি।

আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতপক্ষে ব্যস্ত থাকেন না যে, ব্যস্ততা মুক্ত হবেন। মানুষ যাতে ব্যাপারটা সহজে বুঝতে পারে, সে জন্যেই এভাবে বলা হয়েছে। তাছাড়া হুমকিটা যাতে খুবই ভয়োদ্দীপক হয় এবং তা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে, সেজন্যেই এই বাচনভংগি অবলম্বন করা হয়েছে। নচেত গোটা পৃথিবী যাঁর 'কুন' শব্দটি বলাতেই সৃষ্টি হয়ে যায় এবং গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করতে যাঁর এক নিমেষের বেশী সময় লাগে না, তাঁর শুধুমাত্র জ্বিন ও মানব– এই দুই জাতিকে শাস্তি দিতে সকল ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হবার কী দরকার? অতপর এই ভয়াবহ হুমকি ও শাসানির প্রেক্ষাপটে এই দুই দুর্বল সৃষ্টিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

এরপর এই হুমকি ও শাসানির কঠোরতা আবারও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এই মর্মে চ্যালেঞ্জ দিয়ে যে, তারা যদি পারো তবে আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করে যেন চলে যায়!

'হে জ্বিন ও মানুষ গোষ্ঠী! তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে চলে যেতে পারো, তবে যাও।..........'

কীভাবে ও কোথায় যাবে?

' বিশেষ ক্ষমতা ছাড়া যেতে পারবে না।'

কেননা, যার ক্ষমতা আছে, সে ছাড়া কেউ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। অতপর পুনরায় তাদের প্রশ্ন করছেন, তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

জানা কথা যে, এর পরে তাদের মনে নিছক মৌখিকভাবেও কোনো নেয়ামত অস্বীকার করার ক্ষমতা থাকতে পারে না, কিন্তু তথাপি এই হুমকি ও শাসানি চরম পর্যায়ে পৌঁছা পর্যন্ত অব্যাহত রাখা হয়েছে।

'তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিশিখা ও তামা, তখন তোমরা তা প্রতিরোধও করতে পারবে না। অতপর তোমাদের প্রভুর কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!' এটি এমন চরম পর্যায়ের

হুমকি ও শাসানি যে, মানুষ কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টির পক্ষে এর ভয়াবহতা কল্পনা করাও দুসাধ্য। কোরআনে এ হুমকির দৃষ্টান্ত খুবই কম। যেমন, 'আমাকে ছেড়ে দাও, বিত্তশালী অস্বীকারকারীদের দেখে নেই', 'আমার সৃষ্টি করা বান্দাকে ও আমাকে একাকী ছেড়ে দাও।'

কিন্তু এ সব শাসানির মধ্যে 'আমি অচিরেই তোমাদের জন্যে সকল ব্যস্ততামুক্ত হবো' কথাটা সবচেয়ে জোরদার, সবচেয়ে ভয়াবহ ও সবচেয়ে কঠিন শাসানি।

এখান থেকে সূরার শেষ অবধি কেয়ামতের প্রাক্কালের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রলয় কান্ড, আখেরাতের দৃশ্যসমূহ এবং আযাব ও পুরস্কারের দৃশ্যসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

এই দৃশ্যসমূহের শুরুতেই একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যা সূরার প্রথম দিককার উক্তিসমূহ ও সেগুলোর প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটের সাথে সংগতিপূর্ণ।

'যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন তা রক্ত বর্ণের চামড়ার মতো হয়ে যাবে। ....'

বস্তুত তখন আর অস্বীকার করার ক্ষমতা থাকবে না।

'সেদিন কোনো জ্বিন ও মানুষকে জিজ্ঞেস করা হবে না।............'

এটি সেই কেয়ামতের দিনের বহু রকমের অবস্থার মধ্যে একটি বিশেষ অবস্থা। কখনো বান্দাদের জিজ্ঞেস করা হবে, কখনো কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না, কখনো বা লোকেরা নিজেদের ব্যাপারে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। কখনো কোনো কাজের ফলাফল তাতে যারা যারা অংশ নিয়েছে তাদের সকলের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে, আবার কখনো বা টুঁ শব্দটি করতে এবং বিন্দুমাত্র ঝগড়া-তর্ক করতে দেয়া হবে না। কেয়ামতের দিনটি হবে একটি দীর্ঘস্থায়ী দিন এবং তার প্রতিটি অবস্থাই হবে এক একটি মারাত্মক অবস্থা।

এখানে আরো একটা অবস্থা লক্ষণীয়। কোনো মানুষ ও জ্বিনকে তখনই জিজ্ঞেস করা হবে না, যখন প্রতিটি ব্যক্তির চরিত্র ও কাজ জানা যাবে এবং মুখমন্ডলের হাবভাব দেখেই বুঝা যাবে। খারাপ চরিত্রের লক্ষণ কালো রং এবং ভালো চরিত্রের লক্ষণ সাদা রংয়ের আকারে মুখমন্ডলে প্রকাশ পাবে। এ অবস্থায় আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করার অবকাশ কোথায়? 'অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে?'

'অপরাধীদের তাদের মুখমন্ডল দেখেই চেনা যাবে, ফলে তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে.........'।

এটি একটি চরম নিষ্ঠুরতা ও লাঞ্ছনাময় দৃশ্য। পাগুলো মাথার সাথে মিলিয়ে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এমতাবস্থায় আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করার উপায় আছে কী?

এই দৃশ্য উপস্থাপন এবং পা ও কপাল একত্রে বেঁধে দোযখে নিক্ষেপের দৃশ্য তুলে ধরার পর বলা হচ্ছে,

'এই সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা অস্বীকার করে থাকে। তারা তাতে ফুটন্ত তরল পদার্থের মাঝে ঘুরতে থাকবে।' এই পানি এত চরম পর্যায়ের উত্তপ্ত হবে, যেন তা দোযখে রান্না করা খাবার। তারা জাহান্নাম ও এই তরল পদার্থের মাঝে ঘুরবে। আয়াতের ভাষা থেকে মনে হয় যেন তারা এখনই ঘুরছে।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾ فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾ فِیْهِمَا عَیْنٰنِ تَجْرِیٰنِ ﴿٥٠﴾ فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾ فِیْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾ فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِـِٕیْنَ عَلٰی فُرُشٍۭ بَطَآىِٕنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾ فِیْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾ كَاَنَّهُنَّ الْیَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِاَیِّ

রুকু ৩

৪৬. যে ব্যক্তি তার নিজের মালিকের সামনে দাঁড়াবার (সময়কে) ভয় করবে, তার জন্যে থাকবে দুটো (সুরম্য) বাগিচা, ৪৭. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে, ৪৮. সে (বাগিচা) দুটোও (আবার) হবে ঘন শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট, ৪৯. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে! ৫০. সেখানে দুটো ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, ৫১. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে! ৫২. সেখানে প্রতিটি ফল থাকবে (আবার) দু'প্রকারের, ৫৩. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে! ৫৪. (জান্নাতের অধিবাসীরা সেখানে) রেশমের আস্তর দিয়ে মোড়ানো পুরু ফরাশের ওপর হেলান দিয়ে (আয়েশে) বসবে, (এ সময়) উভয় উদ্যান (ফলসহ তাদের সামনে) ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে, ৫৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে! ৫৬. সেখানকার (অগণিত নেয়ামতের) মধ্যে থাকবে আয়তনয়না হুর, যাদের (জান্নাতের) এ (অধিবাসী)-দের আগে কোনো মানুষ কিংবা জ্বিন কখনো স্পর্শও করেনি, ৫৭. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে, ৫৮. এরা যেন এক একটি প্রবাল ও পদ্মরাগ, ৫৯. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে? ৬০. (তুমিই বলো,) উত্তম (আনুগত্য)—এর বিনিময় উত্তম (পুরস্কার) ছাড়া আর কি হতে পারে? ৬১. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্

ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾

مُدْهَآمَّتَانِ ﴿٦٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾ فَبِأَيِّ

ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ

مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ

إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ

رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾ تَبَارَكَ

اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

নেয়ামত অস্বীকার করবে! ৬২. (নেয়ামতের) এ দুটো (উদ্যান) ছাড়াও (সেখানে) রয়েছে দুটো (ভিন্ন ধরনের) উদ্যান, ৬৩. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে! ৬৪. সে দুটো (বাগিচা হবে চির) সবুজ ও ঘন, ৬৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে, ৬৬. সেখানে থাকবে দুটো ঝর্ণাধারা, ফোয়ারার মতো সদা উচ্ছল গতিতে তা অবিরাম বইতে থাকবে, ৬৭. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে, ৬৮. সেখানে (আরো) থাকবে (রং বেরংয়ের) ফল পাকড়া– খেজুর ও আনার, ৬৯. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে, ৭০. সেখানে থাকবে সৎ স্বভাবের (অনিন্দ্য) সুন্দরী রমণীরা, ৭১. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে, ৭২. (এ) আয়তলোচনা হুররা (রয়েছে) তাঁবুতে (অপেক্ষমাণ অবস্থায়), ৭৩. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে, ৭৪. এদের আগে অন্য কোনো মানুষ কিংবা জ্বিন এদের স্পর্শও করেনি, ৭৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে, ৭৬. (জান্নাতের অধিকারী) এ ব্যক্তিরা সুন্দর গালিচার বিছানা ও সবুজ চাদরের ওপর হেলান দিয়ে বসবে, ৭৭. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে, ৭৮. কতো মহান তোমার মালিকের নাম, তিনি মহাপ্রতাপশালী ও পরম অনুগ্রহশীল।

তাফসীর

আয়াত ৪৬-৭৮

এ পর্যন্ত গেলো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির বিবরণ। এবার শুরু হচ্ছে সম্মান ও পুরস্কারের বিবরণ।

'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিতিকে ভয় পায়, তার জন্যে রয়েছে দুটো বাগান।' কোরআনের সূরাগুলো আমরা যতোই পর্যবেক্ষণ করি, মনে হয়, এই প্রথম বুঝি কোরআনে দুটি জান্নাতের ওয়াদা করা হলো। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, এই জান্নাত দুটো কোনো বড় জান্নাতের আওতাধীন। তবে এখানে এ দুটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এ জান্নাত দুটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। সূরা 'ওয়াকেয়া'য় আসছে যে, জান্নাতবাসীরা হবে দুইটি বড় বড় গোষ্ঠী। প্রথম ঈমান আনয়নকারী আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং ডানদিকে অবস্থান গ্রহণকারী ব্যক্তিরা। উভয় গোষ্ঠীই আল্লাহর নেয়ামত লাভ করবে। এখানেও আমাদের মনে হচ্ছে, এই জান্নাত দুটি একটি উচ্চ মর্যাদাবান গোষ্ঠীর জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। তারা সূরা ওয়াকেয়ায় বর্ণিত প্রথম ঈমান আনয়নকারী ঘনিষ্ঠ লোকেরাও হতে পারে। এরপর আমরা আরো দুটি জান্নাত দেখতে পাই এবং মনে হয়, এরা পূর্ববর্তী গোষ্ঠীর পরবর্তী গোষ্ঠী। এরা হয়তো ডান পাশে আশ্রয় গ্রহণকারীরা।

সে যাই হোক, আমরা প্রথম দুটি জান্নাত একটু পর্যবেক্ষণ করবো এবং তার অভ্যন্তরে কিছু সময় কাটাবো।

'(জান্নাত দুটি) ছোট ডালপালা সম্বলিত।'

'জান্নাত দুটিতে দুটি প্রবাহিত ঝর্ণা রয়েছে।'

ঝর্ণা দুটির পানি চমৎকার ও সাবলীল।

'জান্নাত দুটিতে প্রত্যেক প্রকারের ফলের দুটি করে জোড়া আছে।'

অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে বহু রকমের ফলমূল রয়েছে।

আর জান্নাতবাসীর অবস্থা কিরূপ? আমরা তাদের এভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, তারা 'এমন বিছানায় হেলান দিয়ে আছে যার অভ্যন্তরভাগ মোটা মখমলের রেশম দ্বারা তৈরী।'

অভ্যন্তরভাগ যদি এ রকম হয় তাহলে বহির্ভাগ যে আরো কতো বেশী সুন্দর ও আরামদায়ক হবে তা বলাই বাহুল্য।

'এবং উভয় জান্নাতের উদ্যানের ফল তাদের নিকটে ঝুলন্ত।'

অর্থাৎ হাতের নাগালের মধ্যে এবং ধরতে মোটেই বেগ পেতে হবে না।

তবে এ দ্বারা তার আয়েশ ও বিলাসব্যসনের পুরো উল্লেখ করা হলো না। সেখানে আমোদ প্রমোদের জন্যে আরো রয়েছে,

'সেখানে থাকবে আনতনয়না রমণীরা, যাদের কোনো জ্বিন ও মানুষ ইতিপূর্বে স্পর্শ করেনি।' অর্থাৎ দৃষ্টিতে ও চিন্তায় পর্যন্ত তারা সতী সাধবী। তাদের দৃষ্টি তাদের পুরুষ স্বামীরা ব্যতীত আর কারো দিকে যায় না। এরপরও তারা এতো লাবণ্যময়ী ও এতো রূপবতী–

'যেন তারা প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণী।'

এ সবই আল্লাহভীরু বান্দার পুরস্কার, যে এমনভাবে আল্লাহর এবাদত করেছে যেন তাকে দেখতে পেতো এবং অনুভব করতো যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দেখছেন। এভাবে তারা এহসানের স্তরে পৌঁছেছে। বস্তুত রসূল (স.) এহসানের সংজ্ঞা এভাবেই দিয়েছেন। ফলে তারা তাদের এহসানের বিনিময়ে আল্লাহর কাছ থেকেও এহসান তথা বিপুল প্রতিদান পেয়েছে!

'এহসানের প্রতিদান কি এহসান ছাড়া আর কিছু হতে পারে!' প্রতিটি নেয়ামতের বর্ণনা দিয়ে যথারীতি জিজ্ঞেস করা হয়েছে, 'তোমাদের প্রভুর কোন্ নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?'

এবার অপর দুটি জান্নাতের অধিবাসী সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হচ্ছে, 'এ দুটি উদ্যান ছাড়া আরো দুটি উদ্যান রয়েছে।' আর এ দুটি উদ্যান পূর্ববর্তী দুটি উদ্যানের চেয়ে সামান্য নিকৃষ্ট মানের।

'এ দুটি উদ্যান ঈষৎ কালচে সবুজ।'

কেননা এগুলোতে ঘাস রয়েছে।

'এতে দুটি উদ্বেলিত ঝর্ণা আছে।'

অর্থাৎ স্বল্প স্রোত বিশিষ্ট।

'এখানে ফলমূল, খেজুর ও আংগুর আছে।'

আর পূর্বোক্ত উদ্যান দুটিতে সর্বপ্রকারের ফলের দুটি করে জোড়া আছে। সেখানে উত্তম সুন্দরীরা রয়েছে।'

'তাঁবুতে অবস্থানকারী হুররাও রয়েছে।'

এখানে তাঁবু শব্দটার ব্যবহার দ্বারা মনে হয়, তারা কিছুটা বেদুইন পর্যায়ের মহিলা এবং বেদুইন শ্রেণীর পুরুষদের মনের মতো। এদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে 'তাঁবুতে অবস্থানকারিণী।' আর পূর্বোক্ত উদ্যান দুটির মহিলাদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে 'আনতনয়না' বলে।

'তাদের ইতিপূর্বে কোনো জ্বিন বা মানুষ স্পর্শ করেনি।'

অর্থাৎ সতীত্বে এরা ও পূর্বোক্ত উদ্যানের নারীরা সমান।

আর এই দুই উদ্যানের অধিবাসীদের আমরা দেখতে পাই,

'তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।' রফরফ অর্থ বিছানা। এগুলোকে 'আবকার' নামক জ্বিনদের এলাকার তৈরী জিনিস হিসাবে উল্লেখ করে আবরদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। আরবরা যে কোনো উৎকৃষ্ট মানের জিনিসকে 'আবকারের' তৈরী বলতো। তবে পূর্বোক্ত উদ্যান দুটির হেলান দেয়ার জিনিস মোটা মখমলের রেশম দিয়ে তৈরী বিছানা। আর সেখানে গাছের ফলগুলো ঝুঁকে থাকবে। এ দুটি বৈশিষ্ট্য শেষোক্ত উদ্যানে অনুপস্থিত। কাজেই বুঝা যাচ্ছে, পূর্বোক্ত উদ্যান অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর।

এখানেও প্রত্যেক নেয়ামতের বিবরণ দেয়ার পর যথারীতি 'কোন্ নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে' বলে প্রশ্ন রাখা হয়েছে।

সূরার শেষে তথা আল্লাহর নেয়ামতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পর মহান আল্লাহর গুণগানপূর্বক উপসংহার টানা হয়েছে,

'তোমার মহিমান্বিত ও পরম সম্মানিত প্রতিপালকের নাম কল্যাণময় হোক।'

বস্তুত সূরা রাহমানের জন্যে এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত ও মানানসই উপসংহার।

সূরা আল ওয়াকেয়াহ

আয়াত ৯৬ রুকু ৩

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ﴿٦﴾ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿٩﴾ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾ أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٤﴾ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. যখন (কেয়ামতের অবশ্যম্ভাবী) ঘটনাটি সংঘটিত হবে, ২. (তখন) কেউই তার সংঘটিত হওয়ার অস্বীকারকারী থাকবে না। ৩. এ (ঘটনা)-টি হবে (কারো মর্যাদা) ভূলুণ্ঠনকারী, (আর কারো মর্যাদা) সমুন্নতকারী, ৪. পৃথিবী যখন প্রবল কম্পনে কম্পিত হবে, ৫. পর্বতমালা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, ৬. অতপর তা বিক্ষিপ্ত ধুলাবালিতে পরিণত হয়ে যাবে, ৭. আর তোমরা (মানুষরা তখন) তিন ভাগ হয়ে যাবে; ৮. (প্রথমত হবে) ডান দিকের দল, জানো এ ডান দিকের লোক কারা? ৯. (দ্বিতীয়ত হবে) বাম দিকের দল, কারা এ বাম দিকের লোক? ১০. (তৃতীয়ত হবে) অগ্রবর্তী (ঈমান আনয়নকারী) দল, এরাই (হলো মূলত প্রধান) অগ্রগামী দল, ১১. এরা হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) একান্ত ঘনিষ্ঠ বান্দা, ১২. (এরা অবস্থান করবে) নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহে। ১৩. (এদের) বড়ো অংশটি (অবশ্য হবে) আগের লোকদের মধ্য থেকে, ১৪. আর সামান্য (অংশই) থাকবে পরবর্তী লোকদের মাঝ থেকে; ১৫. (তারা থাকবে) স্বর্ণখচিত আসনের ওপর, ১৬. তার ওপর তারা (একে অপরের) মুখোমুখি (আসনে) হেলান দিয়ে (বসবে)। ১৭. তাদের চারপাশে (তাদের সেবার জন্যে) চির কিশোরদের একটি দল ঘুরতে থাকবে, ১৮. পানপাত্র ও প্রবাহমান সুরা ভর্তি পেয়ালা নিয়ে (এরা প্রস্তুত

لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ

مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءًۢ بِمَا

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا

سَلٰمًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَآ أَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾

وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا

مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّآ أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَآءً ﴿٣٥﴾

فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّأَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾

থাকবে), ১৯. সেই (সুরা পান করার) কারণে তাদের কোনো শিরপীড়া হবে না, তারা (কোনো রকম) নেশাও করবে না, ২০. (সেখানে আরো থাকবে) তাদের নিজ নিজ পছন্দমতো ফলমূল, ২১. (থাকবে) তাদের মনের চাহিদা মোতাবেক (রকমারি) পাখীর গোশত; ২২. (সেবার জন্যে মজুদ থাকবে) সুন্দরী সুনয়না সাথী তরুণী দল, ২৩. তারা যেন (সযত্নে) এক একটি ঢেকে রাখা মুক্তা, ২৪. (এর সব কিছুই হচ্ছে তাদের) সে (কাজের) পুরস্কার যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে। ২৫. সেখানে তারা কোনো অর্থহীন প্রলাপ (বা কথাবার্তা) শুনতে পাবে না, ২৬. (সেখানে) বরং বলা হবে (শুধু) শান্তি, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি! ২৭. (অতপর আসবে) ডান পাশের লোক, আর কারা (এ) ডান পাশের লোক; ২৮. (তারা অবস্থান করবে এমন এক উদ্যানে,) যেখানে থাকবে (শুধু) কাঁটাবিহীন বরই গাছ, ২৯. (থাকবে) কাঁদি কাঁদি কলা, ৩০. (শান্তিদায়িনী) ছায়া দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে, ৩১. আর থাকবে প্রবাহমান (ঝর্ণাধারার) পানি, ৩২. পর্যাপ্ত (পরিমাণ) ফলমূল, ৩৩. (এমন সব ফল) যার সরবরাহ কখনো শেষ হবে না এবং (যার ব্যবহার কখনো) নিষিদ্ধও করা হবে না, ৩৪. আর থাকবে উঁচু উঁচু বিছানা; ৩৫. আমি তাদের (সাথী হুরদের) বানিয়েছি বানানোর মতো (করেই), ৩৬. (তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,) আমি তাদের চির কুমারী করে রেখেছি, ৩৭. (তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে) তারা (হবে) সমবয়সের প্রেম সোহাগিনী, ৩৮. (এগুলো হচ্ছে প্রথম দলের সব) ডান পাশের লোকদের জন্যে;

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আল ওয়াকেয়াহ– কেয়ামতের ঘটনা.............এটি সূরার নামও এবং এর আলোচ্য বিষয়ের আভাসদানকারী শিরোনামও। এই মক্কী সূরায় আলোচিত প্রথম বিষয়টি হচ্ছে আখেরাতে পুনরুত্থানের ঘটনা। আখেরাতের পুনরুত্থানে সন্দেহ পোষণকারী মোশরেক ও কোরআন অবিশ্বাসীদের নিম্নোক্ত উক্তির জবাবে এ বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে, 'আমরা যখন মারা যাবো এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাবো, তখন কি আবার আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা পুনরুজ্জীবিত হবো?'

এ কারণেই কেয়ামতের বিবরণ দিয়ে সূরা শুরু হয়েছে। এখানে কেয়ামতের বিবরণ এমনভাবে দেয়া হয়েছে যে, তা সকল সন্দেহ নিরসন করে, সকল বিবাদ দূর করে এবং এ ব্যাপারে অকাট্য ও সুদৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করে। 'যখন কেয়ামতের ঘটনাটা ঘটবে, যার বাস্তবতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।........' এখানে এই দিনের ঘটনাবলী থেকে শুধু সেই ঘটনা কয়টির উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাকে অন্য সকল দিন থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দিন হিসাবে চিহ্নিত করে। এদিনে মানুষের ধ্যান ধারণা ও পৃথিবীর অবস্থা পাল্টে যাবে, ভয়ংকর আলোড়ন ও বিভীষিকার ফলে পৃথিবীর ভূমির এবং তার সম্পদ ও মূল্যবোধের বিরাট পরিবর্তন ঘটবে। ৩, ৪, ৫, ৬ ও তৎপরবর্তী আয়াতে এই পরিবর্তনের বিবরণ দেয়া হয়েছে। যেমন, 'এ ঘটনা নীচু করে দেবে, উঁচু করে দেবে, যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী।'

এরপর তিন শ্রেণীর মানুষের পরিণতি সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে– অগ্রবর্তীরা, ডান দিকের ও বাম দিকের লোকেরা। এই তিন শ্রেণীর লোকেরা যথাক্রমে যে নেয়ামত ও আযাব ভোগ করবে, তার এতো বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, ঘটনাটা একেবারে অবধারিত ও সন্দেহাতীতরূপে সত্য বলে মনে হয়। আর তার এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ চাক্ষুষ দর্শনের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে। ফলে অস্বীকারকারীরা নিজেদের পরিণাম ও মোমেনদের পরিণাম স্বচক্ষে দেখতে পাবে। এমনকি তাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাবের বিবরণ দেয়ার পর ওখানেই এরূপ বলাবলি করা হবে যে, 'তারা ইতিপূর্বে সীমালংঘনকারী ছিলো, তারা বার বার প্রতিজ্ঞা ভংগ করতো........' যেন আযাবটাই বর্তমান, আর দুনিয়ার জীবন অতীত, যার উল্লেখ কেবল তাদের দুনিয়ার জীবনকে ঘৃণ্য এবং তাদের কুফরী ও অস্বীকৃতিকে বিকৃত বলে আখ্যায়িত করার জন্যে করা হচ্ছে।

এখানে সূরার প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয় এবং ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের আলোচনা বিশেষত আখেরাত ও পুনরুত্থানের আলোচনার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। কেননা, আখেরাতই এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই পর্বে আখেরাত সংক্রান্ত আলোচনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় করা হয়েছে। মানুষ যে পরিবেশেই থাকুক এবং তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যে স্তরেরই হোক, এ পর্বের আয়াতগুলো পড়লে তার কাছে মনে হবে আখেরাতের আলোচিত দৃশ্যগুলো তার অনুভূতি ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আওতাধীন।

মানুষের প্রথম আবির্ভাবটা দেখানো হয়েছে এক ফোঁটা বীর্য থেকে, আর তাদের মৃত্যু ও তাদের পরবর্তীতে তাদের স্থলে অন্যদের আবির্ভাবকে আখেরাতের পুনরুত্থানের প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়ার প্রথম জন্ম ও মৃত্যু কতো সহজ স্বাভাবিক, তা সব মানুষের জানা আছে বলেই এটিকে আখেরাতে তাদের পুনর্জন্মের প্রমাণ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

এ পর্যায়ে দুনিয়ার কৃষি কাজ ও ফসল উৎপাদনের দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। কেননা, এটাও জীবন সৃষ্টির একটা রূপ। আল্লাহর হাতেই জীবন সৃষ্টির একচ্ছত্র ক্ষমতা নিহিত। তিনি ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে আদৌ কোনো জীবন সৃষ্টি করতেন না এবং কোনো ফল বা খাদ্য উৎপন্ন হতো না।

জীবনমাত্রেরই উৎপত্তি যে মিষ্টি পানির ওপর নির্ভরশীল, তারও বিবরণ দেয়া হয়েছে। এই পানি আল্লাহর একক ইচ্ছা ও ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। তিনি মেঘমালা থেকে এই পানি বর্ষাণ। ইচ্ছা করলে তিনি এই পানিকে এমন লবণাক্ত ও বিস্বাদ বানিয়ে দিতে পারতেন, যা থেকে কোনো জীবনেরই উদ্ভব হয় না এবং যা জীবনের অনুকূল ও উপযোগী নয়।

এখানে দেখানো হয়েছে আগুনের দৃশ্যও। মানুষের ব্যবহৃত এ আগুনের উৎস হচ্ছে বৃক্ষ। আগুনের উল্লেখ হওয়া মাত্রই মানুষের অনুভূতি সচকিত হয়ে ওঠে এবং আখেরাতের সেই আগুনকে তাদের মনে পড়ে যায়, যা নিয়ে তারা সন্দিহান ছিলো।

এ সবই মানুষের নিত্যকার সুপরিচিত জিনিসের বাস্তব দৃশ্য। এগুলো তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং তারা এ সবের পশ্চাতে আল্লাহর হাত রয়েছে বলে অনুভব করে। এ সব জিনিস আল্লাহই সৃষ্টি করেন এবং তিনিই এগুলোর তদারক করেন।

এই পর্বে কোরআন নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এই কোরআনই তাদের কেয়ামতের ঘটনা অবহিত করে। কাফেররা কেয়ামতের সত্যতায় যখন সন্দেহ পোষণ করে, তখন সে নক্ষত্রের অবস্থান স্থলসমূহের শপথ করে। এই শপথ যে অত্যন্ত গুরুতর তাও সে জানায়। শপথ করে সে জানায় যে, কোরআন অত্যন্ত মহিমান্বিত গ্রন্থ, যাকে পবিত্র ব্যক্তিরা ছাড়া স্পর্শ করতে পারে না এবং তা বিশ্ব প্রভুর নাযিল করা গ্রন্থ।

সবার শেষে মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার সময়কার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায়। মানুষের আত্মা যখন কণ্ঠনালীতে এসে পৌঁছে, মৃত্যুমুখী মানুষ যখন পার্থিব জীবনের শেষ প্রান্তে পদার্পণ করে, তখন সবাই অসহায় দর্শক হয়ে তার পাশে অবস্থান করে। তারা না পারে তার কোনো সাহায্য করতে, না পারে তার ভেতরে ও বাইরে কী হচ্ছে তা জানতে। একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে। একমাত্র সেই দেখতে পায় তার গন্তব্যের পথ। সে যা দেখতে পায় তা সম্পর্কে কাউকে কিছু বলা তো দূরের কথা, ইংগিতও সে করতে পারে না।

অতপর ওহীর গুণের অকাট্যতা পুনরায় ঘোষণা ও মহান স্রষ্টা আল্লাহর তাসবীহের মধ্য দিয়ে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে। এভাবে সূরার সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে পূর্ণতম যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।

তাফসীর

আয়াত ১-৩৮

এবার সূরার তাফসীরে মনোনিবেশ করা যাক। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যখন কেয়ামতের ঘটনা ঘটবে, যে ঘটনার সত্যতায় কোনোই সন্দেহ নেই, যে ঘটনা নীচু করবে ও উঁচু করবে, যখন পৃথিবী প্রবল জোরে কম্পিত হবে, পাহাড় পর্বত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, অতপর তা ধূলিকণায় পরিণত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে।'

সূরাটা এভাবে শুরু করার উদ্দেশ্য যে এই ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন, তা সুস্পষ্ট। বিশেষত এতে এমন একটা বাচনভংগি ব্যবহৃত হয়েছে, যা এই ভীতি প্রদর্শনের উদ্যোগকে আরো শাণিত করে তোলে এবং তাকে সূরার বক্তব্যের সাথে অধিকতর সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। সূরার প্রারম্ভিক ছয়টি আয়াতে দুবার করে 'যখন' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ এরপর 'তখন' কী হবে, সেটা বলা হয়নি। বলা হয়েছে, 'যখন কেয়ামতের ঘটনা ঘটবে'..... কিন্তু কেয়ামতের ঘটনা ঘটার সময় কী হবে, তা না বলে পুনরায় একই অব্যয় ব্যবহার করে বলা

হয়েছে, 'যখন পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে.........' এখানেও বলা হয়নি যে, পৃথিবী প্রকম্পিত হওয়ার পর কী হবে। এ দ্বারা এই ধারণা দেয়া হয়েছে যে, এই ভয়ংকর ঘটনার পর যা ঘটবে, তা এতোই ভয়াবহ যে, ভাষায় বর্ণনা করা দুসাধ্য।

এই বিশেষ বাচনভংগিটি সূরার প্রারম্ভে অংকিত বিভীষিকাময় দৃশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'আল ওয়াকেয়া' শব্দটির গুরুগম্ভীর ধ্বনাত্মক ব্যঞ্জনা এবং এর অর্থ প্রত্যেক শ্রোতার মনে এই অনুভূতি বদ্ধমূল করে দেয় যেন একটা প্রকান্ড ভারী বস্তু ওপর থেকে মাটিতে পড়ে থেমে গেলো এবং তা আর গড়ালো না বা দূরে সরে গেলো না।

এরপর এই প্রকান্ড ভারী বস্তুর পতন ও অবস্থান থেকে যেন প্রত্যক্ষ করা হয় যে, তার পতন দ্বারা একটা কম্পন ও আলোড়ন সৃষ্টি হবে, তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, 'যে ঘটনা নীচু করে ও উঁচু করে।' বস্তুত কেয়ামতের ঘটনা এমন বহু জিনিসকে উর্ধ্বে তুলে ধরবে, যা দুনিয়ায় থাকাকালে নীচু ও অধোপতিত ছিলো, আবার এমন বহু জিনিসকে তা অধোপতিত করবে, যা পৃথিবীতে খুবই উঁচু ও উন্নত ছিলো। পৃথিবীতে অনেক কিছুর অবমূল্যায়ন হয়, কিন্তু আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় তার সঠিক মাপ নির্ণয় করা হবে। এরপর সেই বিভীষিকা নেমে আসে পৃথিবীতে, যা মানুষের অনুভূতি অনুসারে স্থিতিশীল ও অবিচল। সহসা তা কাঁপতে বা দুলতে আরম্ভ করবে। এই কাঁপন বা দুলুনি কেয়ামতের ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ। অতপর পাহাড় পর্বতগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হতে থাকবে একই কেয়ামতের ঘটনার অংশ হিসাবে এবং তা ধূলিকণার মতো উড়ে যেতে থাকবে। বস্তুত পৃথিবীর এই কাঁপন ও দোলন এবং পাহাড় পর্বতের চূর্ণ হয়ে উড়ে যাওয়ার মতো ভয়াবহ দৃশ্য কেয়ামতের দৃশ্য ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আর আখেরাত অস্বীকারকারীরা এবং আল্লাহর সাথে শরীককারীরা, যারা এই ভয়াবহ দৃশ্যের সম্মুখীন হবে এবং তার আলামত পৃথিবীতে ও পাহাড়ে এভাবে দৃষ্টিগোচর হতে থাকবে, তাদের মতো অজ্ঞ ও গোঁয়ার আর কে হতে পারে?

সূরার এরূপ সূচনা মানবসত্ত্বায় শিহরণ তোলে, তার চেতনায় ভীতির সঞ্চার করে এবং যে ঘটনাকে কাফের ও মোশরেকরা অস্বীকার করে তার সম্পর্কে বিশ্বাস গড়ে তোলে। এভাবে কেয়ামতের ঘটনার প্রথম দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটে। আমরা তার আলামত দেখতে পাই উত্থান ও পতনে, মানুষের ধ্যান ধারণা ও মূল্যবোধে এবং তাদের সর্বশেষ পরিণতিতে।

আল্লাহর ঘনিষ্ঠজনদের বিশেষ পুরস্কার

'আর তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। ডান পাশের লোকেরা ....' কোরআনের অন্যত্র যেমন দুই ধরনের লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়, এখানে তার বিপরীত তিন ধরনের লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে ডান দিকের লোকদের কথা। তবে তাদের বিবরণ না দিয়ে কেবল প্রশ্ন করেই ক্ষান্ত থাকা হয়েছে। অনুরূপ বাম দিকের লোকদের ব্যাপারেও কেবল প্রশ্ন করেই ক্ষান্ত থাকা হয়েছে। অতপর তৃতীয় শ্রেণীটির উল্লেখ করা হয়েছে। এরা হচ্ছে অগ্রবর্তী শ্রেণী। তাদের কথা উল্লেখ করে তাদের গুণেই তাদের গুণান্বিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'অগ্রবর্তীরা অগ্রবর্তীই।' অর্থাৎ তাদের চেনার জন্যে একথা বলাই যথেষ্ট যে, তারা অগ্রবর্তী। তাদের আর কোনো বিশেষণে বিশেষিত করার প্রয়োজন নেই।

তাই আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা কিরূপ, তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এর অব্যবহিত পরেই। বলা হয়েছে,

'তারা আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। তারা নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে থাকবে। সেখানে শুধু শান্তি আর শান্তির বাণীই তারা শুনতে পাবে।'

অগ্রবর্তীদের সর্বপ্রধান পুরস্কার স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'তারা আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম।' তার পরে উল্লেখ করা হয়েছে জান্নাতের কথা। কেননা, নেয়ামতে পরিপূর্ণ সব কটি বেহেশ্ত একত্রিত হয়েও আল্লাহর নৈকট্যের সমান হতে পারে না।

এখানে তাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। এই নৈকট্যলাভকারী কারা? বলা হয়েছে যে, তারা হচ্ছে, 'প্রথম সময়কার একদল এবং শেষের দিককার মুষ্টিমেয় কিছু লোক।' অর্থাৎ তারা সীমিত সংখ্যক উৎকৃষ্টতম ব্যক্তি। প্রথম দিককার লোকদের মধ্যে তাদের সংখ্যা বেশী এবং পরবর্তীদের মধ্যে কম। এই 'প্রথম দিককার' ও 'শেষের দিককার' লোক কারা, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। প্রথম মত এই যে, 'প্রথম দিককার লোক' হলো পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের মধ্যকার প্রথম ঈমান আনয়নকারী সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তিরা। আর 'শেষের দিককার ব্যক্তিরা' শেষ নবীর আমলে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ও কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় নিপতিত ব্যক্তিবর্গ। দ্বিতীয় মত এই যে, প্রথম ও শেষ ব্যক্তিরা মোহাম্মদ (স.)-এর উম্মতেরই প্রথম যুগের ও শেষ যুগের লোকজন। ইবনে কাসীরের মতে শেষোক্ত মতই অগ্রগণ্য। তিনি এই মতের পক্ষে হাসান ও ইবনে সিরীনের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, হাসান এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন, 'সাবেকূন' বা অগ্রবর্তীরা তো অতীত হয়েই গেছে। এখন আমাদের প্রার্থনা এই যে, হে আল্লাহ তায়ালা, আমাদের ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত করো। অপর বর্ণনা অনুযায়ী হাসান বলেছেন, প্রথম দিককার লোকেরা বলতে এই উম্মাতের অতীত ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর ইবনে সিরীন বলেছেন, পূর্ববর্তী লোকেরা সবাই 'প্রথম দিককার' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবার আশা পোষণ করতো।

অতপর তাদের জন্যে নির্ধারিত পুরস্কারের বিবরণ দেয়া হয়েছে, যা স্বভাবতই কল্পনার আওতাভুক্ত, কিন্তু এ ছাড়া আরো কিছু পুরস্কার রয়েছে, যা অকল্পনীয় এবং বেহেশতে গিয়েই তারা তার কথা জানতে পারবে। সেগুলো এত উন্নতমানের যে, তা ইতিপূর্বে কেউ দেখেওনি, শোনেওনি এবং কল্পনাও করেনি।

'মূল্যবান ধাতব পদার্থ খচিত খাটের ওপর তারা থাকবে। তার ওপর হেলান দিয়ে মুখোমুখি বসে থাকবে।'

তাদের কোনো চিন্তা ভাবনা থাকবে না, নেয়ামতের প্রাচুর্যের মধ্যে তারা আনন্দে বিভোর থাকবে, সেসব নেয়ামত কখনো কমবে না বা শেষ হবে না, পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে তারা গল্পগুজবে ব্যস্ত থাকবে। 'তাদের সামনে দিয়ে চির তরুণ বালকেরা ঘুরতে থাকবে।' অর্থাৎ সময়ের আবর্তনে তাদের যৌবন ও সৌন্দর্য ব্যাহত হবে না। 'পানপাত্র, সুরাহী ও পেয়ালাসমূহ নিয়ে' অর্থাৎ চমৎকার স্বচ্ছ মদে পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে তারা ঘুরবে এবং তা পান করাবে। 'যা পান করলে তাদের শিরপীড়া হবে না এবং তারা বিকারগ্রস্তও হবে না।' বস্তুত তারা এই আনন্দ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না এবং তা কখনো ফুরিয়ে যাবে না। সেখানে সব কিছু চিরস্থায়ী। 'তাদের পছন্দমতো ফুল নিয়ে ও রুচিমতো পাখির গোশত নিয়ে তারা ঘুরবে।' বস্তুত সেখানে কোনো কিছু নিষিদ্ধ থাকবে না এবং রুচি বহির্ভূত কোনো খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ করা হবে না। 'সেখানে থাকবে আনতনয়না একদল হূর আবৃত মুক্তার ন্যায়।' অর্থাৎ কেউ তাদের দিকে কখনো তাকায়ওনি এবং কেউ তাদের স্পর্শও করেনি। এ দ্বারা এই হূর কতো উৎকৃষ্ট সেটাই বুঝানো হয়েছে। আর এসবই 'তাদের কাজের প্রতিদান স্বরূপ।' অর্থাৎ এসবই তাদের সৎ কাজের পুরস্কার। দুনিয়ার সব নেয়ামতেই ত্রুটিবিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা থাকতো, কিন্তু আখেরাতের এসব নেয়ামত সর্বাংগীণ সুন্দর ও উৎকৃষ্টতম। এরপর তারা পরম শান্তিতে বসবাস করতে থাকবে

বেহেশতে। কোনো রকমের শোরগোল তাদের কানে আসবে না, কোনো বাদানুবাদ, ঝগড়াঝাটি বা তর্কবিতর্ক কিছুই নয়। 'তারা সেখানে কোনো বাজে কথা বা গুনাহর কথা শুনবে না, কেবলই শুনবে শান্তি শান্তি।' বস্তুত সেখানে তাদের গোটা জীবনই শান্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে। ফেরেশতা তাদের সালাম দেবে। নিজেরাও সালামের আদান প্রদান করবে। আল্লাহও সালাম দেবেন। এভাবে গোটা পরিবেশে বিরাজ করবে অনাবিল সর্বাত্মক শান্তি।

সাধারণ নাজাতপ্রাপ্তদের পুরস্কার

আল্লাহর নির্বাচিত দলটি অর্থাৎ প্রথম ঈমান আনয়নকারী আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের দলটি সম্পর্কে আলোচনার পর তার পরবর্তী দল অর্থাৎ ডান দিকের দল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

'ডান দিকের লোকেরা। ডান দিকের লোকেরা কারা? তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে' ..... (২৭ নং থেকে ৪০ নং আয়াত পর্যন্ত)

সূরার শুরুতে যে ডান দিকের লোকদের কথা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে, এখানে তাদের বিষয়ই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হচ্ছে। তাদের জন্যে কী কী নেয়ামত নির্দিষ্ট রয়েছে, সেটা আল্লাহর ঘনিষ্ঠজনদের পরেই এখানে বিশদ আলোচিত হচ্ছে। এখানে তাদের সম্পর্কে একইভাবে কৌতূহল, বিস্ময় ও গুরুত্ব বুঝাবার জন্যে প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'ডান দিকের লোকেরা কারা?'

এদের জন্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগত নেয়ামত নির্দিষ্ট রয়েছে। এই নেয়ামতের যে বিবরণ এখানে দেয়া হয়েছে, তাতে কিছুটা বেদুইন জীবনসুলভ রূঢ়তা বিদ্যমান। বেদুইনরা নিজেদের অভিরুচি ও অভিজ্ঞতা অনুসারে সুখ, আনন্দ ও ভোগবিলাস সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, সেই ধারণা অনুসারে তাদের চাহিদা পূরণ করা হয়েছে।

আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে' .... বদরিকা বৃক্ষে কাঁটা থাকে, কিন্তু এখানে তাকে কাঁটামুক্ত গাছ হিসাবে দেখানো হয়েছে। এবং কাঁটাহীন 'তালহ' বৃক্ষে। 'তালহ' হেজাযের এক ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ। কিন্তু এটি এখানে অনায়াসে খাওয়ার যোগ্য করে দেখানো হয়েছে। 'আর দীর্ঘ ছায়ায় এবং প্রবহমান পানিতে'– এখানে যে কয়টির উল্লেখ করা হলো, এর সব কয়টিই বেদুইনদের কাছে আরামদায়ক, আনন্দদায়ক, পছন্দনীয় ও আকাংখিত জিনিস।

'আর বহু ফলমূল, যা কখনো বন্ধ ও নিষিদ্ধ হবার নয়।'

বেদুইনদের পরিচিত কতিপয় জিনিস নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার পর অনির্দিষ্টভাবে ফলমূলের উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে সর্বপ্রকারের ফলমূল বুঝানো হয়েছে। 'উঁচু উঁচু বিছানাসমূহ'– বিছানা স্বর্ণখচিত বা মসৃণ কিনা সেটা বলা হয়নি। কেননা, বেদুইন অভিরুচি অনুসারে বিছানা উঁচু হওয়াই যথেষ্ট। উঁচু হওয়াটা দু'রকমের হতে পারে। বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক। তবে এ দুটির একটি অপরটির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অবস্থানের দিক দিয়ে উঁচু এবং গুণগতভাবে পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত হলে উভয় দিক দিয়েই তা উঁচু হয়ে যায়। কেননা, ভূপৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে অবস্থিত জিনিস ভূপৃষ্ঠের ময়লা আবর্জনা থেকে অধিকতর মুক্ত হয়। আর আধ্যাত্মিকভাবে উঁচু হলে তা অপবিত্রতা থেকে অধিকতর নিরাপদ হয়। এ জন্যে বিছানার উল্লেখের অব্যবহিত পরই এ বিছানার অধিবাসী স্ত্রীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, 'আমি তাদের যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছি।' প্রাথমিকভাবে সৃষ্ট স্ত্রীরা হচ্ছে হুর। আর পুনঃসৃষ্ট স্ত্রী হলো যুবতীরূপে পুনরুত্থিত দুনিয়ার পুণ্যবতী স্ত্রীরা। 'আমি তাদের কুমারী বানিয়েছি।' অর্থাৎ কেউ কখনো তাদের স্পর্শ করেনি। আমি তাদের স্বামী সোহাগিনী ও সমবয়সিনী তরুণী বানিয়েছি। তারা ডান দিকের লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট, যাতে উঁচু উঁচু বিছানার সাথে সংগতিশীল হয়।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا

أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا

كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى

الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا

لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾

لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ

الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نُزُلُهُمْ

রুকু ২

৩৯. (এ ডান পাশের লোকদের) এক বিরাট অংশই হবে আগের লোকদের মাঝ থেকে, ৪০. (আবার) অনেকে হবে পরবর্তী লোকদের মাঝ থেকেও; ৪১. যারা বাম পাশের লোক, তুমি কি জানো এ বাম পাশের লোক কারা; ৪২. (যাদের অবস্থান হবে জাহান্নামের) উত্তপ্ত ও ফুটন্ত পানিতে, ৪৩. এবং (ঘন) কালো রঙের ধোঁয়ার ছায়ায়, ৪৪. (সে ছায়া যেমন) শীতল নয়, (তেমনি তা কোনো রকম) আরামদায়কও হবে না। ৪৫. এরা (হচ্ছে সেসব লোক যারা) এর আগে (দুনিয়ায়) অত্যন্ত সুখ সম্পদে কাটাতো, ৪৬. এরা বার বার জঘন্য পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তো, ৪৭. এরা বলতো, আমরা যখন মরে যাবো এবং (মরে যাওয়ার পর) আমরা যখন মাটি ও হাড়ের সমষ্টিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে? ৪৮. (জীবিত করা হবে) কি আমাদের বাপদাদা এবং পূর্বপুরুষদেরও? ৪৯. (হে নবী,) তুমি বলো, অবশ্যই আগে পরের সব লোককেই– ৫০. একটি নির্দিষ্ট দিনে (একটা নির্দিষ্ট সময়ে) জড়ো করা হবে! ৫১. অতপর (কাফেরদের বলা হবে,) ওহে পথভ্রষ্ট ও (এ দিনের আগমনকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ব্যক্তিরা, ৫২. (দুনিয়ায় যা অর্জন করেছো তার বিনিময়ে আজ) তোমরা ভক্ষণ করবে 'যাক্কুম' (নামক একটি) গাছের অংশ, ৫৩. অতপর তা দিয়েই তোমরা (তোমাদের) পেট ভরবে, ৫৪. তার ওপর তোমরা পান করবে (জাহান্নামের) ফুটন্ত পানি, ৫৫. তাও আবার পান করতে থাকবে (মরুভূমির) তৃষ্ণার্ত উটের মতো করে; ৫৬. এ হবে (কেয়ামতে) তাদের (যথার্থ)

يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾

ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ

الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ

فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاۤءُ

لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَاۤءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ

نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاۤءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

মেহমানদারী; ৫৭. আমি (যে) তোমাদের সবাইকে পয়দা করেছি– (এ কথাটা) তোমরা কি বিশ্বাস করছো না? ৫৮. তোমরা যে (সন্তান উৎপাদনের জন্যে এক বিন্দু) বীর্যপাত করে আসো, সে সম্পর্কে (কখনো) কি ভেবে দেখেছো? ৫৯. বলো তো, তাকে কি তোমরা (পূর্ণাংগ) মানুষ বানিয়ে দাও না আমি তার স্রষ্টা? ৬০. তোমাদের মাঝে (সবার) মৃত্যু আমিই নির্ধারণ করি এবং আমি এ ব্যাপারে মোটেই অক্ষম নই যে– ৬১. তোমাদের মতোই আরেক দল মানুষ দিয়ে তোমাদের বদল করে দেবো এবং (প্রয়োজনে) তোমাদেরই (আবার) এমনভাবে তৈরী করবো যে, তোমরা কিছুই জানতে পারবে না। ৬২. তোমরা (যখন) তোমাদের প্রথম সৃষ্টির ঘটনাটা সুনিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছো, (তখন দ্বিতীয় বার সৃষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী থেকে) কেন শিক্ষা গ্রহণ করছো না? ৬৩. তোমরা (যমীনে) যে বীজ বপন করে আসো সে সম্পর্কে কি কখনো চিন্তা করেছো? ৬৪. (তা থেকে) ফসলের উৎপাদন কি তোমরা করো না আমিই তার উৎপাদক? ৬৫. অথচ আমি যদি চাই তাহলে (অংকুরিত সব) বীজ খড়কুটায় পরিণত করে দিতে পারি, আর (তা দেখে) তোমরা হতভম্ব হয়ে পড়বে, ৬৬. (তোমরা বলতে থাকবে, হায়! আজ) তো আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেলো, ৬৭. আমরা তো (ফসল থেকে আজ) বঞ্চিতই থেকে গেলাম! ৬৮. কখনো কি তোমরা সেই পানি সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখেছো যা তোমরা (সব সময়) পান করো; ৬৯. (বলতে পারো?– আকাশের) মেঘমালা থেকে এ পানি কি তোমরা নিজেরা বর্ষণ করো না আমি এর বর্ষণকারী? ৭০. অথচ আমি চাইলে এ (সুপেয়) পানি লবণাক্ত করে দিতে পারি, (পানির এ সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্যে) তোমরা কেন আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করছো না?

أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

৭১. আগুন– যা (প্রতিদিন) তোমরা প্রজ্বলিত করে থাকো– তা সম্পর্কে কি কখনো ভেবে দেখেছো? ৭২. তার (জ্বালানোর) গাছটি কি তোমরা সৃষ্টি করেছো না আমি এর স্রষ্টা? ৭৩. (মূলত) আমিই একে (সভ্যতার) নিদর্শন করে রেখেছি এবং একে ভ্রমণকারীদের জন্যে প্রয়োজন পূরণের সামান বানিয়ে দিয়েছি। ৭৪. অতপর (হে নবী, এসব কিছুর জন্যে) তুমি তোমার মহান মালিকে ়র নামের মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।

তাফসীর
আয়াত ৩৯-৭৪

এই ডান দিকের লোকেরা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। 'প্রাথমিক শ্রেণী ও পরবর্তী শ্রেণী।' এই দুই শ্রেণীর মিলিত সংখ্যা প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আল্লাহর ঘনিষ্ঠ জনদের চেয়ে বেশী। এর কারণ ইতিপূর্বে এই শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছি।

বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের করুণ পরিণতি

এরপর প্রসংগ আসছে বাম দিকের লোকদের। সূরার শুরুতে এদের 'দুর্ভাগা দল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

'বাম দিকের লোকেরা। কারা বামদিকের লোকেরা? তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে ও উত্তপ্ত পানিতে ......' (৪১ নং থেকে ৫৭ নং আয়াত পর্যন্ত)

একদিকে ডান দিকের লোকদের জন্যে রয়েছে দীর্ঘ ছায়া এবং প্রবহমান পানি। অপরদিকে বাম দিকের লোকদের জন্যে রয়েছে বাষ্প ও উত্তপ্ত পানি। তাদের জন্যে গোটা বায়ুমন্ডলই থাকবে উত্তপ্ত, যা লোমকূপ দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেহকে ভাজা ভাজা করে ফেলবে। সেখানকার পানি থাকবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের গরম। যা শরীরকে ঠান্ডাও করবে না, পিপাসাও নিবৃত্ত করবে না। বাম দিকের এই গোষ্ঠীর জন্যেও ছায়া আছে, তবে তা শ্বাসরোধক ধোঁয়ার ছায়া। আসলে এটা তামাশার ও বিদ্রূপাত্মক ছায়া, যা 'ঠান্ডাও নয়, আরামদায়কও নয়।' অর্থাৎ এটা এক ধরনের প্রাণহীন উত্তপ্ত ছায়া। এটা তাদের কৃতকর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মানানসই কর্মফল। 'নিশ্চয় তারা ইতিপূর্বে খুবই ভোগবিলাসী ছিল।' ভোগবিলাসীদের জন্যে এই উত্তপ্ত পরিবেশ যে কী যন্ত্রণাদায়ক, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। 'তারা ভয়ংকর অংগীকার ভংগের কাজে পুন পুন লিপ্ত হতো।' অংগীকার ভংগ করা একটা গুনাহ। এ দ্বারা এখানে আল্লাহর সাথে শরীক করা বুঝানো হয়েছে। বান্দাদের আত্মার কাছ থেকে আল্লাহ তায়ালা যে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের এবং তাঁর একত্বে বিশ্বাসী থাকার অংগীকার নিয়েছিলেন, এখানে সেই দিকে ইংগিত করা হয়েছে। 'তারা বলতো, আমরা মরে মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হওয়ার পরও কি পুনরুজ্জীবিত হবো আর আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরাও হবে?' 'তারা বলতো' এই বাক্যটিতে কোরআন অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করেছে। এটাই কোরআনের বাচনরীতি। যে দুনিয়ার জীবনে অবস্থানকালে বান্দাদের সাথে কথা বলা হচ্ছে, তা যেন শেষ হয়ে গেছে, তাই অতীতে পরিণত হয়েছে। আর বর্তমান হচ্ছে এই আযাব ও এই দৃশ্যপট। দুনিয়া যেন অতীতের ফেলে আসা স্মৃতি। আর বর্তমানই হচ্ছে আখেরাত।

এরপর কোরআন দুনিয়ার জীবনের কথা এমনভাবে উল্লেখ করছে, যাতে মোশরেকদের উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর হয়ে যায়। 'তুমি বলো, পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা সবাই একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হবে।' বস্তুত এই শেষোক্ত দিনটিই কোরআনের ভাষায় বর্তমান ও দৃশ্যমান দিন।

অতপর কাফেরদের জন্যে যে আযাব অপেক্ষা করছে, কোরআন পুনরায় তার বর্ণনা দিচ্ছে এবং ভোগবিলাসীদের আযাবের পূর্ণাংগ দৃশ্য তুলে ধরছে!

'অতপর হে বিভ্রান্ত অবিশ্বাসীদের গোষ্ঠী, তোমরা যাক্কুম গাছ ভক্ষণ করবে।' যাক্কুম গাছ কি, তা তো কেউ জানে না। অন্য একটি সূরায় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যাক্কুম গাছ শয়তানের মাথার মতো, কিন্তু শয়তানের মাথা কেউ দেখেনি। তবে অনুভব করা যায় যে, তা ভালো নয়। তা ছাড়া যাক্কুম শব্দের ধ্বন্যাত্মক ব্যঞ্জনা থেকেও অনুভব হয়, এটা এতো কন্টকাকীর্ণ ও কষ্টদায়ক যে, কণ্ঠনালী তো দূরের কথা, তা স্পর্শ করতে গেলে হাত পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। অথচ এর বিপরীতে রয়েছে মোমেনদের জন্যে বদরিকা ও তালহ বৃক্ষ। যাক্কুম শয়তানের মাথার মতো জিনিস হওয়া সত্তেও তাদের তা ভক্ষণ করতে হবে এবং পেট পুরে ভক্ষণ করতে হবে। কেননা, প্রবল ক্ষুধা ও অসহনীয় কষ্ট তাদের তা ভক্ষণ করতে বাধ্য করবে। আর কাঁটার যন্ত্রণা তাদের গলা ভিজিয়ে মসৃণ করা ও পিপাসা মেটানোর জন্যে পানির কাছে যেতে বাধ্য করবে। অথচ এই পানি হবে এমন গরম যে, তা পিপাসা নিবৃত্ত করবে না। এই পানি তারা পান করবে সেই বিশেষ রোগে আক্রান্ত উটের মতো, যা কোনোক্রমেই পিপাসা নিবৃত্ত হতে দেয় না। 'এ হচ্ছে কর্মফল দিবসে তাদের আপ্যায়ন।' আপ্যায়নে মানুষ তৃপ্তি ও প্রশান্তি বোধ করে, কিন্তু বাম দিকের লোকেরা এতে তৃপ্তি ও প্রশান্তি বোধ করবে না। যে দিন সম্পর্কে তারা সন্দেহ পোষণ করতো, জিজ্ঞাসাবাদ করতো এবং কোরআনের এ সংক্রান্ত সংবাদে বিশ্বাস করতো না। অনুরূপভাবে তারা আল্লাহর সাথে শেরেকে লিপ্ত থাকতো এবং কেয়ামতের দিনে এ জন্যে যে আযাব ভোগ করার হুমকি দেয়া হয়েছে তাকে ভয় পেতো না। এখানে এসে কেয়ামতের দিনের বিবরণ দেয়া শেষ হয়েছে। সেই সাথে সমাপ্ত হয়েছে সূরার প্রথম পর্ব।

হে মানবজাতি! চোখ মেলে একটু তাকাও

সূরার দ্বিতীয় পর্বে সামগ্রিকভাবে ইসলামী আকীদা গঠনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। তবে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে আখেরাত ও কেয়ামতের ওপর। এখানে দেখানো হয়েছে মানুষের বিবেককে কোরআন কিভাবে সম্বোধন করে, কিভাবে ঈমানের সপক্ষে অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করে এবং কোমল ও সহজবোধ্য ভাষায় কিভাবে মানুষের অন্তরে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আকীদাগুলোকে বদ্ধমূল করে।

মানুষের সুপরিচিত নৈমিত্তিক বড় বড় প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ মানুষকে কি শিক্ষা দিতে চান এবং বিশ্বজগত সম্পর্কে তার মধ্যে কী পূর্ণাংগ ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে চান, সেটাই কোরআন স্পষ্ট করে দেয়। এ থেকে সে মানুষকে চিন্তা ও দৃষ্টির একটা পদ্ধতি শেখায়, তার আত্মা ও মনের জন্যে জীবনীশক্তি জে [illegible] য় এবং তার আবেগ অনুভূতিকে প্রেরণা ও চেতনায় উজ্জীবিত করে। যে প্রকৃতিকে প্রতিনিয়ত দেখেও মানুষ তার নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যগুলো উপলব্ধি করতে পারে না, তার ব্যাপারে কোরআন মানুষকে সচেতন করে দেয়। সে মানুষকে তার আপন সত্ত্বা সম্পর্কে এবং সেখানে যে বিস্ময়কর ও অলৌকিক কার্যাবলী সংঘটিত হয়, সে ব্যাপারেও চকিত করে তোলে।

কোরআন মানুষকে শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা নিয়েই চিন্তা ভাবনা করতে বলে না। তাকে নিজের সত্ত্বা থেকে, নিজের নৈমিত্তিক জীবন থেকে এবং তার নিকটবর্তী সুপরিচিত প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অলৌকিক ঘটনাবলী, মোজেযা ও প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার নির্দেশ দেয় না, তাকে এমন কোনো জটিল দর্শন, কঠিন বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান গবেষণা কিংবা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিয়োজিত করে না, যা সবার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। ইসলামী আকীদা ও আদর্শের অনুশীলন এবং এই আকীদা ও আদর্শের ওপর ভিত্তি করে জীবন জগত সম্পর্কে যথার্থ ধ্যান ধারণা গঠনের লক্ষ্যে মানুষকে অনুরূপ কষ্টকর চিন্তা-গবেষণায় নিয়োজিত করার সে পক্ষপাতী নয়।

মানুষ নিজে যেমন আল্লাহর সৃষ্টি, তেমনি তার চারপাশের প্রাকৃতিক বস্তুসমূহও আল্লাহর অপার বিস্ময়কর সৃষ্টি নৈপুণ্যের নিদর্শন। মহান আল্লাহ যা কিছু তৈরী করেন তাতেই নিহিত রয়েছে অলৌকিকত্ব। এই মহাগ্রন্থ কোরআনও তাঁর রচিত গ্রন্থ। তাই এই কোরআন মানুষকে তার সত্ত্বার অভ্যন্তরে এবং তার পারিপার্শ্বিক সৃষ্টিজগতে বিরাজমান অসংখ্য অলৌকিক জিনিসের কাছে নিয়ে যায়। মানুষের চির পরিচিত এসব অলৌকিক জিনিসকে সে প্রতিনিয়ত দেখলেও তার ভেতরের অলৌকিকত্ব উপলব্ধি করে না। দীর্ঘ দিনের পরিচিতির কারণেই প্রকৃতির কোথায় কোথায় অলৌকিক রহস্য রয়েছে, সে ব্যাপারে মানুষ উদাসীন। কোরআন তাকে এ সব জিনিসের অলৌকিকত্বের সন্ধান দিতে এবং এ সবের গুপ্ত রহস্য অবলোকন করাতে নিয়ে যায়। মানুষের নিজ সত্ত্বায় এবং বিশ্ব প্রকৃতির পরতে পরতে ও কোণে কোণে যে অকল্পনীয় সৃষ্টি নৈপুণ্যের নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, যে অভাবনীয় একত্বের রহস্য ও শাশ্বত প্রাকৃতিক বিধানের বার্তা নিহিত রয়েছে, সে সব অবলোকনের জন্যে কোরআন মানুষের চোখ খুলে দেয়। এ সব রহস্য ও নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে ঈমান আকীদার প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ। অতপর তা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তার সচেতন সত্ত্বায় ও স্বভাব প্রকৃতিতে সম্প্রসারিত হয়।

সূরার এই পর্বে এভাবেই আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শনসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এসব নিদর্শন মানুষের নিজ সত্ত্বায় যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে তার কৃষিকার্যে ও কৃষিপণ্যে, তাদের পানীয় পানিতে এবং তাদের ব্যবহৃত আগুনে। মানুষের নিত্য পরিচিত দৃশ্যমান বস্তুসমূহের মধ্যে এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে মামুলী জিনিস। সৃষ্টির নিদর্শনাবলী তুলে ধরার পর কিভাবে আবার এগুলোর ধ্বংস সাধিত হবে এবং কিভাবে দুনিয়ার জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে পরকালীন জীবনের সূচনা হবে, সে দৃশ্যও প্রদর্শন করা হয়েছে। পরকালীন জীবনের সূচনার সেই মুহূর্তটি প্রত্যেকের জীবনেই অবধারিত। তাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো কৌশলই সফল হবে না। সকল প্রাণী সেই নতুন জগতে একত্রিত হবে এবং পরস্পরের মুখোমুখি হবে। তাদের অবস্থান করতে হবে সর্বশক্তিমানের সামনে। সেখানে কোনো আড়াল থাকবে না এবং তা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে কোনো চেষ্টা তদবীরেরও সুযোগ থাকবে না।

কোরআন যে বাচনভংগি অবলম্বন করে মানুষের সাথে কথা বলেছে, স্বয়ং সেই বাচনভংগিই কোরআনের উৎসের সন্ধান দেয়। খোদ মহাবিশ্বেরও উৎপত্তি হয়েছে এই একই উৎস থেকে। মানুষ যেভাবে সৃষ্টি হয়েছে, বিশ্ব-প্রকৃতি সেভাবেই জন্মলাভ করেছে। প্রকৃতির অতি নগণ্য ও অতি মামুলী উপাদান থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে জটিলতম এবং প্রকান্ডতম বস্তু ও প্রাণীর। জগত সৃষ্টির মূল উপাদান অণুপরমাণু এবং জীবন সৃষ্টির মূল উপাদান জীবকোষ– এ হচ্ছে এখনকার প্রচলিত ধারণা। এই অণুপরমাণু ও জীবকোষের ক্ষুদ্রতাই স্বয়ং একটা অলৌকিক ব্যাপার ও নিদর্শন স্বরূপ।

প্রকৃতির ন্যায় কোরআনেও ক্ষুদ্র থেকে বৃহত কিছুতে উত্তরণের প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণাধীন সাধারণ ও নগণ্য পদার্থসমূহকে কোরআন বিশালতম ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও প্রশস্ততম প্রাকৃতিক ধারণা সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করে। প্রত্যেক মানুষই প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করে চলেছে প্রাণীর বংশবৃদ্ধি, বৃক্ষ, ফসল ও ফলমূলের জন্ম, পানি ও আগুনের ব্যবহার এবং মৃত্যুর দৃশ্য। ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী এমন কোন্ মানুষটি আছে, যে এসব দৃশ্য অবলোকন করে না! এমনকি কোনো গিরিগুহায়ও যদি কেউ বাস করে, তবে সেও কোনো না কোনো শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া, কোনো না কোনো গাছের চারার জন্ম নেয়া, পানির বর্ষণ, আগুনের প্রজ্বলন ও দহন এবং কোনো না কোনো জীবের মৃত্যু বরণের দৃশ্য পর্যবেক্ষণ না করে পারে না। প্রতিটি মানুষের পর্যবেক্ষণ করা এসব দৃশ্য থেকেই কোরআন মানুষের মনমগযে আল্লাহ তায়ালা, আখেরাত ও রেসালাত বিষয়ক আকীদা বিশ্বাস গঠন করে। কেননা সে সকল মানুষকে সকল পরিবেশেই সম্বোধন করে থাকে। আর এসব সাধারণ ও মামুলী দৃশ্যাবলীতে রয়েছে প্রকৃতির সবচেয়ে মূল্যবান তত্ত্ব ও সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঐশী রহস্য। এসব প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে এক পর্যায়ে নক্ষত্রমন্ডলীর অবস্থানের উল্লেখও যুক্ত হয়েছে। এসব সহজ সরল জিনিস প্রত্যেক মানুষের সহজাত বিবেক ও চেতনাকে সম্বোধন করে। আর এগুলো পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বড় বড় বৈজ্ঞানিকের চিন্তা গবেষণার খোরাক যোগাতে থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়–

নক্ষত্রমন্ডলীর অবস্থান অর্থ মহাজাগতিক প্রকৌশল। মানব জীবনের উন্মেষ হচ্ছে সবচেয়ে দুর্ভেদ্য রহস্য। উদ্ভিদ জীবনের উন্মেষ প্রাণী জীবনের মতোই সবচেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনা। পানি হচ্ছে জীবনের উৎস। আর আগুন হচ্ছে মানব সভ্যতার বিনির্মাণকারী অলৌকিক বস্তু।

আকীদা বিশ্বাস গঠনের ক্ষেত্রে এ হচ্ছে আল্লাহর অনুসৃত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া। প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের মধ্য থেকে প্রাথমিক পদার্থগুলোকে প্রথমে উল্লেখ করা, অতপর তা থেকে সহজ ও সাবলীল ভংগিতে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস গড়ে তোলা। জগত সৃষ্টিতেও আল্লাহ তায়ালা এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। প্রকৃতির প্রাথমিক পদার্থগুলো দিয়ে গোটা জগতকে সৃষ্টি করেন।

কিন্তু মানুষ আকীদা-বিশ্বাস গড়ে তোলার কাজে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে না। সে এ কাজ করতে গিয়ে প্রাথমিক পদার্থসমূহের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। আর করলেও এমন সহজ সরল ও সাবলীল ভংগিতে করে না; বরং বিষয়টিকে একটি জটিল দার্শনিক তত্ত্বের রূপ দিয়ে ফেলে। ফলে এ পদ্ধতি একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ ছাড়া সর্বসাধারণের সাথে বলার যোগ্য থাকে না।

উভয় ক্ষেত্রে কারিগরির নমুনা একই এবং তা সুস্পষ্ট। অথচ উভয়ের মধ্যে কতো প্রভেদ!

প্রথম ও দ্বিতীয় সৃষ্টি

'আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তবু কি তোমরা বিশ্বাস করবে না?' ....(আয়াত ৫৭ থেকে ৬২ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য)

এ হচ্ছে প্রথম সৃষ্টি ও তার অবসানের প্রক্রিয়া, জন্ম ও মৃত্যুর পর্যায়ক্রমিক আবর্তন। মানব জীবনে এটা একটা বাস্তব ও সুপরিচিত ব্যাপার এবং সার্বজনীন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা। মানুষ কিভাবে বিশ্বাস না করে পারে যে, আল্লাহ তায়ালাই তাকে সৃষ্টি করেছেন? বস্তুত 'আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি ....' এই অকাট্য সত্য মানুষের স্বভাব প্রকৃতির ওপর যতোটা চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম, মানবসত্ত্বা এর পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নিলে ততটা চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো না।

'তোমরা যে বীর্যপাত করো, তার কথা কি ভেবে দেখেছো? ওটা কি তোমরা সৃষ্টি করো না আমি সৃষ্টি করি?'

বস্তুত মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় তার নিজের ভূমিকা এর চেয়ে বেশী কিছু নয় যে, সে নিজের বীর্য কোনো নারীর জরায়ুতে গচ্ছিত রাখে। এরপর তার নিজেরও কিছু করার থাকে না, সেই স্ত্রীলোকেরও না। মহান স্রষ্টার কুশলী হাত সম্পূর্ণ এককভাবে এই তুচ্ছ পানি নিয়ে কাজে নিয়োজিত হয়। তিনি একাই একে সৃষ্টি করেন, এর বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করেন, তার দেহ নির্মাণ করেন ও তাতে আত্মা ফুঁকে দেন। এই প্রক্রিয়ার সূচনালগ্ন থেকে প্রতিটি মুহূর্তে এক একটা অলৌকিক কান্ড ঘটতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ এই অলৌকিক কর্মকান্ড ঘটায় না। এই সৃষ্টিকর্মের রহস্য, স্বরূপ, এবং পদ্ধতি– এর কোনোটাই মানুষের জানা নেই, এতে অংশ গ্রহণ করা তো দূরের কথা!

এই মামুলী বিষয়টি প্রত্যেক মানুষই উপলব্ধি করতে পারে। আর এটুকু উপলব্ধি করাই এই অলৌকিক ব্যাপারটি অনুধাবন করার জন্যে যথেষ্ট, কিন্তু বীর্যপাতের পর যে একটি মাত্র কোষ জরায়ুতে আশ্রয় গ্রহণ করে, তার পরবর্তী কার্যক্রম তথা তার বিবর্তন ও বিকাশের ব্যাপারটা কল্পনারও বহির্ভূত। এটি এতো বিস্ময়কর যে, এটি যদি বাস্তবে সংঘটিত না হতো এবং তা প্রত্যেক মানুষ প্রত্যক্ষ না করতে পারতো, তাহলে বিবেক এটিকে বিশ্বাস করতে সক্ষম হতো না।

এই একক কোষটি জরায়ুতে আশ্রয় নেয়ার পর শুরু হয় তার বিভাজন ও সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া। ফলে কিছুদিনের মধ্যে তা পরিণত হয় লক্ষ কোটি কোষে। এসব কোষের এক একটি সমষ্টি বা কোষপুঞ্জ অন্যান্য কোষপুঞ্জ থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কেননা, যে মানুষটিকে সৃষ্টি করা হতে যাচ্ছে, তার শুধু অংশবিশেষ নির্মাণ করাই এক একটি কোষপুঞ্জের অর্পিত দায়িত্ব। কোনো কোষপুঞ্জ দিয়ে হাড়, কোনো কোষপুঞ্জ দিয়ে শিরা উপশিরা, কোনো কোষপুঞ্জ দিয়ে চামড়া এবং কোনো কোষপুঞ্জ দিয়ে স্নায়ুমন্ডলী তৈরী হয়। শুধু এখানেই শেষ নয়। এরপর এক একটি অংগের কর্মক্ষমতা সৃষ্টির জন্যেও রয়েছে এক একটি কোষপুঞ্জ। কোনোটি চোখের কাজ, কোনোটি জিহ্বার কাজ, কোনোটি কানের কাজ এবং কোনোটি গ্রন্থির কাজ নিশ্চিত করে। এগুলো পূর্বোক্ত কোষপুঞ্জের তুলনায় অধিকতর সীমিত ও নির্দিষ্ট দায়িত্বসম্পন্ন। এদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র কোথায় তা জানে। ফলে একটি কোষপুঞ্জ তার নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র ভুলে গিয়ে অন্যত্র গিয়ে কাজ করবে না। যেমন চোখের কোষপুঞ্জ পেটে বা পায়ে নেমে গিয়ে কাজ করবে না। তা যদি করতো, তাহলে নির্দিষ্ট জায়গার পরিবর্তে পেটে বা পায়ে চোখ তৈরী করে ফেলতো। এ সব কোষ আল্লাহর ইলহামী নির্দেশে কাজ করে। তাই ভুল করে না। অনুরূপভাবে কানের কোষপুঞ্জ পায়ে নেমে গিয়ে সেখানে কান বানিয়ে দেয় না। এভাবে এই সকল কোষ আল্লাহর প্রত্যক্ষ তদারকিতে মানুষকে সুন্দরতম গঠন দিয়ে তৈরী করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কেননা, এক্ষেত্রে মানুষের নিজের কোনো ভূমিকা নেই। (সূরা নাজমের ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

এ তো হলো সৃষ্টির সূচনা। কিন্তু এর অবসান তথা বিলুপ্তি বা মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রক্রিয়াও কম বিস্ময়কর নয়। এটিও মানুষের চোখে দেখা ঘটনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যু নির্ধারণ করেছি এবং আমি অক্ষম নই।'

মৃত্যু প্রত্যেক প্রাণীর অবধারিত পরিণতি। কিন্তু প্রশ্ন, মৃত্যু জিনিসটা কী? কিভাবে তা সংঘটিত হয়! মৃত্যুর এত শক্তি কেন যে, তাকে কেউ ঠেকাতে পারে না!

বস্তুত এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিষয়, তাই কেউ এ থেকে নিস্তার পায় না এবং কেউ একে পেছনে ফেলে যেতে সক্ষম নয়। মৃত্যু মূলত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার একটি পরিপূরক ঘটনা।

'যাতে আমি অন্যদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করি ....' অর্থাৎ তোমাদের পর পৃথিবীকে গড়া ও তোমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ওপর আল্লাহর খলীফা হিসাবে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত তোমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে অন্যদের নিয়ে আসি। আল্লাহ তায়ালা- যিনি জীবনের স্রষ্টা, তিনি মৃত্যুরও স্রষ্টা। মৃতদের বিকল্প তৈরী করার জন্যে পূর্ববর্তীদের মৃত্যু দেয়া হয়। এটা দেয়া হয় পার্থিব জীবনের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ার পর। নির্ধারিত আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে গেলেই পরকালীন জীবন শুরু হয়।

'এবং তোমরা যে জগতকে জানো না, সেখানে তোমাদের সৃষ্টি করি।' অর্থাৎ সেই অদৃশ্য অজানা পরকালীন জগতে। সেই জগত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যতোটুকু জানান তা ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না। এই পরবর্তী জগত সৃষ্টির পরই সৃষ্টি প্রক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করে এবং গোটা মানব জাতির কাফেলা আপন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে।

বস্তুত এ হচ্ছে আখেরাতের জীবনের সূচনা।

'তোমরা প্রথম সৃষ্টির কথা অবশ্যই জেনেছো। সেটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো না কেন?' বস্তুত সেই প্রথম সৃষ্টি খুবই নিকট অতীতের কথা এবং তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

এরূপ অনাড়ম্বর ও সাবলীল ভংগিতে কোরআন প্রথম সৃষ্টি ও শেষ সৃষ্টির বিবরণ দেয়। এটা সৃষ্টির স্বাভাবিক ও অমোঘ নিয়ম এবং মানুষের ঘনিষ্ঠতম জীবনের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা। এতে কোনো জটিলতা নেই, কোনো মগয পীড়নকারী দর্শনও নেই। সুতরাং এ নিয়ে বিতর্কেরও অবকাশ নেই।

এ হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টা, মানবস্রষ্টা ও কোরআন নাযিল করনেওয়ালা আল্লাহর বাচনভংগি।

ফল ফসল উৎপাদনের মাঝে আল্লাহর পরিচয়

এরপর পুনরায় কোরআন অত্যন্ত সহজ সাবলীল ভাষায় এমন একটি বিষয়ের দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে, যা তাদের কাছে সুপরিচিত এবং প্রতিনিয়ত তাদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আওতায় আসে, অথচ সে সম্পর্কে তারা উদাসীন।

'তোমরা যা চাষ করো, তা নিয়ে ভেবে দেখেছো কি? ....' (৬৩ থেকে ৬৭ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

মানুষের চোখের সামনেই ফলমূল ও ফসলাদি জন্মে, ফলে ও পাকে। এগুলোর ব্যাপারে মানুষের ভূমিকা কতোটুকু?

মানুষ জমি চাষ করে, অতপর তার ভেতরে আল্লাহর সৃষ্টি করা বীজ বুনে আসে। এখানে তার কাজ শেষ হয়ে যায়। এরপর এই অলৌকিক কাজটিকে পূর্ণতা দান করে আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হাত।

এই হাত বীজটিকে অনুরূপ গাছ পুনরায় জন্মাতে নিয়ে যায়। সে তাকে একজন বিজ্ঞ মানুষের ন্যায় পর্যায়ক্রমে কাজে নিয়োজিত করে। মানুষ তার কাজে ভুল করে, কিন্তু এই হাত তার কাজে একটিবারও ভুল করে না, বিপথগামী হয় না এবং নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল থেকে বিচ্যুত হয় না। এই সৃজনী হাত গোটা কার্যক্রম চলাকালে নিজ দায়িত্ব বহন করে এবং এমন বিস্ময়কর কাজ সম্পাদন করে, যা মানুষ কোনো না কোনোভাবে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাস করতে পারতো না। কোনো বিবেক এ কথা কল্পনাও করতে পারতো না যে, একটি গমের দানার ভেতর অতো বড় একটা গাছ, অতোগুলো পাতা এবং অতোগুলো গমের শীষ ও দানা লুকিয়ে থাকতে পারে। এও কল্পনা করতে পারতো না যে, সামান্য একটি খেজুরের আঁটির ভেতরে অতো বড় একটা আস্ত খেজুরের গাছ এবং তার আনুষংগিক জিনিসগুলো থাকতে পারে। সকাল-বিকাল এ ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে না দেখলে কোনো মানুষ এটা কল্পনাও করতে পারতো না। আর কোনো মানুষ কি

দাবী করতে পারবে যে, আল্লাহর যমীনের মাটি চাষ করে তাতে আল্লাহরই তৈরী বীজ বপন করা ছাড়া অতিরিক্ত কোনো কাজ সে করেছে!

মানুষ বলে, আমরা ফসল উৎপন্ন করেছি। অথচ তারা চাষ করা ও বীজ বপন করা ছাড়া আর কিছু করে না। এই সমগ্র কর্মকান্ডে যেটি যথার্থই অলৌকিক, তা সবই মহান স্রষ্টা আল্লাহর কাজ। তিনি যদি চাইতেন তবে ফলস উৎপন্ন হওয়ার আগেই ক্ষেতের সমস্ত চারাগাছ ধ্বংস করে দিতে পারতেন।

যদি তাই ঘটতো, তাহলে মানুষ আফসোস করে বলতো, 'হায়, আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হলাম, বরং বঞ্চিত হয়ে গেলাম।' আল্লাহর মেহেরবানী যে, তিনি ফসল উদগত করেন। এ হচ্ছে জীবনের একটি রূপ, যা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তদারক করে থাকেন।

এটা যখন তাঁর পক্ষে সহজ, তখন পরবর্তী সৃষ্টির কাজটিতে আর বিস্ময়ের কী আছে?

'তোমরা যে পানি পান করো, তা কি দেখেছো? মেঘমালা থেকে সে পানি তোমরা বর্ষণ করো, না আমি করি। আমি ইচ্ছা করলে সে পানিকে লবণাক্ত বানিয়ে দিতাম। তবু কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে না?'

বস্তুত এই পানি হচ্ছে জীবনের ভিত্তি ও উৎস। আল্লাহরই নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী পানি না হলে জীবনের সৃষ্টি হতো না। এই পানিতে মানুষের কী ভূমিকা ও অবদান আছে? তার ভূমিকা এতোটুকুই যে, সে পানি পান করে। পানিকে মেঘ থেকে বর্ষণকারী ও তার অন্যান্য উপাদান থেকে সৃজনকারী আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নয়। তিনিই এই পানিকে মিষ্টি বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নচেৎ লোনা পানিতে পরিণত করতে চাইলে তা আর খাওয়া যেতো না এবং তা দিয়ে ফসল ফলানো যেতো না। সুতরাং এই দুর্লভ অনুগ্রহের জন্যে আমাদের আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত।

কোরআন যাদের কাছে সর্বপ্রথম এই বক্তব্য রেখেছে, মেঘ থেকে প্রত্যক্ষভাবে বর্ষিত পানিই ছিলো সেদিন তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল এবং উৎসবাদির উপকরণ। এই পানিই ছিলো তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাসের ভিত্তি। তাদের কবিতা ও গান একে চিরঞ্জীব করে রেখেছে। মানব সভ্যতার উন্নয়নে আজ পানির গুরুত্ব মোটেই কমেনি; বরং বহু গুণ বেড়েছে। যারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে নিয়োজিত এবং প্রথম পানির ব্যাখ্যায় সচেষ্ট, তারা পানির গুরুত্ব অন্যদের চেয়ে বেশী বুঝে। কেননা, পানির প্রয়োজন ও চাহিদা মরুভূমির বেদুইন ও গবেষণায় নিয়োজিত বৈজ্ঞানিকের একই সমান।

'তোমরা যে আগুন জ্বালাও, তা নিয়ে কি ভেবে দেখেছো? আগুনের গাছটা কি তোমরা বানিয়েছ, না আমি বানিয়েছি? আমিই ওটা বানিয়েছি শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে এবং পথিকের পাথেয় হিসাবে।'

মানুষের আগুন আবিষ্কার তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো। বরঞ্চ বলা যেতে পারে, এটি তার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা। এ ঘটনার মধ্য দিয়েই সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিলো, কিন্তু নিত্যব্যবহার্য ও সুপরিচিত হওয়ার কারণে এটা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। মানুষ আগুন জ্বালায় বটে, কিন্তু এর জ্বালানি কাঠ কে বানালো? (কৃষি সংক্রান্ত আলোচনায় তা অতিক্রান্ত হয়েছে।) গাছ কৃষি থেকেই উৎপন্ন। তবে এখানে বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার হলো 'আগুনের গাছ' কথাটা। আরবরা এক গাছের ডাল আর এক গাছের ডালের সাথে ঘষা দিয়ে আগুন জ্বালাতো।

এটা বেদুইনদের রীতি ছিলো এবং সেই রীতি এখনো চলছে। এখন মানব জাতির অভিজ্ঞতায় এটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অবশ্য আগুনের অলৌকিক অস্তিত্ব এবং গবেষক বিজ্ঞানীদের কাছে তার রহস্যময়তা কৌতূহলোদ্দীপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। দুনিয়ার আগুনের উল্লেখ প্রসংগে এখানে আখেরাতের আগুনের বিষয়ে ইংগিত দেয়া হয়েছে। 'আমি আগুনকে শিক্ষণীয় বিষয় বানিয়েছি,' অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনকে স্মরণ করার উপায় বানিয়েছি। অনুরূপভাবে এই আগুনকে পর্যটকদের পাথেয় বানিয়েছি। শ্রোতাদের মনে এই বক্তব্যের গভীর প্রভাব পড়ার কথা। কেননা, এটা জনজীবনের একটি বাস্তব ও জীবন্ত সত্য।

এসব তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্ব, তথ্য ও রহস্য আলোচনার পর এবং ঈমানের সহজ সাবলীল সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের পর এসব তত্ত্ব তথ্যের চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্ব, প্রভুত্ব ও মহত্ত্ব। সৃষ্টির সামনে এই সত্য সর্বাত্মক শক্তি ও পরাক্রম নিয়ে আবির্ভূত হয়। তাই রসূল (স.)-কে এই সত্যের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা ও তাৎক্ষণিকভাবে তাকে অন্তরে বদ্ধমূল করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

'অতএব তোমার মহান প্রভুর নামে তাসবীহ পাঠ করো।'

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٩٢﴾

রুকু ৩

৭৫. অতপর আমি শপথ করছি তারকাগুলোর অস্তাচলের, ৭৬. সত্যিই (আমার গোটা সৃষ্টি নৈপুণ্যের আলোকে) তা হচ্ছে এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে; ৭৭. অবশ্যই কোরআন এক মহামর্যাদাবান গ্রন্থ। ৭৮. এটি লিপিবদ্ধ রয়েছে একটি (সযত্নে) রক্ষিত গ্রন্থে, ৭৯. পূত পবিত্র ব্যতিরেকে তা কেউ স্পর্শও করে না; ৮০. (কেননা তা) নাযিল করা হয়েছে সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে। ৮১. তোমরা এ (গ্রন্থের আনীত) বাণীকে কি সাধারণ কথাই মনে করতে থাকবে? ৮২. এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করাটাকেই তোমরা তোমাদের জীবিকা (আহরণের পেশা) বানিয়ে নেবে? ৮৩. যখন কোনো (মানুষের) প্রাণ (তার) কণ্ঠনালীতে এসে পৌঁছে যায়, ৮৪. তখন (কেন) তোমরা (অসহায়ের মতো) তাকিয়ে থাকো, ৮৫. (এ সময় তো বরং) তোমাদের চাইতে আমিই সেই (মুমূর্ষু) ব্যক্তির বেশী কাছে থাকি, (কিন্তু) তোমরা এর কিছুই দেখতে পাও না। ৮৬. তোমরা যদি এমন অক্ষম না-ই হও, ৮৭. তোমরা যদি (তোমাদের ক্ষমতার দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে কেন সেই (বেরিয়ে যাওয়া প্রাণ)-কে (পুনরায় তার দেহে) ফিরিয়ে আনো না। ৮৮. (হাঁ)– যদি সে (মৃত) ব্যক্তিটি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত (প্রথম দলের) একজন হয়ে থাকে, ৮৯. তাহলে (তার জন্যে) থাকবে আরাম আয়েশ, উন্নত মানের আহার্য ও নেয়ামতে ভরপুর (এক চিরন্তন) জান্নাত। ৯০. আর যদি সে হয় ডান পাশের (দ্বিতীয় দলের) কেউ, ৯১. তাহলে (তাকে এই বলে অভিনন্দন জানানো হবে,) তোমার জন্যে রয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) শান্তি (আর শান্তি, কারণ), তুমি তো (ছিলে) ডান পাশেরই (একজন); ৯২. আর যদি সে হয় (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদী পথভ্রষ্ট দলের কেউ–

فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

৯৩. তাহলে ফুটন্ত পানি দ্বারা (তার) আপ্যায়ন করা হবে, ৯৪. এবং সে জাহান্নামের (কঠিন) আগুনে উপনীত হবে। ৯৫. নিশ্চয়ই এ হচ্ছে এক অমোঘ সত্য (ঘটনা)। ৯৬. অতএব (হে নবী,) তুমি তোমার মহান মালিকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করো।

তাফসীর

আয়াত ৭৫-৯৬

এরপর কোরআনকে যারা অস্বীকার করে, তাদের দিকে পুনরায় দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এ প্রসংগে কোরআনের ও বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর কসম দ্বারা যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

নক্ষত্ররাজির শপথ

'নক্ষত্রমন্ডলীর অবস্থানস্থলসমূহের নামে শপথ করছি। তোমরা যদি জানতে, তবে এটা খুবই গুরুতর শপথ। এটি একটি সুরক্ষিত গ্রন্থে স্থাপিত মহান সম্মানিত কোরআন। একে পবিত্র লোকেরা ছাড়া স্পর্শ করতে পারে না। বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা।'

সেকালের শ্রোতাদের মধ্য থেকে মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যতীত কেউ নক্ষত্রমন্ডলীর অবস্থান জানতো না, আর জানতো না বলেই তারা খালি চোখে দেখে নক্ষত্রগুলোকে ঠিকমতো চিনতো না। এ জন্যেই পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে, 'তোমরা যদি জানতে, তবে এটা খুবই গুরুতর শপথ।' অবশ্য ইদানীংকালে আমরা এই শপথের গুরুত্ব আমাদের পূর্বসুরীদের চেয়ে বেশী জানি, যদিও নক্ষত্রমন্ডলীর অবস্থানের গুরুত্ব আমরাও খুব সামান্যই জানি।

আমাদের এই সামান্য জ্ঞানের অর্জিত একটি তথ্য এই যে, এই বিশাল মহাশূন্যের অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে যে নক্ষত্রপুঞ্জটিতে আমাদের সৌরমন্ডল অবস্থিত, তার নক্ষত্র সংখ্যা হলো একশ' কোটি।

'আল্লাহ তায়ালা ও আধুনিক বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'মহাশূন্য বিশেষজ্ঞদের মতে কযেক হাজার নক্ষত্রের মধ্যে এমন নক্ষত্রও আছে, যা খালি চোখে দেখা যায়, এমন নক্ষত্রও আছে যা দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখতে হয়। আবার এমন নক্ষত্রও আছে যা দূরবীক্ষণ ইত্যাদিও দেখতে পায় না, কেবল অনুভব করে। এতো সব নক্ষত্র অস্বচ্ছ আকাশে সাঁতার কাটে। অথচ একটি নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র অপর নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের কাছাকাছি হবে, বা এক নক্ষত্রের সাথে অপর নক্ষত্রের সংঘর্ষ বেধে যাবে, এমন কোনোই সম্ভাবনা নেই। কেননা, একটি থেকে অপরটির দূরত্ব প্রশান্ত মহাসাগরে ভাসমান একটি নৌকা থেকে ভূমধ্যসাগরে ভাসমান একটি নৌকার দূরত্বের মতো। উভয় নক্ষত্র একই সমান গতিতে একই দিকে ধাবমান থাকে, অথচ তাদের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ লাগা একেবারে অসম্ভব না হলেও সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।'

প্রতিটি নক্ষত্র অন্যান্য নক্ষত্র থেকে ভারসাম্যপূর্ণ ও যুক্তিসংগত দূরত্বে অবস্থিত। সকল নক্ষত্রের সাথে তার সমন্বয় সাধন করা হয়েছে এবং এই বিস্তৃত মহাশূন্যের সকল সৃষ্টি পরিপূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে।

এই হচ্ছে নক্ষত্রসমূহের অবস্থানের গুরুত্বের একটি দিক। কোরআনের প্রথম শ্রোতারা এ সম্পর্কে যা জানতো, এটা তা থেকে অনেক বড়। আর এখন যেটুকু জানা গেছে, তাও এতদসংক্রান্ত প্রকৃত ও সার্বিক তথ্যের অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নক্ষত্রসমূহের অবস্থানস্থলসমূহের শপথ করছি।' বস্তুত বিষয়টি এতো পরিষ্কার যে, শপথের কোনো প্রয়োজন নেই। 'তোমরা যদি জানতে, তবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ শপথ।' বস্তুত শপথের যেখানে আদৌ প্রয়োজনই নেই এবং শপথ ছাড়াই বিষয়টি পরিষ্কার, সেখানে শপথের এই ভংগি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। 'নিশ্চয় এটি মহাসম্মানিত কোরআন, সুরক্ষিত গ্রন্থে স্থাপিত, একে পবিত্র লোকেরা ছাড়া কেউ স্পর্শ করে না। এটি বিশ্বপ্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।'

অর্থাৎ তোমরা যেমন কোরআনকে জ্যোতিষীর বাণী, পাগলের প্রলাপ, আল্লাহর নামে মনগড়া প্রাচীন কেসসাকাহিনী এবং শয়তানের নিয়ে আসা কথা ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করে থাকো, ওসব কিছুই নয়। এটা মহাসম্মানিত কোরআন।

'সুরক্ষিত গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত।' এর ব্যাখ্যা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে যে, পবিত্র লোকেরা ছাড়া একে কেউ স্পর্শ করে না। বস্তুত মোশরেকরা মনে করতো, শয়তানরা কোরআন নিয়ে এসেছে। এখানে তাদের সেই ধারণা খন্ডন করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞানে ও তাঁর তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত কোরআন শয়তান স্পর্শ করতে পারে না। একে নিয়ে এসেছে পবিত্র ফেরেশতারা। এটাই এ আয়াতের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। সুতরাং 'লা' শব্দটি এখানে নেতিবাচক– নিষেধবাচক নয়। কেননা, পৃথিবীতে কার্যত পবিত্র ও অপবিত্র, মোমেন ও কাফের সব ধরনের লোকেই কোরআন স্পর্শ করে থাকে। কাজেই এই অর্থে গ্রহণ করলে নেতিবাচক অর্থ মানানসই হয় না। নেতিবাচক অর্থ মানানসই হয় যদি এটিকে কাফেরদের এই উক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা যায় যে, 'কোরআনকে শয়তান নিয়ে এসেছে।' আর বলা যায়, এ আয়াতে শয়তান কর্তৃক কোরআন বহন করে আনার ধারণা খন্ডন করা হয়েছে। কেননা যে সুরক্ষিত মূল গ্রন্থে কোরআন রয়েছে, সেখান থেকে তা স্পর্শ করা ও বহন করে আনার কাজ পবিত্র ফেরেশতারা ছাড়া আর কেউ করেনি।

আর এই ব্যাখ্যা পরবর্তী আয়াত দ্বারা সমর্থিত হয়। 'এটি নাযিল হয়েছে বিশ্বপ্রভুর পক্ষ থেকে।' অর্থাৎ শয়তানের পক্ষ থেকে আসেনি।

অবশ্য দুটি হাদীস দ্বারা এ আয়াতের অন্য অর্থ প্রকাশ পায়। সেটি এই যে, পবিত্র লোকেরা ছাড়া কেউ কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না। তবে ইবনে কাসীর এই উভয় হাদীসের সনদ অনির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই হাদীস দুটি গ্রহণ না করা উচিত বলে রায় দিয়েছেন।

মৃত্যুর করুণ দৃশ্য

অতপর সূরার শেষাংশ আলোচিত হচ্ছে। এতে মৃত্যুর সময়কার বর্ণনা রয়েছে, যা শরীরের প্রতিটি গ্রন্থিকে কাঁপিয়ে দেয় এবং সকল বিতর্কের অবসান ঘটায়। এটা সেই মুহূর্ত, যা এক জীবনের অবসান ও আর এক জীবন সূচনার মাঝখানে অবস্থিত। এখান থেকে ফিরে আসা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

'তবু কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে?.....' (৮১ থেকে ৮৭ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ তোমাদের আখেরাত সম্পর্কে যে কথা বলা হচ্ছে, তা নিয়ে কি এখনো সন্দেহে পতিত থাকবে? কোরআন ও তাতে আলোচিত আখেরাতকে তোমরা এখনো মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে

থাকবে? এতে আকীদা সংক্রান্ত যা কিছু বলা হয়েছে, তা কি তোমরা অগ্রাহ্য করতেই থাকবে? 'আর তোমাদের এই মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকে কি জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করবে?' অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং অস্বীকার করাই তোমাদের ইহকাল ও পরকালের উপজীব্য বা সম্বল হয়ে দাঁড়াবে? আর এতো খুবই নিকৃষ্ট ধরনের সম্বল!

তোমাদের প্রাণবায়ু যখন কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যাবে এবং তোমরা অজানা পথের সন্ধিস্থলে গিয়ে পৌঁছবে, তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে?

অতপর কোরআন সেই অবস্থাটার চিত্র তুলে ধরছে, যা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সংঘটিত হবে। এখানে অতি দ্রুতগতিতে পরিস্থিতির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

'অতপর যখন কারো প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা তাকিয়ে থাকো, তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার বেশী নিকটে থাকি। কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না।' যেন প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি, যেন সেই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি এবং সেই যন্ত্রণা ও কষ্ট যেন অনুভব করছি এই কথাটার মধ্য দিয়ে, 'অতপর যখন তোমাদের প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত হয়।' অনুরূপ 'তোমরা তখন তাকিয়ে থাকো'– এই কথাটার মধ্য দিয়ে আমরা যেন উপস্থিত লোকদের হতাশাভরা ও দিশাহারা করুণ দৃষ্টিকে দেখতে পাই।

অতপর প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়, দুনিয়া ও তার যাবতীয় ভোগের উপকরণ ছেড়ে সে চলে যায়। সে এমন একটা জগতের দিকে অগ্রসর হয়, যা তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং তার ভালো বা মন্দ কৃতকর্ম ছাড়া আর কোনো সম্বলই সেখানে তার হাতে থাকে না।

এ সময় তার চোখে যে দৃশ্য ভেসে ওঠে, সে সম্পর্কে তার কোনো কিছুই বলার অবকাশ থাকে না এবং তার আশপাশে যতো বস্তু বা প্রাণী থাকে, তা থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দর্শকরা তার দেহ দেখতে পায় বটে, কিন্তু দেহের ওপর বা অভ্যন্তরে কী ঘটছে তা দেখতে পায় না। আর তার কিছু করার ক্ষমতাও থাকে না।

এখানে এসে মানুষের সমস্ত ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়। তার সমস্ত অনুভূতি ও চেতনা স্তব্ধ হয়ে যায় এবং তার সমস্ত কাজের অবকাশও শেষ হয়ে যায়।

এ পর্যায়ে এসে সে বুঝতে পারে যে, সে একেবারেই অক্ষম এবং অসহায়। অথচ আদৌ কোনো বাদ প্রতিবাদ করার ক্ষমতা তার থাকে না।

মানুষের দৃষ্টি, জ্ঞান ও তৎপরতার ওপর তখন পর্দা পড়ে যায়।

অবশিষ্ট থাকে কেবল আল্লাহর ক্ষমতা ও আল্লাহর জ্ঞান। সন্দেহাতীতভাবে ও বিনা বাদ প্রতিবাদে যাবতীয় বিষয় একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ কথাই বলা হয়েছে নিম্নের আয়াতে।

'এখন আমি হয়ে যাই তোমাদের চেয়েও তার (অর্থাৎ মরণোন্মুখ ব্যক্তির) নিকটতর, অথচ তোমরা তা দেখতে পাও না।'

এখানে আল্লাহর প্রতাপ ও তাঁর উপস্থিতির ভীতি গোটা পরিবেশকে ভাবগম্ভীর করে তোলে। যদিও আল্লাহ তায়ালা সব সময়ই সর্বত্র উপস্থিত থাকেন, কিন্তু এখানে যে বাচনভংগি ব্যবহৃত হয়েছে, তা মানুষের ভুলে যাওয়া স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে এবং হারিয়ে যাওয়া চেতনা পুনর্বহাল করে। মৃত্যুর মজলিস যখন বসে যায়, তখন আল্লাহর উপস্থিতির ভীতি ও প্রতাপ তাকে অধিকতর ভাবগম্ভীর করে তোলে। তদুপরি মরণোন্মুখ ব্যক্তির অসহায়ত্ব, ভীতি, বিচ্ছিন্নতা ও বিদায় গ্রহণ পরিবেশকে আরো বেশী বিয়োগ ব্যথায় ভারাক্রান্ত করে তোলে।

এহেন প্রকম্পিত ও বেদনাবিধুর অনুভূতির আওতায় পুনরায় চ্যালেঞ্জের ভাষা প্রয়োগ করে সকল বাদানুবাদ স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে, 'যদি তোমাদের হিসাব-কেতাব না হওয়াই সত্য হয়, তবে তোমরা এই (বিদায়রত) আত্মাকে ফেরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।'

অর্থাৎ তোমরা যে বলে থাকো হিসাব নিকাশ কিছুই হবে না, সে কথাই যদি যথার্থ হয়, তা হলে তো তোমরা মুক্ত, তোমাদের আর কোনো হিসাব নিকাশ দিতে ও জবাবদিহি করতে হবে না। তাহলে বেশ তো, কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যাওয়া প্রাণকে ঠেকাও, যাতে সে হিসাব নিকাশ দিতে না যেতে পারে। অথচ তোমরা তার চারপাশে তাকিয়েই থাকো, আর সে বৃহত্তম জবাবদিহির কাঠগড়ার দিকে যেতে থাকে, তোমরা অক্ষম ও অসহায় দর্শকের মতো তা তাকিয়ে দেখতে থাকো।

এই পর্যায়ে সকল বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক বন্ধ হয়ে যায়। মানবসত্ত্বার ওপর এই অবধারিত মহাসত্য অর্থাৎ মৃত্যুর চাপ প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। সে এর বিরুদ্ধে কিছুমাত্র প্রতিরোধ রচনা করতে সক্ষম হয় না।

অতপর এই প্রাণ বা আত্মার গন্তব্য অভিমুখী যাত্রার বিবরণ দেয়া হয়। কণ্ঠনালীতে পৌঁছেই সে দূর থেকে তার সেই গন্তব্য দেখতে পায়। সে এখন নশ্বর পার্থিব জীবন পেছনে ফেলে চিরস্থায়ী জীবনের দিকে এবং জবাবদিহির দিকে এগিয়ে যায়, যাকে অবিশ্বাসীরা অস্বীকার করে থাকে।

'অতপর সে যদি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্তর্গত হয়, তাহলে তো সুখ, শান্তি ও নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত তার প্রাপ্য হবে ... ।' (৮৮ থেকে ৯৪ আয়াত দ্রষ্টব্য)

সূরার শুরুতে আমরা আল্লাহর নিকটতম ও ঘনিষ্ঠতম বান্দাদের নেয়ামতের কিছু দৃশ্য দেখে এসেছি। মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে আত্মা তার জন্যে আপেক্ষমাণ সেসব সুখ ও আনন্দের উপকরণ দেখতে পায়। রওহুন (সুখ), রায়হানুন (উত্তম জীবিকা) এবং জান্নাতু নাঈম (নেয়ামতপূর্ণ বেহেশত) এখানে খোদ এই ব্যবহৃত শব্দগুলো থেকেই এক ধরনের সুখ, প্রাচুর্য, আনন্দ, মিষ্টতা ও প্রীতির অনুভূতি যেন ফুটে ওঠেছে!

'আর যদি সে ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তা হলে ....।' সহসা তাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, ডান দিকের অন্যান্য ভাইদের পক্ষ থেকে তোমার জন্যে সালাম। সেই মুহূর্তে সালাম যে কত প্রীতিকর ও আনন্দদায়ক, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কণ্ঠাগত আত্মা এই সালাম ও অভিবাদন শুনে অভিভূত, তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত হয় এবং ডান দিকের অন্যদের সাহচর্য লাভের জন্যে সানন্দে অপেক্ষা করতে থাকে।

'আর যদি সে বিভ্রান্ত মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানীয় দ্বারা এবং সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।' দোযখের সেই উত্তপ্ত পানীয় মানের দিক থেকেও এবং শেষ অবলম্বন হিসাবেও অত্যন্ত নিকৃষ্ট জিনিস। আর জাহান্নামের সেই আযাব কত কঠিন ও ভয়াবহ, তা বর্ণনা করাই দুসাধ্য। পাপিষ্ঠ আত্মা দূর থেকে এসব জিনিস দেখতে পায় এবং নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে যে, ওগুলো তাকে ভোগ করতেই হবে।

অবশেষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় সূরার পরিসমাপ্তি টানা হচ্ছে এই বলে যে, 'এটা ধ্রুব ও অকাট্য সত্য। সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রভুর নামে তাসবীহ পাঠ করো।'

অর্থাৎ সূরার শুরুতেই যে বিভীষিকাময় ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে সত্যের মানদন্ডে যাচাই করে তার অকাট্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ঘোষিত হয়েছে। আর এই দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে আল্লাহর তাসবীহ ও মাহাত্ম্য ঘোষণা সহকারে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের যে স্বতস্ফূর্ত প্রেরণা জাগে, সেই প্রেরণাকে সমুন্নত রাখার নির্দেশের মধ্য দিয়ে সূরাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

সূরা আল হাদীদ

আয়াত ২৯ রুকু ৪

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٣ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۖ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٤ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٥ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۖ وَهُوَ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٦

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা এবং মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। ২. আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব তাঁরই জন্যে, তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান, তিনি সব কিছুর ওপর চূড়ান্ত ক্ষমতাবান। ৩. তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি অপ্রকাশ্য এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। ৪. তিনি হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তার আরশে সমাসীন হন; তিনি জানেন যা কিছু এ ভূমির ভেতরে প্রবেশ করে, (আবার) যা কিছু ভূমি থেকে বেরিয়ে আসে, আসমান থেকে যা বর্ষিত হয় (তা যেমন তিনি জানেন— আবার) আসমানের দিকে যা কিছু ওঠে তাও (তিনি অবগত আছেন); তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তিনি তোমাদের সাথেই আছেন; তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখছেন। ৫. আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যে, প্রতিটি বিষয়কে তাঁর দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে। ৬. তিনি রাতকে মিশিয়ে দেন দিনের সাথে, (আবার) দিনকে মিশিয়ে দেন রাতের সাথে; তিনি মনের (কোণে লুকিয়ে থাকা) বিষয় সম্পর্কেও সম্যক অবগত রয়েছেন।

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ⑦ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۙ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ⑧ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑨ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑩

৭. (হে মানুষ,) তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদের অধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে (তাঁরই পথে) তোমরা ব্যয় করো; অতপর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং (আল্লাহর নির্ধারিত পথে) অর্থ ব্যয় করবে, জেনে রেখো, তাদের জন্যে (রয়েছে) এক মহাপুরস্কার। ৮. তোমাদের এ কি হলো, তোমরা কেন আল্লাহর ওপর ঈমান আনছো না? (বিশেষ করে) যখন (স্বয়ং আল্লাহর) রসূল তোমাদের ডাক দিয়ে বলছেন, তোমরা তোমাদের মালিকের ওপর ঈমান আনো এবং তিনি তো (এ মর্মে) তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিলেন, যদি তোমরা সত্যিই ঈমানদার হও (তাহলে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করো)। ৯. তিনিই সে মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দার ওপর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন, যেন তিনি তোমাদের (এর দ্বারা জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোর দিকে বের করে নিতে পারেন; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু ও একান্ত করুণাময়। ১০. তোমাদের এ কি হলো, তোমরা কেন আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে চাও না, অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুর মালিকানা তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; তোমাদের মধ্যে তারা কখনো একই রকম (মর্যাদার অধিকারী) হবে না, যারা বিজয় সাধিত হওয়ার আগে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে এবং (ময়দানেও) সংগ্রাম করেছে; তাদের মর্যাদা ওদের তুলনায় অনেক বেশী যারা বিজয় সাধিত হবার পর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করেছে এবং জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছে; (অবশ্য) আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকেই উত্তম পুরস্কার প্রদানের ওয়াদা দিয়েছেন; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণাংগভাবে জ্ঞাত রয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটি সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতিকে আহবান জানায় যে, যে ইসলামের প্রতি সে ঈমান এনেছে, তা যেন তার নিজ জীবনে পরিপূর্ণরূপে ও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করে। মহান আল্লাহর আহবানে যে মহাসত্যের প্রতি সে একাগ্র ও একনিষ্ঠভাবে সাড়া দিয়েছে, তার পথে সে যেন আর কোনো কার্পণ্য না করে এবং কোনো বাধাবিপত্তি না মানে। জান হোক বা মাল হোক, অন্তর্দ্বন্দ্ব হোক বা মনের কোণে লুকানো কোনো চিন্তা ভাবনা হোক, কোনো কিছুই যেন তার আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে না পারে। আল্লাহর এই দ্বীন হচ্ছে সেই মহাসত্য, যা পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষকে আল্লাহর অনুগত বান্দায় পরিণত করে। আল্লাহর মানদন্ডই তার মানদন্ড হয়ে যায় এবং যে মূল্যবোধ দ্বারা সে গৌরব বোধ করে এবং যে মূল্যবোধ অর্জন করার জন্যে সে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তা হয় আল্লাহর নির্ধারিত মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধই তার দাঁড়িপাল্লায় সব সময় ভারী হয়ে থাকে। এই মহাসত্যই মানুষের মন মগযে আল্লাহর অস্তিত্ব উৎকীর্ণ করে দেয়। ফলে তার মন আল্লাহর স্মরণে বিগলিত ও প্রকম্পিত হয় এবং তা আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণের পথে সকল বাধা ডিংগাতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে।

এই মহাসত্যের ভিত্তিতেই এ সূরা মুসলিম জাতিকে আল্লাহর পথে জান ও মাল উৎসর্গ করার আহবান জানায়। যথা, 'তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন তা ব্যয় করো। .... তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।'

অনুরূপভাবে এই সত্যের আলোকেই মুসলিম জাতিকে আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হবার এবং আল্লাহ তায়ালা যে সত্য নাযিল করেছেন তার প্রতি অনুগত হবার আহবান জানায়। যাতে ঈমানের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট বিনয় ও আনুগত্য তাকে আল্লাহর পথে জান-মাল ব্যয়ে অনুপ্রাণিত করতে পারে। যেমন বলা হয়েছে, 'মোমেনদের কাছে সেই সময়টি কি আসেনি, যখন আল্লাহর স্মরণে তাদের মন বিগলিত ও বিনয়ী হবে ....?'

অনুরূপভাবে এ সূরায় সত্যের দাঁড়িপাল্লায় একদিকে দুনিয়ার মূল্যবোধ, অপরদিকে আখেরাতের মূল্যবোধকে রেখে কোন্‌টি অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য তা বেছে নেয়ার জন্যে এবং যেটি চিরস্থায়ী তা গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, 'জেনে রেখো, দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা, সাজসজ্জা, পারস্পরিক দম্ভ, ধনজনের আধিক্যের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয় ... আল্লাহ তায়ালা বিপুল অনুগ্রহের অধিকারী।'

সূরার বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, যদিও এতে ইসলামের চিরন্তন ও সাধারণ দাওয়াতই প্রতিফলিত হয়েছে, তথাপি এর পাশাপাশি এতে এই সূরার অবতরণকালীন সময়কার মদীনার মুসলিম সমাজের বাস্তব অবস্থা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। হিজরী ৪র্থ বছর থেকে শুরু করে মক্কা বিজয়ের পরবর্তী সময় পর্যন্তকার অবস্থা এই আলোচনার আওতাধীন।

এই সমাজে একদিকে ছিলো আনসার এবং মোহাজেরদের ন্যায় অগ্রণী ও তেজোদ্দীপ্ত মুসলমানদের দল, যারা নিজেদের জীবনে ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং সকল পার্থিব আকর্ষণ, লোভ লালসা ও বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সর্বাত্মক আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে জান ও মাল আল্লাহর পথে বিসর্জন দিয়ে মানবেতিহাসের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

অপরদিকে এই অতুলনীয় মানবগোষ্ঠীর পাশাপাশি এমন একটি গোষ্ঠীও মুসলিম সমাজে বিদ্যমান ছিলো, যাদের ঈমান অতোটা উন্নত, উৎকৃষ্ট ও একনিষ্ঠ পর্যায়ের ছিলো না। বিশেষত

মক্কা বিজয়ের পর যখন ইসলামের ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে, তখন মুসলিম সমাজে এমন একটি গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিলো, যারা ঈমানের মহাসত্যকে ঠিক সেইভাবে উপলব্ধি করেনি এবং সেভাবে আপন জীবনে বাস্তবায়িত করেনি যেমন করেছিলো বিজয় পূর্বকালে ঈমান আনয়নকারী একনিষ্ঠ মুসলমানরা।

বিজয়োত্তর কালের এই মুসলমানদের পক্ষে আল্লাহর পথে জান ও মালের ত্যাগ স্বীকার করা অত্যন্ত কঠিন ছিলো এবং পার্থিব জীবনের রূপসৌন্দর্যের মোহ তাদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করতো। ফলে তারা দুনিয়ার আকর্ষণ ও প্রলোভনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারতো না।

সূরা হাদীদ এই গোষ্ঠীটিকে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত করে ঈমানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার জন্যে উপদেশ দেয় ও প্রেরণা যোগায়। ঈমানের এই পর্যায়ে উন্নীত হলে দুনিয়ার মোহ কাউকে আপন বেড়াজালে আটকে রাখতে পারে না এবং কোনো বাধাই তার অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না।

এই উভয় গোষ্ঠী থেকে পৃথক আরো একটা গোষ্ঠী ছিলো মদীনায়। তারা হচ্ছে মোনাফেক গোষ্ঠী। এরা চিহ্নিত ছিলো না। মুসলমানদের সাথে মিলে-মিশে থাকতো। বিশেষত ইসলামের বিজয় লাভের পর তারা গা ঢাকা দিতে বাধ্য হলো। অথচ তাদের মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। যথারীতি তাদের মন ছিলো দোমুখো। তারা ছিলো সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাবাদী আর মুসলমানদের দুর্যোগ দুর্বিপাক প্রত্যাশী। কেয়ামতের দিন যখন এরা চিহ্নিত ও পৃথক হতে বাধ্য হবে এবং গা ঢাকা দেয়ার আর কোনো সুযোগ পাবে না, তখন তাদের কী পরিণতি হবে, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে পর পর তিনটি আয়াতে, 'যেদিন তুমি মোমেন পুরুষ ও নারীদের দেখবে তাদের জ্যোতি তাদের সামনে দিয়ে ও ডান দিক দিয়ে ছুটতে থাকবে .... ।'

এ ছাড়া যে ইহুদী ও খৃষ্টান জনগোষ্ঠী তখনো আরব উপদ্বীপে অবশিষ্ট ছিলো, তাদের প্রতিও এই সূরায় ইংগিত করা হয়েছে। তাদের তৎকালীন ভূমিকা, আচরণ ও হালচালের কথা এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। আর এ আয়াতে মোমেনদের তাদের মতো না হওয়ার জন্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে তাদের নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ ইংগিত খুব সম্ভবত ইহুদীদের প্রতি। সূরার শেষের দিকে একটি আয়াতে খৃষ্টানদের কথাও আলোচিত হয়েছে এবং বৈরাগ্যবাদসহ তাদের বিভিন্ন ভ্রান্ত নীতির সমালোচনা করা হয়েছে।

যেহেতু সূরার সর্বপ্রধান কেন্দ্রীয় বক্তব্য হৃদয়ে ঈমান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঈমান থেকে উদ্ভূত বিনয়, আল্লাহভীতি, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ত্যাগ তিতিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ সংক্রান্ত, তাই সে সময়ে মুসলিম সমাজে বিরাজমান অপেক্ষাকৃত কম পরিপক্ক মোমেনদের মনে ঈমান মযবুত করার লক্ষ্যে সূরায় ক্রমাগত আলোচনা চালানো হয়েছে। বস্তুত এ ধরনের লোকেরা শুধু যে মদীনার মুসলমানদের মধ্যেই ছিলো তা নয়; বরং সকল যুগের মুসলিম সমাজেই থাকে। এ আলোচনা এমন প্রভাবশালী ও কার্যকর বাচনভংগিতে করা হয়েছে, যা মক্কী সূরার বাচনভংগির সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যা মন মগয ও চেতনা অনুভূতিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

বিশেষভাবে সূরার সূচনাই করা হয়েছে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভংগিতে। এতে আল্লাহর কতিপয় গুণ মানব হৃদয়ের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এ সব গুণ বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহর একক অস্তিত্ব ও সমগ্র বিশ্বচরাচরে তাঁর নিরংকুশ সার্বভৌম এবং কর্তৃত্বের পরিচয় দিয়ে মানুষকে তার প্রতি একাগ্র ও একনিষ্ঠ বানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর মানুষের মনের অভ্যন্তরে লুকানো

গুপ্তভেদও যে আল্লাহ তায়ালা জানেন, সে কথা ব্যক্ত করে তার প্রতি সকল প্রাণী ও জড় বস্তুর আনুগত্য এবং তার এবাদাত উপাসনা করার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। সূরার শুরু থেকে একাদিক্রমে ছয়টি আয়াত জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে আল্লাহর এই পরিচিতি ও গুণাবলীর বর্ণনা। যথা, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই গুণগান করে চলেছে আল্লাহর এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত মহা কুশলী। .... এবং তিনি মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকানো বিষয়ও অবগত।'

সূরার সূচনাতেই এরূপ বক্তব্য থাকা হৃদয়কে ভীত সন্ত্রস্ত ও প্রকম্পিত করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। অনুরূপভাবে, এটা মানুষের মনে আল্লাহর প্রতি একাগ্রচিত্ত হওয়া এবং তার জন্যে জান মালের ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধা সংকোচ ও কার্পণ্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট, কিন্তু সূরার পরবর্তী আয়াতসমূহে প্রচুর আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য রয়েছে। এ সব উদ্দীপনা ও প্রেরণা সঞ্চারকারী বক্তব্য উপরোক্ত উদাত্ত আহবানের মাঝে মাঝে এসেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তা উক্ত আহবানকে জোরদার করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোমেনদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরে এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডানে দৌড়াতে থাকবে।' অনুরূপভাবে আরেকটি আয়াতে দুনিয়ার জীবন ও তার সহায় সম্পদকে আখেরাত ও তার বড় বড় ঘটনাবলীর সামনে নিতান্ত তুচ্ছ নগণ্য করে তুলে ধরা হয়েছে।

অনুরূপভাবে আরেক জায়গায় অদৃষ্ট সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে। এ বক্তব্য রেখে মানুষের মনকে সেই অদৃষ্টের দিকে আবর্তিত করা হয়েছে, যা সৃষ্টি জগতের সব কিছুর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'পৃথিবীতে এবং তোমাদের ওপর যে বিপদ আপদই আসুক, তা পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। .... আল্লাহ তায়ালা অভাবশূন্য স্বতপ্রশংসিত।' এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর পথে থাকা ও চলা অবস্থায় মানুষের ওপর ভালো বা মন্দ যাই আসুক, তার মন যেন স্থির অবিচল থাকে। খারাপ অবস্থায় বিমর্ষ এবং ভালো অবস্থায় যেন দাম্ভিক না হয়। মানুষের জীবনে সুখ দুঃখ যাই আসুক, সে যেন কোনো কারণ, পরিস্থিতি বা দুর্ঘটনাকে আল্লাহর সাথে অংশীদার না বানিয়ে বসে। কেননা, এ সবই যে নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্দিষ্ট সময়ে আসবেই, তা অবধারিত। সব কিছুর ওপর আল্লাহর হাত রয়েছে, সে কথা বিশ্বাস করতে হবে।

সূরাটি স্বীয় আলোচ্য বিষয় নিয়ে দুই পর্যায়ে আলোচনা করেছে। প্রথমটি আমরা এ ভূমিকার শুরুতে উল্লেখ করেছি। আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে সূরার মাঝে বক্তব্য এসেছে, কিন্তু এই দুটো বিষয়ই পরস্পরে সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যশীল। এ বিষয়ে আপাতত আর আলোচনা করতে চাই না। এখন আমরা সূরাটির বিস্তারিত তাফসীর আলোচনা করবো।

তাফসীর

আয়াত ১-১০

'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার সবই আল্লাহর গুণকীর্তন করে। ... তিনি অন্তর্যামী।'

সূরার প্রথমাংশের এই মনোনীত বাণীতে আল্লাহর যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, তিনি যাবতীয় জিনিসের স্রষ্টা, যাবতীয় জিনিসকে পরিবেষ্টনকারী, অর্থাৎ যাবতীয় জিনিসের ওপর নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী, সব কিছুর ওপর আধিপত্যশীল, সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, আকাশ ও পৃথিবীতে তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি অন্তর্যামী এবং বিশ্বচরাচরে যা কিছু ঘটে তার তিনিই উদ্যোক্তা।

সৃষ্টিজগতের সবকিছুই আল্লাহর গুণগান করে

সূরার সূচনার এ সকল বক্তব্য মানুষের মনকে প্রকম্পিত ও আলোড়িত করে এবং তার মনকে সারা বিশ্বে পরিভ্রমণ করায়। অথচ পৃথিবীর কোথাও সে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পায় না, আর কাউকে অনুভব করে না, তার শক্তির নাগালের বাইরে কোনো স্থান সে দেখতে পায় না, তার জ্ঞানের আওতার বাইরে কিছুই সে দেখতে পায় না, তার ছাড়া আর কারো কাছে প্রত্যাবর্তন এবং আর কারো প্রতি একাগ্র হওয়ার কোনো অবকাশ সে দেখতে পায় না।

প্রথম আয়াত আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আল্লাহর গুণগান করে। বস্তুত তিনি মহাকুশলী এবং মহাপরাক্রমশালী।'

সূরার শুরুতে এভাবেই কোরআনের ভাষণ শুরু হয়েছে, আর এর প্রতিক্রিয়ায় গোটা বিশ্বজগত আল্লাহর গুণগানে মুখর হয়ে ওঠে। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু এক ধরনের ঝিরঝির শব্দ করে। মুক্তমনা ও স্বাধীনচেতা মানুষ মাত্রই এ শব্দ শুনতে পায়, যদি তার হৃদয়ের কানে কোনো পর্দা না পড়ে থাকে। কোরআনের এ উক্তির প্রকাশ্য অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থ গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, এ উক্তি স্বয়ং আল্লাহর, যিনি গোটা বিশ্ব নিখিলের স্রষ্টা। এ বিশ্ব প্রকৃতির স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য কী, তা আমাদের জানা নেই। যিনি এগুলোর স্রষ্টা, তাঁর চেয়ে নির্ভুলভাবে এটা জানা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি যখন বলেছেন, 'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহর গুণগান করে', তখন তার অর্থই এই যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস আল্লাহর গুণগান করে। এখানে আর কোনো ওলটপালট ও ব্যাখ্যার মারপ্যাঁচ দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা এ উক্তি থেকে নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর ও পদার্থের প্রাণ আছে, যা দিয়ে সে নিজ স্রষ্টার প্রশংসা ও গুণগান করে, তার প্রতি মনোনিবেশ করে। এ তত্ত্বটি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা যেমন সমর্থিত হয়, তেমনি কারো কারো হৃদয় পরম স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্যের মুহূর্তে এবং বস্তুর বাহ্যিক রূপের আড়ালে যে আসল রূপ রয়েছে তার সাথে সংযোগ সাধিত হওয়ার সময় অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে এ তত্ত্বকে অকাট্য সত্য বলে উপলব্ধি করে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'হে পর্বতমালা, দাউদ ও পক্ষীকুলের সাথে সাথে তোমরাও বিনীত হও।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পর্বতমালা পাখীর মতোই দাউদের সাথে বিনীত হতে পারে। হাদীসে আছে, জাবের ইবনে সামুরা বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, 'মক্কায় একটি পাথর আছে, নবুওতলাভকালীন রজনীগুলোতে সে আমাকে সালাম করতো। আমি এখনো তাকে চিনি।' (সহীহ মুসলিম)

তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি মক্কায় রসূল (স.)-এর সাথে ছিলাম। একবার তাঁর সাথে মক্কার আশেপাশে ঘুরতে বেরুলাম। দেখলাম, যে পাহাড় বা গাছেরই সামনে দিয়ে তিনি যাচ্ছেন, সে তাঁকে বলছে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনাকে সালাম!' বোখারীতে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, রসূল (স.) প্রথমে একটি লম্বা বৃক্ষকান্ডের সাথে হেলান দিয়ে খোত্‌বা দিতেন। পরে যখন লোকেরা তাঁর জন্যে একটি মেম্বার বানালো এবং তার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি খোতবা দিতে আরম্ভ করলেন, অমনি সে বৃক্ষকান্ডটি উষ্ট্রীর ন্যায় শব্দ করে কেঁদে ওঠলো। তা শুনে রসূল (স.) নেমে এলেন এবং তার ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে সে শান্ত হয়ে গেলো।'

এই নৈসর্গিক সত্যটি কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা নূরে আছে, 'তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহর জন্যে আকাশ ও পৃথিবীর সকল জিনিস এবং কাতারবন্দী পাখীরা গুণগান করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামায ও তাসবীহ জেনে নিয়েছে।' সূরা হজ্জে আছে, 'তুমি কি দেখোনি যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও বহু সংখ্যক মানুষ আল্লাহর জন্যে সাজদা করে?' সূরা বনী ইসরাঈলে আছে, 'আল্লাহর প্রশংসা সহকারে গুণকীর্তন করে না এমন কোনো জিনিসই নেই, তবে তোমরা তাদের গুণকীর্তন বুঝতে পারো না। কোরআনের এসব দ্ব্যর্থহীন উক্তির এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিতান্তই অবাঞ্ছিত, যা দুনিয়ার বস্তু ও পদার্থসমূহ সম্পর্কে আমাদের আগে থেকে তৈরী করা কল্পিত ধ্যান ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পড়ে, অথচ তা কোরআন থেকে গৃহীত নয়। বস্তুত সৃষ্টিজগত ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত, ধ্যান-ধারণ যাই থাক না কেন, তা সর্বপ্রথম এই বিশ্বজগতের স্রষ্টার সিদ্ধান্ত থেকেই উদ্ভূত হওয়া উচিত।

'তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাকুশলী।' অর্থাৎ নিজের শক্তির জোরেই তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান, আধিপত্যশীল ও পরাক্রান্ত। আর নিজের প্রজ্ঞা ও কৌশল অনুসারেই তিনি সব জিনিস তৈরী করে থাকেন। বস্তুত আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তারা যে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে, সেটা আল্লাহর পরাক্রম ও প্রজ্ঞারই ফল।

সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালার

প্রথম আয়াতের বক্তব্য এবং সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে মহান স্রষ্টার গুণগানকারী সৃষ্টির সমাবেশ সত্তেও মানব মনে ঈপ্সিত প্রেরণা ও চেতনার উন্মেষ ঘটতে বিলম্ব দেখে পরবর্তী আয়াতে মানুষকে আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্যে নতুন সফরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যাতে উক্ত চেতনার উন্মেষ ঘটা ত্বরান্বিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই রাজত্ব বিরাজিত, তিনিই জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।'

বস্তত আকাশ ও পৃথিবীতে প্রতিটি জিনিস আল্লাহর তাসবীহ তথা গুণগান করে। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র অধপতি। সুতরাং এ তাসবীহ একক ও অদ্বিতীয় মনিবের তাসবীহ। এই মনিব জীবন ও মৃত্যুর স্রষ্টা। প্রতিটি প্রাণীর জীবন ও মৃত্যুর নিয়ন্তা ও নির্ধারক। তিনি যে ভাগ্য নির্ধারণ করেন তা ছাড়া কোথাও কিছু সংঘটিত হয় না।

জীবন কী জিনিস, কোথা থেকে আসে তা এক গভীর রহস্য। কেউ বলতে পারে না কোথা থেকে কীভাবে জীবনের উদ্ভব ঘটেছে! কোরআন বলে, আল্লাহ তায়ালা জীবন দেন। তিনি সকল প্রাণীর দেহে প্রাণের সঞ্চার করেন। এ সত্য কেউ অস্বীকারও করতে পারে না। এর বিপরীত কোনো তত্ত্বও কেউ প্রমাণ করতে পারে না। মৃত্যুও জীবনের ন্যায় এক অভেদ্য রহস্য। মৃত্যুর প্রকৃতি কিরূপ তা কেউ জানে না এবং কেউ তা সৃষ্টিও করতে পারে না। কেননা, জীবন যে দিতে পারে না, সে তা ছিনিয়েও নিতে পারে না। এই দুটো জিনিস অর্থাৎ জীবনদান ও মৃত্যু সংঘটিত করা, আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর একচ্ছত্র রাজত্ব এবং আধিপত্যের প্রতীক।

'তিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাশালী।' অর্থাৎ তাঁর ক্ষমতা সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক, সীমাহীন ও বাধাবন্ধনহীন। বস্তুত আল্লাহর অবাধ ইচ্ছার কার্যকারিতাও অবাধ অসীম। তাঁর ইচ্ছা যদি কোনো কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে সেটাও তাঁর ইচ্ছাক্রমেই হয়। যার সাথে ইচ্ছার সংশ্লিষ্ট হওয়া তিনি পছন্দ করেন, তার সাথেই সংশ্লিষ্ট হয়। মানবীয় বিবেকবুদ্ধি নিজস্ব যুক্তি অনুসারে আল্লাহর ইচ্ছাকে যে ধরনের সীমায়ই আবদ্ধ বলে ধারণা করে, সে ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল ও

ভিত্তিহীন। কেননা, তা সীমাবদ্ধ মানবীয় বিবেকবুদ্ধি থেকেই উদ্ভূত। আল্লাহর ইচ্ছা যে প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে নেয় সেটাও তার অবাধ ও অসীম কর্তৃত্বেরই আওতাধীন। কেননা, প্রাকৃতিক নিয়মকে সে কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে নয়, বরং স্বাধীনভাবেই মেনে নেয় এবং স্বাধীনভাবেই কাজে লাগায়। এই স্বাধীন ইচ্ছা প্রাকৃতিক নিয়মের পেছনে সর্বদাই সক্রিয় রয়েছে।

কোরআন এই বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাই সে উপযুক্ত প্রসংগ পেলেই উল্লেখ করে, আল্লাহর ইচ্ছা এত অবাধ ও শর্তহীন যে, তা এমন কি তার নিজের কাজের বাধাও মানে না। এর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর সর্বশক্তিমান হওয়ার তত্ত্বটি যেন স্পষ্ট ও স্বচ্ছ থাকে এবং এ সংক্রান্ত ধারণায় যেন কোনো জড়তা না থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহ জান্নাতবাসী ও দোযখবাসী সম্পর্কে ওয়াদা করেছেন, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এই ওয়াদা তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত, কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছাকে খোদ তার এই ওয়াদার বাধ্যবাধকতা থেকেও মুক্ত রেখেছেন। অথচ এই ওয়াদা তাঁর নিজেরই একটি কাজ এবং স্বেচ্ছামূলক কাজ। তিনি দোযখ ও বেহেশতের অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন, 'তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, কেবল তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া।' এ ধরনের প্রসংগ যেখানেই এসেছে, সেখানেই তিনি এরূপ উক্তি করেছেন। মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি উদ্ভূত যুক্তি বা তার কোনো মনগড়া ধ্যানধারণার এ অবকাশ বা ক্ষমতা নেই যে, এ উক্তির বিপক্ষে অবস্থান নেয়; বরং তার কর্তব্য হলো তার যাবতীয় ধ্যানধারণা বা সিদ্ধান্ত কোরআন থেকেই গ্রহণ করা এবং কোরআন ছাড়া আর কোনো উৎস থেকে গ্রহণ না করা।

তাই এ আয়াতের মধ্য দিয়ে মানব হৃদয়ের কাছে এই সত্যটিই প্রস্ফুটিত হয় যে, আল্লাহর একক ও একচ্ছত্র শাসনাধীন এই বিশাল বিশ্বচরাচর, তাঁর ক্ষমতা অবাধ সীমাহীন ও সর্বাত্মক। তাই তাঁর সৃষ্টি এ মহাবিশ্ব তাঁরই গুণগানে নিয়োজিত এবং তিনি যথার্থই এর উপযুক্ত।

এই মহাসত্য হৃদয়ংগম করার পরও যখন মানুষের মধ্যে চেতনা ও জাগরণের সঞ্চার হয় না, তখনই তার সামনে আর একটা মহাসত্য তুলে ধরা হয়, যা অধিকতর বড় ও অধিকতর শক্তিশালী। সেটি এই যে, প্রকৃতপক্ষে এই মহাবিশ্বে স্বয়ং আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। তাই তাঁর অস্তিত্ব বিশ্বজগতের আর সব কিছুকে নিজ বলয়ে ধারণ করে রেখেছে এবং সব কিছু সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

'তিনিই প্রথম তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য ও তিনিই গোপন। আর তিনি সর্ববিষয়ে অবগত।'

যেহেতু তিনিই প্রথম, তাই তাঁর আগে কিছু ছিলো না, তিনিই শেষ, তাই তাঁর পরেও কিছু নেই। তিনিই প্রকাশ্য, তাই তাঁর চেয়ে প্রকাশ্য কিছু নেই। আর যেহেতু তিনিই গোপন, সুতরাং তাঁর চেয়ে গোপন আর কিছু নেই।

প্রথম ও শেষ এ দুটি শব্দ দ্বারা সমগ্র কাল বা সমগ্র সময় বুঝানো হয়েছে। আর গোপন ও প্রকাশ্য এ দুটি শব্দ দ্বারা সমগ্র স্থানকে বুঝানো হয়েছে। মানুষের মনমগয যখন আল্লাহর এই দুটি বৈশিষ্ট্য বা গুণের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করে, তখন সে মহাবিশ্বে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে বলে অনুভব করে না। আসলে অস্তিত্বের দৃশ্যমান যাবতীয় বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যেই নির্ধারিত, অন্য কারো জন্যে নয়। এমন কি খোদ এই হৃদয়ের অস্তিত্বও আল্লাহর অস্তিত্ব থেকেই উদ্ভূত। সুতরাং আল্লাহর অস্তিত্বই একমাত্র আসল অস্তিত্ব এবং প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্বের উৎস। আর এই সত্য হচ্ছে প্রথম সত্য, যা থেকে প্রতিটি জিনিস তার সত্যতা ও বাস্তবতা অর্জন করেছে। এর বাইরে এই মহাবিশ্বে কোনো সত্য নেই এবং কোনো জিনিসের বাস্তব

অস্তিত্ব নেই। 'তিনি সর্ববিষয়ে অবগত।' অর্থাৎ পূর্ণাংগ সত্যের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে, আর কারো নেই। এটি এমন জ্ঞান, যাতে তাঁর সাথে আর কেউ শরীক নেই। এ জ্ঞানের ধরন, প্রকৃতি ও অর্জনের পন্থা একমাত্র তাঁরই আয়ত্তাধীন। মানুষ বা অন্যান্য সৃষ্টি কেবল বস্তুনিচয়ের বাহ্যিক রূপ ও বৈশিষ্ট্য জানতে সক্ষম, অন্তর্নিহিত রূপ ও বৈশিষ্ট্য নয়।

কারো অন্তরে যখন এই মহাসত্য বদ্ধমূল হয়, তখন এই বিশ্বজগতে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোনো জিনিসের প্রতি সে আকৃষ্ট হতে পারে না। আর এই মহাসত্য থেকে যা কিছু উদ্ভূত, তা ছাড়া আর কোনো জিনিসের অস্তিত্বও নেই, বাস্তবতাও নেই, এমন কি মানুষের মনেরও কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। সকল জিনিসই নিছক ক্ষণস্থায়ী কল্পনামাত্র। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ বহাল আছেন ও থাকবেন। এই মহাসত্য হৃদয়ে বদ্ধমূল ও স্থিতিশীল হওয়ার ফলে হৃদয় স্বয়ং এই মহাসত্যের অংগে পরিণত হয়। কারো হৃদয়ে এ মহাসত্য বদ্ধমূল হওয়ার আগ পর্যন্ত কোরআনের এই আয়াতই তার জন্যে যথেষ্ট। এই আয়াত নিয়ে, এর মর্মার্থ নিয়ে এবং এর একমাত্র মর্মার্থে পৌঁছার চেষ্টা কিভাবে করা যায়, সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে সে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

তাসাওউফপন্থীরা এই মৌলিক সত্য অবলম্বন করে আজীবন সাধনা করেছেন এবং বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন, আমি বিশ্বজগতের প্রতিটি জিনিসের মধ্যে আল্লাহকে দেখতে পাই। কেউ বলেছেন, বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুর অন্তরালে আল্লাহকে দেখেছি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আমি বিশ্ব নিখিলে শুধু আল্লাহকেই দেখি, তাঁকে ছাড়া আর কিছুই দেখি না। এই কথাগুলো শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা চলে না। কেননা এ সব শব্দ এর প্রকৃত অর্থ ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। যখন এ সব কথার শাব্দিক অর্থের উর্ধ্বে ওঠা যায়, তখন বুঝা যায়, এগুলো সে মহাসত্যের দিকেই ইংগিত করছে। তবে মোটামুটিভাবে তাদের ওপর যে আপত্তি উত্থাপিত হয়, সেটা এই যে, তারা এ চিন্তাধারার মাধ্যমে পার্থিব জীবন উপেক্ষা করেছেন। যেহেতু ইসলাম একটা ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, তাই সে একদিকে যেমন মানুষের বিবেকের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে যে, সে এই মহাসত্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করুক এবং এরই জন্যে ও এরই উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করুক, অপরদিকে একই সাথে সে পৃথিবীতে আল্লাহ্র আইন ও বিধান বাস্তবায়নের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা, সংগ্রাম ও নিষ্ঠাসহকারে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করুক। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন সে উক্ত মহাসত্যকে পূর্ণ ভারসাম্য সহকারে এবং মানুষ ও বিশ্বজগতের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সমন্বয় সাধন করে উপলব্ধি করবে। সেই মহাসত্য দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরার পর তা থেকে বিশ্বজগতের অন্যান্য সত্য কিভাবে উদ্ভূত হয়েছে, তার উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে,

'তিনিই সেই আল্লাহ্, যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতপর আরশের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ......এবং তিনি অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে অবহিত।'

এ তিনটি আয়াতে যে সত্যগুলো আলোচিত হয়েছে, তা হলো এই যে, আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি আরশের অধিপতি ও সকল সৃষ্টির ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্বসম্পন্ন, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবহিত, প্রতিটি সৃষ্টির সাথে তিনি বিরাজমান, তা সে যেখানেই থাক না কেন। সকল জিনিসের তারই কাছে প্রত্যাবর্তন অবধারিত, সৃষ্টিজগতকে তিনি সকলের দৃষ্টির বাইরে থেকে পরিচালিত করছেন এবং তিনি অন্তর্যামী।

এই সব ক'টি সত্য উপরোক্ত মহাসত্য থেকেই উদ্ভূত। এই মহাজাগতিক প্রেক্ষাপটে এ সত্যগুলো বর্ণনা করায় মানুষের মনের ওপর বিপুল প্রভাব পড়ে। বিশাল নীল আকাশ ও বিশাল

পৃথিবী নিজের বিরাটত্ব, গাম্ভীর্য, পারস্পরিক সমন্বয়, অপরূপ সৌন্দর্য, সুষ্ঠু সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা এবং চিরন্তন বৈশিষ্ট্যসমূহ দ্বারা মানব হৃদয়কে প্রভাবিত ও অভিভূত করে। তা ছাড়া মানুষের হৃদয় যেমন আল্লাহর সৃষ্টি, এই জিনিসগুলোও তেমনি আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং এগুলোর সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও আত্মীয়সুলভ। এই সকল মহাজাগতিক জিনিসগুলো ও সত্যগুলোর প্রতি যখন সে মনোযোগ দেয়, এগুলোর আহবান শ্রবণ করে এবং তা অনুভব করে, তখন তা তার হৃদয়ে আল্লাহর উপলব্ধি এনে দেয়। এ জিনিসগুলো অর্থাৎ আকাশ, পৃথিবী ও তার অভ্যন্তরের প্রতিটি বস্তু তাকে যেন বলতে থাকে, তাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তারা যেমন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে থাকে, তেমনি তারও আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করা উচিত। তাদের অস্তিত্ব তাদের স্রষ্টার অস্তিত্ব থেকেই উদ্ভূত। মানুষের অস্তিত্বও তদ্রূপ। সুতরাং এই মহাসত্যকেই সগৌরবে মেনে নেয়া উচিত।

ছয় দিনের প্রকৃত মর্ম কি, তা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। আমাদের দিন রাত তো পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফল। পৃথিবী ও সূর্যের সৃষ্টির পরই এর উৎপত্তি। সুতরাং যে ছয় দিনে আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সে দিন আর আমাদের এইদিন এক নয়। কাজেই এইদিনের প্রকৃত মর্ম কি, সেটা আমরা আল্লাহর কাছেই সমর্পণ করছি। তিনি ইচ্ছা করলে আমাদের জানাবেন।

আরশের ব্যাপারটাও অনুরূপ। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন, আমরা তার ওপরই ঈমান আনয়ন করি। এর প্রকৃত তাৎপর্য কি তা জানি না। তবে আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হওয়া প্রসংগে আমরা বলতে পারি, এ দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি জগতের ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব বুঝানো হয়েছে। এর একটি প্রমাণ এই যে, কোরআন থেকে আমরা অকাট্যভাবে জানতে পারি, আল্লাহর কোনো অবস্থান্তর ঘটে না, সুতরাং এমনটি কখনো হওয়া সম্ভব নয় যে, তিনি এক সময় আরশে অধিষ্ঠিত থাকেন না। পরে আবার অধিষ্ঠিত হন। আমরা যদি বলি, আমরা আল্লাহর আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ায় বিশ্বাস রাখি, কিন্তু তা কিভাবে সংঘটিত হয় বুঝি না, তাহলে

'অতপর তিনি আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হলেন'

এই কথাটার কোনো ব্যাখ্যাই করা হয় না। তবে ইতিপূর্বে আমরা যে বলেছি, আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ সমগ্র সৃষ্টির ওপর নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব, সেটাই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা আমাদের আলোচিত জীবন বিধানের আওতার বাইরে যায় না। কেননা, এ ব্যাখ্যা আমাদের মনগড়া ধ্যান ধারণা থেকে উদ্ভূত নয়। এটা খোদ কোরআনের চিন্তাধারা এবং কোরআন আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে যে ধারণা দেয়, তার সাথেই সামঞ্জস্যশীল এবং তা থেকেই উদ্ভূত।

সৃষ্টি করা ও সৃষ্টিজগতের ওপর সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ এবং নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া আল্লাহর এই দুটি গুণের উল্লেখের অব্যবহিত পরেই তাঁর সর্বব্যাপী সূক্ষ্ম জ্ঞানের উল্লেখ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে কোরআন নিজের কর্মক্ষেত্র ও প্রভাববলয়কে অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে বিচিত্র করেছে। এই বিরাট বিশাল কর্মক্ষেত্রে মানুষের মন যেন সর্বদা সচেতন সক্রিয় থাকে– এটাই তার উদ্দেশ্য। সৃষ্টি ও কর্তৃত্ব বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর গুণের কথা উল্লেখ করলে এই উদ্দেশ্য সফল হতো না। এভাবে উল্লেখ করে সে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনমগযকে এবং তার সকল মানসিক শক্তি ও কল্পনাকে প্রভাবিত করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'পৃথিবীতে যা কিছু প্রবেশ করে ও তা থেকে যা কিছু বর্হিগত হয় এবং আকাশ থেকে যা কিছু অবতরণ করে ও তার ওপর যা কিছু আরোহণ করে সে সব সম্পর্কে তিনি অবগত।'

পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত অসংখ্য প্রাণী ও বস্তুর আগমন নির্গমন হচ্ছে। এ সবের পরিচয় ও সংখ্যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। অনুরূপভাবে প্রতি মুহূর্তে আকাশ থেকে অসংখ্য জিনিস নেমে আসছে, যেমন বৃষ্টি, আলোকরশ্মি, উল্কা, ফেরেশতা, অদৃষ্ট ও অজানা রহস্য। আবার দৃশ্য-অদৃশ্য বহু জিনিস আকাশে ওঠেও যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এসবের সীমাসংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। আয়াতের এই ক্ষুদ্র বাক্যটি এই নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম এবং এই অগণিত ঘটনাবলীর দিকেই ইংগিত দিচ্ছে, আকাশ ও পৃথিবীতে আগমন নির্গমনরত এবং অবতরণ ও আরোহণরত অগণিত সৃষ্টির প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করছে আর আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞান সম্পর্কে সর্তক করে দিচ্ছে। কেননা, আল্লাহর এই জ্ঞান এই সকল ঘটনা ও কার্যক্রমকে সর্বদা গভীরভাবে তদারক এবং নিরীক্ষণ করছে।

মানুষের মন এ সব জিনিস ও ঘটনাবলীর প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং সচেতন থাকা অবস্থায় আল্লাহর অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থান করে, তার বিশাল রাজ্যে বিচরণ করে এবং বিশ্ব প্রকৃতির প্রতিটি স্থানে সুতীব্র অনুভূতি ও স্বচ্ছতা সহকারে ভয়ে কম্পমান অবস্থায় পরিভ্রমণ করে।

তার মন যখন আকাশ ও পৃথিবীর পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত থাকে ঠিক তখনই কোরআন তাকে আল্লাহর সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত করে, আর সে আল্লাহকে নিজের ঘনিষ্ঠতম সাথী, তার তৎপরতা নিরীক্ষণকারী ও তার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানী হিসাবে পায়। এ কথাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে।

'আর তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সাথে আছেন, আর তিনি তোমাদের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখছেন।'

এ কথাটা কোনো রূপক অর্থে নয়, বরং স্বাভাবিক ও আসল অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা যথার্থই প্রত্যেক প্রাণী ও বস্তুর সাথে সর্বদা সর্বত্র রয়েছেন, বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখছেন এবং তাদের কার্যকলাপ দেখছেন। এটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়াবহ সত্য, যা অনুধাবন করলে মানব হৃদয় পবিত্রতা অর্জন করে, উন্নত হয়, পৃথিবীর যাবতীয় লোভ লালসা থেকে মুক্ত হয় এবং নিরবচ্ছিন্ন খোদাভীতি, সতর্কতা, লজ্জা ও সকল নোংরামি থেকে সাবধানতা অর্জন করে।

পরবর্তী আয়াতে পুনরায় আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব এবং আধিপত্যের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। তবে পূর্বে যে প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা হয়েছে, এবারকার প্রেক্ষাপট তা থেকে স্বতন্ত্র।

'আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁর কাজেই সকল বিষয় প্রত্যাবর্তন করবে।'

পূর্ববর্তী আয়াতে 'আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর'- একথা বলে জীবন ও মৃত্যু দানের ক্ষমতা এবং সর্ববিষয়ে সর্বাত্মক ক্ষমতার উল্লেখ করা হয়েছে। আর এখানে একথাটা বলার পর যাবতীয় বিষয় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর তাঁর কাছে সব কিছুর প্রত্যাবর্তন, আকাশ পৃথিবীতে তাঁর নিরংকুশ রাজত্ব আধিপত্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং পরিপূরক।

এ বিষয়টি অনুধাবন করলে হৃদয় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া যে কোনো জিনিসের আর্কষণ ও মোহ থেকে মুক্ত হয়। যে কোনো কাজে আল্লাহ ছাড়া আর কারো পরোয়া করা থেকে অব্যাহতি পায়। গোপন ও প্রকাশ্যে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা অপরিহার্য মনে করে এবং সকল কাজে, কথায় ও চিন্তায় আল্লাহর আদেশ মেনে চলে। কেননা, সে জানে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কাছে তার আশ্রয় লাভের সম্ভাবনা নেই।

সূরার এই প্রথমাংশটির উপসংহারে বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের একটি সূক্ষ্ম দিক তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'তিনি রাতকে দিনের অভ্যন্তরে ও দিনকে রাতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করান। আর তিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরে কি আছে তা জানেন।'

রাতের অভ্যন্তরে দিনের প্রবেশ ও দিনের অভ্যন্তরে রাতের প্রবেশ একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া। সেই সাথে এটি একটি সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াও, চাই এর অর্থ দিনের অংশ নিয়ে রাতের দীর্ঘস্থায়ী হওয়া কিংবা রাতের অংশ নিয়ে দিনের দীর্ঘস্থায়ী হওয়া যেটাই হোক না কেন। এর অর্থ অস্ত যাওয়ার সময় দিনের মধ্যে রাতের প্রবেশ এবং উদয়ের সময় রাতের ভেতর দিনের প্রবেশও হতে পারে। প্রত্যেকের হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকানো সব কিছু জানাও দিন রাতের আগমনের মতোই সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন একটি কাজ। মনের অভ্যন্তরে লুকানো জিনিস মাত্রই এক একটি গোপন রহস্য, যা কখনো মন থেকে লুপ্ত হয় না। আল্লাহ কর্তৃক দিনের অভ্যন্তরে রাতকে এবং রাতের অভ্যন্তরে দিনকে প্রবেশ করানোর সূক্ষ্ম ও রহস্যময় কাজটা যে অনুধাবন করে, তার হৃদয়ে সূক্ষ্ম চিন্তা ও স্বচ্ছ অনুভূতির উন্মেষ ঘটে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর অন্তর্যামী হওয়ার বিষয়টা উপলব্ধি করে, তার মনেও সূক্ষ্ম চিন্তা ও স্বচ্ছ অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

ঈমানের আহবান ও তার পুরস্কার

সূরার এই প্রারম্ভিক অংশটি মানুষের হৃদয়ে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি করে। এ জন্যে পরবর্তী আয়াতে তাকে ঈমান আনার আহবান জানানো হয়েছে। শুধু ঈমান আনা নয়, সেই সাথে ঈমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য জিনিসেরও আহবান জানানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং ব্যয় করো সেসব জিনিস থেকে, যার ওপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিজের প্রতিনিধি বানিয়েছেন ....।' (আয়াত ৭ থেকে ১০)

আল্লাহ তায়ালা নিজের সৃজিত হৃদয়গুলোকে সম্বোধন করেন। কেননা, তিনিই জানেন হৃদয়ের অভ্যন্তরে কোথায় কী লুকিয়ে আছে, তার অবস্থাই বা কী এবং তার প্রবেশদ্বারগুলো কোথায়। তিনি এও জানেন, মানুষের আকীদা বিশ্বাসকে কলুষমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করা, হৃদয়কে একাগ্র ও একনিষ্ঠ করা, হৃদয়ে ঈমান এতোটা মযবুত ও স্থিতিশীল হওয়া যাতে সে অনুসারে তার বাস্তব জীবন গড়ে ওঠে, তথা একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে সে সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যায় এমনভাবে জীবন গড়ে ওঠে– এগুলো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এর জন্যে মানুষকে প্রচুর শ্রম ও শক্তি ব্যয় করতে হয় এবং দীর্ঘ সংগ্রাম সাধনা করতে হয়। এ জন্যেই তাকে উদ্বুদ্ধকারী ও তার মধ্যে প্রেরণা সঞ্চারকারী এসব বাণী ও বক্তব্যের সমাবেশ করেছেন এবং তার সামনে বিশ্ব-প্রকৃতির অজানা রহস্যগুলো উন্মোচন করেছেন, যাতে সে সেগুলো অবলোকন করে, তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং সব কিছুকেই তার সূক্ষ্ম ও বিরাট মানদন্ডে যাচাই এবং মূল্যায়ন করে। মানুষের হৃদয়কে তিনি বারংবার ও পদে পদে সদুপদেশ দিয়ে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন। শুধু একবার একটা আহবান জানিয়ে, একটা বক্তব্য দিয়ে বা একটা উদ্বুদ্ধকারী ঘোষণা দিয়েই তার কাছ থেকে উধাও হয়ে যান না। আর প্রকৃতপক্ষে মানুষের হৃদয়ের সুচিকিৎসার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে এই নীতিই ধার্য করেছেন যে, যারা আল্লাহর দিকে আহবান জানাবে, তারা যেন আহূত ব্যক্তির পাশে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে, তাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে ও তাকে চূড়ান্তভাবে বশীভূত করেই ক্ষান্ত হয়।

সূরার শুরুতে যে প্রেরণাদায়ক বক্তব্যগুলো এসেছে, তা এতো তেজোদ্দীপ্ত, এতো গভীর, এতো প্রভাবশালী এবং এতোটা ধারাবাহিক যে, তা পাষাণ ও স্থবির হৃদয়গুলোকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়, বিগলিত করে ও তীব্র অনুভূতিশীল করে। তথাপি কোরআন মোমেনদের হৃদয়গুলোকে শুধু এসব উদ্বুদ্ধকারী প্রারম্ভিক কথাবার্তার ওপর নির্ভরশীল করে রেখে দেয় না, বরং তাকে ঈমান আনা ও আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার আহবানও জানায়। সে বলে,

'তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনো এবং ব্যয় করো সেই সম্পদ থেকে, যার ওপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন ....'

আল্লাহ তায়ালা এখানে যাদের সম্বোধন করেছেন তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের ঈমান আনার আহবান জানানো হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেলো, তিনি তাদেরকে তাদের অন্তরে যথার্থ ও প্রকৃত ঈমান বদ্ধমূল করার আহবান জানাচ্ছেন। এটা একটা সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যময় ইংগিত। তাদের যে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহবান জানানো হয়েছে, তার সাথেও রয়েছে একটা তাৎপর্যময় উক্তি। বলা হয়েছে, তাদের নিজেদের সম্পদ থেকে নয়; বরং যে সম্পদে আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজের প্রতিনিধি বানিয়েছেন তা থেকে যেন দান করে। বস্তুত আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের মালিক আল্লাহ তায়ালা। আর তিনি সমগ্র মানব জাতিকে তাঁর মালিকানাভুক্ত সেই সম্পদের কিছু অংশে প্রতিনিধি বানিয়েছেন। আর যেহেতু তিনি জীবন-মৃত্যুর একক নিয়ন্তা, তাই এক বংশধরকে মৃত্যু দেয়ার পর তিনি আর এক বংশধরের আবির্ভাব ঘটান। এভাবে এক প্রজন্মের পর আর এক প্রজন্মকে তিনি প্রতিনিধি বানান।

এভাবে এই ইংগিত সূরার শুরুতে যে সত্যগুলো বর্ণিত হয়েছে তার সাথে নিজেকে যুক্ত করে। অতপর তা মানুষকে এই বলে লজ্জা দেয় যে, যে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সম্পদের প্রকৃত মালিক এবং যিনি তার সম্পত্তিতে তাদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন, সেই আল্লাহ যখন তা থেকে কিছু অংশ তাঁর পথে ব্যয় করতে বলছেন, তখন তাতে তাদের আর কী বলার থাকতে পারে? তাদের কার্পণ্য থেকে দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে বলা হয়েছে, আল্লাহই তো সবকিছুর দাতা, তার কাছে অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে এবং মানুষের কাছে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই দেয়া সম্পদ। সুতরং তাদের দান না করার কারণ কী?

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা শুধু এই লজ্জা দিয়ে এবং আহবান জানিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তাকে পুরস্কারের আশ্বাসও দিয়েছেন,

'তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও আল্লাহর পথে দান করবে, তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট প্রতিদান।' এমন প্রতিদিন ও অনুগ্রহের আশ্বাসের মুখে এমন কে আছে যে ঈমান না এনে ও আল্লাহর পথে দান না করে থাকতে পারে?

কোরআন এতটুকু বলেও ক্ষান্ত থাকেনি, বরং তাদের বাস্তব জীবনের অনিবার্য দাবী এবং ঈমানের অপরিহার্য ফল হিসাবেই যে তাদের ঈমান আনা উচিত, তাও উল্লেখ করেছে পরবর্তী আয়াতে।

'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনো না, অথচ রসূল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনার আহবান জানাচ্ছেন? ....'

অর্থাৎ তাদের ভেতরে যখন রসূল স্বয়ং যথাযথভাবে ঈমান আনার দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন এবং তারাও ইতিপূর্বে তাঁর সাথে অংগীকার করেছে, তখন কে তাদের ঈমান আনতে বাধা দিচ্ছে? আর আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর বান্দার ওপর এমন সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করছেন, যা তাদের গোমরাহী, সন্দেহ সংশয় ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে হেদায়াত, বিশ্বাস ও নিশ্চিন্ততার আলোর দিকে নিয়ে যায়, তখন তাদের ঈমান আনা কে ঠেকাচ্ছে? বস্তুত রসূল ও কোরআন দ্বারা

এভাবে ঈমানের দাওয়াত দেয়া তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণারই স্বাক্ষর বহন করে।

একটি জাতির অভ্যন্তরে রসূলের সশরীরে উপস্থিতি, রসূল কর্তৃক জাতিকে সরাসরি আল্লাহর বাণী শোনানো এবং জনগণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল ব্যাপারে আল্লাহর সাথে তাদের সংযোগ স্থাপন যে কত বড় নেয়ামত, তা এতো দূর থেকে কল্পনা করাও আমাদের সাধ্যাতীত। যে যুগে রসূল জীবিত ছিলেন এবং ওহী আসতো, সে যুগটি ছিলো সত্যই এক বিস্ময়কর যুগ! আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁর বান্দার মুখ দিয়ে তাঁর সৃষ্টি করা মানুষকে সম্বোধন করে পরম দয়া ও মমতার সাথে বলতেন, 'এটা গ্রহণ করো, আর ওটা বর্জন করো। এটা আমার পথ। এই পথে চলো। তোমাদের পা বিপথগামী হয়ে গেছে। এই নাও আমার রজ্জু। একে আঁকড়ে ধরো। তোমরা ভুল করেছো, পাপ করেছো। এসো, আমার দ্বার উন্মুক্ত। তাওবা করো। এসো, দূরে সরে যেও না। আমার দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না। আমার দয়া সকল গুনাহ মাফ করার জন্যে যথেষ্ট প্রশস্ত। হে অমুক, তুমি এই কথা বলেছিলে। ওটা অন্যায়। এইরূপ সংকল্প করেছিলে। ওটা গুনাহ। এইরূপ কাজ করেছো। ওটা পাপ। এখন আমার কাছে এসো, তাওবা করো, পবিত্র হও, আমার সংরক্ষিত স্থানে আশ্রয় নাও। তোমার অমুক কঠিন সমস্যার এই নাও সমাধান। তোমার অমুক জটিল প্রশ্নের এই নাও জবাব। তোমার অমুক কাজের এই নাও মূল্যায়ন।'

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তাঁর সেসব প্রিয় বান্দার সাথে এভাবেই কথা বলেন। বান্দারা তাঁর সান্নিধ্যেই অবস্থান করে এবং তাঁর নৈকট্য অনুভব করে। সে অনুভূতি বাস্তব ও যথার্থ। তিনি গভীর রাতে তাদের অভিযোগ শোনেন এবং সাড়া দেন। তিনি তাদের প্রতি পদে পদে তদারক করেন ও তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

যারা ওহীর যুগে জীবন যাপন করেনি, তাদের জন্যে এমন প্রত্যক্ষ তদারকী অকল্পনীয়, কিন্তু এই আয়াতগুলোতে যাদের সম্বোধন করা হয়েছে, তারা সেই যুগেই জীবন যাপন করেছেন এবং তা সত্তেও তাদের এভাবে সতর্ক করা ও স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয়েছে। এটা তাদের জন্যে আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ। কিন্তু যারা সেই বিস্ময়কর যুগে জীবন যাপন করার সুযোগ পায়নি, তারাও এই কোরআনের কল্যাণে অনুরূপ তদারকী ও সতর্কীকরণের সুযোগ লাভ করেছে।

সহীহ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (স.) একদিন তাঁর সাহাবীদের বললেন, মোমেনদের মধ্যে কারা তোমাদের কাছে অধিক বিস্ময়কর?

তারা বললেন, 'ফেরেশতারা'। রসূল (স.) বললেন, 'তারা তো তাদের প্রতিপালকের নিকটেই থাকে। কাজেই তাদের ঈমান আনাতে বিস্ময়ের কী আছে?' সাহাবীরা বললেন, 'তাহলে নবীরা।' রসূল (স.) বললেন, 'তাদের ওপর তো সরাসরি ওহী নাযিল হয়। সুতরাং তাদের ঈমান না আনার কী কারণ থাকতে পারে?'

সাহাবীরা বললেন, 'তাহলে আমরা।' রসূল (স.) বললেন, আমি স্বয়ং যখন তোমাদের মধ্যে উপস্থিত আছি, তখন তোমাদের ঈমান আনায় বিস্ময়ের কী আছে? বস্তুত মোমেনদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে বিস্ময়কর মোমেন, যারা তোমাদের পরে দুনিয়ায় আসবে, তারা কেবল কিছু লিখিত পুস্তকাদি পাবে এবং তাতে যা লেখা আছে তার ওপর ঈমান আনবে।'

আল্লাহর রসূল সত্য কথাই বলেছেন। বস্তুত পূর্ববর্তীদের ঈমান আনাটা একেবারেই স্বতন্ত্র ব্যাপার। যে জিনিস তাদের ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করেছে তা অত্যন্ত বিস্ময়কর বটে। রসূল (স.) বিস্ময় প্রকাশ করেই বলেছেন, তাদের ঈমান না আনার কী কারণ থাকতে পারে? এর পরও তাদের বলা হয়েছে, মোমেন হয়ে থাকলে তারা যেন তাদের অন্তরে ঈমানকে বদ্ধমূল ও বাস্তবায়িত করে!

দুঃসময়ের ঈমান ও ত্যাগের মর্যাদা

ঈমানের প্রেরণা সৃষ্টিকারী বক্তব্য দেয়ার পর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয়ে উদ্বুদ্ধ করা ও তার জন্যে তাগিদ দিয়ে বক্তব্য রাখা হয়েছে। লক্ষ্য করুন,

'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সকল উত্তরাধিকার একমাত্র আল্লাহর।' .....

এ আয়াতে আসলে পূর্ববর্তী আয়াত 'আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব শুধু তাঁরই এবং তাঁর দিকেই সব কিছু প্রত্যাবর্তন করবে' এ বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কেননা, আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আসলে তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। আর মানুষকে যে সম্পদে আল্লাহর প্রতিনিধি করা হয়েছে, সে সম্পদ উত্তরাধিকার হিসাবে আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার আহবান জানাচ্ছেন, তখন তাদের এটা না করার কোনো কারণ নেই। অথচ আল্লাহ তায়ালা আগেই বলেছেন, তাদের এই সম্পদে আল্লাহর প্রতিনিধি বানানো হয়েছে। আর এখানে বলা হচ্ছে, সমস্ত সম্পদ আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। এ সব অকাট্য যুক্তির পর কার্পণ্য করার আর কী যুক্তি অবশিষ্ট থাকে?

প্রথম ঈমান আনয়নকারী আনসার ও মোহাজেররা আল্লাহর পথে তাঁদের সাধ্যানুযায়ী জান ও মালের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আর সেটা করেছেন চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এবং নিদারুণ দরিদ্র ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে, মক্কা বিজয় ও হোদায়বিয়ার সন্ধির আগে। ইসলাম যখন চরম অসহায় অবস্থায় ছিলো, চারদিক থেকে শত্রু পরিবেষ্টিত ছিলো এবং তার সমর্থকের সংখ্যা ছিলো নিতান্তই মুষ্টিমেয়। পরবর্তীতে হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয় দ্বারা প্রভূত শক্তি ও সম্মান লাভ করেছিলো, কিন্তু তার আগে ইসলামের চরম দুর্দিনে তাঁরা আল্লাহর পথে যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। অথচ এই দানের বিনিময়ে তাঁরা কোনো পার্থিব পুরস্কার বা প্রতিদান পাওয়ারও আশা করতেন না। আর পরবর্তীকালের বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কাছে নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করে বাহবা কুড়াতেও চাইতেন না। তাঁদের ত্যাগ, কোরবানী ও দান ছিলো সম্পূর্ণ নির্ভেজাল, খালেস ও একনিষ্ঠ। এ দান ও কোরবানীতে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হতেন শুধু আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান লাভের আশায় এবং যে আদর্শকে তাঁরা নিজেদের জীবন ও যাবতীয় সহায় সম্পদের চেয়ে বড় মনে করে গ্রহণ করেছিলেন, তার মর্যাদা রক্ষার অদম্য বাসনায়। তবে তাঁরা যে সম্পদ ব্যয় করতেন, তা পরিমাণের দিক থেকে বিজয় পরবর্তীকালের মুসলমানদের চেয়ে কম ছিলো। পরবর্তীদের কেউ কেউ ঠিক সেই পরিমাণ দান করতো, যা পূর্ববর্তীরা দান করেছেন বলে শুনতো বা জানতো। এই পর্যায়েই কোরআনের আয়াত নাযিল হলো এবং সত্যের দাঁড়িপাল্লায় মেপে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুসলমানদের দানের সঠিক মূল্য নিরূপণ করলো। এ আয়াতের পরবর্তী অংশে জানিয়ে দেয়া হলো যে, দানের পরিমাণটাই আসল বিবেচ্য বিষয় নয় বরং আসল বিবেচ্য বিষয় হলো তার ঈমান, যা তাকে দানে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিজয়ের পূর্বে দান করেছে ও লড়াই করেছে, সে এবং বিজয়ের পরে দানকারী ও লড়াইকারী সমান নয়। পূর্ববর্তীরা পরবর্তী দানকারী ও লড়াইকারীদের চেয়ে অধিক মর্যাদাশালী।'

ইসলাম যখন শত্রুদের আক্রমণের লক্ষবস্তু ছিলো, তার সমর্থকরা যখন ছিলো সংখ্যালঘু এবং কোনো লাভ, সুখ ও ক্ষমতাপ্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনাই দৃষ্টিগোচর হতো না, তখন যে ব্যক্তি ইসলামের জন্যে দান করেছে ও লড়াই করেছে, সে ওই ব্যক্তির সমপর্যায়ের নয়, যে ইসলামের

জন্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পরিবেশ, বিপুলসংখ্যক সমর্থক এবং সাফল্য ও বিজয় নাগালের মধ্যে থাকা অবস্থায় দান করে ও লড়াই করে। প্রথমোক্ত ব্যক্তির সম্পর্ক ছিলো সরাসরি আল্লাহর সাথে, তাঁর প্রতি তার ভরসা ও আনুগত্য ছিলো সন্দেহাতীতভাবে আন্তরিক ও নির্ভেজাল এবং সকল প্রকারের বাহ্যিক উপায় উপকরণ থেকে সে ছিলো অনেক দূরে। ইসলামের প্রতি অটুট বিশ্বাস ও আস্থা থেকে সে যে শক্তি সঞ্চয় করতো, সেই শক্তি ছাড়া সত্য ও কল্যাণের পথে লড়াইতে তার আর কোনো সাহায্যকারী বা প্রেরণাদাতা ছিলো না। আর শেষোক্ত ব্যক্তি যদিও নিষ্কলুষ নিয়তের অধিকারী হয়ে থাকে এবং পূর্ববর্তীদের ন্যায় আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান হয়ে থাকে, তাহলেও ন্যায়ের পথে সংগ্রাম সাধনা চালাতে তার কিছু না কিছু সমর্থক ও সাহায্যকারী জুটে যাওয়া একেবারে দুর্লভ নয়।

ইমাম আহমদ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একবার খালেদ ইবনে ওলীদ ও আবদুর রহমান ইবনে আওফের মধ্যে কিঞ্চিত কথা কাটাকাটি হয়ে যায়। খালেদ আবদুর রহমানকে বললেন, 'বুঝেছি, তোমরা আমাদের কিছু দিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছো বলে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ফলাচ্ছ।' হযরত আনাস বলেন, শুনতে পেয়েছি, এই বাকবিতন্ডার খবর রসূল (স.)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি বললেন, আমার সাথীদের ব্যাপারটা তোমরা আমার ওপর সমর্পণ করো। সেই আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি ওহুদ পর্বত পরিমাণ সম্পদও আল্লাহর পথে দান করো, তবু তারা যে সব কাজ করেছে, তার সমান মর্যাদায় তোমরা কখনো পৌঁছতে পারবে না।' (১)

সহীহ বোখারীতে এক হাদীসে রসূল (স.) বলেছেন, 'তোমরা আমার সাথীদের গালি দিও না। আল্লাহর কসম, তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পর্বত সমান স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করো তবু তাদের সমান এমনকি তাদের অর্ধেক মর্যাদাও পাবে না।' (২)

উভয় শ্রেণীর সাহাবীদের প্রকৃত মান আল্লাহর মানদণ্ডে কিরূপ, তা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করার পর পুনরায় উভয় শ্রেণীকে উত্তম প্রতিদানের অধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

'সকলকেই আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

কেননা, সকলেই সাধ্যমত সৎকাজে ব্রতী ছিলেন, তাই তাদের পরস্পরের মধ্যে মান মর্যাদার যতো ব্যবধানই থাক না কেন। আর যেহেতু তাদের মান সম্পর্কে এবং তাদের কাজের পেছনে যে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সংকল্প সক্রিয় ছিলো, তার সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই অবহিত, তাই পরস্পরের মানগত পার্থক্য ও সবার জন্যে উত্তম প্রতিদানের বিষয়টি আল্লাহর গুণের সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত।'

এ কথা দ্বারা মনকে সচেতন ও সজাগ করা হয়েছে এবং বাহ্যিক কার্যকলাপের পেছনে যে গোপন সংকল্প ও উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কেননা, এই গোপন সংকল্প ও উদ্দেশ্য তথা নিয়তের ওপরই কাজের মূল্য ও মান নির্ভরশীল এবং দাঁড়িপাল্লায় নিয়তই অগ্রগণ্য।

(১) যদিও সাহাবী এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ঈমান আনার পর রসূল (স.)-এর সাক্ষাত লাভ করেছে, কিন্তু এখানে 'আমার সাথী' বলে তিনি ইসলামের শুরু থেকেই যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর সহচর সহযোগী হয়েছে তাদের বুঝিয়েছেন।

(২) এখানেও 'আমার সাথী' বলে অগ্রণী সাহাবীদের বুঝানো হয়েছে।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ۚ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا ۚ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ ۚ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۚ قَالُوا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتّٰى

রুকু ২

১১. কে আছে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ঋণ দেবে- (এমন) উত্তম ঋণ, (যার বিনিময়) আল্লাহ তায়ালা (পরকালে) তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তার জন্যে (থাকবে আরো) বড়ো ধরনের পুরস্কার, ১২. যেদিন তুমি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলাদের এগিয়ে যেতে দেখতে পাবে- (দেখবে) তাদের সামনে দিয়ে এবং তাদের ডান পাশ দিয়ে নূরের এক জ্যোতিও এগিয়ে চলেছে, (এ সময় তাদের উদ্দেশে বলা হবে), আজ সুসংবাদ তোমাদের জন্যে (আর সে সুসংবাদটি হচ্ছে) জান্নাতের, যার পাদদেশ দিয়ে (সুপেয়) ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, সেখানে (তোমরা) অবস্থান করবে অনন্তকাল ধরে; আর এটা হচ্ছে চরম সাফল্য, ১৩. সেদিন মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারীরা ঈমানদারদের বলবে, তোমরা আমাদের দিকে একটু তাকাও, যাতে করে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছুটা হলেও আলো গ্রহণ করতে পারি, তাদের বলা হবে, তোমরা (আজ) পেছনে ফিরে যাও এবং (পারলে সেখানে গিয়ে) আলোর সন্ধান করো; অতপর এদের (উভয়ের) মাঝখানে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, এতে একটি দরজাও থাকবে; যার ভেতরের দিকে থাকবে (আল্লাহর) রহমত, আর তার বাইরের দিকে থাকবে (ভয়াবহ) আযাব; ১৪. তখন মোনাফেক দল ঈমানদারদের ডেকে বলবে, আমরা কি (দুনিয়ার জীবনে) তোমাদের সাথী ছিলাম না; তারা বলবে, হাঁ (অবশ্যই ছিলে), তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের (গোমরাহীর বিপদে) বিপদগ্রস্ত করে দিয়েছিলে, তোমরা (সব সময় সুযোগের) অপেক্ষায় থাকতে, (নানা রকমের) সন্দেহ পোষণ করতে, (আসলে দুনিয়ার) মোহ তোমাদের সব সময়ই প্রতারিত করে রাখছিলো, আর এভাবে একদিন (তোমাদের ব্যাপারে) আল্লাহর (পক্ষ থেকে মৃত্যুর) ফয়সালা এসে হাযির হলো এবং সে (প্রতারক

جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا

مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ۚ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾ اَلَمْ

يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ

وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ

فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿١٦﴾ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ

بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٧﴾ اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ

وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٨﴾

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ

শয়তান) তোমাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কেও ধোকায় ফেলে রেখেছিলো। ১৫. অতপর আজ (আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যে) তোমাদের কাছ থেকে কোনো রকম মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না, আর না তাদের কাছ থেকে কোনো রকম মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে; (আজ) তোমাদের (উভয়ের) ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) আগুন; (আর এ) আগুনই হবে (এখানে) তোমাদের (একমাত্র) সাথী; কতো নিকৃষ্ট তোমাদের (এ) পরিণাম! ১৬. ঈমানদারদের জন্যে এখনো কি সে ক্ষণটি এসে পৌছুয়নি যে, আল্লাহর (আযাবের) স্মরণে, আল্লাহ তায়ালা যে সঠিক (কেতাব) নাযিল করেছেন তার স্মরণে তাদের অন্তরসমূহ বিগলিত হয়ে যাবে এবং সে (কখনোই) তাদের মতো হবে না, যাদের কাছে এর আগে আল্লাহর কেতাব নাযিল করা হয়েছিলো, অতপর তাদের ওপর এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলো, যার ফলে তাদের মনও কঠিন হয়ে গেলো; এদের মধ্যে এক বিরাট অংশই না-ফরমান (থেকে গেলো)। ১৭. তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালাই এ ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করেন; অবশ্যই আমি (আমার) যাবতীয় নির্দেশন তোমাদের জন্যে খুলে খুলে বর্ণনা করেছি, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো। ১৮. যেসব পুরুষ ও নারী (অকাতরে আল্লাহর পথে) দান করে এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করে, তাদের (সে ঋণ) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ (থেকে) বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে, (উপরন্তু) তাদের জন্যে (থাকবে আরো) সম্মানজনক পুরস্কার। ১৯. আর যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, ঈমান এনেছে তাঁর রসূলের ওপর, তারাই হচ্ছে যথার্থ সত্যবাদী, যারা তাদের মালিকের সামনে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবে, তাদের সবার জন্যে (রয়েছে) তাদের (মালিকের পক্ষ থেকে) পুরস্কার এবং তাদের

رَبِّهِمْ ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

নিজেদের নূর (-ও, যা তাদের সাফল্যের প্রমাণ বহন করবে, অপরদিকে), যারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং আমার নিদর্শনসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে তারা হবে জাহান্নামের বাসিন্দা।

তাফসীর

আয়াত ১১-১৯

এরপর পুনরায় ঈমান ও আল্লাহর পথে দান করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, "আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে প্রস্তুত এমন কে আছে ? তাহলে তিনি তাকে বহুগুণ বর্ধিত করে তার প্রতিদান দেবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। যে দিন মোমেন নারী ও পুরুষদের দেখবে........... বস্তুত, তা হচ্ছে নিকৃষ্টতম বিধান।'

দানশীল মোমেনদের সংবর্ধনা ও মোনাফেকদের পরিণতি

এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে একটি চমৎকার প্রেরণাদায়ক ভাষণ। যে বান্দারা আল্লাহর কাছে নিতান্ত দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী, সেই বান্দাদেরই তিনি দান করতে উদ্বুদ্ধ করছেন এবং তাদের কাছে ঋণ চাইছেন। কোনো বান্দা শুধু যদি এতোটুকু কল্পনা করে যে, সে একজন নিঃস্ব ফকীর হলেও আল্লাহকে ঋণ দিতে পারে, তবে এই কল্পনাই তাকে আল্লাহর পথে দানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। কোনো বিত্তশালী লোক যদি ঋণ চায়, তবে লোকেরা তাকে ঋণ দিতে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। কেননা, এই ঋণ যে যথাসময়ে পরিশোধ করা হবে তা সুনিশ্চিত। উপরন্তু একজন বিত্তশালী লোককে ঋণ দেয়ার জন্যে তারা বাড়তি সম্মানেরও অধিকারী হয়ে থাকে। তাহলে যে আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে বিত্তশালী এবং যিনি সদা প্রশংসিত, তাকে ঋণ দিতে কুণ্ঠিত হবে কেন?

আল্লাহ তায়ালা শুধু যে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয়; বরং তিনি এই ঋণ যদি সদুদ্দেশ্যে ও শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দেয়া হয়, তবে তার জন্যে বহুগুণ বেশী প্রতিদান ও তদুপরি বাড়তি সম্মানজনক পুরস্কারও ধার্য করেছেন।

এরপর সেই সম্মানজনক পুরস্কারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ দৃষ্টান্তটি হচ্ছে উক্ত সম্মানজনক পুরস্কার যেদিন দেয়া হবে সেদিনকার একটি চমকপ্রদ দৃশ্য।

কোরআনী দৃশ্যসমূহের মধ্যে এটি একটি অভিনব দৃশ্য। এটি সেসব দৃশ্যের অন্যতম, যার চলন্ত ছবি সুসংহতভাবে অংকিত হবার পর আলোচনার মাধ্যমে তাকে জীবন্ত করে তোলা হয়। এভাবে আমরা যারা এখন কোরআন পড়ছি তারা একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। মোমেন নারী-পুরুষকে তো আমরা অহরহই দেখে থাকি, কিন্তু এখন কোরআনের আয়াতে তাদের এমন ভংগিতে দেখতে পাচ্ছি যে, তাদের সামনে ও ডান দিকে রয়েছে প্রশান্ত স্থির প্রদীপ্ত আলো। এ আলো তাদেরই। তাদের দেহ থেকেই তা বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং তাদের সম্মুখভাগকে আলোকিত করছে। এই মানব মানবীরা এমন আলো বিকিরণ করছে, যা দিগন্তব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে এবং তা দ্বারা তারা সামনে ও ডানে দেখতে পাচ্ছে। এটি সেই জ্যোতি, যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা এই মোমেন নরনারীদের অন্ধকার থেকে বের করে নিজের দিকে এগিয়ে এনেছেন, এটি সেই আলো, যা তাদের আত্মায় প্রজ্বলিত হওয়ার পর তারা তাদের প্রবৃত্তির ওপর জয়যুক্ত হয়েছে। এমনকি সম্ভবত এটিই সেই জ্যোতি বা নূর, যা থেকে আল্লাহ তায়ালা এই বিশ্বজগতকে এবং এর অভ্যন্তরে

যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করেছেন। (১) এই জ্যোতি নিজের আসল রূপ নিয়ে এই মানবগোষ্ঠীর ভেতরে আত্মপ্রকাশ করেছে, যারা নিজেদের প্রকৃত মানুষরূপে বিকশিত করেছেন।

অতপর আমরা শুনতে পাই, এই মোমেন নরনারীকে কিরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন জানানো হয়েছে এবং কিরূপ সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

'আজ তোমাদের সুসংবাদ হলো জান্নাত, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। এতে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটা এক বিরাট সাফল্য।'

কিন্তু এই চমকপ্রদ দৃশ্যের সাথে আরো একটা দৃশ্য রয়েছে। সেটি হলো মোনাফেক নরনারীর লাঞ্ছিত অবহেলিত ও উদভ্রান্ত অবস্থায় মোমেন নরনারীদের পেছনে পেছনে ছুটার দৃশ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যেদিন মোনাফেক নরনারী মোমেনদের বলবে, তোমরা আমাদের দিকে একটু তাকাও না। আমরা তোমাদের কাছ থেকে একটু আলো নেই। তাদের বলা হবে, 'তোমাদের অতীত জীবনে ফিরে যাও এবং সেখানে আলোর সন্ধান করো।' মোনাফেকদের কাতর অনুনয়ের ফলে যখন মোমেনরা তাদের দিকে তাকাবে, তখন আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকবে, কিন্তু মোনাফেকরা সারাটা জীবন গোমরাহীর অন্ধকারে কাটিয়ে দেয়ার কারণে সেই আলো দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না এবং পথ দেখতে পাবে না। তখন একটি অপরিচিত ধ্বনি উচ্চারিত হবে, 'তোমরা তোমাদের পেছনের জীবনে ফিরে যাও এবং সেখানে আলো সন্ধান করো।' এ কথার মধ্যে ধমকের সুর প্রতিধ্বনিত। তাদের দুনিয়ার জীবনের মোনাফেকী, শঠতা, কপটতা, দোমুখো নীতি ও ধোকাবাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনে যেসব কাজ করতে, দুনিয়ায় ফিরে গিয়ে সেসব কাজ করো। আলো যদি পেতে চাও, তবে দুনিয়ায় ফিরে যাও। কেননা, ওখানে বসেই সৎকর্ম দ্বারা আলোর ব্যবস্থা করে আসতে হয়। আজ এখানে বসে আলোর কোনো ব্যবস্থা হবে না।

আর এই কথা বলার সাথে সাথেই মোমেনদের ও মোনাফেকদের মাঝে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। দুনিয়ায় মোমেন ও মোনাফেকরা পাশাপাশি অবস্থান করলেও কেয়ামতের দিন সেটা হবে না। কেননা কেয়ামত হচ্ছে সৎলোক ও অসৎ লোকদের পৃথক করার দিন। 'তৎক্ষণাত তাদের মাঝে একটা দরজা বিশিষ্ট দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ, আর বাইরের দিকে থাকবে আযাব।' মনে হয়, এই দেয়াল এমন ধরনের হবে, যার এক পাশ থেকে অপর পাশের দৃশ্য দেখা যাবে না, কিন্তু শব্দ শোনা যাবে। মোনাফেকরা মোমেনদের ডেকে বলবে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?' অর্থাৎ আজ আমাদের কী দোষ হলো যে, তোমাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে? দুনিয়াতে কি আমরা একই জায়গায় বাস করতাম না? আর আজও কি একই জায়গায় সমবেত হইনি? মোমেনরা বলবে, 'হাঁ, ঠিকই। কিন্তু তোমরা নিজেদের ফেতনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছো।' ফলে তোমরা হেদায়াত থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছো। 'আর তোমরা অপেক্ষায় থেকেছো।' অর্থাৎ সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো দৃঢ়তা দেখাতে পারনি। 'তোমরা সন্দেহে নিমজ্জিত ছিলে।' ফলে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারোনি। 'তোমাদের আশা তোমাদের প্রতারিত করেছে।' অর্থাৎ এই মিথ্যা আশাই তোমাদের ধোঁকা দিয়েছে যে, এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকেই তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে। 'অবশেষে

(১) আজকাল এটাই বিশ্বাস করা হচ্ছে যে, বিশ্ব-প্রকৃতি সৃষ্টির মূল উপাদান হচ্ছে আলো। যে অণুপরমাণু দিয়ে বিশ্ব-প্রকৃতি গঠিত, তা মূলত আলো ছাড়া আর কিছু নয়। সম্ভবত এই মতবাদই প্রকৃত সত্যের নিকটতম। কেননা, এটা কোরআনের সাথে সংগতিপূর্ণ।

আল্লাহর সিদ্ধান্ত এসে গেছে।' অর্থাৎ সময় শেষ ও সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। 'আর চরম বিভ্রান্তকারী তোমাদের আল্লাহর ব্যাপারে বিভ্রান্ত করেছে।' এই চরম বিভ্রান্তকারী হচ্ছে শয়তান, যে মানুষকে মিথ্যা আশার মরীচিকার পেছনে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

পরবর্তী বাক্যটি মোনাফেকদের উদ্দেশ্য করে দেয়া মোমেনদের বক্তব্যের ধারাবাহিকতাও হতে পারে, অথবা তা ফেরেশতাদের বা স্বয়ং আল্লাহর কথাও হতে পারে।

'আজ তোমাদের কাছ থেকেও কোনো মুক্তিপণ নেয়া হবে না, কাফেরদের কাছ থেকেও নয়। তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। ওটাই তোমাদের আশ্রয়স্থল এবং জঘন্যতম ঠিকানা।'

দৃশ্য তুলে ধরার প্রতি যদি শৈল্পিক বিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকাই, তাহলে মনে হয়, এখানে বিশেষভাবে আলোর দৃশ্যটা নির্বাচনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ও গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এখানে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মোনাফেক নরনারী। আর মোনাফেকদের স্বভাব এই যে, তারা তাদের মনের আসল কথা গোপন করে এবং যা তাদের মনের কথা নয় তাই প্রকাশ করে। এভাবে তারা শঠতা, ভণ্ডামি ও জালিয়াতির ঘোর অন্ধকারে বিচরণ করে। আর আলোর বৈশিষ্ট্য হলো, তা গোপন জিনিসকে প্রকাশ করে। অন্য কথায়, আলো হচ্ছে তমসাচ্ছন্ন ও বিকারগ্রস্ত মোনাফেকীর সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস। তাই এই বিরাট দৃশ্যটির ওপর আলোকপাত করার জন্যে এই আলোই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এই আলোই মোমেনদের সামনে ও ডানে আলো বিস্তারের সবচেয়ে উপযুক্ত। আর মোনাফেকরা তো অন্ধকারেই থাকে, যা বিবেকের অন্ধকার ও গোপনীয়তার অন্ধকারের সাথে মানানসই।

এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, কেয়ামতের দিন এই আলোর জন্যে লালায়িত হবে না এমন কেউ থাকবে না। আর তাই আল্লাহর পথে জান মাল দিয়ে সংগ্রাম সাধনার আহবানেও প্রত্যেকেরই সাড়া দেয়া উচিত। কোরআন নিরন্তর মানুষকে এই আহ্বানই শুধু জানাচ্ছে না; বরং এই আহবানে সাড়া দেয়ার জন্যে তাকে নিরন্তর উদ্বুদ্ধ এবং প্রস্তুতও করছে। সূরার পরবর্তী অংশে এই আহবান ও এই উদ্বুদ্ধকরণেরই ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়।

এ অংশটি সূরার মূল আলোচ্য বিষয়েরই ধারাবাহিকতা। এর মূল আলোচ্য বিষয় হলো অন্তরে প্রকৃত ঈমান বদ্ধমূল করা, যাতে তার ভেতরে আল্লাহর পথে জান ও মালের ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। ঈমানের প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী বক্তব্যে এ অংশটি প্রথমাংশের মতোই পরিপূর্ণ।

এ অংশটি শুরু হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মোমেনদের লক্ষ্য করে মৃদু তিরস্কারের মধ্য দিয়ে। কারণ, তারা তখন পর্যন্ত আল্লাহর প্রত্যাশিত মানে উন্নীত হতে পারেনি। সেই সাথে তাদের ইহুদী ও খৃষ্টানদের ন্যায় নিষ্ঠুরতা ও পাপাচার থেকে এবং দীর্ঘকাল এই নিষ্ঠুরতা ও পাপাচারে অভ্যস্ত থাকার কারণে ইহুদী ও খৃষ্টানরা যে শোচনীয় পরিণামের সম্মুখীন হয়েছিলো তা থেকে সাবধান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তাদের আল্লাহর সাহায্যের জন্যে আশাবাদী করে তোলা হয়েছে, যা মৃত পৃথিবীকে সজীব করার মতো মৃত হৃদয়কেও পুরুজ্জীবিত করে।

এর পরই আখেরাত সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে। পূর্ববর্তী অংশে আলোচিত আল্লাহকে ঋণ প্রদান অর্থাৎ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের বিষয়টির পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহকে ঋণদাতাদের জন্যে কিরূপ গুণিতক হারে পুরস্কার ও প্রতিদান ধার্য করা হয়েছে তাও বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে, তা হলো আল্লাহর মানদন্ডে পরকালের তুলনায় ইহকালের মূল্যমান। এখানে দেখানো হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবনের মূল্য নিতান্তই খেলা তামাশার

মত। আল্লাহর মানদন্ডে আখেরাতের পাল্লাই ভারী এবং এর গুরুত্বই সর্বাধিক। এজন্যে আখেরাতের মর্যাদা লাভের জন্যে প্রতিযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আহ্বান জানানো হয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় প্রশস্ত ও বিশাল বেহেশতে প্রবেশের প্রতিযোগিতা করতে, যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের জন্যেই নির্দিষ্ট।

চতুর্থ যে বিষয়টি এখানে আলোচিত হয়েছে তা তাদের আখেরাতের অংগন থেকে দুনিয়ার বাস্তব জীবন ও তার ঘটনাবলীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের মনকে সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল বানায়। এভাবে আল্লাহর পথে ব্যয় করা তাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায় এবং দুনিয়ার সহায়-সম্পদের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি না হয়ে যাবতীয় আবেগ অনুভূতি শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

পাষাণহৃদয় মানুষদের ঈমান আনার উৎসাহ দান

এরপর আলোচিত হয়েছে পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত ও আন্দোলনের ইতিহাসের একটি অংশ। এতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহর বিধান সর্বকালেই এক অভিন্ন এবং এটাই একমাত্র সঠিক মত ও পথ। প্রত্যেক যুগে আল্লাহর বিধানকে যারা অগ্রাহ্য ও অমান্য করে, তারাই ফাসেক। সেই সাথে আহলে কেতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের কিছু ভ্রষ্টতা বিপথগামিতার সমালোচনা ও তা থেকে মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে, যেমনটি করা হয়েছিলো সূরার পূর্ববর্তী অংশে। সবার শেষে মুসলমানদের আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি সুদৃঢ় ঈমান আনয়ন ও তাকওয়া অবলম্বনের আহবান জানানো হয়েছে। এতে আল্লাহ তায়ালা তাদের দ্বিগুণ রহমত দান করবেন, তাদের পথ চলার আলো ও ক্ষমা দান করবেন। আল্লাহর এসব অনুগ্রহ শুধু আহলে কেতাবদের জন্যে নির্দিষ্ট বলে আহলে কেতাব গোষ্ঠী মনে করে, কিন্তু আসলে তা নয়, এ সব আল্লাহর হাতে এবং তিনি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকেন। 'বস্তুত আল্লাহ তায়ালা বিপুল অনুগ্রহের অধিকারী।'

এ ভাবে সমগ্র সূরাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক অটুট সংযোগ ও সমন্বয় বিদ্যমান। মানুষের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত, আলোড়িত ও উজ্জীবিত করার উপাদানে এ সূরা সমৃদ্ধ। কোথাও কোথাও প্রয়োজনীয় পরিমাণে কোনো কোনো বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যাতে এর প্রভাব হৃদয়ে গভীরভাবে বদ্ধমূল হয় ও আবেগে উদ্দীপনার উষ্ণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়।

১৬ নং আয়াত দিয়ে এ অংশটি শুরু হয়েছে। এ আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহর স্মরণের জন্যে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া সত্যের জন্যে মোমেনদের হৃদয় উদ্দীপিত হবার সময় কি এখনো আসেনি ! ইতিপূর্বে যাদের কেতাব দেয়া হয়েছিলো। তাদের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিলো, ফলে তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিলো এবং তাদের অনেকেই ফাসেক হয়ে গিয়েছিলো, তাদের মতো যেন মোমেনদের অবস্থা না হয়। তোমরা জেনে রাখো যে, পৃথিবী মৃত হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে পুনরুজ্জীবিত করে থাকেন। 'তোমাদের জন্যে আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি যেন তোমরা হৃদয়ংগম করো।'

পরম দয়ালু ও পরম করুণাময় মনিবের পক্ষ থেকে এটি একটি কার্যকর তিরস্কার। যে অন্তরগুলোর ওপর তিনি তার অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর আহবানে পরিপূর্ণরূপে সাড়া দিতে বিলম্ব হওয়ায় এখানে খানিকটা ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, তাদের কাছে তিনি রসূল প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান আনার দাওয়াত দেন, তাদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাদের

ওপর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন এবং সৃষ্টিজগতে তাঁর এমন সব নিদর্শন তাদের প্রত্যক্ষ করিয়েছেন, যা সতর্কীকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণে সক্ষম।

এ তিরস্কার স্নেহ মিশ্রিত, উদ্বুদ্ধকারী, আল্লাহর মহত্ত্ব উপলব্ধি করার প্রেরণা সঞ্চারক, তাঁর স্মরণে উৎসাহদানকারী এবং যে মহাসত্য নাযিল হয়েছে তা যথোপযুক্ত ভীতি ও আত্মসমর্পণের মনোভাব নিয়ে গ্রহণের আগ্রহ সঞ্চারক। কিছুটা নিন্দা ও ক্ষোভের ভাব সহকারে প্রশ্ন করা হয়েছে,

'আল্লাহর স্মরণের জন্যে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া মহাসত্যের জন্যে মোমেনদের হৃদয় উদগ্রীব হবার সময় কি আসেনি?'

উদ্বুদ্ধ করা ও ক্ষোভ প্রকাশ করার পাশাপাশি সত্য গ্রহণে শৈথিল্য ও বিলম্ব প্রদর্শন থেকে সতর্কও করা হয়েছে, দীর্ঘকালব্যাপী এই শৈথিল্য প্রদর্শনে মানব হৃদয়ে যে মরিচা পড়ে ও আল্লাহর স্মরণে ক্রমাগত উদাসীনতা এবং সত্য গ্রহণে আগ্রহী না হওয়ার কারণে হৃদয়ে যে কঠোরতার সৃষ্টি হয়, এখানে তারও বিবরণ দেয়া হয়েছে,

'আর তারা যেন তাদের মতো না হয়ে যায়' যাদের ইতিপূর্বে কেতাব প্রদত্ত হয়েছিলো, অতপর তাদের ওপর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হয়েছিলো, ফলে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিলো এবং তাদের অনেকেই ফাসেক হয়ে গিয়েছিলো।'

হৃদয় কঠিন হওয়ার পেছনে আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহী হওয়া ছাড়া আর কোনো কারণ নেই।

মানব হৃদয় দ্রুত পরিবর্তনশীল ও দ্রুত বিস্মৃতিপ্রবণ। এই হৃদয় যতোক্ষণ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল থাকে, ততোক্ষণ তা হেদায়াতের আলো দ্বারা উপকৃত হয় ও উজ্জ্বলতর হয়, কিন্তু যখন তাকে আখেরাতের কথা ও তাকওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় না এবং সেও তা স্মরণ করে না, আর এই অবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তা কঠিন পাষাণের মতো হয়ে যায়, তার স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। তাই এই হৃদয়কে সব সময় আখেরাতের কথা ও আল্লাহভীতির কথা স্মরণ করতে থাকা উচিত যাতে সে আল্লাহর অনুগত ও বিনত হয়, তার ওপর ক্রমাগত করাঘাত করতে থাকা উচিত, যাতে তা স্বচ্ছতা লাভ করে ও তার মরিচা ঝরে যায়। সর্বদা তাকে সজাগ ও সতর্ক করা উচিত, যাতে তা কঠিন ও পাষাণ না হয়ে যায়।

তবে যদি কোনো হৃদয় কঠিন ও পাষাণ হয়েই যায়, তবে হতাশ হওয়া অনুচিত। কেননা, সেই পাষাণ হৃদয়ও সজীব হয়ে ওঠতে পারে, তা হেদায়াতের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে যেতে পারে এবং তা আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হয়ে যেতে পারে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা তো নির্জীব মাটিতেও প্রাণ সঞ্চার করে থাকেন। আল্লাহর দেয়া উজ্জীবনী শক্তিতে তা উজ্জীবিত হয়ে থাকে, তাতে ফল ও ফুল ফোটে এবং প্রাণীকুলকে খাদ্য জোগায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা যখন ইচ্ছা করেন তখন মৃত হৃদয়গুলোকেও পুনরুজ্জীবিত করেন। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বুঝিয়েছেন,

'তোমরা জেনে রাখো যে, আল্লাহ তায়ালা মৃত মাটিকে পুনরুজ্জীবিত করে থাকেন। আর মৃত ও নির্জীব মাটিতে যেমন প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তেমনি মৃত হৃদয়ে প্রাণ সঞ্চারের জন্যেও এই কোরআনে প্রয়োজনীয় উপকরণ, খাদ্য ও পানীয় রয়েছে।'

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বলেছেন, 'তোমাদের জন্যে আমি (কোরআনে) আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।'

সিদ্দীক ও শহীদদের মর্যাদা

কিভাবে তিনি মৃতকে জীবনদান করেন তার বর্ণনা, মোমেনদের আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হওয়ার সময় এখনো কি হয়নি বলে মৃদু তিরস্কার এবং তাদের আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া ও সাবধান করার পরই নতুন করে আল্লাহর পথে ব্যয় ও কোরবানীর জন্যে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই সদকাদানকারী নারী ও পুরুষরা এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিয়ে থাকে, তাদের প্রতিদান বহু গুণ বাড়ানো হবে এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। আর যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে................'

অর্থাৎ সদকাদানকারী মোমেন নারী ও পুরুষরা সদকা গ্রহণকারীদের কাছে নিজেদের বড়ত্ব জাহির করার উদ্দেশ্যে তা করে না এবং এ ক্ষেত্রে তারা মানুষের সাথে কোনো লেনদেন করে না। তারা সরাসরি আল্লাহর সাথে লেনদেন করে এবং তাঁকেই ঋণ দিয়ে থাকে। দানকারীর জন্যে এর চেয়ে কার্যকর ও গভীর প্রেরণাদায়ক বিষয় আর কিছু হতে পারে না যে, সে চির প্রশংসিত ও সর্বাধিক ধনাঢ্য আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছে। সারা বিশ্বের মালিকের সাথে আদান প্রদান করছে। সে যা দান করছে তার বহুগুণ বেশী প্রতিদান সে পাবে এবং সর্বোপরি তার জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

একাধিক হাদীস থেকে জানা যায়, সিদ্দীকদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ, কিন্তু যতো উচ্চই হোক, তা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়; বরং যে ব্যক্তিই তা অর্জনে ইচ্ছুক, তার জন্যে তা অর্জন করার সুযোগ অবারিত। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের ওপর যথাযথভাবে ঈমান আনে, সে এই উচ্চ মর্যাদা লাভের আশা করতে পারে। আল্লাহর অনুগ্রহ কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। পরবর্তী আয়াতে এই বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত হয়েছে,

'যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের ওপর ঈমান এনেছে, তারাই সিদ্দীক।' বস্তুত ইসলামের এ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, তার দ্বার সকলের জন্যে অবারিত ও উন্মুক্ত, সকল মানুষ ইসলামের নির্দিষ্ট সকল সম্মান মর্যাদা লাভ করতে পারে। এতে কারো একচেটিয়া অধিকার নেই। নির্দিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির জন্যে কোনো নির্দিষ্ট মর্যাদা নেই, সৎকর্ম ব্যতীত আর কোনো জিনিস এমন নেই যা মানুষকে উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করতে পারে। ইসলাম এমন ধর্ম, যাতে কোনো কুলীন ও অভিজাত শ্রেণী-গোষ্ঠীর স্থান নেই।

ইমাম মালেক স্বীয় হাদীস গ্রন্থ 'মোয়াত্তা'য় আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল (স.) বলেন, 'জান্নাতবাসী তাদের উর্ধ্বে অবস্থানকারী বিশেষ কক্ষসমূহে অবস্থানকারীদের দিকে এমনভাবে তাকাবে, যেমন তোমরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে গমনকারী উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে তাকাও। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্তরভেদ থাকার কারণেই এরূপ হবে।' সাহাবীরা বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, এসব মর্যাদাপূর্ণ বাসগৃহ তো নবীদের জন্যে, অন্যেরা তা পাবে না।' রসূল (স.) বললেন, সেই আল্লাহর কসম যার হাতে আমার প্রাণ, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে এবং রসূলদের সত্য জানবে, তারা এসব বাসগৃহের অধিকারী হবে।'

এ হচ্ছে ঈমানের মর্যাদা। পরবর্তীতে আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জনের মর্যাদা কতো বড়ো তা বলা হচ্ছে।

'আর শহীদরা তো আল্লাহর কাছে থাকবে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিদান ও তাদের আলো।'

শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে কোরআনে একাধিক বিবরণ রয়েছে। এতদসংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যাও প্রচুর। কারণ, আল্লাহর দ্বীন প্রহরা ছাড়া টিকে থাকতে পারে না এবং জেহাদ ব্যতীত তা পৃথিবীতে বাস্তবায়িত হতে পারে না। ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাস সংরক্ষণ করা, ইসলামের দাওয়াতের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং মুসলমানদের ফেতনা গোমরাহী থেকে ও ইসলামী আইন বিধানকে বিপর্যয় বিকৃতি থেকে রক্ষা করার জন্যে জেহাদ অপরিহার্য। এ জন্যেই শহীদদের এতো বড় মর্যাদা। শহীদদের শহীদ অর্থাৎ সাক্ষী নামকরণের কারণ এটাই। আর এ কারণেই তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। 'তারা আল্লাহর কাছে থাকবে' এ কথা দ্বারা এই নৈকট্যই বুঝানো হয়েছে।

সহীহ বোখারী ও মোসলেমে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, 'শহীদদের রূহসমূহ এক ধরনের সবুজ পাখির পেটে অবস্থান করে এবং সেই পাখি জান্নাতের যেখানে খুশী বিচরণ করে। অতপর তারা জান্নাতের আলোক স্তম্ভগুলোতে এসে আশ্রয় নেবে। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের দিকে একটা নযর বুলাবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমরা চাই তুমি আবার আমাদের দুনিয়ায় পাঠাও এবং আমরা তোমার জন্যে লড়াই করি ও শহীদ হই, যেমন ইতিপূর্বে হয়েছি। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'আমি ফায়সালা করেছি যে, মৃত ব্যক্তিরা আর দুনিয়ায় ফিরে যাবে না।'

সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসূল (স.) বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশকারী কোনো ব্যক্তিকে যদি সারা পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ দেয়ার আশ্বাস দেয়া হয়, তবু সে দুনিয়ায় ফিরে যেতে চাইবে না। একমাত্র শহীদরাই হবে এর ব্যতিক্রম। সে কামনা করবে যে, 'তাকে আরো দশ বার পৃথিবীতে পাঠানো হোক এবং প্রতিবার সে শহীদ হোক। জান্নাতে সে যে সম্মান লাভ করবে, তার কারণেই তার এরূপ অভিলাষ হবে।'

এরূপ প্রেরণাদায়ক উক্তি যে শ্রবণ করে এবং আল্লাহর নিকট শহীদের মর্যাদা কিরূপ তা জানে, তার জন্যে দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়।

ইমাম মালেক (র.) ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন, একবার রসূল (স.) জেহাদের জন্যে উৎসাহ দিলেন ও জান্নাতের উল্লেখ করলেন। এই সময় জনৈক আনসারী সাহাবী খোরমা খাচ্ছিলেন এবং তাঁর হাতে কয়েকটি খোরমা ছিলো। সে বললো, 'আমি যদি সব কয়টা খোরমা খাওয়ার জন্যে আরো খানিকক্ষণ বসে কাটাই, তবে সেটা হবে আমার দুনিয়ার লোভে লালায়িত হওয়ার লক্ষণ।' এই বলেই সে হাতের বাকী খোরমাগুলো ফেলে দিয়ে তরবারি নিয়ে জেহাদে চলে গেলো এবং লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলো। এই ব্যক্তির নাম ছিলো ওবায়র ইবনুল হামাম রাদিয়াল্লাহু আনহু।

সিদ্দীক ও শহীদদের এই উচ্চ মর্যাদা বর্ণনা করার পর কোরআন কাফেরদের সম্পর্কে বলেছে,

'আর যারা কাফের হয়েছে এবং আমার আয়াতগুলো অস্বীকার করেছে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।'

এ আলোচনার পর এমন কে আছে যে, জান্নাতের নেয়ামত ও সম্মান পরিত্যাগ করবে এবং জাহান্নামের অধিবাসী হতে চাইবে?

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا ۭ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۭ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٢٢﴾

রুকু ৩

২০. তোমরা জেনে রাখো, এ পার্থিব জীবন খেলাধুলা, (হাসি) তামাশা জাঁকজমক (প্রদর্শন), পরস্পর অহংকার প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বাড়ানোর চেষ্টা সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়; (সমগ্র বিষয়টা) যেন আকাশ থেকে বর্ষিত (এক পশলা) বৃষ্টি, যার (উৎপাদিত) ফসলের সমাহার কৃষকের মনকে খুশীতে ভরে দেয়, অতপর (একদিন) তা শুকিয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে তুমি দেখতে পাও, তা হলুদ রং ধারণ করতে শুরু করেছে, তারপর তা (অর্থহীন) খড়কুটায় পরিণত হয়ে যায়, (কাফেরদের জন্যে পার্থিব জীবনের চেষ্টা সাধনা এমনি এক অর্থহীন কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়); আর পরকালের জীবনে (তাদের জন্যে থাকবে) কঠোর আযাব এবং (ঈমানদারদের জন্যে থাকবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে (তাঁর) ক্ষমা ও সন্তুষ্টি; (সত্যি কথা হচ্ছে,) দুনিয়ার এ জীবন কতিপয় ধোকা প্রতারণার সামগ্রী বৈ কিছুই নয়। ২১. (অতএব, এ সব অর্থহীন প্রতিযোগিতা বাদ দিয়ে) তোমরা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সেই (প্রতিশ্রুত) ক্ষমা ও চিরন্তন জান্নাত পাওয়ার জন্যে এগিয়ে যাও, (এমন জান্নাত) যার আয়তন আসমান যমীনের সমান প্রশস্ত, তা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সেসব মানুষদের জন্যে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর (পাঠানো) রসূলের ওপর ঈমান এনেছে; (মূলত) এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার এক অনুগ্রহ, যাকে তিনি চান তাকেই তিনি এ অনুগ্রহ প্রদান করেন; আর আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন মহা অনুগ্রহশীল। ২২. (সামগ্রিকভাবে গোটা) দুনিয়ার ওপর কিংবা (ব্যক্তিগতভাবে) তোমাদের ওপর যখনি কোনো বিপর্যয় আসে, তাকে অস্তিত্ব দান করার (বহু) আগেই (তার বিবরণ একটি গ্রন্থে লেখা থাকে, আর আল্লাহ তায়ালার জন্যে এ কাজ অত্যন্ত সহজ,

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

২৩. (আগেই লিখে রাখার এ ব্যবস্থাটি এ জন্যেই রাখা হয়েছে) যাতে করে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু (সুযোগ সুবিধা) হারিয়ে গেছে তার জন্যে তোমরা আফসোস না করো এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তাতেও যেন তোমরা বেশী হর্ষোৎফুল্ল না হও; আল্লাহ তায়ালা এমন সব লোকদের ভালোবাসেন না যারা ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রদর্শন করে, ২৪. (আল্লাহ তায়ালা তাদেরও ভালোবাসেন না) যারা নিজেরা কার্পণ্য করে, আবার অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ দেয়; যে ব্যক্তি (জেনে বুঝে আল্লাহর হুকুম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (তার জানা উচিত), আল্লাহ তায়ালা কারোরই মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি মহান প্রশংসায় প্রশংসিত। ২৫. আমি অবশ্যই আমার রসূলদের কতিপয় সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ (মানুষদের কাছে) পাঠিয়েছি এবং আমি তাদের সাথে কেতাব পাঠিয়েছি, আরো পাঠিয়েছি (আমার পক্ষ থেকে এক) ন্যায়দন্ড, যাতে করে মানুষ (এর মাধ্যমে) ইনসাফের ওপর কায়েম থাকতে পারে, তাদের জন্যে আমি লোহা নাযিল করেছি, যার মধ্যে (একদিকে যেমন রয়েছে) বিপুল শক্তি, (অন্য দিকে রয়েছে) মানুষের বহুবিধ উপকার, এর মাধ্যমে (মূলত) আল্লাহ তায়ালা জেনে নিতে চান কে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের না দেখেও সাহায্য করতে এগিয়ে আসে; আল্লাহ তায়ালা প্রচন্ড শক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী।

তাফসীর

আয়াত ২০-২৫

ইতিপূর্বে ঈমান এবং আল্লাহর পথে ত্যাগ ও কোরবানীর যে আহবান জানানো হয়েছে, পরবর্তী আয়াতে তারই পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ পর্যালোচনায় সমগ্র দুনিয়ার জীবনকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ করে দেখানো হয়েছে, মানুষকে তার মোহমুক্ত হতে বলা হয়েছে এবং তাকে আখেরাত ও তার মর্যাদার বিষয়ে সজাগ করা হয়েছে!

পার্থিব জীবন সম্পর্কিত সঠিক বাস্তববাদী দর্শন

'তোমরা জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা, তামাশা ও চাকচিক্য, তোমাদের পরস্পরের মধ্যকার বড়াই ও গর্ব এবং ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়..................'

বস্তুত দুনিয়ার জীবনকে যখন দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় ও দুনিয়াবী মানদন্ডে যাচাই করা হয়, তখন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট মনে হয়, কিন্তু তাকে যখন আখেরাতের মানদন্ডে

যাচাই করা হয়, তখন অত্যন্ত তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তু বলে মনে হয়। এখানে দুনিয়াকে আখেরাতের তুলনায় নিছক শিশুদের খেলাধূলার বস্তুতে চিত্রিত করা হয়েছে। দুনিয়ার খেলাধুলা সাংগ হলে দুনিয়াবাসী তার কর্মফল ভোগ করতে আখেরাতের জগতে পাড়ি জমায়।

দুনিয়ার যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততা ও আয়োজন অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে মাত্র এই শব্দ কটির মধ্য দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে: খেলাধুলা, সৌন্দর্যচর্চা, পারস্পরিক গর্ব, পরস্পরের মধ্যে সম্পদ বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা। অতপর কোরআনের অভিনব রীতি অনুসারে এর উদাহরণ দেয়া হয়েছে যে, 'ঠিক সেই মেঘের মতো যার কল্যাণে উদগত উদ্ভিদ কৃষকদের মুগ্ধ করে।' এখানে কুফফার শব্দটি (কাফেরের বহুবচন), অর্থ কৃষককুল। কুফর শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো কিছু লুকানো বা গোপন করা। কৃষক এই অর্থে কাফের যে, সে বীজ মাটির নীচে ঢেকে দেয় ও লুকিয়ে রাখে, অর্থাৎ বপন করে। তবে শব্দটি এখানে প্রয়োগ দ্বারা এই মর্মে ইংগিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবনের প্রতি কাফেরদের প্রলুব্ধ হওয়া কৃষকের একটি উদ্ভিদ দেখে মুগ্ধ ও আনন্দে আত্মহারা হওয়ার মতোই হাস্যকর। কেননা, 'অচিরেই তা পেকে যায় এবং তুমি তাকে হলুদ দেখতে পাও।' অর্থাৎ তা কাটার উপযুক্ত হয়ে যায়। কেননা, উদ্ভিদের আয়ুষ্কাল সীমাবদ্ধ। তা দ্রুত শেষ হয়ে যায়। অতপর তা ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের নিত্যকার সুপরিচিত এই চলমান দৃশ্যের মতোই সমগ্র দুনিয়ার জীবনের ভিডিও টেপ এভাবেই শেষ পরিণতির দৃশ্যে পৌঁছে যায়, আর এই শেষ পরিণতি হলো ধ্বংস।

আখেরাতের অবস্থা এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আখেরাতের সেই ভিন্নতা স্বাতন্ত্র্য বিবেচনায় রেখেই তার জন্যে প্রস্তুতি নেয়া উচিত। 'আর আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তোষ।' অতএব, সেটা দুনিয়ার মতো ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর নয় এবং এ উদ্ভিদটির মতো ধ্বংসশীল নয়। হিসাব নিকাশ ও স্থায়িত্বই হলো আখেরাতের বৈশিষ্ট্য এবং এ জন্যেই তা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

'দুনিয়ার জীবন কল্পনার ধন ব্যতীত আর কিছু নয়।' অর্থাৎ দুনিয়ায় যা কিছু সম্পদ রয়েছে, তার নিজস্ব কোনো অবস্থান ও স্থিতি নেই, শুধুমাত্র প্রবঞ্চনাপূর্ণ কল্পনায় ডুবিয়ে শেষ করে দেয়।

মানুষ যদি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা করে, তাহলে বুঝতে পারে, এটি একটি পরম সত্য। তবে এই পরম সত্য দ্বারা কোরআন মানুষকে পার্থিব জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে সংসারত্যাগী বানাতে চায় না, মানুষের ওপর পৃথিবীকে গড়ার ও পৃথিবীতে খেলাফতের যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাকে অবহেলাও করতে চায় না। (১) বরন্তু এ দ্বারা সে চায় মানুষের আবেগ অনুভূতির মানদন্ড ও মূল্যবোধকে বিশুদ্ধ করতে এবং তাকে নশ্বর পার্থিব সম্পদের লালসা ও তার আকর্ষণের উর্ধে স্থান দিতে। এই সূরা নাযিল হবার সময়কার মোমেনদের যেমন উক্ত লালসা ও আকর্ষণের উর্ধ্বে ওঠা তাদের ঈমানকে বাস্তব রূপদানের স্বার্থে অপরিহার্য ছিলো, তেমনি প্রত্যেক মোমেনেরই নিজ ঈমান ও আকীদাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্যে এর প্রয়োজন রয়েছে। এমনকি এই বাস্তব রূপদানের জন্যে যদি গোটা পার্থিব জীবনও বিসর্জন দিতে হয়, তবু তা দিতে কুন্ঠিত হওয়া উচিত না।

এ জন্যে প্রকৃত প্রতিযোগিতার ময়দানে এবং যে মহতী লক্ষ্যে প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত, সেই লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা করার জন্যে কোরআন আহবান জানাচ্ছে। কেননা, এই লক্ষ্য তার পার্থিব জীবনের শেষ পরিণতির কেন্দ্রবিন্দু এবং পার্থিব জীবনের পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনেও তার অবিচ্ছেদ্য সংগী। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে কোরআন যে আহবান জানায় তা হলো,

---

(১) সূরা 'আয যারিয়াতের 'ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদূন' আয়াতটির তাফসীর দ্রষ্টব্য।

'তোমরা প্রতিযোগিতা করো তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা লাভের জন্যে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মতো প্রশস্ত জান্নাতের জন্যে, যা আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। ....'

অর্থাৎ যারা প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান এবং খেলাধুলার জগতকে শিশুদের জন্যেই রেখে দেয়, খেলাধুলা, পারস্পরিক অহংকার ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়; বরং তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত জান্নাত এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষ লাভের প্রতিযোগিতা।

সম্ভবত মহাবিশ্বের বিশালত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উদঘাটিত হওয়ার আগে অতীতের কেউ কেউ এ ধরনের আয়াত ও হাদীসকে এবং ইতিপূর্বে সাধারণ জান্নাতবাসী উচ্চতর কতিপয় কক্ষের অধিবাসীদের দিকে নক্ষত্রের দিকে তাকানোর মতো তাকাবে– এই মর্মে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছি সেই হাদীসটি রূপক অর্থে গ্রহণ করতেন। তবে আজকাল যখন মানুষের তৈরী ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণ যন্ত্র মহাবিশ্বের সীমাহীন দিগন্ত উদঘাটন করে চলেছে, তখন জান্নাতের বিশালত্ব ও দূর থেকে কক্ষসমূহ নিরীক্ষণসংক্রান্ত কথাবার্তা যে একেবারেই স্বাভাবিক, চাক্ষুষ ও বাস্তব সত্য বলে প্রতীয়মান হবে, তা সুনিশ্চিত। একে রূপক অর্থে গ্রহণ করার কোনোই প্রয়োজন নেই। কেননা, পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে যা কিছু আছে, তা মহাবিশ্বের বিশাল রাজ্যের একটি ভগ্নাংশ পরিমাণও নয়।

জান্নাতের সেই বিশাল রাজ্যে যে কেউ প্রবেশ করতে পারে এবং তার জন্যে যে কেউ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারে। এর জন্যে একমাত্র প্রয়োজনীয় উপকরণ হলো আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলদের প্রতি ঈমান। 'ওটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে চান তাকেই তা দেন।' '...... আর আল্লাহ তায়ালা বিরাট অনুগ্রহের অধিকারী।' বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহকে কেউ ঠেকিয়েও রাখতে পারে না। লুকিয়েও রাখতে পারে না। আগ্রহী ও সাধনাকারীদের জন্যে তা সহজলভ্য। প্রতিযোগিতাকারীদের উচিত এই অনুগ্রহ অর্জনের জন্যে প্রতিযোগিতা করা– নশ্বর পৃথিবীর তুচ্ছ স্বার্থের জন্যে নয়।

এই বিশাল সৃষ্টিজগতের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করা প্রত্যেক মোমেনের কর্তব্য। নিজেকে, নিজের দৃষ্টি, বিচার বিবেচনা ও আবেগ-অনুভূতিকে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। মোমেন হিসাবে তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের জন্যেই এটা করা উচিত। অবশ্য এই ভূমিকা পালন করা খুবই কঠিন, সাধারণ মানুষের পছন্দ অপছন্দের সাথে সংঘর্ষশীল এবং তাদের গোমরাহী ও বক্রতার সাথে বেমানান। এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে সে বাতিল শক্তির পক্ষ থেকে এবং তার দুনিয়া লোলুপতার দিক থেকে এমন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় যে, তা সহ্য করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। একমাত্র সেই ব্যক্তিই এই চাপ সহ্য করতে পারে, যে পার্থিব জীবনের চেয়ে বৃহত্তর, প্রশস্ততর ও দীর্ঘস্থায়ী জীবনের সাথে সমন্বয় রেখে চলে।

মনে রাখতে হবে, মোমেনের বিবেকে যে সত্য বদ্ধমূল থাকা উচিত, পার্থিব মানদন্ডের সাথে তার পুরোপুরি মিল নেই। পৃথিবীর আয়তনের সাথে মহাবিশ্বের আয়তনের যতোটা ব্যবধান, পৃথিবীর বয়সের সাথে মহাকালের যতোটা পার্থক্য, পার্থিব মানদন্ডের সাথে মোমেনের বিবেকে বদ্ধমূল সত্যের ঠিক ততোখানি পার্থক্য। বস্তুত এই পার্থক্য এতো বড় যে, পৃথিবীর সকল দাঁড়িপাল্লা একত্রিত হয়েও তা মাপা তো দূরের কথা, তার আভাস ইংগিতও দিতে সক্ষম নয়।

এ কারেণেই মোমেন তার অনুসৃত মহাসত্যের ওপর অবিচল থাকার জন্যে দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতার অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করে, তা যতো বড়, দীর্ঘস্থায়ী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ হোক না কেন। সে পার্থিব জীবনের সংকীর্ণ গন্ডির বাধাবন্ধনমুক্ত মহাসত্যের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে, আখেরাতের অনন্ত অসীম জগতের সাথে এবং ক্ষুদ্র ও ছলনাময় তুচ্ছ পার্থিব জীবনের হাজারো উত্থান পতনের মধ্যেও অটল অবিচল থাকে যে ঈমানী মূল্যবোধ, তার প্রতি আনুগত্য রক্ষা করে

চলে। পার্থিব জীবনের মানদন্ড ও মূল্যবোধগুলো সংশোধন করার জন্যে এটা মোমেন বান্দাদের আল্লাহর মনোনীত ঈমানী কর্তব্য। পার্থিব মূল্যবোধের সাথে আপস করে ও মিল খাইয়ে চলা মোমেনদের কাজ নয়।

তাকদীরের সঠিক দর্শন ও মোমেনের হৃদয়ের প্রশান্তি

সূরা হাদীদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তাকদীর বা অদৃষ্ট সংক্রান্ত। অদৃষ্ট হচ্ছে ইহকালীন জীবনের এক অমোঘ অলংঘনীয় ব্যাপার। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

পৃথিবীতে অথবা তোমাদের সত্তায় যে কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা সংঘটিত হোক না কেন, তা তার সৃষ্টির পূর্বেই একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে। ....আল্লাহই অভাবমুক্ত ও চির প্রশংসিত।'

বস্তুত এই মহাবিশ্বে কোনো কিছুই আকস্মিক ও অপরিকল্পিতভাবে সংঘটিত হয় না। প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনা আগে থেকেই পরিকল্পিত, মহাবিশ্ব ও সকল প্রাণীর সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ স্বীয় সর্বব্যাপী জ্ঞান দ্বারা তা জানতেন। আল্লাহর জ্ঞানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নামের কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। সময় ও কাল সংক্রান্ত সেসব বিভক্তি রেখা শুধু আমাদের ন্যায় নশ্বর জীবেরই বৈশিষ্ট্য। এগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন জিনিসের সীমানা পরিমাপ করে থাকি। কেননা, আমরা কোনো বস্তুকে অপর বস্তু থেকে পৃথককারী কালগত ও স্থানগত সীমানা চিহ্ন ছাড়া চিনতে পারি না। কোনো সীমাহীন বস্তুকে আমরা কেবল তখনই চিনতে সক্ষম হই, যখন এক ধরনের আলোক রশ্মি এসে আমাদের হৃদয়কে তার সাথে যুক্ত করে দেয়। দুনিয়ার অন্যান্য বস্তুকে চিনতে আমরা যে পন্থা নির্ধারণ করে রেখেছি, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় এই যুক্তকরণের কাজটি সম্পন্ন হয়, কিন্তু মহান স্রষ্টা আল্লাহর ব্যাপারটা ঠিক এর বিপরীত। তিনি হচ্ছেন সেই অসীম মহাসত্য, যা এই গোটা সৃষ্টিজগতের ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে অবহিত এবং কোনো সীমা ও বাধাবন্ধন তার অবহিত হওয়া ব্যাহত করে না। সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এই মহাবিশ্বের যেখানে যতো কিছুই ঘটবে, তার সবই আল্লাহর জানা রয়েছে এবং কালগত ও স্থানগত কোনো বাধা তাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। প্রত্যেকটি ঘটনা আল্লাহর পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে এবং তা তাঁর কাছে সুবিদিত। আয়াতে যে 'মুসিবত' শব্দটি রয়েছে, তা দ্বারা আভিধানিক অর্থে ভালো ও মন্দ উভয় প্রকারের ঘটনাই বুঝানো হয় এবং এখানেও উভয়ই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ভালো ও মন্দ যাই ঘটুক, তা বিশ্বজগত ও প্রাণীসমূহের আবির্ভাবের আগে থেকেই সেই আদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। 'এটা আল্লাহর কাছে খুবই সহজ ব্যাপার।'

মানুষ যখন প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করে, তখন তার অন্তরে এমন এক প্রশান্ত ভাবের সৃষ্টি হয় যে, সে ভালো ও মন্দ সকল ঘটনাকেই শান্তভাবে গ্রহণ করে। ফলে খারাপ ঘটনায় সে মুষড়ে পড়ে না বা হতাশ ও বিমর্ষ হয় না। আবার ভালো কিছু সংঘটিত হলেও আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে না। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বলেছেন,

'যেন তোমরা যা হারিয়েছো তার জন্যে আক্ষেপ না কর এবং আল্লাহ তায়ালা যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তার জন্যে গর্বিত না হও।'

বস্তুত দৃষ্টিকে যদি প্রশস্ত করা হয়, মহাবিশ্বের সাথে যদি সমন্বয় রক্ষা করে চলা হয়, আদি ও অন্তকে দৃষ্টিপথে রেখে আল্লাহর নির্ধারিত বিশ্ব পরিকল্পনার আলোকে যদি ঘটনাবলীকে বিচার বিবেচনা করা হয়, তাহলে ভালোমন্দ সকল ঘটনা হাসিমুখে বরণ করে নেয়ার মতো মানসিক ঔদার্য, ভারসাম্য, গাম্ভীর্য ও স্থিতি জন্মে। কারণ, সে বুঝতে পারে, এ জাতীয় ঘটনা মানবসত্ত্বা ও প্রাকৃতিক জগতে সমভাবেই ঘটে।

মানুষ কেবল তখনই ঘটনাবলীতে অধীর ও অস্থির হয়ে থাকে, যখন সে মহাবিশ্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবে এবং মনে করে যে, এ ধরনের ঘটনা কেবল তার ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে

বিপর্যস্ত করার জন্যেই ঘটে, কিন্তু সে যখন উপলব্ধি করে যে, সে নিজে এবং তার ওপর ও পৃথিবীর অন্যত্র সংঘটিত ঘটনাবলী মহাবিশ্বের বিশাল দেহে অতি ক্ষুদ্র অণুপরমাণু সদৃশ, এই সকল অণুপরমাণু সামগ্রিক বিশ্ব পরিকল্পনায় যথাস্থলে অবধারিতভাবে বিদ্যমান এবং মহান আল্লাহ তা পুংখানুপুংখরূপে ও অবিকলভাবে জ্ঞাত, তখন সে সব কিছুতেই শান্ত ও সন্তুষ্ট থাকে। তখন আর কোনো কিছু হারিয়ে অস্থির হয় না এবং কোনো কিছুর প্রাপ্তিতে সে গর্বের আতিশয্যে আত্মভোলা হয়ে যায় না; বরং সে পূর্ণ আনুগত্য ও সন্তোষের সাথে আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরকে মেনে নেয়। সে বুঝতে পারে যে, যা হয়েছে বা হবে, তা হওয়াই উচিত এবং কল্যাণকর।

অবশ্য খুব কম সংখ্যক মোমেনই হয়তো এই মানে উত্তীর্ণ হয়ে থাকে। তবে সাধারণ মুসলমানদের কাছ থেকে কেবল এতোটুকু প্রত্যাশা করা হয় যে, ক্ষয়ক্ষতির দুঃখ ও বেদনা এবং প্রাপ্তির সুখ ও তৃপ্তি যেন তাদের আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ, তাঁর স্মরণ ও ভারসাম্য থেকে বিচ্যুত করে না ফেলে। হযরত ইকরামা (রা.) বলেছেন যে, 'সুখ-দুঃখ ভোগ করে না এমন কেউ নেই। তবে তোমরা সুখকে শোকরে ও দুঃখকে ধৈর্যে পরিণত করো।' ইসলাম এই ভারসাম্যই শিক্ষা দেয় এবং এ ভারসাম্য সকলেরই সমান আয়াসসাধ্য।

'আল্লাহ তায়ালা অহংকারী ও গর্বিত লোকদের ভালোবাসেন না, যারা নিজেরাও কার্পণ্য করে এবং অন্যদেরও কার্পণ্য করতে নির্দেশ দেয়।'

পূর্বের আলোচিত বিষয়ের সাথে অহংকার ও গর্বের যোগসূত্র এবং উল্লিখিত উভয় জিনিসের সাথে কার্পণ্য ও কার্পণ্যের নির্দেশ দানের যোগসূত্র এই যে, যে ব্যক্তি উপলব্ধি করে, যাই ঘটে তা আল্লাহর নির্দেশেই ঘটে, সে কোনো প্রাপ্তিতেই গর্ব ও অহংকার করে না এবং কাউকে কিছু দিতে কার্পণ্য করে না ও কার্পণ্য করতে কাউকে নির্দেশ দেয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি এটা বোঝে না, সে যে সম্পদ, শক্তি ও পদমর্যাদা লাভ করে, তাকে নিজের উপার্জিত জিনিস মনে করে। ফলে তা নিয়ে সে অহংকারে লিপ্ত হয়, অতপর তা অন্যকে দিতে কার্পণ্য করে এবং নিজের এই আচরণ ও রীতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে অন্যদেরও কার্পণ্য করতে উদ্বুদ্ধ করে।

'আর যে ব্যক্তি অমান্য করে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ তায়ালা অভাবশূন্য ও চির প্রশংসিত।'

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দান করে, সে নিজেরই উপকার সাধন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দান করার আদেশ মেনে নেয়, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অভাবশূন্য। তাই তিনি বান্দাদের কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তিনি চির প্রশংসিত। বান্দাদের প্রশংসায় তাঁর কোনো অভাব পূরণ হয় না।

ইতিহাসের কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সর্বশেষে আসছে সূরার শেষ বিষয়টি। এতে সংক্ষেপে হযরত নূহ ও ইবরাহীম (আ.)-এর আমল থেকে শুরু করে রেসালাত ও ইসলামের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। মানব জাতির পার্থিব জীবনে রেসালাতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী এবং বিশেষত আহলে কেতাব ও হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের অবস্থা কী ছিলো তা বর্ণনা করা হয়েছে।

'আমি আমার রসূলদের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে পাঠিয়েছি .... তাদের (ঈসার অনুসারীদের) অনেকেই ফাসেক।'

বস্তুত সকল রেসালাত মূলত একই জিনিস। রসূলরাই ছিলেন রেসালাতের বাহক। সেই সাথে তাঁরা অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে আসতেন। তাঁদের অধিকাংশই অলৌকিক ঘটনাবলী তথা মোজেযাসমূহ সাথে নিয়ে আসতেন। তাঁদের কারো কারো ওপর কেতাব নাযিল হয়েছিলো।

আয়াতের দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে, 'এবং তাদের সাথে কেতাব নাযিল করেছি।' সকল নবীর কথা এক শব্দে উল্লেখ এবং কেতাবকে বহুবচনের পরিবর্তে একবচনে উল্লেখ করা দ্বারা এই সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে, রেসালাত মূলত একই জিনিস।

'এবং দাঁড়িপাল্লাও (নাযিল করেছি)।' অর্থাৎ কেতাবের সাথে সাথে। বস্তুত সকল নবী রসূল পৃথিবীতে ও মানব জাতির জীবনে এমন একটা স্থায়ী দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলেন, যার দিকে মানব জাতি তাদের কার্যকলাপ, ঘটনাপ্রবাহ, বস্তুনিচয় ও লোকদের পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ধাবিত হবে, যার ওপর মানব জাতি নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে তাকে খেয়ালখুশীর যথেচ্ছাচার, স্বভাবের বহুমুখিতা ও স্বার্থের সংঘাত থেকে নিরাপদ করবে এবং যাকে সকল প্রকার স্বজনপ্রীতি ও বঞ্চনার উচ্ছেদ সাধনের মানদন্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। এ দাঁড়িপাল্লা সত্যের মাপকাঠি দিয়ে সকলের অধিকার মেপে দেয় বিধায় কারো প্রতি স্বজনপ্রীতি করে না এবং আল্লাহ তায়ালা সকলের প্রভু বিধায় কারো ওপর যুলুম করে না।

রেসালাতের অন্তর্ভুক্ত করে এই দাঁড়িপাল্লা আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন, এটি যাবতীয় দুর্যোগ, দুর্বিপাক, বিপদ মসিবত ও দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে মানব জাতির নিরাপত্তার একমাত্র গ্যারান্টি। মানুষ সকল বঞ্চনা ও স্বজনপ্রীতি থেকে মুক্ত হয়ে ন্যায্য অধিকার, ইনসাফ ও সুবিচার পাওয়ার জন্যে শরণাপন্ন হতে পারে এমন একটা স্থায়ী দাঁড়িপাল্লা বা মানদন্ড তার একান্ত প্রয়োজন। একথাই বলা হয়েছে আয়াতের পরবর্তী অংশে, 'যেন মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।' আল্লাহর এই অটল দাঁড়িপাল্লা তথা আল্লাহর বিধান ও আল্লাহর আইন ছাড়া মানুষ ন্যায়বিচারের সন্ধান পেতে পারে না, আর যদি ন্যায়বিচারের সন্ধান পায়ও, তবে এই দাঁড়িপাল্লা হাতে না পেলে অজ্ঞতা ও খেয়ালখুশীর স্রোতে ভেসে গিয়ে ন্যায়বিচারের গন্তব্যস্থল থেকে বিপথগামী হয়ে যেতে পারে।

'আর আমি লোহা নাযিল করেছি। লোহাতে রয়েছে মানব জাতির জন্যে নিদারুণ বিপদাশংকা এবং বিপুল উপকারিতাও। আর এজন্যেও যে, কে কে না দেখে আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের সাহায্য করে, তা যেন আল্লাহ তায়ালা জেনে নেন।'

'লোহা নাযিল করেছি' কথাটা ঠিক এ রকম, যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, 'তিনি তোমাদের আট জোড়া পশু নাযিল করেছেন।' উভয় জায়গায় এর মর্মার্থ হলো, জিনিস ও ঘটনাবলী সৃষ্টিতে আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা। কেননা, এ সবই আল্লাহর পরিকল্পনা ও বিচার বিবেচনা অনুসারে নাযিল তথা আবির্ভূত হয়ে থাকে। তা ছাড়া এখানে আয়াতের প্রেক্ষাপটের সাথে সমন্বয় রয়েছে। এই প্রেক্ষাপট হলো কেতাব ও দাঁড়িপাল্লা নাযিল করার প্রেক্ষাপট। অনুরূপভাবে আল্লাহ যত জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তাও তাঁর কেতাব ও দাঁড়িপাল্লার মতোই পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা লোহাকে 'নিদারুণ বিপদাশংকার উৎস' অর্থাৎ যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থায় শক্তির উৎস হিসাবে, 'আর মানুষের জন্যে উপকারিতারও উৎস' হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আজকের মানব সভ্যতা লোহার ওপর ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে। 'না দেখে কে কে আল্লাহকে সাহায্য করে ...' এ দ্বারা আসলে সশস্ত্র জেহাদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ বিষয়টি জান ও মাল উৎসর্গ করা সংক্রান্ত বক্তব্যের আকারে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের সাহায্যকারীদের প্রসংগে বক্তব্য রাখার পর পরই সাহায্যের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই বলে যে, 'আল্লাহ তায়ালা শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করাই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের সাহায্য করার শামিল।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ

রুকু ৪

২৬. আমি নূহ ও ইবরাহীমকে আমার রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি এবং তাদের উভয়ের বংশধরদের মাঝে আমি নবুওত ও কেতাব (প্রেরণের ব্যবস্থা করে) রেখেছি, অতপর তাদের মাঝে কিছু কিছু লোক সঠিক পথ অবলম্বন করেছে, (অবশ্য) তাদের অধিকাংশ লোকই ছিলো না-ফরমান। ২৭. তারপর (তাদের বংশে) একের পর এক আমি অনেক রসূলই প্রেরণ করেছি, তাদের পরে (এক পর্যায়ে) আমি মারইয়াম পুত্র ঈসাকে (রসূল বানিয়ে) পাঠিয়েছি এবং তাকে আমি (হেদায়াতের গ্রন্থ) ইঞ্জিল দান করেছি, (এর প্রতিষ্ঠায়) যারা তার আনুগত্য করেছে তাদের মনে (তার প্রতি) দয়া ও করুণা দান করেছি; (তার অনুসারীদের অনুসৃত) সন্ন্যাসবাদ! (আসলে) তারা নিজেরাই এর উদ্ভব ঘটিয়েছে, আমি কখনো এটা তাদের জন্যে নির্ধারণ করিনি, (আমি তাদের শুধু বলেছিলাম) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে, অতপর তারা এর যথাযথ হক আদায় করেনি, তারপর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের আমি (যথার্থ) পুরস্কার দিয়েছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই ছিলো না-ফরমান। ২৮. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং তাঁর প্রেরিত রসূলের ওপর ঈমান আনো, এর ফলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দ্বিগুণ অনুগ্রহে ভূষিত করবেন, তিনি তোমাদের জন্যে স্থাপন করবেন সেই আলো, যার সাহায্যে তোমরা পথ চলতে সক্ষম হবে, (উপরন্তু) তিনি তোমাদের (যাবতীয় গুনাহ খাতা) মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, ২৯. আহলে কেতাবরা যেন একথাটা (ভালো করে) জেনে নিতে পারে, আল্লাহ তায়ালার সামান্যতম অনুগ্রহের ওপরও তাদের কোনো অধিকার নেই, যাবতীয় অনুগ্রহ! সে

عَلٰى شَیۡءٍ مِّنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الۡفَضۡلَ بِیَدِ اللّٰهِ یُؤۡتِیۡهِ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ

وَاللّٰهُ ذُو الۡفَضۡلِ الۡعَظِیۡمِ ﴿۲۹﴾

তো সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালারই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই এ অনুগ্রহ দান করেন; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা সুমহান অনুগ্রহশীল।

তাফসীর

আয়াত ২৬-২৯

রেসালাত যে স্বীয় মৌলিক প্রকৃতি, কেতাব ও দাঁড়িপাল্লার দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন, সে কথা ঘোষণা করার পর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, এই রেসালাতের বাহকরাও এই হিসাবে এক ও অভিন্ন যে, তাঁরা সবাই নূহ ও ইবরাহীমের বংশধর।

'আমি নূহ ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছি এবং তাদের উভয়ের বংশধরকে কেতাব ও নবুওত দিয়েছি।'

বস্তুত এটি একটি অখন্ড বৃক্ষ, যার বহু শাখা প্রশাখা। এসব শাখা প্রশাখা কেতাব ও নবুওতের ধারক বাহক। মানব জাতির উৎপত্তিকাল থেকে এবং নূহ (আ.)-এর সময়কাল থেকে তা চলে আসছে। ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত এলে তা ক্রমান্বয়ে বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়।

তবে যে বংশধরের কাছে কেতাব ও নবুওত এসেছিলো, তারা নিজেদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। 'তাদের কতেক ছিলো হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং অনেকেই ছিলো ফাসেক।'

এখানে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার প্রায় শেষ পর্যায়ে আসেন মারইয়ামের ছেলে ঈসা (আ.)। বলা হচ্ছে, 'অতপর আমি তাদের পর আমার অন্য রসূলদের ও মারইয়ামের ছেলে ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম।' অর্থাৎ নূহ ও ইবরাহীমের প্রাথমিক বংশধরের পদাংক অনুসরণ করে পরবর্তীদের পাঠিয়েছি। এই রেসালাত একই ধারা-প্রবাহ এবং এরই শেষ প্রান্তের কাছাকাছি ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটে।

বৈরাগ্যবাদ কখনো ইসলামসম্মত নয়

এখানে আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসার অনুসারীদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছেন, 'আমি তাঁর অনুসারীদের হৃদয়ে দয়া ও মমতার সৃষ্টি করেছি।'

এই সকল গুণ হযরত ঈসার দাওয়াত, তাঁর মহত্ত্ব ও ঔদার্য, আত্মিক পবিত্রতা ও উজ্জ্বল স্বচ্ছতার স্বাভাবিক ফল। দয়া মমতা হযরত ঈসার রেসালাতের একনিষ্ঠ ভক্ত ও যথার্থ ঈমানদার লোকদের এক সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য। কোরআনের অন্যান্য আয়াতেও এদিকে ইংগিত করা হয়েছে। নাজ্জাশী, নাজরান থেকে আগত প্রতিনিধি দল এবং ইসলামের বিজয়ের পর অন্যান্য যারা ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হয়ে মুসলিম দেশে এসেছে, তাদের সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের প্রদত্ত বিবরণেও তাদের এই গুণবৈশিষ্ট্যের চিত্র ফুটে ওঠেছে। কেননা, তারা হযরত ঈসার যথার্থ অনুসারী হওয়ায় তাদের হৃদয়ে সত্যের প্রকৃত রূপ বদ্ধমূল ছিলো।

এখানে হযরত ঈসার অনুসারীদের আরো একটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, 'আর বৈরাগ্যবাদ তারাই উদ্ভাবন করে নিয়েছিলো, আমি তাদের ওপর এটিকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তেই বিহিত করেছিলাম।'

এ আয়াতের যে তাফসীর সর্বাধিক অগ্রগণ্য তা এই যে, খৃষ্টান জাতির ইতিহাসে বৈরাগ্যবাদের যে স্থান, তা হযরত ঈসার কিছু সংখ্যক অনুসারীর স্বনির্বাচিত ব্যবস্থা ছিলো। আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ এবং দুনিয়ার জীবনের নোংরামি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে তারা এটি উদ্ভাবন করেছিলো। এ জিনিসটি প্রথম থেকে আল্লাহর দেয়া বিধান হিসাবে চালু ছিলো না। তবে তারা যখন এটা নিজেরাই গ্রহণ করে নিলো এবং নিজেদের ওপর এটিকে বাধ্যতামূলক করে নিলো, তখন একে যথাযথভাবে মেনে চলা ও এর দাবী অনুযায়ী উচ্চতর, পরিচ্ছন্ন, অল্পে তুষ্ট ও লালসামুক্ত জীবন যাপন এবং যেকর ও এবাদাতে নিয়োজিত থাকা তাদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ালো। অন্য কথায়, যেহেতু আল্লাহর সর্বাত্মক নিষ্ঠা ও আনুগত্য অর্জনই ছিলো তাদের এই স্ব-উদ্ভাবিত ও মনগড়া বৈরাগ্যবাদের উদ্দেশ্য, তাই এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে পরিগণিত হয়েছিলো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি প্রাণহীন প্রথা ও অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেলো। এর জন্যে যে কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন ছিলো, তাদের খুব কম লোকই তার জন্যে প্রস্তুত ছিলো। আল্লাহ তায়ালা একথাই বলেছেন,

'তবে তারা তাকে যথাযথভাবে মেনে চললো না। ফলে আমি তাদের মধ্য থেকে যথার্থ ঈমানদারদের তাদের প্রতিদান দিলাম। তবে তাদের অনেকেই ছিলো ফাসেক।'

আল্লাহ তায়ালা বাহ্যিক কোনো রূপ গ্রহণ করেন না। তিনি গ্রহণ করেন মানুষের আমল ও নিয়ত। গ্রহণ করেন বাস্তব কাজ ও তার অন্তর্নিহিত সদুদ্দেশ্য। আর সেই অনুসারেই তাদের হিসাব গ্রহণ করেন। তিনি তো মনের গোপন অবস্থা জানেন। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপস্থাপন ও পর্যালোচনার পর মোমেনদের প্রতি সর্বশেষ আহবান জানানো হয়েছে। এই মোমেনদের দ্বারা নবীদের অনুসারীদের সর্বশেষ কাফেলা অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মাদীকে বুঝানো হয়েছে, যারা কেয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনের উত্তরাধিকারী হবে।

'হে মোমেনরা, আল্লাহকে ভয় করো, ... আর আল্লাহ তায়ালা বিরাট অনুগ্রহের অধিকারী।'

এখানে 'হে মোমেনরা' বলে সম্বোধনে তাদের হৃদয়ে এক বিশেষ উজ্জীবনী পরশ বুলানো হয়েছে, ঈমানের প্রকৃত মর্ম পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে, ঈমানের দাবী অনুসারে কাজ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদের প্রতিপালকের সাথে তাদের সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে এবং এই সম্পর্কের ওসিলায় তাদের আল্লাহভীতি ও আল্লাহর রসূলের প্রতি যথার্থ ঈমান আনয়নের আহ্বান জানানো হয়েছে। সুতরাং যে ঈমানের আহ্বান জানানো হয়েছে, তা বিশেষ তাৎপর্যবহ। অর্থাৎ আসল ও প্রকৃত ঈমান এবং তার দাবীর বাস্তবায়ন।

'আল্লাহকে ভয় করো এবং তার রসূলের প্রতি ঈমান আনো। তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দ্বিগুণ রহমত দান করবেন।'

আল্লাহর রহমত যদিও অখন্ড বস্তু, তবু এ দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন ও ক্রমবর্ধমান রহমত বুঝানো হয়েছে।

'আর তোমাদের জন্যে এমন জ্যোতি প্রস্তুত করবেন, যা দ্বারা তোমরা চলতে পারবে।' এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দাতব্য বিশেষ দান, যা আল্লাহ তায়ালা সত্যিকার মোমেন ও আল্লাহভীরু হৃদয়কে দিয়ে থাকেন। এ দান মোমেনদের হৃদয়কে এতো আলোকিত করে যে, তারা পর্দার আড়ালের সত্যও দেখতে পায়। ফলে তারা কখনো গোমরাহ হয় না, বিপথগামী হয় না।

'এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, দয়াবান।'

মনে রাখতে হবে, মানুষ যতোই জ্যোতি বা নূর লাভ করুক, যতই জ্ঞানী ও পারদর্শী হোক, তথাপি সে মানুষ এবং তার ভুলত্রুটি ও গুনাহ হতে পারে। তাই সে ক্ষমা ও দয়ার মুখাপেক্ষী। 'আর আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াবান।'

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'হে মোমেনরা! আল্লাহকে ভয় করো ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো।' যাতে আল্লাহর দ্বিগুণ রহমত লাভ করতে পারো এবং সেই নূর বা জ্যোতি অর্জন করতে পারো, যা দিয়ে পথ চলতে পারবে এবং যার সাহায্যে তোমাদের গুনাহ মাফ হয়ে যেতে পারে।

'যাতে আহলে কেতাব না জানে যে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণের অধিকারী নয়। অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে রয়েছে এবং তা তিনি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকেন।' আহলে কেতাব তথা ইহুদী-খৃষ্টানরা মনে করতো, তারাই আল্লাহর মনোনীত জাতি এবং তাঁর সন্তান ও প্রিয়জন। 'তারা বলতো, তোমরা ইহুদী অথবা খৃষ্টান হয়ে যাও। সুপথগামী হতে পারবে।' 'তারা বলতো যে, ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছাড়া কি বেহেশতে যাবে না।' তাই আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.)-এর ওপর ঈমান আনয়নকারীদের ডেকে নিজের রহমত, জান্নাত, ক্ষমা ও অনুগ্রহ দেয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন, যাতে আহলে কেতাবের সে ভ্রান্ত ধারণা দূর হয় এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ তাদের মুঠোর মধ্যে নেই এবং তাদের তা ঠেকানোর ক্ষমতাও নেই, বরং সকল অনুগ্রহ ও রহমত আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ, তিনি যাকে যতো খুশী দিয়ে থাকেন। এটা কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

এই আহবানে জান্নাত ও রহমত লাভের জন্যে প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এই আহবানের মধ্য দিয়েই সূরা হাদীদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। সর্বশেষে এই আহবানের পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য হলো, মোমেনরা যেন ঈমানের দাবীর বাস্তবায়ন করে। আল্লাহর যথার্থ অনুগত হয় এবং একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা সহকারে তাঁর জন্যে যাবতীয় জানমালের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়।

বস্তুত সূরা হাদীদ মানুষের হৃদয়কে সম্বোধন করার দিক দিয়ে কোরআনের এক অনন্য দৃষ্টান্তমূলক সূরা। এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে মানুষের মনের ওপর গভীর প্রভাব ও ভাবাবেগ সৃষ্টি করার উপকরণ নিহিত। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের পতাকাবাহীদের জন্যে এতে রয়েছে চমকপ্রদ শিক্ষা। কিভাবে মানুষকে সম্বোধন করতে হয়, কিভাবে হৃদয়কে উজ্জীবিত ও জাগ্রত করতে হয়, এ সূরায় তার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

এ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ হৃদয়সমূহের স্রষ্টার, কোরআন নাযিলকারীর ও পরিকল্পিতভাবে প্রতিটি জিনিস সৃষ্টিকারীর। এই প্রশিক্ষণাগার থেকেই তৈরী হয়ে বেরুতে পারবে সেই সব দাওয়াতদাতা, যাদের দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হবে এবং যারা দাওয়াতের প্রেরণায় উজ্জীবিত থাকবে।

সূরা আল মোজাদালা

আয়াত ২২ রুকু ৩

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ① اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـئِيْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ② وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ③ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. (হে রসূল,) তার কথা আল্লাহ তায়ালা (যথার্থই) শুনেছেন, যে (মহিলা) তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছিলো এবং (নিজের অসুবিধার জন্যে) আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ করে যাচ্ছিলো, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উভয়ের কথাবার্তাই শুনছেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু দেখেন। ২. তোমাদের মধ্যে যারা (তাদের মায়েদের শরীরের কোনো অংশের সাথে তুলনা করে) নিজ স্ত্রীদের সাথে 'যেহার' করে (তাদের জেনে রাখা উচিত), তাদের স্ত্রীরা কিন্তু কখনো তাদের মা নয়; মা তো হচ্ছে তারা, যারা তাদের জন্ম দিয়েছে; (এ কাজ করে) তারা (মূলত) অন্যায় ও মিথ্যা কথাই বলে; (তারপরও) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন (মানুষের) গুনাহ মোচনকারী ও পরম ক্ষমাশীল। ৩. যারা (এভাবে) তাদের স্ত্রীদের সাথে 'যেহার' করে, অতপর (অনুতপ্ত হয়ে) যা কিছু বলে ফেলেছে তা থেকে ফিরে আসতে চায় (তাদের জন্যে বিধান হচ্ছে), তাদের একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসের মুক্তি দান করা; এ (বিধানে)-র মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের করণীয় কি— তা বলে দিচ্ছেন, (কেননা) তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত রয়েছেন। ৪. যে ব্যক্তি (মুক্তিদানের জন্যে কোনো দাস) পাবে না (তার বিধান হচ্ছে), তাদের একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একাধারে দু'মাসের রোযা পালন (করা, স্বাস্থ্যগত কারণে) যে ব্যক্তি (রোযা রাখার) সামর্থ রাখবে না (তার বিধান হচ্ছে), ষাট জন মেসকীনকে (পেট ভরে)

سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ④ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑤ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑥

খাওয়ানো; এ বিধান এ জন্যেই (তোমাদের দেয়া হচ্ছে) যেন তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনো; (মনে রাখবে, 'যেহারের' ব্যাপারে) এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, যারা (এ সীমা) অস্বীকার করে তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ৫. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের তেমনিভাবে অপদস্থ করা হবে, যেমনি করে তাদের আগে (বিদ্রোহী) লোকদের অপদস্থ করা হয়েছিলো, আমি তো আমার সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করে দিয়েছি; যারা (এসব আয়াত) অস্বীকার করে তাদের জন্যে অবশ্যই অপমানকর শাস্তি থাকবে, ৬. যেদিন আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকে পুনরায় জীবন দান করবেন তখন তাদের সবাইকে তিনি বলে দেবেন তারা কি করে এসেছে; আল্লাহ তায়ালা সে কর্মকান্ডের পুংখানুপুংখ হিসাব রেখেছেন, অথচ তারা নিজেরা সে কথা ভুলে গেছে; (সেদিন) আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদের সব কয়টি কাজের সাক্ষ্য প্রদান করবেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আমরা এই গোটা সূরাসহ বলতে গেলে প্রায় এই সমগ্র পারাটার মাঝেই মাদানী সমাজে রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত ঘটনাবলীর সাক্ষাৎ পাই। দেখতে পাই সদ্যোজাত মুসলিম দলটিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, শুধু এই ছোট পৃথিবীতেই নয়; বরং সমগ্র বিশ্বনিখিলে তার সেই ভূমিকা পালনের জন্যে কিভাবে তাকে গড়ে তোলা হচ্ছে, যে ভূমিকা আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন। এটা আসলেই এক বিরাট ভূমিকা। এই দলটির হৃদয়ে মানব জীবন সম্পর্কে যে পূর্ণাংগ ও সর্বব্যাপী ধারণা জন্মে এবং সেই ধারণার ভিত্তিতে তাদের যে বাস্তব জীবন ও চরিত্র গড়ে ওঠে, তা থেকেই এই ভূমিকা পালন করা শুরু হয়। জীবন সম্পর্কে এই পূর্ণাংগ ও সর্বব্যাপী ধারণা এই দলটি অতপর সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়, যাতে করে সমগ্র মানব জাতির জন্যে এ ধারণার ভিত্তিতে একটা পূর্ণাংগ জীবন ও চরিত্র গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়। সুতরাং এই ভূমিকাটা এতো বড় যে, তার জন্যে একটা পূর্ণাংগ প্রস্তুতির প্রয়োজন।

যে মুসলিম দলটিকে মহান আল্লাহ এই বিরাট ভূমিকা পালনের জন্যে তৈরী করছিলেন, সে দলটির লোকগুলো অন্যান্য মানুষের মতোই মানুষ ছিলো। তাদের মধ্যে একদল ছিলো সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী মোহাজের ও আনসার, যাদের ঈমান পরিপক্বতা অর্জন করেছিলো, নতুন

আকীদা ও আদর্শের ব্যাপারে তাদের ধারণা পূর্ণতা লাভ করেছিলো, এর জন্যে তাদের অন্তরও একনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলো। তাদের নিজেদের সত্ত্বা ও মহাবিশ্বের বিশাল সত্ত্বার সাথে প্রকৃত পরিচয় তারা জানতে পেরেছিলো এবং তাদের সত্ত্বা মহাবিশ্বের সাথে মিশ্রিত হয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিলো। এভাবে তারা সৃষ্টিজগতে আল্লাহর পরিকল্পনার একটি অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। তাদের মন মগযে এ ব্যাপারে কোনো বক্রতা ও সমন্বয়হীনতা ছিলো না, তাদের গৃহীত কোনো পদক্ষেপই মহান আল্লাহর পরিকল্পনার বাইরে গৃহীত হতো না এবং তাদের অন্তরে এমন কোনো চিন্তা বা ইচ্ছাও জন্ম নিতো না, যা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়। এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াতে তাদের সম্পর্কে যে ধরনের বিবরণ দেয়া হয়েছে তারা আসলে সে রকমই ছিলো,

'তুমি আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাসী কোনো গোষ্ঠীকে আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলের বিরোধী কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসে এমন দেখতে পাবে না, এমনকি সে যদি তাদের মা বাবা, ছেলে মেয়ে, ভাই বোন অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন হয় তবুও নয়। তারা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ঈমান অংকন করে দিয়েছেন ....।' (শেষ আয়াত)

কিন্তু ঈমান আনয়নে অগ্রণী এসব লোক পরবর্তীকালের ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনগোষ্ঠীর তুলনায় ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়, বিশেষত ইসলাম একটা শক্তিতে পরিণত হবার পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সময়ে এটা বেশী লক্ষ্য করা গেছে। এ সময়ে এমন লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে, যারা ইসলামী শিক্ষাও যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করেনি এবং ইসলামী পরিবেশে দীর্ঘকাল জীবন যাপনও করেনি। কিছু কিছু মোনাফেক শ্রেণীর লোকও এই সময়ে ইসলামে প্রবেশ করে, যাদের অন্তরে ইসলাম অতোটা শেকড় গাড়েনি, যতোটা শেকড় গেড়েছিলো স্বার্থপ্রীতি, নিরাপত্তাপ্রীতি, সুযোগসন্ধানী মানসিকতা। মুসলিম শিবির ও তৎকালীন শক্তিশালী মোশরেক ও ইহুদী গোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্কে দোদুল্যমানতা, স্থিতিহীনতা ও নমনীয়তা সৃষ্টির কুমতলব যতোটা মযবুত ছিলো তাদের ঈমান ততোটা মযবুত ছিলো না।

সমগ্র সৃষ্টিজগতে এই মুসলিম জাতির জন্যে যে ভূমিকা নির্ধারিত হয়েছিলো, সে ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রস্তুত করা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে প্রয়োজন ছিলো বহুমুখী চেষ্টা সাধনার, সুদীর্ঘ ধৈর্যের এবং ছোট বড়ো প্রত্যেক সমস্যার পর্যায়ক্রমিক ও ধীরগতিসম্পন্ন সঠিক সমাধানের। এ উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিলো মানুষ গড়া ও চরিত্র গড়ার সেই বিরাট আন্দোলন, যা ইসলাম ও রসূল (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এ আন্দোলন সেসব চরিত্রবান মানুষ গড়ে তুলেছিলো, যারা ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, যারা আল্লাহর আইন ও বিধানের পতাকা উত্তোলন করতে পারবে, সর্বোপরি যারা আল্লাহর বিধান বুঝবে ও বাস্তবায়িত করতে পারবে। যারা তাকে পৃথিবীর সর্বত্র জীবন্ত ও কার্যকরভাবে ছড়িয়ে দেবে, একে শুধু বই পুস্তকের পাতায় সীমাবদ্ধ রাখবে না, কিংবা তা নিয়ে শুধু গলাবাজি করেই ক্ষান্ত হবে না।

এই সূরাসহ সমগ্র পারা জুড়ে আমরা সেই বহুমুখী চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রামের কিছু নমুনা দেখতে পাই। দেখতে পাই সেই মহান মানুষগুলোকে তৈরী করা ও বিভিন্ন রকমের ঘটনা, আদত অভ্যাস, রীতি নীতি, আবেগ উচ্ছ্বাস ও ঝোঁকপ্রবণতা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোরআন যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তার কিছু কিছু দিক। আর ইসলামের নানান রকমের শত্রু মোশরেক, ইহুদী ও মোনাফেকদের সাথে ইসলামের যে দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব সংঘাত চলে আসছে, তারও কিছু অংশ আমরা এখানে দেখতে পাই।

বিশেষত এই সূরায় আমরা সদ্য আবির্ভূত মুসলমান দলটির প্রতি মহান আল্লাহর অসাধারণ কৃপা ও যত্নের একটা প্রতিফলন দেখতে পাই। মনে হয়, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাকে চোখে চোখে রেখে গড়ে তুলেছেন, নিজের বিধানের আলোকে তাকে প্রতিপালন করেছেন, তার মনমগযে এরূপ চেতনা ও অনুভূতির সৃষ্টি করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তার ছোটো বড়ো গোপন প্রকাশ্য সকল ব্যাপারে সর্বদা তার সাথে সাথে রয়েছেন, তাকে তার শত্রুদের গোপন ও প্রকাশ্য সকল চক্রান্ত থেকে রক্ষা করে চলেছেন, তার স্বভাব চরিত্র, আদত অভ্যাস ও ঐতিহ্যকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যাতে তারা আল্লাহ তায়ালার সুরক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রিয় দলের উপযোগী স্বভাব চরিত্রের মানুষে পরিণত হয়, পৃথিবীতে আল্লাহর বাহিনী গড়ে তোলার ও সারা পৃথিবীতে আল্লাহর পতাকা উত্তোলনের যোগ্য হয়।

এ কারণেই অত্যন্ত চমকপ্রদ ভংগিতে সূরাটার সূচনা হয়েছে। মূলত এ সময়টা ছিলো মানবেতিহাসের একটা বিরল যুগ। এ যুগে মহান আল্লাহ কর্তৃক পৃথিবীর অধিবাসীদের সাথে প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতভাবে সংযোগ রক্ষা করা এবং একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীর দৈনন্দিন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের একটা উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা শুনেছেন সেই মহিলার কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো ও আল্লাহর কাছে অভিযোগ পেশ করেছিলো, আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উভয়ের কথোপকথনও তখন শুনছিলেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।' (আয়াত-১)

এখানে আমরা দেখতে পাই, মহান আল্লাহ তায়ালা একটা নগণ্য দরিদ্র ও সাধারণ ক্ষুদ্র পরিবারের দৈনন্দিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন, যাতে সে পরিবারের উদ্ভূত সমস্যায় আল্লাহর ফয়সালা কার্যকরি হতে পারে। মহিলাটি রসূল (স.)-এর সাথে কথা বলার সময় আল্লাহ তায়ালা তা শুনেছেন। অথচ তার কাছে থেকেও হযরত আয়শা (রা.) তা শুনতে পাচ্ছিলেন না! এটা আসলে এমন এক দৃশ্য, যা আল্লাহর উপস্থিতি, নৈকট্য, স্নেহ ও অভিভাবকত্বের অনুভূতি দিয়ে হৃদয়কে পরিপ্লুত করে দেয়।

এর পরেই খুব জোরের সাথে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর আশ্রয় লাভকারী মুসলমানদের চরম শত্রু। তাদের ওপর ইহকালেও থাকবে আল্লাহর আক্রোশ ও অভিশাপ, আর পরকালেও তারা অপমানজনক শাস্তি পাবে। তারা তাদের নিজেদের কর্মফলই ভোগ করবে। তারা নিজেরা তাদের অপকর্ম ও পপাচার ভুলে গিয়েছিলো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা গুনে গুনে লিখে রেখেছেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তো সব কিছুই দেখেন।

তারপর প্রত্যেক গোপন পরামর্শের সময়েও যে আল্লাহ তায়ালা সেখানে উপস্থিত থাকেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা মনে করে যে, সেখানে তারা ছাড়া কেউ নেই। অথচ তারা যেখানেই থাকে, আল্লাহ তায়ালা সেখানেই তাদের সাথে থাকেন। 'অতপর তিনি কেয়ামতের দিন তাদের জানিয়ে দেবেন তারা কী করেছে। আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই জানেন।' বস্তুত এ আয়াতেও এমন দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যা আল্লাহর অস্তিত্ব, সার্বক্ষণিক উপস্থিতি, তদারকী ও খবরদারী সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলে।

এই হুশিয়ারী আসলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্তদের বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ। এ দ্বারা তাদের মনে উদ্বেগ ও ভীতির সঞ্চার করা হয়েছে। তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের গোপন দুরভিসন্ধি ফাঁস হয়ে গেছে। আল্লাহর চোখকে তারা ফাঁকি দিতে পারেনি। পাপকার্য, যুলুম

অত্যাচার, রসূল (স.)-এর অবাধ্যতার লক্ষ্যে তাদের সমস্ত গোপন তৎপরতা ও পরিকল্পনা আল্লাহ লিখে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা এসবের জন্যে তাদের পাকড়াও করবেন ও শাস্তি দেবেন। তিনি মুসলমানদের নিষেধ করেছেন, তারা যেন ভালো কাজ, আল্লাহর ভয় এবং এর জন্যে মানুষের মন মগয প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে গোপন সলাপরামর্শ না করে।

এরপর এই মোমেনদের প্রশিক্ষণ দেয়া অব্যাহত রাখা হয়েছে, রসূল (স.)-এর বৈঠকে, অন্যান্য এলেম ও যেকেরের বৈঠকে তাদের ভদ্রতা, সুশীলতা ও আনুগত্যের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে রসূল (স.)-এর সাথে কথা বলা ও প্রশ্ন করার আদবও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গাম্ভীর্য ও সম্মান বজায় রাখার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

এরপরও সূরার অবশিষ্টাংশ হচ্ছে ইহুদীদের সাথে দহরম-মহরম পাতানো ও তাদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র পাকানো মোনাফেকদের সাথে সংশ্লিষ্ট। বলা হয়েছে যে, তারা তাদের মোনাফেকী ও অপতপরতাকে মিথ্যাচার ও মিথ্যা শপথের মাধ্যমে রসূল (স.) ও মুসলমানদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। আখেরাতেও তারা মিথ্যা কথা ও মিথ্যা শপথের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে, যেমন এই দুই কৌশল কাজে লাগিয়ে তারা দুনিয়াতে রসূল (স.) ও মুসলমানদের আক্রোশ থেকে রক্ষা পেতো। সেই সাথে এ কথাও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সর্বাপেক্ষা অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে লিখে দেবেন। তিনি এও লিখে রাখবেন যে, তিনিও তাঁর রসূলরাই বিজয়ী হবেন। এ কথা দ্বারা মূলত মোনাফেকদের অপমানিত করা হয়েছে। কেননা কোনো কোনো মুসলমান তাদের মর্যাদাশালী মনে করতো। তাই তারা তাদের সাথে কিছুটা সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করতো। অথচ মুসলমানদের শুধুমাত্র আল্লাহর পতাকার নীচে সমবেত করা, একমাত্র আল্লাহর অভিভাবকত্ব দ্বারা সম্মানিত ও শক্তিমান বোধ করা উচিত। আল্লাহর প্রিয় বান্দা এই মুসলমানদের আল্লাহর প্রহরাধীন থাকতে পেরে নিশ্চিন্ত থাকার গুরুত্ব কতো তা তারা উপলব্ধি করে না। সূরার শেষাংশে আল্লাহর দল হিসেবে মুসলমানদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয়েছে। এ ভাবমূর্তি হচ্ছে সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী মোহাজের ও আনসারদের। তাদের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে শেষ আয়াতটিতে—

'তুমি দেখতে পাবে না আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী কোনো গোষ্ঠী আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের বিরোধী কোনো লোকের সাথে প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখে........।'

তাফসীর

আয়াত ১-৬

'আল্লাহ তায়ালা সেই মহিলার কথা শুনেছেন যে তোমার সাথে তার স্বামীকে নিয়ে তর্ক করেছিলো এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেছিলো। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উভয়ের কথোপকথন শুনেন।' (আয়াত ১-৪)

কিছুই আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে নয়

জাহেলী যুগে কখনো কখনো এমন ঘটতো যে, কোনো স্বামী তার স্ত্রীর কোনো কাজ বা কথায় রেগে গেলে বলতো, 'তুই আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো।' এর ফলে সে তার ওপর হারাম হয়ে যেতো, অথচ এতে তালাক হতো না। সে এভাবেই ঝুলন্ত থেকে যেতো। সে তার জন্যে হালালও থাকতো না যে তাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল থাকবে, আবার সে তালাকপ্রাপ্তও হতো না যে, অন্য কোনো স্বামী গ্রহণ করবে। জাহেলী যুগে এটা ছিলো নারী নির্যাতনের অসংখ্য উপায়ের মধ্যে অন্যতম একটা উপায়।

যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটলো, ঠিক তখনই এই ঘটনাটা ঘটে, যার দিকে এই আয়াত কটিতে ইংগিত দেয়া হয়েছে। তখনো পর্যন্ত যেহারের কোনো বিধান নাযিল হয়নি। ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, হযরত খোওয়ায়লা বিনতে সা'লাবা (রা.) বলেছেন, আল্লাহর কসম আমার ও আওস বিন সামেত সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা সূরা মোজাদালার প্রথম অংশ নাযিল করেছেন। তিনি বলেন, আমি আওস বিন সামেতের স্ত্রী ছিলাম। সে তখন অতি মাত্রায় বুড়ো এবং মেজাজ খুব খিটখিটে তিরিক্ষি হয়ে গেছে। একদিন সে আমার কাছে এলো। আমি তাকে একটা বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করতেই সে ভীষণ রেগে গেলো। সে তৎক্ষণাৎ বলে ওঠলো, তুই আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো। এরপর সে বেরিয়ে গেলো এবং তার গোত্রের আড্ডাখানায় কিছুক্ষণ বসলো। তারপর নিভৃতে আমার কাছে এলো। এসেই সে সহবাস করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলো। আমি বললাম, খবরদার! খোওয়ায়লার প্রভুর কসম, তুমি যে কথা বলেছো, তারপর আর আমার কাছে নিভৃতে সাক্ষাত করো না, যতোক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল আমাদের ব্যাপারে ফয়সালা ঘোষণা করেন। এরপর সে আমার সাথে ধস্তাধস্তি করতে লাগলো, কিন্তু আমি নিজেকে রক্ষা করলাম। একজন দুর্বল বুড়োর ওপর জয়লাভ করতে একজন নারীর যে কৌশল অবলম্বন করতে হয়, তাই অবলম্বন করে আমি জয়লাভ করি। আমি তাকে আমার কাছ থেকে হটিয়ে দিলাম। এরপর আমি আমার এক প্রতিবেশীর কাছে চলে গেলাম এবং তার কাছ থেকে কিছু পোশাক ধার করে আনলাম। তারপর রসূল (স.)-এর কাছে চলে গেলাম এবং তাঁর সামনে বসে আমার স্বামীর কাছ থেকে যে দুর্ব্যবহার ভোগ করে আসছি, সে ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলাম। রসূল (স.) বললেন, 'হে খোওয়ায়লা, তোমার চাচাতো ভাই (অর্থাৎ স্বামী) অত্যধিক বুড়ো। তার ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করো।' এরপর আমার ব্যাপারে কোরআনের আয়াত নাযিল হওয়া পর্যন্ত আমি চুপচাপ থাকি। রসূল (স.) গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন। তারপর একদিন তাঁর চিন্তা দূর হলো। তিনি আমাকে বললেন, হে খোওয়ায়লা, আল্লাহ তায়ালা তোমার ও তোমার স্বামীর ব্যাপারে কোরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। তারপর তিনি আমাকে এই সূরার প্রথম চারটা আয়াত পড়ে শোনালেন। এরপর রসূল (স.) আমাকে বললেন, তুমি ওকে একটা দাস মুক্ত করে দিতে বলো। আমি বললাম, হে রসূল, তার মুক্ত করার মতো কোনো দাস নেই। তিনি বললেন, তাহলে তার একনাগাড়ে দু'মাস রোযা রাখা উচিত। আমি বললাম, সে এতোটা বুড়ো হয়ে গেছে যে, তার পক্ষে রোযা রাখা সম্ভব নয়। তিনি বললেন, তাহলে সে ষাট জন দরিদ্রকে এক ওয়াসাক খোরমা খাওয়াক। আমি বললাম, ওর কাছে তাও নেই। রসূল (স.) বললেন, আমরা তাকে এক আরক (৬০ সা) খোরমা দিয়ে সাহায্য করবো। আমি বললাম, হে রসূল, আমিও ওকে আরো এক আরফ খোরমা দিয়ে সাহায্য করবো। রসূল (স.) বললেন, তুমি ঠিক কাজ করেছো ও ভালো করেছো। যাও, ওর পক্ষ থেকে সদকা দিয়ে দাও। তারপর তোমার চাচাতো ভাইয়ের জন্যে শুভ কামনা করো। আমি তাই করলাম।' (আবু দাউদ)

এই হচ্ছে সেই সমস্যা, যা নিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে এসে বাদানুবাদে লিপ্ত মহিলার ও রসূল (স.)-এর মধ্যকার সংলাপ আল্লাহ তায়ালা শুনেছিলেন। এটাই সেই সমস্যা যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সাত আকাশের ওপর থেকে নিজের ফয়সালা নাযিল করেছিলেন, যাতে এই মহিলাকে তার অধিকার দেয়া যায়। তার ও তার স্বামীর মনকে প্রবোধ দেয়া এবং এ ধরনের দৈনন্দিন পারিবারিক সমস্যায় মুসলমানদের কী করা উচিত তা তাদের জানিয়ে দেয়া যায়।

এ হচ্ছে সেই ঘটনা, যা দিয়ে আল্লাহর চিরঞ্জীব কোরআনের একটি সূরা শুরু হয়েছে। যে কোরআনের প্রতিটি শব্দ আল্লাহর সর্বোচ্চ পরিষদের কাছ থেকে নাযিল হয় এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অংশ তা দ্বারা আলোড়িত ও স্পন্দিত হয়, তার একটি সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে, 'মহান আল্লাহ তায়ালা সেই মহিলার কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছিলো......' এটা ভেবে দেখার মতো ব্যাপার যে, সাধারণ মুসলমানদের ও পৃথিবীর পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার ব্যস্ততা তাঁকে এ সমস্যাটার প্রতি কর্ণপাত করা ও তার ব্যাপারে ফয়সালা দেয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

এটা এমন একটা চমকে দেয়া ঘটনা, যা দ্বারা একদল মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, আল্লাহ তায়ালা এভাবে তাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন, তাদের ছোটো বড়ো সকল সমস্যার তিনি তদারক করছেন, তাদের দৈনন্দিন সমস্যাবলী নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হন এবং তাদের যাবতীয় সমস্যা সংকটের সমাধান দিতে তিনি প্রস্তুত থাকেন। অথচ তিনি সেই মহামহিম, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ, যাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব সমগ্র আকাশ এবং পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত, যিনি সকল অভাবমুক্ত ও যাবতীয় প্রশংসনীয় গুণাবলীতে ভূষিত!

হযরত আয়শা (রা.) বলেন, সেই আল্লাহর সকল প্রশংসা, যাঁর শ্রবণশক্তি সকল শব্দকে পরিবেষ্টন করে আছে। বাদানুবাদরত খোওয়ায়লা রসূল (স.)-এর কাছে এসে আমাদের ঘরের এক কোণে বসে যে কথাবার্তা বলছিলো, আমিও তা শুনতে পাচ্ছিলাম না। এই সময়ে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, 'আল্লাহ তায়ালা সেই মহিলার কথা শুনেছেন........।' (বোখারী ও নাসায়ী)

খাওলা বা খোওয়ায়লা নিজে এ ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন, অর্থাৎ এ ঘটনায় তার যেটুকু ভূমিকা রয়েছে, রসূল (স.)-এর কাছে তার গমন, সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে বাদানুবাদ করা, শেষ পর্যন্ত তার সমস্যার সমাধান নিয়ে কোরআনের আয়াত নাযিল হওয়া– এসব কিছুতে মুসলমানদের সেই অতুলনীয় দলটি সে সময়ে কী ধরনের জীবন যাপন করছিলো, তার কিছুটা চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। জানা যায়, মহান আল্লাহর সাথে তাদের কেমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকতো, তাদের প্রতিটি সমস্যার সমাধানের জন্যে তারা কিভাবে মহান আল্লাহর নির্দেশের প্রতীক্ষা করতো এবং এই প্রতীক্ষার পর তিনি কিভাবে তাদের প্রয়োজনে সাড়া দিতেন। মূলত এসব কিছু সেই দলটিকে যেন আল্লাহর পরিবার হিসেবেই চিহ্নিত করে। তিনি যেন এ পরিবারের এমন সযত্ন তত্ত্বাবধান করছেন, যেমন কোনো পিতা তার সন্তানর তত্ত্বাবধান করে থাকে।

খোদ কোরআনের আয়াতে এ ঘটনার যেটুকু বর্ণনা রয়েছে, তাতেই আমরা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ ও তাৎপর্যবহ উপাদান দেখতে পাই। আল্লাহর বিধান ও ফায়সালার পাশাপাশি এতে চমকপ্রদ মন্তব্যও করা হয়েছে এবং এটাই কোরআনের অনুপম বর্ণনাভংগি,

'আল্লাহ তায়ালা শুনেছেন সেই মহিলার কথা, যে তোমার সাথে তার স্বামীর ব্যাপারে বাদানুবাদ করছিলো এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিলো, আর আল্লাহ তোমাদের উভয়ের সংলাপ শুনছিলেন।'

এভাবে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও বিস্ময়করভাবে সূরার সূচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা শুধু দু'জনই সেখানে ছিলে না। আল্লাহ তায়ালাও তোমাদের সাথে ছিলেন এবং তিনি তোমাদের কথা শুনছিলেন। তিনি মহিলার কথা শুনেছেন। তাকে তোমার সাথে নিজের স্বামীর ব্যাপারে বাদানুবাদ করতে ও আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে শুনেছেন। সমস্ত ঘটনা তিনি জানেন। তিনি তোমাদের উভয়ের কথোপকথন ও তার কথোপকথনের বিষয় জানেন। তিনি শ্রবণকারী,

দর্শনকারী। ঘটনার এই হচ্ছে একটা চিত্র, যাতে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দু'জনের সাথে তৃতীয় হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

'যেহার' অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করার কাফফারা

কোরআনের বিবরণ হৃদয়কে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করে। এরপর আসল সমস্যার বিবরণ আসছে দ্বিতীয় আয়াতে, 'তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যেহার করে, তারা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারাই, যারা তাদের প্রসব করেছে। তারা আসলে একটা নিকৃষ্ট কথা বলে ও মিথ্যা বলে। তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী।

এভাবে মূল সমস্যার গোড়ায় হাত দেয়া হয়েছে। বস্তুত যেহার জিনিসটা একটা অমূলক ও ভুয়া ব্যাপার। স্ত্রী কখনো মা নয় যে, মায়ের মতো সে হারাম হয়ে যাবে। মা তো তিনি– যিনি তাকে প্রসব করেছেন। মুখের একটা কথায় স্ত্রী মা হয়ে যেতে পারে না। ওটা একটা খারাপ কথা, যা বাস্তবকে অস্বীকার করে। একটা ভুয়া কথা, যা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। জীবনের যাবতীয় ব্যাপার সত্য ও বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। একটা অন্যটার সাথে মিশে জগাখিচুড়ি হতে পারে না। তবে যা অতীতে হয়ে গেছে সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, দয়াশীল।

এভাবে সুস্পষ্টভাবে ও স্বচ্ছভাবে মূল বিষয়টা তুলে ধরার পর এর ব্যাপারে আইনগত ফায়সালা ঘোষণা করা হচ্ছে,

'তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীর সাথে যেহার করে অতপর তাদের উক্তি প্রত্যাহার করতে চায়, তাদের কর্তব্য একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একজন দাস মুক্ত করা। এ নির্দেশ দিয়ে তোমাদের নসীহত করা হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত।'

আল্লাহ তায়ালা দাস মুক্তকরণের কাজটাকে বহু রকমের গুনাহর কাফফারা রূপে নির্ধারণ করেছেন। যারা যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে প্রথমে যুদ্ধবন্দী হয়ে পরে দাসত্বের ভাগ্য বরণ করতে বাধ্য হতো, কাফফারা তাদের স্বাধীনতা ও তাদের মুক্তির অন্যতম উপায় হয়ে ওঠেছিলো।

'অতপর তাদের উক্তি প্রত্যাহার করতে চায়'– এ কথাটার ব্যাখ্যায় অনেকগুলো মতামত উদ্ধৃত হয়েছে। আমি সেসব মতামতের মধ্যে থেকে এই মতটাই অগ্রগণ্য মনে করেছি যে, এর অর্থ হচ্ছে, তারা তাদের সে উক্তি তথা যেহার দ্বারা নিজেদের ওপর যে স্ত্রী সহবাস হারাম করেছিলো, সেটা পুনরায় বৈধ করার জন্যে সে উক্তি প্রত্যাহার করতে চায়। এই মতটাই আয়াতের বাহ্যিক বাচনিক রূপের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নিকটতম। অর্থাৎ স্বামীর নিজের সৃষ্টি করা এই সমস্যার সমাধানের জন্যে একজন দাস মুক্ত করা অপরিহার্য। অতপর মন্তব্য করা হচ্ছে,

'এ নির্দেশ দিয়ে তোমাদের নসীহত করা হচ্ছে।'

অর্থাৎ যে যেহারের কোনো ন্যায়সংগত ভিত্তি নেই এবং কোনো ভালো কাজ বলে পরিচিতও নয়, তা যাতে তোমরা পুনরায় না করো, সে জন্যে এই কাফফারা একটা উপদেশবাণী ও স্মরণিকা হয়ে থাকবে।

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত।'

অর্থাৎ তোমাদের কার্যকলাপের ধরন, তার সংঘটন ও তার পেছনে তোমাদের যে নিয়ত, মনোভাব ও উদ্দেশ্য সক্রিয়া রয়েছে তা তাঁর জানা আছে।

এই মন্তব্য করা হয়েছে যেহারের বিধান পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করার পূর্বে, যাতে মোমেনদের মন সেই বিধান গ্রহণের জন্যে জাগ্রত ও প্রস্তুত হয়, বিধানের আনুগত্য করার প্রশিক্ষণ যেন সে

লাভ করে এবং এই মর্মে সতর্ক হয় যে, আল্লাহ তায়ালা যে ব্যাপারেই নির্দেশ দেন, তার সম্পর্কে তার পূর্ণ অভিজ্ঞতা এবং তার গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু অবহিত থাকার ভিত্তিতেই নির্দেশ দেন। এ কথা বলার পর কাফফারার অবশিষ্ট বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে,

'আর যে ব্যক্তি তা (দাসমুক্ত করতে) পারে না, সে যেন উভয়ের পক্ষ থেকে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে একনাগাড়ে দু'মাস রোযা রাখে, আর যে ব্যক্তি তাও না পারে, সে যেন ষাট জন অভাবী ব্যক্তিকে আহার করায়।'

এরপর অধিকতর বিশ্লেষণ ও মনোযোগ আকর্ষণের লক্ষ্যে বলা হচ্ছে, ' নির্দেশদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো।' যাদের সম্বোধন করে এ কথা বলা হচ্ছে, তারা মোমেনই। তবুও এই বর্ণনা, এসব কাফফারা এবং এর ভেতরে তাদের অবস্থা আল্লাহর নির্দেশ ও ফয়সালার সাথে যেভাবে সংযুক্ত ও সমন্বিত করা হয়েছে, তা ঈমানকে নিছক বিশ্বাস ও মানসিক প্রেরণা-উদ্দীপনার স্তর থেকে বাস্তবতার স্তরে উন্নীত করে। ঈমানের সাথে কর্মময় জীবনের সংযোগ সাধন করে এবং বাস্তব জীবনের জন্যে ঈমানকে একটা লক্ষণীয় শক্তির উৎসরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

'আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা।' এই সীমারেখা তিনি এজন্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাতে মানুষ এই সীমারেখার কাছে এসে থেমে না যায় এবং তা অতিক্রম না করে। কেননা যে ব্যক্তি এই সীমারেখা মানে না এবং মাড়াতে দ্বিধাবোধ করে না, তার ওপর আল্লাহ তায়ালা রাগান্বিত হন।

সীমালংঘনকারীদের প্রতি কঠোর হুমকি

'আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' কারণ তারা এই সীমারেখা অতিক্রম করে, প্রতিনিয়ত একে চ্যালেঞ্জ করে, আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না এবং তাঁর সীমারেখায় এসে কখনো থেমে যায় না- যেমন করে মোমেনরা থেমে যায়।

'কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'- এই শেষ বাক্যটার সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের শেষ মন্তব্যের মিল রয়েছে। আবার এই শেষ বাক্যটা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের শাস্তির বিবরণ সম্বলিত পরবর্তী আয়াতের সাথেও সংযোগ সেতু রচণা করছে। এভাবে এক বিস্ময়কর ধারাবাহিকতার পথ বেয়ে এক প্রসংগ থেকে আর এক প্রসংগে যাওয়াই কোরআনের বর্ণনাভংগির বৈশিষ্ট্য।

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা তাদের পূর্ববর্তীদের মতো লাঞ্ছিত হবে। .... আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ের ওপর সাক্ষী রয়েছেন।'

সূরার প্রথম পর্বটা ছিলো মোসলমানদের প্রতি সহৃদয়তা ও মমত্ববোধের অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় পর্বটায় কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব ও যুদ্ধংদেহী মানসিকতার অভিব্যক্তি ঘটেছে। কাফেরদের এখানে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয়ে তাঁর নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রমকারী বলে আখ্যায়িত করার বিষয়টি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের নির্ধারিত সীমারেখা চ্যালেঞ্জ করে তা অতিক্রম করতে চায়, সীমারেখার কাছে এসে থেমে যায় না। এখানে আসলে খোদাদ্রোহীদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে, যাতে তাদের কার্যকলাপের ভয়াবহতা ও তাদের ভূমিকার নিকৃষ্টতা প্রকাশ পায়। যে সৃষ্টি তার স্রষ্টা ও জীবিকাদাতাকে চ্যালেঞ্জ করার ধৃষ্টতা দেখায় এবং তার সীমারেখার বিপরীত সীমারেখায় উপনীত হবার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে, তার

নীতির মতো জঘন্য নীতি আর কারো হতে পারে না। এসব স্পর্ধিত ও উদ্ধত ব্যক্তিরা সবাই আল্লাদ্রোহী। তাদের পূর্ববর্তীরা যেমন লাঞ্ছিত হয়েছিলো, তেমনি তারাও লাঞ্ছিত হবে। অগ্রগণ্য মত এই যে, এটা আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে অভিসম্পাৎ, অর্থাৎ তারা লাঞ্ছিত হোক, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ অভিসম্পাত দেয়ার অর্থ দাঁড়ায়, তাদের লাঞ্ছিত করার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে ফেলেছেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন সেটাই বাস্তবায়ন করেন। লাঞ্ছনা দ্বারা অপমান ও পরাজয় বুঝানো হয়েছে। আর পূর্ববর্তীদের দ্বারা বুঝানো হয়েছে অতীতে আল্লাহ তায়ালা তাদের শাস্তি দিয়েছেন, অথবা বদর যুদ্ধের মতো বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানরা যেসব কাফেরদের পরাজিত ও পদানত করেছে– তাদেরও বুঝানো হতে পারে।

'অথচ আমি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যার্থহীন আয়াতসমূহ নাযিল করেছি।' এই বাক্যটি আল্লাহ তায়ালা ও আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের ইহকালের পরিণতি ও পরকালের পরিণতির পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছে। বলা হচ্ছে, এই আয়াতগুলোতে এ উভয় ধরনের পরিণতির বিবরণ রয়েছে, আর কাফেররা অজ্ঞতা কিংবা অস্পষ্টতা থাকার কারণে এ পরিণতি ভোগ করে না। কেননা তাদের স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়েছে এবং তারাও এইসব দ্ব্যর্থহীন আয়াতগুলো দ্বারা তা জেনেছে।

এরপর তাদের পরকালীন পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে এবং তার সাথে সাথে হৃদয়ে জাগরণ সৃষ্টিকারী তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যও করা হয়েছে,

'আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। যেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন ....' এ অপমান হচ্ছে দুনিয়ায় যে ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা দেখানো হয়েছিলো তারই অপমানজনক শাস্তি দেয়া হবে। এ শাস্তি তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি। তারা নিজেরা এর কথা ভুলে গেলেও আল্লাহ তায়ালা নিজের জ্ঞান দ্বারা তা গুনে গুনে রেখেছেন। আল্লাহর সে জ্ঞানের কাছ থেকে কোনো কিছুই গোপন থাকে না। 'আর আল্লাহ তায়ালা সবকিছুতেই দর্শক ও উপস্থিত।'

মোমেনদের প্রতি সহৃদয়তা ও মহানুভবতার দৃশ্য এবং কাফেরদের প্রতি কঠোরতা ও শাস্তির এই উভয় দৃশ্য আল্লাহর জ্ঞানে ও তার উপস্থিতিতে একত্রিত করা হয়েছে। তিনি সদয় আচরণ ও সাহায্যের ক্ষেত্রেও উপস্থিত এবং দর্শক থাকেন, আবার নির্দয় কঠোর আচরণের সময়ও একইভাবে দর্শক এবং উপস্থিত থাকেন। সুতরাং সদা সর্বদা তাঁর উপস্থিতির ব্যাপারে মোমেনদের সন্তুষ্ট নিশ্চিন্ত থাকা উচিত আর কাফেরদের থাকা উচিত সতর্ক সাবধান।

'আল্লাহ তায়ালা সব কিছুতে সদা দর্শক ও উপস্থিত'– এই উক্তির মধ্যে যে তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে, পরবর্তী আয়াতে তাকে এমন একটা জীবন্ত ছবিতে পরিণত করেছে, যা শুধু দর্শনেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তা গভীর পরশ বুলায়। মহান আল্লাহ বলেন,

'তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে, আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা জানেন? যে কোনো তিন ব্যক্তি গোপন সলাপরামর্শ করুক, আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে চতুর্থ হিসেবে বিরাজ করছেন,...... । নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে অবগত।' (আয়াত ৭)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوٰى ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ۖ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ۙ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنٰجَيْتُمْ فَلَا

রুকু ২

৭. তুমি কি কখনো এটা অনুধাবন করো না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন; কখনো এমন হয় না যে, তিন ব্যক্তির মধ্যে কোনো গোপন সলাপরামর্শ হয় এবং (সেখানে) 'চতুর্থ' হিসেবে আল্লাহ তায়ালা উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ জনের মধ্যে (কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, যেখানে) 'ষষ্ঠ' হিসেবে তিনি থাকেন না, (এ সলা পরামর্শকারীদের সংখ্যা) তার চাইতে কম হোক কিংবা বেশী, তারা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তায়ালা সব সময়ই তাদের সাথে আছেন, অতপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাদের (সবাইকে) বলে দেবেন তারা কি কাজ করে এসেছে; আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছেন। ৮. তুমি কি তাদের লক্ষ্য করো না, যাদের (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সম্পর্কে কোনো) গোপন কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিলো; (কিন্তু) তারা (ঠিক) তারই পুনরাবৃত্তি করলো যা করতে তাদের বারণ করা হয়েছিলো, তারা একে অপরের সাথে সুস্পষ্ট গুনাহের কাজ, মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও রসূলের নাফরমানীর ব্যাপারে কানাঘুষা করতে লাগলো, (অথচ) এরা যখন তোমার সামনে আসে তখন তোমাকে এমনভাবে অভিবাদন জানায়, যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালাও তোমাকে অভিবাদন জানান না, (আর এ সব প্রতারণার সময়) ওরা মনে মনে বলে, আমরা যা বলছি তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কোনো প্রকার শাস্তি দিচ্ছেন না কেন? (তুমি তাদের বলো,) জাহান্নাম তাদের (শাস্তির) জন্যে যথেষ্ট, তার আগুনে (পুড়ে) তারাই দগ্ধ হবে, কতো নিকৃষ্ট (হবে সেই) বাসস্থান। ৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন একে অপরের সাথে গোপনে কোনো কথা বলো, তখন কখনো কোনো

تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ

وَالتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿৯﴾ اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ

الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿১০﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ

تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا

فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿১১﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ

الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿১২﴾

পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের বিরোধিতা সম্পর্কিত কথা বলো না; বরং গোপনে কিছু বলতে হলে (সেখানে) একে অপরকে ভালো কাজ ও (আল্লাহকে) ভয় করার কথাই বলো; (সর্বোপরি) সে সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর সামনে (একদিন) তোমাদের (সবাইকে) সমবেত করা হবে। ১০. (আসলে এদের) গোপন সলাপরামর্শ তো হচ্ছে একটা শয়তানী প্ররোচনা, যার (একমাত্র) উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানদার লোকদের কষ্ট দেয়া (অথচ এরা জানে না), আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা ঈমানদারদের বিন্দুমাত্রও কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; (তাই) ঈমানদারদের উচিত (হামেশা) আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা। ১১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যখন মজলিসসমূহে (একটু নড়েচড়ে) জায়গা প্রশস্ত করে দিতে তোমাদের বলা হয়, তখন তোমরা জায়গা প্রশস্ত করে দিও, (তাহলে) আল্লাহ তায়ালাও তোমাদের জন্যে (জান্নাতে) এভাবে জায়গা প্রশস্ত করে দেবেন, (আবার) কখনো যদি (জায়গা ছেড়ে) ওঠে দাঁড়াতে বলা হয়, তাহলে ওঠে দাঁড়িয়ে যেও, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কেয়ামতের দিন তাদের মহামর্যাদা দান করবেন; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে পূর্ণ খবর রাখেন। ১২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যদি কখনো রসূলের সাথে একাকী কোনো কথা বলতে চাও, তাহলে (অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা নিয়ন্ত্রনের কৌশল হিসেবে) তোমরা কিছু দান (সাদাকা) আদায় করে নেবে; এটা তোমাদের (সবার) জন্যে মংগলজনক ও (রসূলের মজলিসের পরিবেশ নিয়ন্ত্রনে রাখার একটি) পবিত্রতম পন্থা, অবশ্য সাদাকা আদায় করার মতো তোমরা যদি কিছু না পাও তাহলে (দুশ্চিন্তা করো না, কেননা,) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۚ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا

وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ

وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. তোমরা কি তোমাদের একাকী কথা বলার আগে সাদাকা আদায় করার আদেশে ভয় পেয়ে গেলে? যদি তোমরা তা করতে না পারো এবং আল্লাহ তায়ালা স্বীয় করুণা দ্বারা তোমাদের ক্ষমা করে দেন, তবে তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতে থাকো, যাকাত আদায় করতে থাকো এবং (সর্বকাজে সর্ববিষয়ে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে থাকো; তোমরা যা করছো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

তাফসীর

আয়াত ৭-১৩

আয়াতের শুরুতে আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজমান যাবতীয় জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহর সর্বাত্মক জ্ঞান থাকার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ কথা ব্যক্ত করে মানুষের মনকে আকাশ ও পৃথিবীর কোণে কোণে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ চালানোর জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে। সে ইচ্ছা করলে মহান আল্লাহর সীমাহীন ও সর্বব্যাপী জ্ঞানের আওতায় এই বিশাল সুপরিসর মহাবিশ্বে ছোটো বড়ো, গোপন প্রকাশ্য, জানা অজানা বহু তথ্য সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা ষড়যন্ত্রকারীদের সব খবর রাখেন

এরপর আয়াতের পরবর্তী অংশ মহাবিশ্বের এই সব দিক-দিগন্ত পেরিয়ে কিছুটা সামনে এগিয়ে যায়, তারপর ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে তা কোরআনের শ্রোতাদের কাছাকাছি পৌঁছে যায় এবং আল্লাহর সেই সর্বাত্মক জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের হৃদয়ে এমন পরশ বুলায় যে, তাদের হৃদয়কে প্রবলভাবে আলোড়িত করে,

'যে কোনো তিন ব্যক্তি গোপন সলাপরামর্শ করুক, আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে চতুর্থ হিসেবে বিরাজ করেন, পাঁচ জন হলে তিনি থাকেন তাদের মধ্যে ষষ্ঠ.........।'

এটা আসলেই কঠিন বাস্তবতা, তবে এ বাস্তবতা এখানে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী একটা শাব্দিক রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এ শাব্দিক রূপ হৃদয়কে কখনো আল্লাহর ভয়ে ভীত ও প্রকম্পিত করে, কখনো আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসায় তাকে আপ্লুত করে। কেননা এ আয়াতের শ্রোতাদের মন সর্বত্র আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতি অনুভব করে, যিনি একাধারে ভীতিপ্রদ, আবার প্রেমময়ও। যেখানেই তিন জন নিভৃতে সমবেত হয় এ আয়াতের আলোকে তারা অনুভব করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে চতুর্থ হিসাবে বিরাজ করেন। আর যেখানেই পাঁচ জন নিভৃতে সমবেত হয়, সেখাতের তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা ষষ্ঠ হিসেবে থাকেন। যেখানেই দু'জন নিভৃতে কথা বলে, সেখানেই আল্লাহ তায়ালা থাকেন। যেখানে আরো বেশী সংখ্যক লোক জমায়েত হয়, সেখানেও আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে থাকেন।

এটা এমন এক অবস্থা, যার মোকাবেলা করে টিকে থাকার জন্যে প্রত্যেকেই ভীত প্রকম্পিত হয়ে পড়ে। এ কথা সত্য যে, আল্লাহর উপস্থিতি একটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, এটা ভয়াল ও আতংকজনকও বটে। বলা হয়েছে, 'তারা যেখানেই থাকে, তিনি তাদের সাথে থাকেন।'

আবার বলা হচ্ছে, 'অতপর তিনি তাদের কেয়ামতের দিন জানিয়ে দেবেন তারা কী করেছে।' এ হলো ভয়ে কাঁপিয়ে দেয়ার মতো আরো একটা হুঁশিয়ারী সংকেত। নিছক আল্লাহর উপস্থিত থাকা ও শ্রবণই যেখানে একটা ভয়ংকর ব্যাপার, সেখানে এই উপস্থিতি ও শ্রবণের পরে যদি জবাবদিহিতা ও শাস্তির কথাও বলা হয়, তাহলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়? যে জিনিস লুকিয়ে রাখার জন্যে লোকেরা নিভৃতে মিলিত হয় ও গোপেনে সলাপরামর্শ করে, সে জিনিস কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সকল সৃষ্টির সামনে প্রকাশ করে দেবেন, এ কথা শুনলে কার লোম আতংকে শিউরে না ওঠে পারে?

তারপর আয়াতটা তার শুরুর মতোই স্বাভাবিকভাবে শেষ হয়ে যায়।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ে অবগত।' এভাবে একই আয়াতে বিভিন্ন ভংগিতে আল্লাহর সর্ববিষয়ে অবগত থাকার বিষয়টি শ্রোতার হৃদয়ে বদ্ধমূল করা হয়।

সর্বত্র আল্লাহ তায়ালার উপস্থিত থাকা ও সব কিছু সম্পর্কে অবহিত থাকার বিষয়টি এমন প্রভাবশালী পন্থায় ও এমন ভয়াবহ এক ভংগিতে উপস্থাপন করার আসল উদ্দেশ্য হলো মোনাফেকদের সাবধান করে দেয়া। কারণ তারা রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে, মদীনার মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। তাদের সাবধান করার সাথে সাথে তাদের এই আচরণে বিস্ময়ও প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করোনি, যাদের কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিলো? তথাপি তারা যা নিষেধ করা হয়েছিলো তার পুনরাবৃত্তি করে? (আয়াত-৮)

এ আয়াত থেকে প্রতিভাত হয়, শুরুতে মোনাফেকদের ব্যাপারে রসূল (স.)-এর পরিকল্পনা ছিলো তাদের একনিষ্ঠ, আন্তরিক ও ঈমানের ব্যাপারে দৃঢ় হওয়া এবং ইহুদীদের প্ররোচনায় মদীনায় চক্রান্তে লিপ্ত থাকা থেকে বিরত হওয়ার উপদেশ দেবেন, কিন্তু উপদেশ দেয়ার পরও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে, গোপন দুরভিসন্ধিতে ও জঘন্য কারসাজিতে লিপ্ত থাকতো। তাদের সেসব অপকর্ম অপকৌশল চালিয়ে যেতো, যা ছিলো রসূল (স.)-এর আদেশ লংঘনের নামান্তর, আর রসূল (স.) ও নিষ্ঠাবান মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা রকমের নোংরা ফন্দিফিকির আঁটতো।

এ আয়াত থেকে এ কথাও জানা যাচ্ছে, মোনাফেকদের কেউ কেউ রসূল (স.)-কে এমন বিকৃত ভাষায় অভিবাদন জানাতো, যার অর্থ দাঁড়াতো অত্যন্ত খারাপ। অথচ সেটা স্পষ্টভাবে বুঝাও যেতো না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যখন তা তোমার কাছে আসে, তখন তোমাকে এমন ভাষায় অভিবাদন জানায়, যে ভাষায় আল্লাহ তায়ালা তোমাকে অভিবাদন জানাননি।' যেমন ইহুদীদের অনুকরণে তারা বলতো, 'আস্-সামু আলাইকুম'। অথচ তারা ধারণা দিতো, আসসালামু আলাইকুমই বলেছে। 'আস-সামু আলাইকুম' এর অর্থ হলো, 'তোমাদের মৃত্যু হোক'। অথবা 'তোমরা তোমাদের ধর্ম নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ো।' এ ধরনের আরো অনেক কথা বলতো, যাকে বাহ্যত মনে হতো নির্দোষ। অথচ আসলে তা ভয়ংকর দূষণীয় ও নিন্দনীয়। এসব বলে তারা আবার মনে মনে এই ভেবে তৃপ্তি লাভ করতো যে, সে যদি যথার্থই নবী হতো, তাহলে আল্লাহ

আমাদের এসব কথার জন্যে অর্থাৎ বিকৃত অভিবাদন এবং গোপন সলাপরামর্শ ও ষড়যন্ত্রের জন্যে অবশ্যই শাস্তি দিতেন।

সূরার শুরু থেকে যে আলোচনা চলে আসছে, তা থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে মোনাফেকদের মনের কথা ও গোপন মজলিসের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিতেন। ইতিপূর্বে ঘোষিত হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বাদানুবাদরত মহিলাটির কথা শুনেছেন এবং তিনি যে কোনো তিন জনের গোপন পরামর্শে চতুর্থ হিসেবে উপস্থিত থাকেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের বৈঠকে উপস্থিত থেকে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে রসূলকে অবহিত করতেন এবং তারা মনে মনে যে কুমতলব পোষণ করতো, তাও আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জানিয়ে দিতেন। তারপর তাদের জবাব দিয়েছেন,

'তাদের জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট। সেখানে তারা দগ্ধ হবে। ওটা বড়োই নিকৃষ্ট ঠিকানা।'

এইসব গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া, নিষেধ করা সত্তেও তাদের গোপন সলাপরার্শে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে হাটে হাঁড়ি ভেংগে দেয়া ও তাদের এই বক্তব্য প্রকাশ করে দেয়া যে, 'আমরা যা বলি, তার জন্যে আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেয় না কেনো', এসব কিছু থেকে প্রমাণিত হয়, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং সকল সলাপরামর্শে তিনি উপস্থিত থাকেন।

এভাবে এ আলোচনা মোনাফেকদের মনে এ কথা বদ্ধমূল করে দেয় যে, তাদের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গেছে এবং দুরভিসন্ধি ধরা পড়ে গেছে। এতে মোমেনদের মনে জন্মেছে স্বস্তি ও বিশ্বাস।

এরপর মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের মোনাফেকদের মতো পাপের কাজ, যুলুম অত্যাচার ও রসূল (স.)-এর নাফরমানী থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তাদের আল্লাহর ভয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের বোঝানো হয়েছে যে, এভাবে গোপন সলাপরামর্শ করা শয়তানের প্ররোচণার ফল। এটা মোমেনদের জন্যে শোভনীয় নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে মোমেনরা! যখন তোমরা গোপন পরামর্শ করো, তখন পাপ কাজ, যুলুম অত্যাচার ও রসূলের অবাধ্যতার পক্ষে পরামর্শ করো না.......।' (আয়াত ৯)

মনে হয়, ইসলামী সংগঠনের মেযাজ ও প্রকৃতি অনুসারে তখনো সবার মন মগয গড়ে ওঠেনি, এমন কিছু সংখ্যক মুসলমান যুদ্ধ-বিগ্রহ ও গুরুতর সংকটের সময় রসূল (স.) ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বৈঠকে বসে আলাপ আলোচনা ও সলাপরামর্শ করতো। অথচ ইসলামী সংগঠনের মেযাজ ও প্রকৃতি এ ব্যাপারটা মেনে নিতে পারতো না। ইসলামী সংগঠনের প্রকৃতি দাবী করতো, প্রতিটি চিন্তা, মতামত বা প্রস্তাব প্রথমে নেতৃবৃন্দের কাছে পেশ করতে হবে এবং দলের ভেতরে থেকে পৃথক পৃথক বৈঠক করা অনুচিত। সম্ভবত এ জাতীয় কিছু বৈঠকে এমন আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো, যা দলের ঐক্যে ফাটল ধরাতে এবং মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারতো। যদিও এসব গোপন আলোচনার উদ্দেশ্য মুসলমানদের ক্ষতি করা ছিলো না, তথাপি নিছক চলতি সমস্যাবলীর ব্যাপারে আলোচনা করা, অজ্ঞতা সত্ত্বেও তা নিয়ে মতামত ব্যক্ত করা কখনো কখনো ক্ষতির কারণ ও অবাধ্যতার প্ররোচক হয়ে দাঁড়াতে পারতো।

এ পর্যায়ে তাদের সেই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে সম্বোধন করা হয়েছে, যা দ্বারা তারা আল্লাহর সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঈমান। 'ঈমানদাররা!' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই সম্বোধন অত্যন্ত প্রভাবশালী ও হৃদয়গ্রাহী

হয়েছে। এ সম্বোধনের উদ্দেশ্য হলো, তারা যখন গোপন সলাপরামর্শ করবে, তখন তা যেন গুনাহর কাজ, উৎপীড়ন ও রসূলের অবাধ্যতার লক্ষ্যে না করে। এখানে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, কোন কোন বিষয়ে সলাপরামর্শ করা মোমেনদের জন্যে সংগত; 'বরং কল্যাণমূলক কাজ ও তাকওয়ার বিষয়ে আলাপ আলোচনা করো।' একমাত্র এই দুটো কাজের উপায়-উপকরণ সংগ্রহ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই গোপন আলাপ-আলোচনা চালানো যেতে পারে। 'বের' শব্দটার অর্থ হলো সর্বপ্রকারের সৎ ও কল্যাণমূলক কাজ। তাকওয়ার অর্থ হলো সার্বক্ষণিক সতর্কতা ও আল্লাহর সার্বক্ষণিক প্রহরা সম্পর্কে সচেতনতা। এ জিনিসটা মানুষকে কেবল সততা ও ভয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কাছে সকলকে সমবেত হতে হবে এবং তখন তিনি তাদের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। তারা তাঁর কাছ থেকে যতো কিছুই গোপন করুক, তিনি তা জানেন, দেখেও শুনে শুনে রাখেন।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, হযরত সাফওয়ান বলেন, আমি একদিন হযরত ইবনে ওমরের হাতধরা অবস্থায় ছিলাম। এই সময় এক ব্যক্তি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, রসূল (স.)-কে কেয়ামতের গোপন আলাপচারিতা সম্পর্কে তিনি কিভাবে কথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা মোমেনকে সকল মানুষের কাছ থেকে আড়ালে ডেকে নেবেন, অতপর তাকে অভয় দেবেন, ডেকে নেবেন। একে একে তার গুনাহগুলোর উল্লেখ করে বলবেন, তুমি কি অমুক গুনাহর কথা জানো? তুমি কি অমুক গুনাহর কথা জানো? অমুক গুনাহর কথা জনো? এভাবে যখন তিনি তার গুনাহগুলো প্রমাণ করবেন এবং সেই ব্যক্তি মনে করবে, তার সর্বনাশ হয়ে গেছে, তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি তোমার এসব গুনাহ দুনিয়াতে লুকিয়ে রেখেছিলাম, আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম। অতপর তার ভালো কাজের আমলনামা তাকে দেবেন। পক্ষান্তরে কাফের ও মোনাফেকদের সম্পর্কে উপস্থিত জনতা বলে ওঠবে, এরা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে, সাবধান, যালেমদের ওপর অভিস্পাত। (বোখারী ও মুসলিম)

সবার মাঝ থেকে মাত্র একজনের সাথে গোপন কথা বলা নিষেধ

পরবর্তী আয়াতে গোপন সলাপরামর্শ এবং একটি দলের সাথে একত্রে থাকা অবস্থায় তাদের থেকে আলাদা হয়ে গোপন আলোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি একটি দলের অন্তর্ভুক্ত এবং তার স্বার্থ সে দলের স্বার্থের সাথে একীভূত, তার সম্পর্কে সে দলটি যেন কখনো অনুভব না করে সে কোন ব্যাপারে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখানে এমন কিছু বিষয় পরিহার করতে বলা হয়েছে যা মুসলমানদের পরস্পরকে কুপ্ররোচনা দেয়া, কানাঘুষা করা ও দূরে নিয়ে গোপনে এমন সব কথা বলা, যা তাদের সাথীদের মনে দুশ্চিন্তা ও ভয়ভীতি এবং অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে, আর শয়তান এরূপ গোপন আলোচনা ও কানাঘুষায় প্ররোচিত করে, যাতে মুসলমানদের আশ্বাস দেয়া হচ্ছে, শয়তান তাদের ব্যাপারে যা করতে চায় তা করতে পারবে না।

'গোপন আলোচনা শুধু শয়তানের কারসাজি, যাতে সে মুসলমানদের দুর্ভাবনায় ফেলতে পারে। অথচ সে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারে না। মোমেনদের কেবল আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা উচিত।' (আয়াত ১০)

বস্তুত মোমেনরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো ওপর ভরসা করে না। কেননা তাদের আর কোথাও কোনো ভরসা আদৌ নেই, আর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো ওপরই মোমেনদের তাওয়াক্কুলের কোনো সুগো নেই।

যে পরিস্থিতিতে গোপন সলাপরামর্শ করলে আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় এবং সন্দেহ ও ভীতির সৃষ্টি করে, সে পরিস্থিতিতে গোপন সলাপরামর্শ করতে একাধিক হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে,

সহীহ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (র.) বলেছেন, তোমরা যখন তিন জন এক জায়গায় থাকো, তখন একজনকে বাদ দিয়ে তোমাদের দু'জনের গোপন আলোচনা করা উচিত, কেননা এটা তৃতীয়জনকে পীড়া দেয়।

এ হচ্ছে উন্নত চরিত্র এবং বিজ্ঞজনোচিত সতর্কতা, যাতে কোনো সন্দেহ সংশয় জন্ম নিতে না পারে। তবে কোথাও যদি গোপনীয়তা রক্ষা করা বা গোপন জিনিস লুকিয়ে রাখা কল্যাণকর হয়, চাই তা ব্যক্তিগত অথবা সামষ্টিক যে কোনো ব্যাপারেই হোক, তবে সে ক্ষেত্রে গোপনে পরামর্শ করা অবৈধ নয়। দলের দায়িত্বশীল নেতাদের মধ্যে সাধারণত এমনটি হয়ে থাকে। তবে দলের নেতাদের অজ্ঞাতসারে কোনো উপদলীয় সমাবেশ করা জায়েয নেই। এটাই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.) নিষেধ করেছেন। এটা দলের ঐক্যে ফাটল ধরায় এবং দলের ভেতরে সন্দেহ ও অনাস্থার সৃষ্টি করে। মোমেনদের দুশ্চিন্তায় ফেলার জন্যে শয়তানই এর প্ররোচনা দেয়। আল্লাহর ওয়াদা এই মর্মে অকাট্য যে, শয়তান এ উপায়ে মুসলিম দলের ভেতরে যে অনৈক্যের বীজ বপন করতে চায়, তা সে পারবে না। কেননা মুসলমানদের দলের রক্ষক ও প্রহরী স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তিনি সকল গোপন কথাবার্তায় উপস্থিত থাকেন এবং সকল দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত। তাই শয়তান কখনো মোমেনদের ক্ষতি করতে পারে না। 'আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত'– এ উক্তি দ্বারা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছার অবাধ স্বাধীনতা প্রতিপন্ন হয়েছে। চাই তা প্রতিশ্রুতি ও সংকল্পের যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন। 'আর আল্লাহর ওপরই নির্ভরকারীদের নির্ভর করা উচিত।' কেননা তিনিই একমাত্র রক্ষক ও প্রহরী, তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনিই সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত। তিনিই সদা ও সর্বত্র উপস্থিত। কোথাও তিনি অনুপস্থিত থাকেন না। সৃষ্টি জগতে তিনি যা চান তাছাড়া অন্য কিছু হয় না। আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের প্রহরা দেয়ার ওয়াদা করেছেন। এরপর আর কোনো কিছুর আশ্বাস দেয়া অবশিষ্ট থাকে না।

সভা সমাবেশ ও মজলিসের আদব

এরপর আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের সামষ্টিক জীবনের আর একটি ভদ্র রীতি শিক্ষা দিচ্ছেন,

'হে মোমেনরা, যখন তোমাদের বলা হয়, মজলিসের মধ্যে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন (তা) প্রশস্ত করে দিয়ো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যেও স্থান প্রশস্ত করে দেবেন। (আয়াত ১১)

এ আয়াত নাযিলের উপলক্ষ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, মোনাফেকদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এভাবে এ আয়াতের সাথে এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর একাধিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কাতাদা বলেন, যেকেরের মজলিসগুলো সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। কোনো একটা বৈঠকে উপস্থিত লোকেরা যদি দেখতো যে, অন্য একজন সে বৈঠকে যোগদানের জন্যে এগিয়ে আসছে, তখন তাকে জায়গা দেয়ার ব্যাপারে কিছুটা কৃপণতা প্রকাশ করতো। এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা জায়গা দেয়ার ব্যাপারে প্রশস্ততা অবলম্বন করার আদেশ দেন।

মোকাতেল বলেছেন, এ আয়াত জুমার দিনে নাযিল হয়। রসূল (স.) সেদিন সুফফাতে একটা সংকীর্ণ স্থানে অবস্থান করছিলেন। মোহাজের ও আনসারদের মধ্য থেকে বদর যোদ্ধাদের তিনি বেশী শ্রদ্ধা করতেন। সেদিন বদর যোদ্ধাদের একটা দল তাঁর কাছে এলেন। তারা একটু বিলম্বে এসেছিলেন। এসে রসূল (স.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারা রসূল (স.)-কে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিলেন। তারপর তারা উপস্থিত জনতাকেও সালাম করলেন। জনতা তাদের সালামের জবাব দিলো। তাদের বসতে জায়গা দেয়া হবে এই আশায় তারা দাঁড়িয়ে

রইলেন। রসূল (স.) বুঝতে পারলেন তারা কেন দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের বসার জায়গা দেয়া হয়নি বলেই তারা দাঁড়িয়ে আছেন। এ অবস্থা দেখে রসূল (স.) বিব্রত হলেন। তার আশপাশে যেসব অ-বদর যোদ্ধা মোহাজের ও আনসার রয়েছেন তাদের তিনি বললেন, 'হে অমুক তুমি ওঠো। হে অমুক, তুমিও ওঠো।' এভাবে তিনি তার কাছে দাঁড়ানো কয়েকজন বদর যোদ্ধাকে বসাতে লাগলেন। যাদের মজলিস থেকে ওঠিয়ে তাদের বসানো হয়েছিলো, তারা বিরক্ত হলো এবং রসূল (স.) তা লক্ষ্য করলেন। তখন মোনাফেকরা বললো, তোমরা কি দাবী করতে না যে, তোমাদের এই সাথী (রসূল স.) তোমাদের প্রতি সুবিচার করবে? আল্লাহর কসম, তিনি এদের ওপর সুবিচার করেছেন বলে আমাদের মনে হয়নি। একটা দল তাদের বসার জায়গায় বসলো এবং তাদের নবীর নিকটবর্তী হতে চাইলো, অমনি তিনি তাদের দাঁড় করলেন এবং যারা পরে এসেছে তাদের বসিয়ে দিলেন। এরপর আমরা জানতে পারলাম, রসূল (স.) বলেছেন, যে তার ভাইয়ের বসার জায়গা করে দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। এরপর দ্রুত গতিতে লোকেরা ওঠে তাদের ভাইদের বসালো। আর এ আয়াত জুমার দিনে নাযিল হলো।

এই রেওয়ায়াত যদি সঠিক হয়ে থাকে তবুও এটা সেই হাদীসের বিরোধী নয়, যাতে একজনকে উঠিয়ে তার জায়গায় অন্য জনকে বসাতে নিষেধ করা হয়েছে। সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে, রসূল (স.) বলেছেন, 'কেউ কাউকে তার আসন থেকে ওঠিয়ে সেই আসনে নিজে বসবে না। তবে জায়গা প্রশস্ত করে দাও।' অনুরূপভাবে সেই হাদীসেরও পরিপন্থী নয়, যাতে আগন্তুককে মজলিসের শেষ প্রান্তে বসতে বলা হয়েছে এবং সামনে স্থান পাওয়ার জন্যে মানুষের ঘাড় টপকাতে নিষেধ করা হয়েছে।

আয়াতে আগন্তুকের জন্যে স্থান প্রশস্ত করে দিতে বলা হয়েছে যাতে সে বসতে পারে। অনুরূপভাবে কোনো উপবিষ্ট লোককে ওঠতে বললে সেই আদেশ মান্য করে ওঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে এ আদেশ আসতে হবে নেতার পক্ষ থেকে, আগন্তুকের পক্ষ থেকে নয়।

এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো জায়গা প্রশস্ত করার আগে মন প্রশস্ত করা। মন যখন প্রশস্ত হবে, তখন স্থানও প্রশস্ত হবে, উদার হবে এবং উপবিষ্ট লোক তার আগন্তুক ভাইকে স্বেচ্ছায় সাদরে বসাবে। নেতা যখন মনে করবে যে, স্থান খালি করে দেয়ার যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে, তখন নির্দ্বিধায় ও সানন্দে তার আদেশ মান্য করতে হবে। সেই সাথে স্থায়ী মূলনীতিগুলোও বহাল রাখতে হবে, যেমন মানুষের ঘাড় টপকে টপকে পেছন থেকে সামনে না যাওয়া ও একজনকে ওঠিয়ে তার জায়গায় না বসা। কোথায় উদারতা প্রদর্শন করে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অন্য ভাইকে অগ্রাধিকার দিয়ে জায়গা করে দিতে হবে, কোথায় নেতার নির্দেশে বাধ্যতামূলকভাবে জায়গা দিতে হবে- এ দুটোর কোনটা কোথায় প্রযোজ্য হবে, সেটা স্থির করবে ইসলামের বিধান, তবে সদাচার ও সদ্ব্যবহার সর্বাবস্থায়ই অপরিহার্য।

প্রত্যেকটি দায়িত্ব কর্তব্য ঘোষণা করার সময় সে জন্যে যথোপযুক্ত আবেগ ও প্রেরণা সৃষ্টি করা কোরআনের বিশেষ রীতি। তাই যারা বৈঠকাদিতে অন্য ভাইদের জন্যে জায়গা প্রশস্ত করে দেয়, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালাও তাদের প্রশস্ততা দান করবেন, 'জায়গা প্রশস্ত করে দাও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে জায়গা প্রশস্ত করে দেবেন।' যারা রসূলের নির্দেশে স্বেচ্ছায় ওঠে যায় ও স্থান খালি করে দেয় তাদের উচ্চ মর্যাদাদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। 'আর যখন তোমাদের বলা হবে ওঠো, তখন তোমরা ওঠে যাবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যকার ঈমানদার ও জ্ঞানলাভকারীদের উচ্চতর মর্যাদা দান করবেন।' এটা তাদের জায়গা খালি করতে নির্দেশ মান্য করার ও বিনয়ের প্রতিদান।

জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে রসূল (স.)-এর কাছে বসার প্রসংগ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিলো। তাই এ আয়াতে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, ঈমান মানুষকে হৃদয়ের প্রশস্ততা ও রসূলের আনুগত্যের পথে টেনে নেয়, আর মানুষের জ্ঞান হৃদয়কে পরিশীলিত করার মাধ্যমে প্রশস্ত ও অনুগত করে। তাই ঈমান ও জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা বাড়ায়। এভাবে তারা তাদের উচ্চতর সম্মান ও মর্যাদার যেটুকু স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলো, অর্থাৎ নিজেদের আসন ছেড়ে ওঠে দাঁড়িয়ে অন্য ভাইকে শুধু রসূলের বিবেচনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বসতে দিয়েছিলো, সেই ত্যাগের বদলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল,' অর্থাৎ তিনি তোমাদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করে এ কাজের পেছনে যে আবেগ ও প্রেরণা সক্রিয় রয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের তার উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করেন।

এভাবে কোরআন মানুষের লালন পালন ও পরিশীলনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রেরণা উদ্দীপনা ও উৎসাহ যোগানোর মাধ্যমে তাকে উদারতা, মহানুভবতা ও আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। বস্তুত ইসলাম আক্ষরিক অর্থে কেবল কতকগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্যের সমষ্টি নয়; বরং বিবেকের সচেতনতা ও জাগৃতি এবং আবেগ অনুভূতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করার আরেক নাম হচ্ছে ইসলাম।

অনুরূপ কোরআন মুসলমানদের আরো একটা আদব শিক্ষা দেয়। এ আদবটা রসূল (স.)-এর সাথে সম্পর্ক রক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট। রসূল (স.)-এর সাথে একাকী সাক্ষাত করার ব্যাপারে একটা প্রতিযোগিতা লেগে থাকতো। প্রত্যেকে তাঁকে নিভৃতে নিজের মনের কথা বলতে চাইতো এবং তার প্রতি রসূল (স.)-এর ঐকান্তিক নির্দেশ ও মতামত গ্রহণ করতে চাইতো। কেউবা নিছক শখের বশেই রসূল (স.)-এর একক ও নিভৃত সাক্ষাতের স্বাদ উপভোগ করতে চাইতো এবং তাঁর সামষ্টিক দায়িত্ব ও তাঁর সময়ের মূল্যকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতো না, আর তাঁর সাথে একাকী সাক্ষাত করার গুরুত্ব যে কত এবং তা যে কেবল অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে ছাড়া হতে পারে না, সেটা অনেকেই বুঝতে চাইতো না। এসব বিষয় উপলব্ধি করানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালা একাকী সাক্ষাতকারীর ওপর এক ধরনের কর ধার্য করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ কর একাকী সাক্ষাতকারীর পক্ষ থেকে সমগ্র মুসলিম জামায়াতের জন্যে ধার্য করা হয়েছিলো। কেননা আলোচ্য ব্যক্তিটি সমগ্র মুসলিম জামায়াতের সময় ও অধিকারের একটা অংশ একাই ভোগ করতে চাইতো। এ ধরনের নিভৃত সাক্ষাত প্রার্থনা করার আগেই সদকার আকারে এটা আগাম দিতে হতো,

'হে মোমেনরা! তোমরা যখন রসূলের সাথে চুপে চুপে কথা বলতে যাবে তখন অগ্রিম কিছু সদকা প্রদান করবে।' .... (আয়াত ১২)

হযরত আলী (রা.) এই আয়াতের ওপর আমল করতেন। তিনি যখনই রসূল (স.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইতেন, এক দেরহাম সদকা দিয়ে নিতেন। তবে ব্যাপারটা সাধারণ মুসলানদের জন্যে কষ্টকর হয়ে দেখা দেয়। আল্লাহ তায়ালাও এটা জানতেন। যেহেতু এ নির্দেশের উদ্দেশ্যও ইতিমধ্যেই সফল হয়ে গিয়েছিলো এবং মুসলমানরা রসূল (স.)-এর সাথে একাকী সাক্ষাতের মূল্য কতো তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলো। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর থেকে এ কড়াকড়ি শিথিল করলেন এবং এ কড়াকড়ি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে পরবর্তী আয়াত নাযিল হলো। তার পরিবর্তে তাদের সাধারণ এবাদাতে মনোযোগী হবার উপদেশ দেয়া হলো, যা অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত করে,

'তোমরা কি অগ্রিম সদকা দেয়ায় ঘাবড়ে গেছো? বেশ, তা যখন করতে পারছো না, তাই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তা মাফ করেছেন, তখন নামায কায়েম করো, যাকাত দাও।' (আয়াত ১৩)

এ দুটো আয়াতে এবং এ আয়াত দুটোর নাযিল হওয়ার কারণ সম্বলিত বর্ণনাগুলোতে আরো দেখতে পাই, ছোট বড় নানা ধরনের আচরণ ও ভাবাবেগকে সংযত করার লক্ষ্যে মুসলমানদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে কত চেষ্টা সাধনা করা হতো।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي

রুকু ৩

১৪. (হে নবী,) তুমি কি সে সম্প্রদায়ের অবস্থা কখনো লক্ষ্য করোনি, যারা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব পাতায় যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন; এ (সুযোগসন্ধানী) লোকেরা যেমন তোমাদের আপন নয়, (তেমনি) তারাও ওদের আপন নয়, এরা জেনে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা শপথ করে। ১৫. আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে (জাহান্নামের) কঠোর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন; তারা যে কাজ করছে তা সত্যিই এক (জঘন্য) অপরাধের কাজ । ১৬. তারা তাদের (মিথ্যা) শপথগুলোকে (নিজেদের স্বার্থ রক্ষায়) ঢাল বানিয়ে নিতো, অতপর তারা মানুষদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতো, অতএব তাদের জন্যে (রয়েছে) এক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। ১৭. আল্লাহ তায়ালার (শাস্তির) কাছ থেকে (তাদের বাঁচানোর জন্যে) সেদিন তাদের ধন সম্পদ, সন্ততি সন্ততি কোনোটাই কোনো কাজে আসবে না; তারা তো দোযখেরই বাসিন্দা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ১৮. যেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন– (আশ্চর্য! সেদিনও) তারা তাঁর সামনে (এ মিথ্যা) শপথ (করে দায়িত্বমুক্তির চেষ্টা) করবে, যেমনি করে তারা (আজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে) তোমাদের সাথে মিথ্যা শপথ করছে, তারা ভাববে, (দুনিয়ার মতো সেখানেও বুঝি এর মাধ্যমে) কিছু উপকার পাওয়া যাবে; (হে রসূল,) তুমি (এদের থেকে) সাবধান থেকো, এরা কিন্তু মিথ্যাচারী। ১৯. (আসলে) শয়তান এদের ওপর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছে, শয়তান এদের আল্লাহর স্মরণ (সম্পূর্ণ) ভুলিয়ে দিয়েছে; এরা হচ্ছে শয়তানের দল; (হে রসূল,) তুমি জেনে রাখো, শয়তানের দলের ধ্বংস অনিবার্য। ২০. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অবশ্যই সেদিন চরম

الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ২১. আল্লাহ তায়ালা তো (এ) সিদ্ধান্ত (জানিয়েই) দিয়েছেন যে, 'আমি এবং আমার রসূল অবশ্যই জয়ী হবো,' নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী। ২২. (হে রসূল,) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান এনেছে এমন কোনো সম্প্রদায়কে তুমি কখনো পাবে না যে, তারা এমন লোকদের ভালোবাসে যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদি সে (আল্লাহবিরোধী) লোকেরা তাদের পিতা, ছেলে, ভাই কিংবা নিজেদের জাতি গোত্রের লোকও হয় (তবুও নয়); এ (আপসহীন) ব্যক্তিরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ঈমান (-এর ফয়সালা) এঁকে দিয়েছেন এবং নিজস্ব গায়বী মদদ দিয়ে তিনি (এ দুনিয়ায়) তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন; কেয়ামতের দিন তিনি তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে; (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর প্রসন্ন হবেন এবং তারাও (সেদিন) তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হবে; এরাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব বাহিনী, আর হাঁ, আল্লাহর বাহিনীই (শেষতক) কামিয়াব হয়।

তাফসীর

আয়াত ১৪-২২

এরপর পুনরায় সেসব মোনাফেক সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে, যারা ইহুদীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো। তাদের কিছু কিছু তৎপরতা ও অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে এবং তাদের সকল গোপন অপতৎপরতা ফাঁস করে দেয়া ও তাদের ভয়ংকর পরিণতির সম্মুখীন করার হুমকি দেয়া হয়েছে। সেই সাথে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সকল অপতৎপরতা ও চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হবে।

ইসলাম বিরোধীদের সাথে মোনাফেকদের সখ্যতা

'তুমি কি তাদের দেখোনি, যারা আল্লাহর গযবে নিপতিত একটা গোষ্ঠীকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে?' (আয়াত ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭)

আল্লাহর গযবে নিপতিত এই গোষ্ঠীটি হচ্ছে ইহুদী সম্প্রদায়। এদের বন্ধুরূপে গ্রহণকারী মোনাফেকদের ওপর যে জোরদার আক্রমণ এই আয়াতগুলোতে চালানো হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয়, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনবরত ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকতো এবং 'তাদের

জঘন্যতম শত্রুদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে তাদের বিরুদ্ধে নানারকমের ফন্দিফিকির করতো। সেই সাথে এও প্রমাণিত হয় যে, এ সময়ে ইসলাম যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিলো, ফলে মোনাফেকরা তাকে ভয় পেতো। তাদের কিছু কিছু ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের কাছে ফাঁস করে দেয়ার পর রসূল (স.) ও মুসলমানরা যখন তা নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, তখন তারা সেই ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে অস্বীকার করতো। অথচ তারা জানতো যে, এগুলো মিথ্যা কসম। কিন্তু তবু মুসলমানদের সম্ভাব্য পাকড়াও ও তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এসব মিথ্যা কসম খেতে বাধ্য হতো।

'তারা তাদের কসমগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতো।' অর্থাৎ ব্যবহার করতো আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে। আর এভাবেই তারা মানুষদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখতো। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ আয়াতগুলোর মধ্য দিয়ে একাধিকবার শাসিয়েছেন। যেমন বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা অত্যন্ত জঘন্য কাজে লিপ্ত থাকতো।' আবার বলেছেন, 'তাদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি রয়েছে।' আবার বলেছেন, 'তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তাদের আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তারা জাহান্নামী এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।'

অতপর কেয়ামতের দিন তাদের যে শোচনীয় অবস্থা হবে তার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, দুনিয়াতে তারা যেমন মানুষের সামনে মিথ্যা কসম খেতো, তেমনি আল্লাহর সামনেও মিথ্যা কসম খাবে। 'যেদিন আল্লাহ সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং তোমাদের সাথে যেমন কসম খায় তেমনি আল্লাহর সাথেও কসম খাবে।' এ থেকে প্রতীয়মান হয়, মোনাফেকী তাদের মেরুমজ্জায় মিশে গিয়েছিলো। তাই কেয়ামত পর্যন্তও তা তাদের সাথে সাথে যাবে এবং অন্তর্যামী আল্লাহর সামনেও তা বহাল থাকবে। তারা মনে করবে, এতে তাদের কিছু না কিছু লাভ হবেই। অথচ তাতে তাদের কিছুই লাভ হবে না। তাদের সব কিছুই শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

এই বলে তাদের মূল মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে দেয়া হবে।

'জেনে রাখো, তারা মিথ্যাবাদী।'

এরপর তাদের এই অবস্থার মূল কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে। সে কারণটা হলো, 'শয়তান তাদের ওপর পরাক্রান্ত হয়েছে পুরোমাত্রায়। ফলে সে তাদের আল্লাহর স্মৃতি ভুলিয়ে দিয়েছে।' আর যে হৃদয় আল্লাহর স্মৃতি ভুলে যায়, তা বিকৃত হয়ে যায় এবং তা কেবল অন্যায় অসত্যের জন্যেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তারা হচ্ছে শয়তানের দল।' অর্থাৎ তারা শয়তানের একনিষ্ঠ অনুসারী। তারই পতাকাতলে সমবেত হয়, তারই নামে কাজ করে এবং তারই উদ্দেশ্য সফল করে। এটা হচ্ছে নির্ভেজাল অন্যায়, যা সার্বিক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'মনে রেখো, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।'

এটা হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন ও তীব্র আক্রমণ। মুসলমানদের কু-চক্রী দুশমনদের সাথে গাঁটছাড়া বেঁধে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত আঁটে এবং যে নির্যাতন তাদের ওপর চালায়, এটা তার সমান, তবে মুসলমানদের মন এ কথা জেনে আশ্বস্ত থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের পক্ষ থেকে তাদের গোপন দুশমনদের দাঁতভাংগা জবাব দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

যেহেতু মোনাফেকরা ইহুদীদেরকে সবচেয়ে ক্ষমতাধর শক্তি ভেবে একমাত্র তাদের কাছ থেকেই কিছু আশা করা যায় এবং একমাত্র তাদেরকেই ভয় করা যায় মনে করে তাদের কাছে আশ্রয় নিতো, তাদের কাছ থেকেই সাহায্য ও পরামর্শ চাইতো, তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের ইহুদীদের সম্পর্কে হতাশ করে দিচ্ছেন এবং ঘোষণা দিচ্ছেন, তিনি শত্রুদের জন্যে পরাজয় ও

লাঞ্ছনা বরাদ্দ করে রেখেছেন, নিজের জন্যে এবং নিজের রসূলের জন্যে বিজয় ও সর্বময় ক্ষমতা সুনিশ্চিত করে রেখেছেন,

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সাথে দুশমনী করে, তারা লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা লিখে রেখেছেন যে, আমি ও আমার রসূলরা অবশ্যই অবশ্যই জয়লাভ করবো। কারণ আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।' বস্তুত এটা সত্য প্রতিশ্রুতি। এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছিলো। সময়ে সময়ে বাহ্যত এই সত্য প্রতিশ্রুতির বিপরীত ঘটতে দেখা গেলেও ভবিষ্যতে চূড়ান্ত পর্যায়ে এই প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়িত হতে বাধ্য।

কার্যত এটাই ঘটেছে যে, কুফর ও শেরেকের ওপর তাওহীদ বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহর দ্বীনই পৃথিবীতে স্থিতি লাভ করেছে। শেরেক ও পৌত্তলিকতার সকল বাধা ডিংগিয়ে এবং সকল ইসলামবিরোধী শক্তির সাথে লড়াই শেষে মানব জাতি এই দ্বীনের কাছেই নতিস্বীকার করেছে। যদিও পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে সময়ে সময়ে শেরেক বা কুফর ফিরে এসেছে, তথাপি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সাধারণত সর্বত্রই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে রেখেছে। অবশ্য কুফর ও শেরেকের যুগ নিশ্চিতভাবে পতনের দিকে ধাবিত। কেননা এগুলো টিকে থাকার যোগ্যই নয়। উপরন্তু মানব জাতি প্রতিনিয়ত এমন সব অকাট্য প্রমাণের সন্ধান পাচ্ছে, যা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দিকেই টেনে নিয়ে যায় এবং ঈমান ও একত্বের ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

আল্লাহার প্রতিশ্রুতিকে মুসলমান সর্বাবস্থায় বাস্তব সত্যই মনে করে, যদিও কোনো সীমিত প্রজন্মে বা কোনো সীমিত ভূখন্ডে কোনো ছোটখাটো ঘটনা এর বিপরীত ঘটে থাকুক। বস্তুত এসব ঘটনা বাতিল ও অপসৃয়মান। কোনো বিশেষ কারণে পৃথিবীতে সাময়িকভাবে এর আবির্ভাব ঘটতে পারে। সম্ভবত মোমেনদের ঈমান জোরদার করা ও শক্তিশালী করাই এর উদ্দেশ্য, যাতে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়।

মানুষ যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুদের চাপিয়ে দেয়া বহুমুখী ভয়াবহ যুদ্ধবিগ্রহগুলো দেখতে পায়, যা কখনো সশস্ত্র যুদ্ধের আকারে আবার কখনো সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও চাপের আকের সুদীর্ঘকালব্যাপী এ দুনিয়ায় চালু রয়েছে, যার কোনো কোনোটা মোমেনদের ব্যাপক গণহত্যা, নিপীড়ন অথবা বিতাড়নের কারণ হয়েছে এবং যার দরুন কোথাও বা তারা জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে অথবা নানা রকমের নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তখন বিশ্ববাসী হতবাক হয়ে দেখেছে, এতোকিছুর পরও মুসলমানদের অন্তরে ঈমান অটল রয়েছে, সেই ঈমানই তাদের নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করেছে এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে হানাদার জাতিগুলোর মধ্যে বিলীন হওয়া ও তাদের পদানত হওয়া থেকে এই ঈমানই তাদের বাঁচিয়েছে। একমাত্র আকস্মিক আঘাত হানা ব্যতীত আর কোনো উপায়ে হানাদাররা তাদের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি দিলেই যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতির কার্যকরিতা নিজেরাই দেখতে পাবে।

মোটকথা, চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহর প্রতিশ্রুতিই যে বিশ্বজগতে কার্যকর হবে, আল্লাহদ্রোহীরাই যে শোচনীয় পরাজয় বরণ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের বিজয় যে অবধারিত অখন্ডনীয়, সে ব্যাপারে কোনো মোমেনের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ-সংশয় থাকতে পারে না।

মোমেনের কাছে রক্তের চেয়ে আদর্শিক বন্ধনের মূল্য অনেক বেশী

সর্বশেষে আলোচিত হচ্ছে সেই চিরন্তন মূলনীতি, যাকে মোমেনরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকে এবং যা ঈমানের চূড়ান্ত মানদন্ড হিসেবে জনগোষ্ঠীকে দেখবে না আল্লাহার ও তার রসূলের অবাধ্য কোনো ব্যক্তির সাথে প্রীতি ভালোবাসার সম্পর্ক রাখে, এমনকি সে যদি তার মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, ভাই বোন অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনও হয়.........।'

বস্তুত এ হচ্ছে আল্লাহর দল ও শয়তানের দলের মধ্যকার চূড়ান্ত পার্থক্য, এ হচ্ছে সকল বাধা বন্ধন ও সকল আকর্ষণের উর্ধ্বে অবস্থিত একনিষ্ঠ আনুগত্য এবং এটাই হচ্ছে একই আদর্শিক বন্ধনে আবদ্ধ একমাত্র ঈমানী যোগসূত্র।

'তুমি দেখবে না আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো গোষ্ঠীকে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলের অবাধ্য কোনো ব্যক্তির প্রতি প্রীতি ও ভালোবাসা পোষণ করে .....।'

কেননা আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষকে দুটো মন দেননি এবং কোনো মানুষ তার একমাত্র অন্তরে দুটো ভালোবাসা একত্রিত করতে পারে না! একটা ভালোবাসা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের জন্যে এবং অপরটা তাঁদের শত্রুদের জন্যে! সুতরাং অন্তরে হয় ঈমান থাকবে নচেত বে-ঈমানী থাকবে, উভয়টা একই সাথে একত্র থাকতে পারে না।

'যদিও তারা তাদের মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, ভাই বোন বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন হয় .....।'

বস্তুত এসব আত্মীয়তার বন্ধন ঈমান ও কুফরীর শেষ সীমায় গিয়ে ছিন্ন না হয়ে পারে না। এ বন্ধন কেবল ততোক্ষণই বহাল থাকতে পারে যতোক্ষণ আল্লাহর দল ও শয়তানের দলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে না যায়। মোশরেক মাতাপিতার সাথে সন্তানের ভালো সম্পর্ক ততোক্ষণই বহাল থাকবে, যতোক্ষণ আল্লাহর বাহিনী ও শয়তানের বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ না বেধে যায়। এই সমস্ত আত্মীয়তার বন্ধন একই নীতি ও আদর্শের রজ্জুতে আবদ্ধ নয়। তাই এগুলো শত্রুতা ও যুদ্ধের সময় বহাল থাকতে পারে না। এ কারণেই হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) নিজের বাবাকে বদরের ময়দানে হত্যা করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক নিজের ছেলে আবদুর রহমানকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, হযরত মায়াব ইবনে ওমায়র নিজের ভাই ওবায়দ ইবনে ওমায়রকে হত্যা করেছিলেন এবং হযরত ওমর, হামযা, আলী, আবু ওবায়দা ও হারেস নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করেছিলেন। কেননা তারা রক্তের বন্ধন ও আত্মীয়তার বন্ধনের ওপর আদর্শ এবং বিশ্বাসের বন্ধনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আল্লাহর মানদন্ডে এর চেয়ে উত্তম বন্ধন ও মূল্যবোধ আর হতেই পারে না।

'এরাই সেসব লোক, যাদের অন্তকরণে আল্লাহ ঈমান খোদাই করে দিয়েছেন .....।'

অর্থাৎ তাদের অন্তকরণে আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে ঈমান খোদাই করে দিয়েছেন। তাই এ ঈমান কোনো অবস্থায়ই বিলুপ্ত বা টলটলায়মান হতে পারে না।

'আল্লাহ তায়ালা তার নিজের পক্ষ থেকে একটা রূহ দিয়ে তাদের সাহায্য করেছেন।'

আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত রূহ বা আত্মা ছাড়া তাদের পক্ষে এতো দৃঢ়চেতা হওয়া সম্ভব হতো না। এই রূহই তাদের অন্তরকে এমন ঈমানী আলোয় আলোকিত করেছে এবং এমন অমিততেজা শক্তি যুগিয়েছে। এই আত্মাই তাদের প্রকৃত শক্তি ও আলোর উৎসের সাথে সংযুক্ত করেছে।

'আর তিনি তাদের সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে।' দুনিয়ায় তারা যে সকল সম্পর্ক বন্ধন ছিন্ন করতে ও যে সকল পার্থিব স্বার্থ সুবিধা বিসর্জন দিতে পেরেছে, তার প্রতিদান হিসেবেই তাদের এই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

'আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট।'

এ উক্তি থেকে মোমেনদের একটা উজ্জ্বল সন্তোষজনক ও প্রশান্ত ভাবমূর্তি স্পষ্ট হয়ে যায়। তাদের অবস্থান যে কতো উঁচুতে এবং কতো প্রাণ মাতানো পরিবেশে, তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। তাদের প্রতিপালক তাদের ওপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাদের প্রতিপালকের ওপর সন্তুষ্ট। তারা সব কিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং শুধু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজের সযত্ন আশ্রয়ে আশ্রয় দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টির কথা অবহিত করেছেন।

তারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। তাঁর নৈকট্য লাভ করে তাঁর আপনজনে পরিণত হয়েছে। 'তারাই আল্লাহর দল।' বস্তুত তারা আল্লাহরই দল। তাঁরই পতাকাতলে তারা সমবেত। তাঁরই অধিনায়কত্বে চলমান। তাঁরই আদর্শে তারা উজ্জীবিত অনুপ্রাণিত। তাঁরই বিধান বাস্তবায়নে তারা তৎপর। তাঁর যমীনে তাঁরই হুকুম ও ফয়সালা অনুসারে সক্রিয়। তাই তারা হচ্ছে আল্লাহর ফায়সালার একটা অংশবিশেষ।

'জেনে রাখো, আল্লাহর দলই সফলকাম।' কেন সফলকাম হবে না? আল্লাহর মনোনীত বাহিনী যদি সফলকাম না হয় তাহলে আর হবে কে?

এভাবে গোটা মানব জাতি দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহর দল ও শয়তানের দল। হকের বাহিনীও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যে ব্যক্তি শয়তানের দলভুক্ত হবে, সে শয়তানের বাহিনীরও অন্তর্ভুক্ত হবে এবং বাতিলের পতাকার নীচে সমবেত হবে। এ দুটো সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী দল, স্বতন্ত্র দল। এরা কখনো পরস্পরের সাথে মিলিত হতে পারে না।

ইসলামের মোকাবেলায় কোনো আত্মীয়তা, কোনো স্বাদেশিকতা, কোনো জাতীয় এবং কোনো বংশীয় বন্ধনের মূল্য নেই। ইসলামের আদর্শিক বন্ধনই একমাত্র গ্রহণযোগ্য বন্ধন। যারা আল্লাহর দলভুক্ত হবে ও আল্লাহর পতাকার নীচে সমবেত হবে, তারা সবাই ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। তারা সবাই পরস্পরের দ্বীনী ভাই। তা তাদের বর্ণ, দেশ, আত্মীয়তা ও বংশ যতোই ভিন্ন ভিন্ন হোক না কেন। তারা একমাত্র আল্লাহর দল হিসেবে এক পাতাকার নীচে সমবেত হবে। এই এক পতাকার পরিচয় ছাড়া আর সমস্ত পরিচিতি তাদের বিলীন হয়ে যাবে। আর যাদের ওপর শয়তান প্রবল হয় এবং তারা বাতিলের পতাকার নীচে সমবেত হয়, তাদের আল্লাহর দলের সাথে কোনো সম্পর্ক বন্ধন বা মৈত্রী থাকে না। এক দেশ, এক জাতি, এক বর্ণ, এক বংশ, এক ভাষা, এক আত্মীয়তা কোনো কিছুই তাদের একান্ত করতে পারে না। একটি মাত্র ঐক্যের বন্ধন ইসলামের বন্ধনই এই সমস্ত বন্ধনকে একীভূত করতে পারে।

এ আয়াত থেকে যদিও জানা যায় যে, মুসলমানদের দলে রক্ত ও আত্মীয়তার বন্ধনে এবং পার্থিব স্বার্থ ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ একটি গোষ্ঠী ছিলো এবং এ আয়াত তাদের মনমানসিকতাকে সংশোধন করে, ঈমানের মানদন্ডকে চূড়ান্ত ও অকাট্য বন্ধন বলে স্থির করে দেয়, কিন্তু এ আয়াত থেকে মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি দলেরও সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের কাছে দ্বীনী সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক বন্ধনের কোনো গুরুত্ব ছিলো না এবং ঈমানী ও দ্বীনী ভ্রাতৃত্বই তাদের কাছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব বহন করতো।

বন্ধনের আনুগত্যের কারণেই তারা এতো উঁচুস্তরে উন্নীত হতে পেরেছিলো।

সূরার সমাপ্তিতে মোমেনদের এই উৎকৃষ্ট গোষ্ঠীটির বিবরণ দেয়া একান্ত প্রাসংগিক ও সমীচীন হয়েছে। কেননা সূরার শুরুতে ছিলো একজন দরিদ্র মহিলার ঘটনার মধ্য দিয়ে এই উম্মতের প্রতি আল্লাহর অসীম কৃপা ও দয়ার বিবরণ। সেই নগণ্য দরিদ্র মহিলার কথা আল্লাহ শুনেছিলেন, যে স্বয়ং রসূল (স.)-এর সাথে নিজের ও নিজের স্বামীর ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিলো। সুতরাং এ সূরার শেষ কথা এটাই যে, মহান আল্লাহ তার মনোনীত এই উম্মতকে যে মহাজাগতিক ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তা হচ্ছে, তারা যেন তাদের প্রতি মহান আল্লাহর সে কৃপা ও দয়ার কথা না ভুলে সমস্ত পার্থিব স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হয়, আর এই নিবেদিত হওয়ার দাবী হলো, স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া এবং শয়তানের দল ও আল্লাহর দলের পার্থক্য স্মরণ রেখে আল্লাহর দলকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দান।

সূরা আল হাশর

আয়াত ২৪ রুকু ৩

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١ هُوَ

الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ

الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ

اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ

يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى

الْاَبْصَارِ ۝٢ وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ؕ

وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝٣ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তারা সবাই আল্লাহ তায়ালার (পবিত্রতা ও) মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে, আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। ২. তিনি হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি আহলে কেতাবদের মাঝে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে— তাদের প্রথম নির্বাসনের দিনেই তাদের নিজ বাড়িঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন; (অথচ) তোমরা তো (কখনো) কল্পনাও করোনি যে, ওরা (কোনোদিন এ শহর থেকে) বেরিয়ে যাবে (তারা নিজেরাও চিন্তা করেনি), তারা (তো বরং) ভেবেছিলো, তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো তাদের আল্লাহ তায়ালা (-র বাহিনী) থেকে বাঁচিয়ে দেবে, কিন্তু এমন এক দিক থেকে আল্লাহর পাকড়াও এসে তাদের ধরে ফেললো, যা ছিলো তাদের কল্পনার বাইরে, আল্লাহর সে পাকড়াও তাদের অন্তরে প্রচন্ড ভীতির সঞ্চার করলো, ফলে তারা নিজেদের হাত দিয়েই এবং (কিছু কিছু ক্ষেত্রে) মোমেনদের হাত দিয়ে নিজেদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দিলো, অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা, (এসব ঘটনা থেকে) তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। ৩. যদি আল্লাহ তায়ালা ওদের ওপর নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত বসিয়ে না দিতেন, তাহলে (আগের জাতিসমূহের মতো) তিনি তাদের এ দুনিয়ায় (রেখে)-ই কঠোর শাস্তি দিতে পারতেন; (অবশ্য) তাদের জন্যে পরকালে জাহান্নামের আগুন তো (প্রস্তুত) রয়েছেই। ৪. (ওটা) এজন্যেই (রাখা হয়েছে) যে, তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের

وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ

تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ وَمَا

أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ

وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ

الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ

(সুস্পষ্ট) বিরুদ্ধাচরণ করেছিলো, আর যে কেউই আল্লাহর বিরোধিতা করে (তার জানা উচিত), আল্লাহ তায়ালা শাস্তিদানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। ৫. (এ সময়) তোমরা যেসব খেজুর গাছ কেটে ফেলেছো এবং যেগুলো (না কেটে) তার মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো (তা অসংগত ছিলো না, বরং); তা ছিলো সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমেই, (আর আল্লাহ তায়ালা অনুমতি এ কারণেই দিয়েছেন), যেন তিনি এ দ্বারা না-ফরমানদের অপমানিত করতে পারেন। ৬. (এ ঘটনার ফলে) আল্লাহ তায়ালা যেসব ধন সম্পদ তাদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রসূলকে দিয়েছেন (তা ছিলো তাঁরই একান্ত অনুগ্রহ), তোমরা তো এ (গুলো পাওয়া)-র জন্যে কোনো ঘোড়ায় কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ (করে যুদ্ধ) করোনি, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যার ওপর চান তার ওপরই তাঁর রসূলকে কর্তৃত্ব প্রদান করে থাকেন; আর আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ের ওপরই শক্তিমান। ৭. আল্লাহ তায়ালা (ধন সম্পদের) যা কিছু (সেই) জনপদের মানুষদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রসূলকে দিয়েছেন, তা হচ্ছে আল্লাহর জন্যে, রসূলের জন্যে, (রসূলের) আত্মীয় স্বজন, এতীম মেসকীন ও পথচারীদের জন্যে, (সম্পদ তোমরা এমনভাবে বন্টন করবে) যেন তা (কেবল) তোমাদের (সমাজের) বিত্তশালী লোকদের মাঝেই আবর্তিত না হয় এবং (আল্লাহর) রসূল তোমাদের যা কিছু (অনুমতি) দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং সে যা কিছু নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো, আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা। ৮. (এ সম্পদ) সেসব অভাবগ্রস্ত মোহাজেরদের জন্যে, যাদের (আল্লাহর ওপর ঈমানের

أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا

وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ

وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ

صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

خَصَاصَةٌ ۠ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ جَآءُوْا

مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ

وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝١٠

কারণেই) নিজেদের ভিটেমাটি ও সহায় সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে, অথচ এ লোকগুলো আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টিই হাসিল করতে চায়, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সাহায্য সহযোগিতায় তৎপর থাকে; (মূলত) এ লোকগুলোই হচ্ছে সত্যাশ্রয়ী, ৯. (এ সম্পদে তাদেরও অংশ রয়েছে) যারা মোহাজেরদের আগমনের আগ থেকেই এ (জনপদ)-কে (নিজেদের) নিবাস বানিয়েছিলো এবং যারা (এদের আসার) আগেই ঈমান এনেছিলো, তারা ওদের অত্যন্ত ভালোবাসে যারা হিজরত করেছে, (রসূলের পক্ষ থেকে) তাদের (মোহাজের সাথীদের) যা কিছু দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের অন্তরে তার কোনো রকমের প্রয়োজন অনুভব করে না, (শুধু তাই নয়), তারা তাদের (মোহাজের সাথীদের) প্রয়োজনকে সর্বদাই নিজেদের (প্রয়োজনের) ওপর অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদের নিজেদেরও (অনেক) অভাবগ্রস্ততা রয়েছে, (আসলে) যাদের মনের কার্পণ্য (ও সংকীর্ণতা) থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তারাই হচ্ছে সফলকাম, ১০. (সে সম্পদ তাদের জন্যেও,) যারা তাদের (মোহাজের ও আনসারদের) পরে এসেছে, এরা (সব সময়ই) বলে, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের আগে আমাদের যে ভাইয়েরা ঈমান এনেছে তুমি তাদেরও মাফ করে দাও এবং আমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো রকম হিংসা বিদ্বেষ রেখো না, হে আমাদের মালিক, তুমি অনেক মেহেরবান ও পরম দয়ালু।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটা নাযিল হয়েছিলো ৪র্থ হিজরীতে বনু নযীরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বনু নযীর ছিলো একটা ইহুদী গোত্র। বনু নযীরের ঘটনাটা কেন কিভাবে ঘটলো এবং এরপর মুসলমানরা তাদের মোকাবেলায় কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলো এ সূরায় তাঁর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোরআনের বর্ণনাভংগিতেই এ বিষয়গুলোর বিবরণ দেয়া হয়েছে। অতপর ঘটনাবলী ও তার প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানদের গৃহীত ব্যবস্থাবলীর ওপর কোরআনের সেই নির্দিষ্ট ভংগিতে বিস্তারিত পর্যালোচনাও পেশ করা হয়েছে। ঘটনা ও ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশনাগুলো সুন্দর পর্যালোচনার মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের সেই দলটিকে কোরআন এভাবে প্রাণবন্ত প্রশিক্ষণ দিতো।

সূরার মূল আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে আমরা সেই ঘটনার কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরবো, যার প্রসংগে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। এভাবে আমরা এখানে কোরআনের উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবো। দেখতে পাবো, যে ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে এটা নাযিল হয়েছে তার অন্তরালে কী সুদূরপ্রসারী কার্যকারণ সক্রিয় ছিলো। এভাবে ঘটনাবলীর তাৎপর্যের চেয়েও ব্যাপকতর ও প্রশস্ততর পরিমন্ডলে তার বিস্তৃতি কতো দূর তা নিয়ে কোরআনের আলোচনার বিশিষ্ট ধরন ও রীতি আমরা হৃদয়ংগম করতে পারবো।

বনু নযীরের ঘটনাটা চতুর্থ হিজরী সনে ওহুদ যুদ্ধের পরে ও খন্দক যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায়, একদিন রসূল (স.) হযরত আবু বকর, ওমর ও আলী (রা.)-সহ দশ জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে বনু নযীরের পল্লীতে গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাদের অনুরোধ করেন যে, তাঁর মদীনায় আগমনের সূচনাতে তাঁর সাথে বনু নযীরের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো, সে অনুসারে তারা যেন নিহত ব্যক্তিদের দিয়াতে (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) অংশগ্রহণ করে। বনু নযীর রসূল (স.)-এর আগমনকে বাহ্যত স্বাগত জানায় এবং তাদের ওপর যে দায়দায়িত্ব বর্তে তা পালনের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু এর পাশাপাশি তারা গোপনে রসূল (স.) ও তাঁর সাথীদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটে। তিনি যখন তাদের একজনের বাড়ীর প্রাচীরের পাশে বসে ছিলেন, তখন তারা পরস্পরকে বলে, এই ব্যক্তিকে তোমরা এমন সুবিধাজনক অবস্থায় আর কখনো পাবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ এই প্রাচীর সন্নিহিত বাড়ীটির ছাড়ের ওপর ওঠে গিয়ে ওর ওপর বড়ো এক পাথর ছুঁড়ে মারুক এবং আমাদের তার কবল থেকে রেহাই দিক। আমর বিন জাহশ এই দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং বললো, হাঁ, এ কাজটা আমি করবো। তারপর সে ছাদের ওপর চড়াও হলো, যাতে রসূল (স.)-এর ওপর বিশাল একটা পাথর ফেলে দিতে পারে। ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্রের বিষয়টি তৎক্ষণাত রসূল (স.)-কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হলো। সংগে সংগে তিনি একটা জরুরী কাজ সেরে আসার ভান করে স্থান ত্যাগ করলেন। তিনি তাঁর সাথীদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। এদিকে তাঁর ফিরতে অনেক দেরী হচ্ছে বলে সাথীরাও তাঁর সন্ধানে ইহুদী পল্লী থেকে বেরিয়ে গেলেন। পরে তারা জানতে পারলো যে, রসূল (স.) মদীনায় প্রবেশ করেছেন।

বনী নযীরের বিশ্বাসঘাতকতা ও মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভংগের বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পর রসূল (স.) বনু নযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। ইতিপূর্বে বনু নযীরের নেতা কাব ইবনে আশরাফ রসূল (স.)-কে নিন্দা করে এবং তাঁকে হত্যা করার জন্যে তার শত্রুদের উস্কানি দিয়ে কবিতা লিখেছিলো। তাছাড়া একথাও লোক মুখে প্রচারিত হয়েছিলো যে, রসূল (স.)-এর সাথে বনু নযীরের পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতার চুক্তি থাকা সত্ত্বেও বনু নযীরের লোকেরা দলে দলে গিয়ে কোরায়শ কাফেরদের সাথে যোগাযোগ ও সলাপরামর্শ করছে। রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা ও গাঁটছড়া বাঁধাই ছিলো এই যোগাযোগের উদ্দেশ্য। এসব কারণে রসূল (স.) মোহাম্মদ বিন মাসলামাকে অনুমতি দিলেন কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার, অনুমতি পেয়ে মোহাম্মদ বিন মাসলামা তাকে হত্যা করে ফেললেন।

বনু নযীরের মহল্লায় যখন রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো, তখন তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা ছাড়া রসূল (স.)-এর আর কোনো উপায়ান্তর থাকলো না। কেননা ইসলামের একটা মূলনীতি হলো, 'কোনো দলের পক্ষ থেকে যদি তুমি বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা করো, তাহলে চুক্তিটা তাদের ওপর একইভাবে ছুঁড়ে মারো। আল্লাহ তায়ালা বিশ্বাসঘাতকদের ভালোবাসেন না।' (সূরা তাওবা)

রসূল (স.) যথারীতি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বনু নযীরের মহল্লা অবরোধ করলেন। তাদের তিনি তিন দিনের– মতান্তরে দশ দিনের চরম পত্র দিলেন যেন এই সময়ের মধ্যে তারা তাদের মহল্লা ছেড়ে চলে যায়। তিনি তাদেরকে তাদের অস্থাবর সম্পত্তি সাথে নিয়ে যাওয়া এবং ক্ষেতখামার ও বাগানগুলোর দেখাশুনার জন্যে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, কিন্তু মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল তাদের কাছে দূত পাঠিয়ে প্ররোচনা দিলো যেন তারা রসূলের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে তাকে প্রতিরোধ করে। সে তাদের আশ্বাস দিলো যে, তোমরা অবিচল অনড় থাকো। আমরা তোমাদের কখনো অসহায় ছেড়ে দেবো না। তোমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলে আমরা তোমাদের পক্ষে লড়বো, আর তোমাদের বহিষ্কার করা হলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসংগে বলেন,

‘তুমি কি দেখোনি, মোনাফেকরা তাদের আহলে কেতাব কাফের ভাইদের বলে যে, তোমাদের যদি বের করে দেয়া হয় তবে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের ব্যাপারে আর কারো হুকুম মানবো না, আর যদি তোমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয় তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। অথচ আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। আহলে কেতাব গোষ্ঠীকে যদি বের করে দেয়া হয়, তবে মোনাফেকরা তাদের সাথে মদীনা থেকে বেরিয়ে যাবে না। আহলে কেতাব গোষ্ঠীকে যদি যুদ্ধ করতে হয় তবে তাদেরকে মোনাফেকরা সাহায্যও করবে না। আর যদি সাহায্য করে তাহলেও আহলে কেতাব গোষ্ঠী পরাভব মেনে নিয়ে পালিয়ে যাবে। এরপর তারা আর কোনো সাহায্য পাবে না। তাদের মনে আল্লাহর চেয়েও তোমাদের ভয় অধিক প্রবল। কেননা তারা একটা নির্বোধ জাতি।’

এরপর ইহুদীরা দুর্গের ভেতরে আশ্রয় নিলো। ফলে রসূল (স.) তাদের খেজুর বাগান কেটে ফেলতে ও জ্বালিয়ে দিতে মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন। তা দেখে আহলে কেতাব গোষ্ঠী বললো, হে মোহাম্মদ, আপনি তো অরাজকতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করতেন এবং অরাজকতা সৃষ্টিকারীর নিন্দা করতেন। এখন এই যে খেজুর বাগান কেটে ফেলা হচ্ছে ও জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে, এটা কেমন ব্যাপার? তাদের এই প্রশ্নের জবাবেই সূরা হাশরের আয়াত নাযিল হলো, ‘তোমরা যদি কোনো গাছ কেটে থাকো অথবা তাকে তার মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়ে থাকো, তবে সেটা আল্লাহর হুকুমেই করেছো, যাতে তিনি পাপিষ্ঠদের লাঞ্ছিত করতে পারেন।’

অবরোধ যখন একটানা ছাব্বিশ দিন পর্যন্ত গড়ালো, তখন ইহুদীরা নিশ্চিত হলো যে, মোনাফেকদের প্রতিশ্রুতি কার্যকরি হবার কোনো আশা নেই। এ সময় আল্লাহ তায়ালাও তাদের মনে আতংকের সৃষ্টি করে দিলেন। তাই তারা রসূল (স.)-এর কাছে প্রার্থনা জানালো যেন তিনি রক্তপাত না করে তাদের বিতাড়িত করেন, যেমন ইতিপূর্বে অপর ইহুদী গোষ্ঠী বনু কায়নুকা'কে করেছেন (এর কারণ ও পটভূমি সূরা আহযাবে বর্ণিত হয়েছে)। তারা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিলো যে, তাদের উট যে পরিমাণ বইতে পারবে কেবল সেই পরিমাণ মালপত্রই তারা নেবে। কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেবে না। রসূল (স.) তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তারা উটের বহনযোগ্য পরিমাণ মালপত্র নিয়ে চলে গেলো। কেউ কেউ দরজার চৌকাঠসহ গোটা ঘর ভেংগে উটের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে গেলো। কেউ নিজের ঘর এমনভাবে বিধ্বস্ত করে গেলো, যাতে মুসলমানরা তা ব্যবহার করতে না পারে। অবরোধ চলাকালে যেসব প্রাচীর আত্মরক্ষার কাজে লাগানো হয়েছিলো, তার কোনো কোনো প্রাচীর মুসলমানরা পরে ভেংগে গুঁড়িয়ে দেয়।

আল্লাহ তায়ালা এ সূরার ২, ৩ ও ৪ নং আয়াতে এ প্রসংগটি আলোচনা করেছেন। মদীনা থেকে বহিষ্কৃত এই বনু নযীর ইহুদী গোত্রের কেউ সিরিয়ায় কেউ বা খায়বরে চলে যায়। খায়বরে গমনকারীদের মধ্যে নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি ছিলো সালাম বিন আবিল হাকীক, কেনানা ইবনুর রবী বিন আবিল হাকীক এবং হুওয়াই বিন আখতাব। পরবর্তীকালে আহযাব যুদ্ধ ও বনু কোরায়যার ঘটনায় মক্কার মোশরেকদের মুসলমানদের ওপর হামলা করতে উস্কে দেয়া (সূরা আহযাব দ্রষ্টব্য) এবং খায়বরে যুদ্ধ বাধানোতে (সূরা আল-ফাতাহ দ্রষ্টব্য) এসব লোকের ভূমিকা ছিলো। বনু নযীরের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের সম্পত্তি হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। মুসলমানদের ঘোড়া বা উট ব্যবহার করে যুদ্ধ করে এগুলো জয় করতে হয়নি। এগুলো রসূল (স.) কেবল মোহাজেরদের মধ্যেই বন্টন করেন। আনসারদের মধ্যে দু'জন দরিদ্রতম ব্যক্তি সাহল বিন হানিফ ও আবু দুজানা সাম্মাক বিন খারশাকে ছাড়া আর কাউকে এর অংশ দেয়া হয়নি। কারণ মোহাজেররা মক্কায় তাদের যাবতীয় সহায় সম্পদ ত্যাগ করে চলে এসেছিলো শুধু ঈমান রক্ষার তাগিদে, আর আনসাররা তাদের ঘরবাড়ী ও জমিজমায় মোহাজের ভাগ দিয়ে নযীরবিহীন ত্যাগ ও আন্তরিক ভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার পর রসূল (স.) মুসলিম সমাজে স্বাভাবিক পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠায় ত্বরিত পদক্ষেপ নিলেন, যাতে দরিদ্র লোকদের হাতে নিজস্ব সম্পত্তি থাকে এবং যাবতীয় ধন সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে না যায়। আনসারদের মধ্যে কেবল দু'জন দরিদ্র ব্যক্তিকেই তিনি এর ভাগ দিয়েছিলেন। বনু নযীরের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভাটবাটোয়ারা নিয়ে কেউ কেউ বিতর্ক তুলেছিলো। প্রসিদ্ধ মতানুসারে এই লোকটি ছিলো মোনাফেক। এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা এই সূরায় বলেন,

'আল্লাহ তায়ালা যে সম্পত্তি তার রসূলকে দিয়েছেন, তা অর্জন করতে তোমরা উট ও ঘোড়া ছুটাওনি, তবে আল্লাহ তার রসূলকে যার ওপর বিজয়ী করতে চান করতে পারেন, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।' রসূল (স.) আনসারদের বললেন, তোমরা যদি চাও, তোমাদের সম্পত্তি ও ঘরবাড়ীর একাংশ মোহাজেরদের বন্টন করে দিতে পারো, আর এই গনিমতে তোমরা তাদের সাথে অংশীদার হতে পারো। আর যদি চাও তোমাদের সম্পত্তি ও ঘরবাড়ী পুরোপুরি তোমাদেরই থাক এবং গনিমতের কোনো অংশ তোমাদের মধ্যে বন্টন করা হবে না। আনসাররা বললেন, বরং আমরা আমাদের সম্পত্তি ও ঘরবাড়ীর অংশও তাদের দেবো এবং গনিমতেও তাদের অগ্রাধিকার দেবো, তাদের সাথে আমরা শরীক হবো না।

এ হচ্ছে সেই ঘটনা যার প্রেক্ষাপটে এ সূরা নাযিল হয়েছে। সমগ্র সূরাই এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত মুসলমানদের সম্বোধন করে সূরার শেষাংশে কিছু বক্তব্য রাখা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনার পর্যালোচনা করে প্রশিক্ষণ ও চরিত্র গঠনমূলক মন্তব্য করা এবং এ ঘটনাবলীকে তার মৌলিক তত্ত্ব ও নীতিসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কোরআনের যে ঐতিহ্যবাহী রীতি রয়েছে, সূরার শেষভাগের বক্তব্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। সূরার একেবারে শেষাংশে মহান আল্লাহর এমন কিছু গুণাবলীর বিবরণ দেয়া হয়েছে, যার কার্যকর প্রভাব এই সৃষ্টিজগতে সর্বক্ষণ বিদ্যমান। এ গুণাবলীর প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি করার ওপরই সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টি সম্বলিত, বোধগম্য ও বিবেকসম্মত ঈমানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ গুণাবলী হচ্ছে সেই আল্লাহর, যিনি এই কোরআন দ্বারা ঈমানদারদের সম্বোধন করেন ও তার দিকে আহবান করেন। সূরাটার সূচনা ও সমাপ্তি দুটোই ঘটেছে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসের সর্বময় অধিপতি মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর তাসবীহ তথা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার মধ্য

দিয়ে। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সূরার প্রথমাংশ ও শেষাংশ তার আলোচিত বিষয়ের সাথে এবং তাকওয়া, একাগ্রতা, আনুগত্য ও মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহর বিশ্ব ব্যবস্থাপনা নিয়ে চিন্তা গবেষণার আহবানের সাথে পরিপূর্ণভাবে সমন্বয়যুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এবার আসুন, আমরা কোরআনের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করি এবং দেখি, কিভাবে কোরআন ঘটনাবলীকে চিত্রিত করে ও এই ঘটনাবলী দ্বারা কিভাবে তা ব্যক্তির মনমানস গঠন করে।

তাফসীর

আয়াত ১-১০

'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সকলেই আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহা পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী।' (আয়াত-১)

অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান প্রতিটি জিনিস কর্তৃক আল্লাহর মহিমা ঘোষণা এবং পবিত্রতা ও প্রশংসা করার এই শাশ্বত সত্যটি দিয়েই এ সূরার উদ্বোধন করা হচ্ছে। এ সূরা আল্লাহর বিদ্রোহী ইহুদীদের তাদের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করার কাহিনী বর্ণনা করেছে। আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদের বিতাড়িত করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা গুণ বর্ণনাকারী ও তাঁর পবিত্র নামসমূহ দ্বারা তাঁর মহিমা ঘোষণাকারী মোমেনদের হাতে তাদের বসতবাড়ীর মালিকানা সমর্পণ করেছেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী। অর্থাৎ তনি নিজের প্রিয় বান্দাদের সাহায্য করা ও শত্রুদের ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখেন এবং নিজের যাবতীয় পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় তিনি বিজ্ঞানময়, প্রাজ্ঞ।

ইহুদীদের দেশ থেকে বহিষ্কারের দৃষ্টান্ত

পরবর্তী আয়াত থেকেই শুরু হয়েছে সেই ঘটনার বিবরণ। যার প্রেক্ষাপটে এ সূরা নাযিল হয়েছে। বলা হচ্ছে, তিনি সেই সত্তা, যিনি কাফের আহলে কেতাব গোষ্ঠীকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে প্রথমবারেই একেক করে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করোনি যে, তারা বের হবে। তারা বরং ভেবেছিলো যে, তাদেরকে তাদের দুর্গগুলো আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে, কিন্তু আল্লাহর শাস্তি তাদের ওপর এমনভাবে এসে পড়লো যে, তারা কল্পনাও করেনি, আর আল্লাহ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। আর আল্লাহ যদি তাদের জন্যে নির্বাসন দন্ড লিখে না দিতেন, তবে তিনি দুনিয়াতেই কঠোর শাস্তি দিতেন; আর পরকালে তাদের জন্যে আগুনের শাস্তি তো রয়েছেই। এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহ ও তার রসূলের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করেছিলো। আর যে কেউ আল্লার বিরুদ্ধাচরণ করে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা।' (আয়াত ২, ৩ ও ৪)

এ আয়াতগুলো থেকে আমরা জানতে পারি, আহলে কেতাব গোষ্ঠীকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে প্রথম বার একত্রে বহিষ্কার করেছিলেন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং। যদিও সব কাজ আল্লাহই করে থাকেন, কিন্তু এখানে কথা এমনভাবে বলা হয়েছে যে, বিষয়টিকে প্রত্যক্ষভাবেই আল্লাহর কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ থেকে অনুভূত হয় যে, আল্লাহ তাদের বহিষ্কার করার ক্ষমতা মানুষের কাজের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করার পরিবর্তে সরাসরি নিজেই করেছেন এবং বহিষ্কৃতদের এমন ভূখন্ডে নিয়ে গেছেন, যেখানে থেকে তারা আর পূর্ববর্তী নিবাসে ফিরে আসবে না।

আয়াতের নিম্নোক্ত অংশ দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাচ্ছে যে, তাদের বহিষ্কার ও বিতাড়নের কাজটি আল্লাহ তাযঅলা প্রত্যক্ষভাবেই করেছিলেন।

'তোমরা ধারণাও করোনি যে, তারা বের হবে। তারা বরং ভেবেছিলো, তাদেরকে তাদের দুর্গগুলো আল্লাহ তায়ালা থেকে রক্ষা করবে।'

অর্থাৎ তোমরাও আশা করতে পারোনি যে, তারা বের হয়ে যাবে, আর তারাও মেনে নিতে পারছিলো না যে, ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই ঘটবে। কেননা তারা তাদের দুর্গে এতোটাই শক্তিশালী ও নিরাপদ ছিলো যে, তোমরা তাদের বহিষ্কার করতে পারবে, সে আশা অবশ্যই করতে পারোনি, আর এই নিরাপদ অবস্থান তাদের এতোটা গর্বিত করেছিলো যে, তারা আল্লাহর দোর্দণ্ড শক্তিকে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলো। আল্লাহর সে শক্তিকে কোনো দুর্গই যে হার মানাতে পারে না, তা তাদের মনেই ছিলো না।

'কিন্তু আল্লাহর শাস্তি তাদের ওপর এমনভাবে এসে পড়লো যে, তারা কল্পনাও করতে পারেনি, আর আল্লাহ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন।'

অর্থাৎ শাস্তিটা দুর্গের ভেতর থেকে নয় বরং তাদের মনের ভেতর থেকে এসেছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করলেন। তাই তারা নিজ হতেই তাদের দুর্গ খুলে দিলো। আল্লাহ তায়ালা তাদের দেখিয়ে দিলেন যে, তাদের নিজেদের ওপরই তারা কোনো নিয়ন্ত্রণ রাখে না, নিজেদের মনকেই তারা বশে রাখতে পারে না এবং নিজেদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা মোতাবেক আল্লাহর কাছ থেকেও তারা নিরাপদ থাকতে পারে না। তাদের দুর্গ ও ভবনসমূহের নিরপত্তার তো প্রশ্নই ওঠে না। তারা সবদিক থেকেই নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিয়েছিলো, কিন্তু তাদের নিজেদের ভেতর থেকে কোনো আক্রমণ আসবে তা তারা ভাবতেও পারেনি। আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন তা এ রকমই ঘটে। যে দিক মানুষের জানা থাকে ও ক্ষমতার আওতাধীন থাকে, সেদিক থেকেই ঘটনা ঘটে। তিনি তো সবই জানেন এবং তিনি সর্বশক্তিমান। সুতরাং মানুষের জানা ও তাদের ক্ষমতাধীন হওয়ার জন্যে কোনো কারণ বা উপলক্ষের প্রয়োজন হয় না। কারণ সব সময়ই সেখানে উপস্থিত থাকে এবং উপলক্ষ সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। কারণ বা ফলাফল সবই আল্লাহর সৃষ্টি। উপলক্ষ এবং পরিণতিও তাঁরই সৃষ্টি। কোর কারণ বা ফলাফলই আল্লাহর নাগালের বাইরে নয় বা সাধ্যাতীত নয়। তিনি মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী।

আহলে কেতাব কাফেরদের যে গোষ্ঠীটি তাদের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলো, তাদের কাছে আল্লাহর শাস্তি এমনভাবে এসেছিলো যে, তারা ভাবতেও পারেনি। আল্লাহ তায়ালা তাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। তারা তাদের দুর্গে ও ভবনে আশ্রয় নিয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজেদের ও মোমেনদের হাত দিয়ে সেসব দুর্গ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

এখানেই ইহুদী বনু নযীর গোত্রের ঘটনার সমাপ্তি ঘটে। তাদের দুর্গ তাদের নিজেদের কর্মকান্ডের কারণেই ধ্বংস হয়, তারপর তা তাদের নিজ নিজ হাতে ও মুসলমানদের হাতে বিধ্বস্ত হয়। এখানে ঘটনাটির ওপর সর্বপ্রথম এই বলে মন্তব্য করা হয়,

'অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।'

মন্তব্যটি নিসন্দেহে উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত স্থানে করা হয়েছে, বিশেষ করে যখন শ্রোতাদের মন যথার্থই শিক্ষা গ্রহণের জন্যে তখন প্রস্তুত ছিলো।

পরবর্তী আয়াতে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের নির্বাসনে পাঠিয়ে পার্থিব শাস্তি থেকে রেহাই দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেননি; বরং এ শাস্তি না দিলেও তাদের অন্য কোনো পার্থিব শাস্তি তিনি অবশ্যই দিতেন, উপরন্তু আখেরাতের শাস্তি তো রয়েছেই।

'আল্লাহ তায়ালা যদি তাদের জন্যে নির্বাসন স্থির না করতেন, তাহলেও তাদের দুনিয়ায় শাস্তি দিতেন, উপরন্তু তাদের জন্যে আখেরাতে রয়েছে দোযখের শাস্তি।'

অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের জন্যে শাস্তি অবধারিত ছিলো। যেভাবে হয়েছে সেভাবে হোক অথবা অন্যভাবে হোক। আল্লাহ তায়ালা যদি তাদের নির্বাসনের শাস্তি না দিতেন, তবে তিনি তাদের অন্য কোনো শাস্তি দিতেন, আর আখেরাতের দোযখের শাস্তি তো পৃথকভাবে নির্দিষ্ট রয়েছেই। মোটকথা, যে কোনো ভাবেই হোক, পার্থিব শাস্তি তাদের জন্যে অনিবার্য ও অবধারিত ছিলো। 'এ শাস্তির কারণ এই যে, তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলো, আর যে কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা।

আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থই হলো আল্লাহর পথ ছেড়ে অন্য পথে চলা। আর আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ তায়ালা তাদের আযাবের যোগ্য হওয়ার এই কারণ জানিয়েছেন যে, আল্লাহর রসূলের পথই আল্লাহর পথ এবং সেই পথ ত্যাগ করাই তাদের আযাবের কারণ। এজন্যেই শেষাংশে আল্লাহ তায়ালা শুধু তাঁর বিরুদ্ধাচরণের কথা বলেই ক্ষান্ত থেকেছেন। কেননা রসূলের বিরুদ্ধাচরণও এর অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা হয়ে তারই সামনে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা জঘন্য ধরনের ধৃষ্টতার নামান্তর, তাই এটা একটা বিপজ্জনক ও ভয়ংকর কাজ। যে নগণ্য তুচ্ছ সৃষ্টি মহান স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণের ধৃষ্টতা দেখায়, সে যে আল্লাহর আযাব ও গযবের শিকার হবে তা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। কেননা তিনি কঠিন শাস্তিদাতা।

এভাবে সর্বযুগের ও সকল জায়গার আল্লাহদ্রোহীদের ভয়ংকর পরিণতির বিষয়টি ইহুদী গোত্র বনু নযীরের অপরাধ ও তার শাস্তির বিচরণের মধ্য দিয়ে অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ ইহুদী গোত্র বনু নযীরকে চার বার 'কাফের আহলে কেতাব' নামে আখ্যায়িত করেছেন। এটা একটা সত্য ঘটনাও বটে। কেননা আল্লাহর দ্বীন যখন মোহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে পূর্ণাংগ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অবয়বে উপস্থাপিত হয়েছে, তখন তারা এটা প্রত্যাখ্যান করেছে। অথচ তারা এর প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষায় ছিলো। তাই তাদের বার বার কাফের আহলে কেতাব নামে আখ্যায়িত করে তাদেরকে অপমানিত ও ধিকৃত করা হয়েছে। সেই সাথে মুসলমানরা ইহুদীদের সাথে যে কঠোর আচরণ করেছে এবং তাদের হাত দিয়ে তাদের যে শাস্তি দিয়েছে, সে ব্যাপারে মুসলমানদের মনকে আশ্বস্ত করা হয়েছে, তারা কোনো অন্যায় করেনি। এ কথাটা স্পষ্ট করে বলে দেয়াই এখানে উদ্দেশ্য।

পরবর্তী আয়াতে মুসলমানদের আরো আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী এই ইহুদীদের খেজুর বাগানের কিছু গাছ নষ্ট করে তারা সঠিক কাজই করেছে। আসলে কিছু কিছু মুসলমানদের মনে এ ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় ছিলো,

'কোনো খেজুর গাছ যদি তোমরা কেটে থাকো বা বহাল রেখে থাকো, তবে সেটা আল্লাহর হুকুমেই করেছো এবং আল্লাহর অবাধ্য লোকদের লাঞ্ছিত করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য।' মূলত আয়াতের 'লীনাতুন' শব্দটি দ্বারা তৎকালের আরবে সুপরিচিত উত্তম মানের খেজুর গাছ বুঝানো হয়েছে। মুসলমানরা ইহুদীদের খেজুর বাগানের কিছু কিছু খেজুর গাছ কেটে ফেলেছিলো এবং কিছু কিছু তারা বহাল রেখেছিলো। এতে তাদের কিছু লোকের মনে আপত্তি ও সংশয় দেখা দিয়েছিলো। কেননা এই ঘটনার আগে পরে যে কোনো ধরনের জ্বালানো পোড়ানো ও নাশকতার কাজ মুসলমানদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিলো। এ জন্যে এই ব্যতিক্রমী কাজটির ব্যাপারে মুসলমানদের মনকে আশ্বস্ত করার জন্যে বিশেষ ধরনের বাচনভংগির প্রয়োজন ছিলো। তাই এখানে বলা হয়েছে, কিছু গাছ কাটা ও কিছু গাছ না কাটা দুটোই আল্লাহর হুকুমে ও অনুমতিতে হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এ ঘটনাটা ঘটানোর দায়িত্ব সরাসরি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। তাই এখানে তিনি যা ইচ্ছা করেছেন সেটাই বাস্তবায়িত হয়েছে। পুরো ঘটনাটাই আল্লাহর মর্জি অনুসারে সম্পাদিত

হয়েছে। এ দ্বারা তিনি পাপিষ্ঠদের অপমানিত করতে চেয়েছেন। গাছ কাটা এজন্যে অপমানজনক যে, তা কাটা দেখে তাদের অন্তরে আক্ষেপ ও দুঃখ জন্মেছে। আর গাছগুলো কাটা হয়নি, তাও ছেড়ে যেতে হবে ভেবে অন্তর্জ্বালার সৃষ্টি হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা একই।

এভাবে মুসলমানদের মনের সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয়েছে এবং তারা এ কথা বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হয়েছে যে, যা কিছু হয়েছে, সব আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়েছে এবং আল্লাহই তা করেছেন। তিনি যা চান তাই করেন। তারা কেবল আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হয়েছে।

বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের ব্যাপারে শরিয়তের বিধান

এ ঘটনা ও অনুরূপ অন্যান্য ঘটনার মাঝ দিয়ে মহান আল্লাহ তার রসূলকে যে সম্পত্তির মালিকানা অর্পণ করেছেন, যে সম্পত্তি অর্জন করতে মুসলমানদের কোনো যুদ্ধ করতে হয়নি, কোনো আক্রমণও চালাতে হয়নি, অর্থাৎ যেসব ঘটনায় প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্যভাবে কোনো মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়াও আল্লাহর হাতকে সরাসির সক্রিয় দেখা গেছে, সে বিষয়েই সূরার এই দ্বিতীয় পর্বটির আলোচনা কেন্দ্রীভূত। (আয়াত ৬-১০)

এই সম্পত্তি ও অনুরূপ অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালা সম্বলিত এই আয়াতগুলো একই সাথে তৎকালীন মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা যেমন বর্ণনা করছে, তেমনি সর্বকালের মুসলিম উম্মাহর চিরন্তন স্বভাব ও মেযাজ এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলোরও বিবরণ দিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা কালগত ব্যবধান সত্তেও পরস্পরের সাথে একাত্ম হয়, পৃথিবীর সকল অঞ্চলের ও সকল যুগের সকল প্রজন্ম পরস্পরের সাথে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং কখনো কোনো প্রজন্ম অপর প্রজন্ম থেকে, কোনো জাতি অপর জাতি থেকে, কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। এটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

'আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে যে সম্পত্তির মালিকানা অর্পণ করেছেন, তার ওপর তোমরা কোনো ঘোড়া উট দাবড়াওনি, তবে আল্লাহ তায়ালা তার রসূলদের যার ওপর উচ্ছা করেন বিজয়ী করেন। আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।'

এ আয়াতটিতে যে 'আওজাফতুম' কথাটা রয়েছে, তার মূল হচ্ছে 'ইজাফ', এর অর্থ ঘোড়া বা উট ইত্যাদি দ্রুত দাবড়ানো বা হাঁকানো, আর 'রেকাব' অর্থ উট। আয়াতটি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, যে সম্পত্তি ইহুদী গোত্র বনু নযীর রেখে গেছে, মুসলমানরা তা ঘোড়া বা উট দাবড়িয়ে অর্থাৎ যুদ্ধ করে জয় করেনি। সুতরাং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) থেকে যেভাবে আল্লাহর সাথে মুসলমান যোদ্ধাদের জন্যে চার পঞ্চমাংশ এবং আল্লাহর সাথে তাঁর রসূল, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মেসকীন ও পথিকদের জন্যে মাত্র এক পঞ্চমাংশ বরাদ্দ করেছেন, যেমন বদর যুদ্ধের গনীমত তিনি বরাদ্দ করেছেন, এক্ষেত্রে সেভাবে বরাদ্দ করেননি। এ সম্পত্তি সম্পর্কে আল্লাহর বিধান হলো, এর সমগ্রটাই আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মেসকীন ও পথিকদের জন্যে নির্দিষ্ট। রসূল (স.) স্বয়ং এ সম্পত্তি এই খাতগুলোর মধ্যে যেমন ইচ্ছা ব্যয় করার ক্ষমতা ভোগ করেন। এখানে যে আত্মীয়-স্বজনের কথা উল্লেখ রয়েছে, তারা হলো রসূলের আত্মীয় স্বজন। তাদের জন্যে সদকা হালাল না হয়, অন্যদিকে তারা তার সম্পত্তির কোনো ভাগও পাচ্ছে না; অথচ তাদের ভেতর কপর্দকহীন দরিদ্ররাও রয়েছে। তাই তাদের জন্যে গনীমতের এক পঞ্চমাংশ থেকে একটা অংশও এই সম্পত্তি (ফায়) থেকে বরাদ্দ করেছেন। এছাড়া অন্যান্য শ্রেণী ও ব্যয়ের খাত সংক্রান্ত বিধান সুবিদিত। রসূল (স.)-ই এ ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। (১)

---

(১) রসূলের আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। শুধু দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনই এ সম্পত্তির অংশ পাওয়ার অধিকারী না সবাই, তা নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। যে মতটি অগ্রগণ্য তা হলো, সব আত্মীয়-স্বজনই অংশ পাওয়ার অধিকারী।

এ আয়াতগুলোতে ফায় অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে দখলীকৃত সম্পত্তি সম্পর্কে শরীয়তের বিধান বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু শুধু বিধান ও তার বিশেষ কারণ বলেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং অন্য একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদের যার ওপর ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন।' অর্থাৎ এই 'ফায়' আল্লাহ নির্ধারিত তকদীরের ফায়সালার অন্তর্ভুক্ত, আর নবীরা হচ্ছেন এই ফয়সালারই একটা পক্ষ। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের যখন যার ওপর বিজয়ী করতে চান বিজয় দান করেন। কোন মানবীয় চেষ্টা সাধনা, সাহায্য বা যুদ্ধ বিগ্রহের প্রয়োজন হয় না। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

এ বক্তব্য দ্বারা নবীদের সম্পর্ককে সরাসরি আল্লাহর তাকদীর সংক্রান্ত ফায়সালার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। অদৃষ্টের এ ঘূর্ণায়মান চাকার ভেতরেই তাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, তারা যদিও মানুষ, তথাপি আল্লাহর ফয়সালা বাস্তবায়নে তাদের বিশেষ ভূমিকা নির্দিষ্টি রয়েছে। সে ভূমিকা তারা আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি ও পরিকল্পনা অনুসারেই পালন করে থাকেন। নিজেদের প্রবৃত্তির খেয়াল খুশি অনুসারে তারা কোনো কাজ করেন না। নিজেদের ইচ্ছা বা পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা কোনো কিছু গ্রহণও করেন না। কোনো কিছু বর্জনও করেন না। তারা যখন কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ নেন অথবা শান্তি ও সন্ধি চুক্তি করেন, তা সবই করেন আল্লাহর ফয়সালার কোনো না কোনো অংশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই এবং তা এই পৃথিবীতে তাদের তৎপরতা ও আন্দোলনের সাথেই সম্পৃক্ত থাকে। সেসব তৎপরকার নেপথ্য প্রকৃত কার্য সম্পাদনকারী হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং। ...... বস্তুত তিনি সব কিছুর ওপরই ক্ষমতাবান।

'আর আল্লাহ তাঁর রসূলকে যে সম্পত্তি দান করেন, তা আল্লাহর রসূলের, তাঁর আত্মীয় স্বজন, এতিম, মেসকীন ও পথিকদের জন্যে। সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীকদের মধ্যে ঘূর্ণায়মান না থেকে যায়। রসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কঠিন শাস্তিদাতা।'

সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ ইসলামী অর্থনীতিরই মূলনীতি

আমি ইতিপূর্বে যে বিধানের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি, এ আয়াতে সেই বিধানটিই বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই বন্টনের যুক্তি আলোচনা করার মাধ্যমে ইসলামী সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক একটা মৌলিক বিধান তুলে ধরা হয়েছে– 'যেন ধন সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।' অনুরূপ ইসলামী রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইনেরও একটা মৌল বিধান এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে, 'রসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।' যদিও এ দুটো বিধান এখানে এই 'ফায়' এর সম্পত্তি ও তার বন্টন প্রসংগে এসেছে, কিন্তু এটা এই সুনির্দিষ্ট ঘটনা অতিক্রম করে ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত পরিসর পর্যন্ত নিজ ভূমিকা পালন করে।

প্রথম মূলনীতিটা অর্থনৈতিক বন্টন ব্যবস্থা সংক্রান্ত। মূলনীতিটাতে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদী দর্শনের একটা বিরাট অংশ নিহিত রয়েছে। এই দর্শনে ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তবে তা একটি মৌলিক নীতিমালা দ্বারা সীমিত। সে নীতিমালা হচ্ছে এই যে, সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যে ঘূর্ণায়মান থাকতে পারবে না এবং দরিদ্রদের মধ্যে তার আবর্তন বন্ধ করা চলবে না। যে সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হয়, সে সমাজ ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপন্থী এবং তা গোটা সামাজিক বিন্যাসের লক্ষ্যেরও বিপরীত। ইসলামী সমাজের যাবতীয় সংযোগ-সম্পর্ক ও লেনদেন এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যেন তাতে এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, আর সৃষ্টি হলেও যেন তা বহাল না থাকে।

ইসলাম তার সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে কার্যত এই মূলনীতির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। এজন্যেই সে যাকাত ফরয করেছে এবং নগদ টাকার বার্ষিক শতকরা আড়াই ভাগ তার হার ধার্য করেছে। আর অন্য যাবতীয় আয় থেকে ধার্য করেছে দশ ভাগ অথবা পাঁচ ভাগ। এরই অনুরূপ হার ধার্য করেছে পশু সম্পদেও, আর খনিজ সম্পদেও প্রায় নগদ অর্থের মতো হারে যাকাত প্রবর্তন করেছে। নিসন্দেহে এ হার বেশ বড়ো। ওদিকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (গনীমত) চার পঞ্চমাংশ ধার্য করেছে ধনী অথবা গরীব মোজাহেদদের জন্যে, আর 'ফায়' অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পত্তির পুরোটাই দরিদ্রদের জন্যে বরাদ্দ করেছে। যমীন লীজ দেয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম বর্গা চাষ পদ্ধতিকে মনোনীত করেছে। অর্থাৎ ভূমির মালিক ও চাষী উৎপন্ন ফসলের অংশীদার হবে, ধনীদের অতিরিক্ত সম্পদ গরীবদের মধ্যে বণ্টন করার অধিকার সরকারকে দেয়া হয়েছে। সরকারী কোষাগার শূন্য হয়ে গেলে ধনীদের সম্পদ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যাবে। সম্পদ গোলাজাত করা এবং সুদ হারাম করা হয়েছে। কেননা এ দুটো হচ্ছে সম্পদ ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার নিকৃষ্ট মাধ্যম।

মোটকথা, ইসলাম তার গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তুলেছে, যাতে উল্লেখিত মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়। কেননা সে মূলনীতিই (সম্পদ-ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না থাকা) হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানার অন্যান্য শর্তের পাশাপাশি একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় মালিকানার স্বীকৃতি থাকলেও তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নয়। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ইসলাম থেকে আসেনি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যদি সুদ ও গোলাজাতকরণ ছাড়া চলে, তাহলে তা আল্লাহর নিজস্ব নিয়মে মনোনীত বিশেষ ব্যবস্থা হতে পারে। আসলে ইসলামী ব্যবস্থা নিজস্ব নিয়মে গঠিত হয়েছে, নিজস্ব নিয়মে পথ চলে আজ পর্যন্ত টিকে আছে। এটা সুসমন্বিত ভারসাম্যপূর্ণ নযীরবিহীন এক ব্যবস্থা, এতে অধিকার ও দায় দায়িত্বের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। যেদিন মহান স্রষ্টা এ ব্যবস্থা রচনা করেছেন, সেদিন থেকেই তা গোটা সৃষ্টির মতোই ভারসাম্যপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে, আর সৃষ্টিজগতের ভারসাম্য ও সমন্বয়ের তো কোনো তুলনাই নেই।

শরীয়তের উৎস

দ্বিতীয় যে মূলনীতিটার উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো, শরীয়ত একটি মাত্র উৎস থেকেই গ্রহণ করতে হবে। বলা হয়েছে, 'রসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, আর যা তিনি নিষেধ করেন তা বর্জন করো।' এ থেকে ইসলামের সাংবিধানিক মূলনীতিটিও পাওয়া যায়। ইসলামের আইনের গ্রহণযোগ্যতা ও শক্তির উৎস শুধু এই যে, তা রসূল কর্তৃক প্রদত্ত। চাই কোরআনের মাধ্যমেই হোক অথবা হাদীসের মাধ্যমেই হোক। গোটা মুসলিম উম্মাহ এবং তাদের শাসকরা সবাই মিলেও রসূল যে বিধান দেন তার বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা এবং অধিকার রাখে না। এর বিরুদ্ধাচরণ করে তারা কোনো আইন প্রণয়ন করলে সে আইনেরও কোনো শক্তি ও গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। কেননা যে প্রাথমিক উৎস থেকে এ জিনিসটা শক্তি অর্জন করে, সেই উৎসই সে তখন হারিয়ে ফেলে। ইসলামের এ মতবাদ মানবরচিত যাবতীয় মতবাদের পরিপন্থী। মানব রচিত মতবাদে জাতিকে ক্ষমতার উৎস ও সার্বভৌমত্বের মালিক বলা হয়। তাকে তার নিজের জন্যে আইন রচনার ক্ষমতা দেয়া হয়। তার সকল আইন গ্রহণযোগ্য ও সমাজে তা চালু হওয়ার শক্তি সম্পন্ন বলা হয়।

পক্ষান্তরে ইসলামে ক্ষমতার উৎস হলো আল্লাহর সেই বিধান যা রসূল (স.) নিয়ে এসেছেন, আর মুসলিম উম্মাহ শুধু এ বিধানের বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণেরই দায়িত্বসম্পন্ন। তাদের শাসকরা হচ্ছে এ ব্যাপারে তাদেরই প্রতিনিধি। তাদের অধিকার ও ক্ষমতা এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। আইন

রচনায় রসূলের আনীত বিধানের বিরোধিতা করার কোনো অধিকারই মুসলিম উম্মাহর বা তার শাসকদের নেই।

তবে উম্মাহ যদি এমন কোনো অবস্থা বা সমস্যার সম্মুখীন হয়, যা সম্পর্কে রসূলের আনীত বিধানে কোনো সুস্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায় না, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে এমনভাবে আইন প্রণয়ন করতে হবে, যাতে রসূলের দেয়া কোনো মূলনীতি লংঘিত না হয়, এই মূলনীতির বিরুদ্ধাচরণ করা না হয়। যে কোনো আইন রচনার মূলনীতি হবে এই যে, যদি সে ব্যাপারে কোরআন বা সুন্নাহর কোনো সুস্পষ্ট উক্তি থাকে, তাহলে তা অনুসরণ করতে হবে, আর যদি কোনো সুস্পষ্ট উক্তি না থাকে তবে কোরআন ও সুন্নাহর কোনো মূলনীতি লংঘিত না হয় এমনভাবে তা রচনা করতে হবে। উম্মাহ ও তার প্রতিনিধিত্বশীল শাসকের ক্ষমতা এ পর্যন্তই সীমিত থাকবে। মানব রচিত কোনো বিধানের সাথে ইসলামের এ বিধানের কোনো তুলনা করা যাবে না। এ বিধান দ্বারা মানুষের আইন রচনার প্রক্রিয়াকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের সাথে সমন্বিত করা হয়েছে এবং বিশ্বজগত পরিচালনার জন্যে আল্লাহর রচিত বিধানের সাথে মানব জাতির পরিচালনার জন্যে আল্লাহর রচিত বিধানের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। যাতে মানুষের আইন বিশ্ব প্রকৃতির বিধানের সাথে সংঘর্ষশীল না হয়। কেননা তা হলে মানুষ হয় এখানে অসুখী হবে, নচেত তারা ধ্বংস হবে, অথবা তার সমস্ত চেষ্টা সাধনা বিফলে যাবে।

এই মূলনীতি দুটোকে এ আয়াত মোমেনদের অন্তরে তার মূল উৎসের সাথে সংযুক্ত করে দেয়। সেই মূল উৎস হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। এই সংযোগ সাধনের লক্ষ্যেই তাদের আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়– 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।' এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো গ্যারান্টি। এর সাথে কোনো টালবাহানা চলে না এবং একে এড়িয়ে যাওয়ারও কোনো উপায় নেই। কেননা মোমেনরা জানে, আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় গোপন তথ্য জানেন, সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল, তাঁর কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি কঠিন শাস্তিদাতা। মোমেনরা জানে, সম্পদ কেবল ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে আবর্তনশীল ও সীমিত না করে তার আবর্তন সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে অবাধ ও উন্মুক্ত করে দেয়া তাদের দায়িত্ব। রসূল (স.) যা দেন তা সন্তুষ্ট চিত্তে ও পূর্ণ আনুগত্য সহকারে গ্রহণ করা তাদের কর্তব্য এবং তিনি যা কিছু থেকে নিষেধ করেন তা থেকে কোনো রকম শৈথিল্য ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন ছাড়াই বিরত থাকতে তারা আদিষ্ট। কেননা তাদের সামনে একটা কঠিন হিসাব নিকাশের দিন রয়েছে।

আনসার ও মোহাজেরদের আত্মত্যাগ ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

বনু নযীরের প্রায় সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি কেবল মোহাজেরদের মধ্যেই বণ্টন করা হয়েছিলো। মাত্র দু'জন আনসারকে এই বন্টনের সাথে যুক্ত করা হয়েছিলো। এই নিয়ম শুধু 'ফায়' সম্পত্তির জন্যে নির্দিষ্ট। 'সম্পদ যেন তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তনশীল না থাকে'– এই মূলনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এরূপ করা হয়েছিলো। নচেত এই বিধানটা যেভাবে প্রযোজ্য তা হচ্ছে, এ ধরনের সম্পত্তি দরিদ্র শ্রেণীর সকলের জন্যেই নির্দিষ্ট থাকবে– মোহাজের হোক, আনসার হোক বা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম হোক। পরবর্তী আয়াতগুলো থেকেও এই কথা জানা যায়।

তবে কোরআন কেবল নীরস ও নিরেট বিধান দিয়েই ক্ষান্ত থাকে না; বরং সে এমন প্রাণোচ্ছল পরিবেশে তার বিধান জারি করে, যেখানে সকল সজীব প্রাণী তার পক্ষে সাড়া দিতে গিয়ে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ জন্যে নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণীকে এর আওতাভুক্ত করে নেয়া হয়েছে এবং এদের গুণবৈশিষ্ট্যগুলো এতো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই তিনটি শ্রেণীর প্রকৃত পরিচয় তা থেকে সহজেই জানা যায়।

'সেসব দরিদ্র মোহাজেরদের জন্যে, যারা নিজ নিজ ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আর যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভ এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে, তারাই হচ্ছে সত্যবাদী।'

এ আয়াতে মোহাজেরদের প্রকৃত বৈশিষ্টগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের এক নিখুঁত নির্ভুল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তারা নিজ নিজ ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তাদের আত্মীয়-স্বজনের অত্যাচার ও নির্যাতন সব কিছু ছেড়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য তাদের করেছে। 'আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রভু' এ কথা বলা ছাড়া তাদের আর কোনো অপরাধ ছিলো না। তারা কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ী ও সহায় সম্পত্তি ত্যাগ করে হিজরত করেছিলো। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তোষলাভে তাদের আস্থা ছিলো অটুট। তাঁর আশ্রয় ছাড়া তাদের আর কোনো আশ্রয় নেই এবং তারা মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিতাড়িত লোক হলেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে সাহায্য করবেন বলে সুদৃঢ় সংকল্পে আবদ্ধ হলেন। 'তারাই সত্যবাদী।' অর্থাৎ তারা মুখ দিয়ে যে ঈমানের বাণী উচ্চারণ করেছে, নিজেদের কাজ দ্বারা তার সত্যতার প্রমাণ দিয়েছে। তারা যে আল্লাহকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেছে সে ব্যাপারে তারা সত্যবাদী ছিলো। রসূল (স.)-কে যে তারা অনুসরণ করবে, তাঁর আনুগত্য করবে, সে ব্যাপারেও তারা সত্যবাদী ছিলো। আল্লাহর সত্য দ্বীনের সাথেও তারা ছিলো নিষ্ঠাবান। কারণ পৃথিবীতে তারা যে এই দ্বীনের যথার্থ অনুগত ও বাস্তব অনুসারী, সাধারণ মানুষ তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলো।

'যারা তাদের পূর্বেই এই আবাসভূমি ও ঈমানকে আবাসস্থল বানিয়েছে, তারা তাদের কাছে হিজরতকারীদের ভালোবাসে এবং তাদের যা দেয়া হয় তার প্রতি কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না, তারা ক্ষুধার্ত হওয়া সত্তেও অন্যদের নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। আর যে ব্যক্তিকে প্রবৃত্তির সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে সে আসলেই সফলকাম।'

এ আয়াতে একইভাবে আনসারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই শ্রেণীটি এমন অতুলনীয় গুণাবলীতে ভূষিত ছিলো এবং এতো উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলো যে, বাস্তব জগতে যদি তাদের অস্তিত্ব না থাকতো, তাহলে তারা মানুষের মনে কেবল কল্পনার আকারেই ডানা মেলে উড়ে বেড়াতো এবং কতগুলো শ্রেষ্ঠ উদাহরণ কল্পচিত্র হিসাবেই মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করতো।

'যারা তাদের পূর্বেই এই আবাসভূমি ও ঈমানকে আবাসস্থল বানিয়েছিলো', অর্থাৎ হিজরতের আবাসভূমি ইয়াসরেব তথা পবিত্র মদীনা, যেখানে মোহাজেরদের আগে থেকেই আনসাররা বসবাস করতো এবং সেখানে ঈমানকেও তারা তাদের বাসস্থান বানিয়ে ছিয়েছিলো, অর্থাৎ ঈমান যেন তাদের বাড়ীঘরে পরিণত হয়েছিলো। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য। ঈমানের সাথে আনসারদের যে ঘনিষ্ঠ অবস্থান ছিলো, সেটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত ঈমানই ছিলো তাদের ঘরবাড়ী ও বাসস্থান, এখানে তাদের অন্তরাত্মা বাস করতো ও বিশ্রাম নিতো, যেমন মানুষ নিজের বাড়ী ঘরে বাস করে ও বিশ্রাম নেয়।

'তাদের কাছে হিজরতকারীদের তারা ভালোবাসে এবং তাদের যা দেয়া হয় তার প্রতি তারা কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না।' ...

মদীনার আনসার কর্তৃক মোহাজেরদের সাদর অভ্যর্থনা জানানোর মতো ঘটনা সমগ্র মানবেতিহাসে সত্যিই নযীরবিহীন। এতো ভক্তি ও সমাদর এতো মুক্তহস্তের বদান্যতা, এমন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অংশগ্রহণ এবং আশ্রয়দান ও দায় বহনে এতো প্রতিযোগিতা ইতিহাসে সত্যিই

বিরল। এমনকি এও জানা যায়, কোনো মোহাজের কোনো আনসারীর বাড়ীতে লটারি ব্যতীত ওঠতে পারেননি। কেননা অভ্যর্থনাকারী ও আশ্রয়দানকারীর সংখ্যা ছিলো মোহাজেরদের সংখ্যার চেয়ে বেশী। 'তাদের যা কিছু দেয়া হতো তার প্রতি তারা প্রয়োজন অনুভব করতো না।' অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোহাজেরদের যে অগ্রাধিকার দেয়া হতো, যেমন 'ফায়' সম্পত্তির কথাই ধরা যাক, এসবের ব্যাপারে তাদের মনে লেশমাত্রও দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকতো না। অর্থাৎ মোহাজেরদের যেখানে যেটুকু অগ্রাধিকার দেয়া হতো, সে ব্যাপারে আনসারদের মনে কোনোই সংকীর্ণতা বা আপত্তি থাকতো না। তাদের মন থাকতো সম্পূর্ণ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও ভাবলেশমুক্ত।

'তারা অন্যদের অগ্রাধিকার দেয় যদিও নিজেরা ক্ষুধার্ত থাকে।' নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া সর্বোচ্চ স্তরের এক মহানুভবতা। আনসাররা এই স্তরেই উপনীত হয়েছিলো, মানবেতিহাসে যার কোনো নযীর নেই। সকল অবস্থায় ও সকল ক্ষেত্রেই তাদের এই মহত্ত্ব উদারতা অব্যাহত ছিলো, যা প্রাচীন ও আধুনিক মানুষের আচরণে একটা অলৌকিক ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়।

'আর যে ব্যক্তিকে নিজের প্রবৃত্তির সংকীর্ণতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে সে সফলকাম।'

বস্তুত মনের ও প্রবৃত্তির সংকীর্ণতা প্রত্যেকটা সৎকাজের পথে প্রধান বাধা। সৎকাজ মাত্রই হচ্ছে তা কোনো না কোনো প্রকারের ত্যাগ স্বীকারের নামান্তর। হয় তা আর্থিক বদান্যতা, নচেত অন্তরে সহানুভূতির বদান্যতা, নচেত চেষ্টা সাধনার বদান্যতা, অথবা প্রয়োজনে জীবন ও সময়ের ত্যাগ স্বীকার করা। যে ব্যক্তি এতোটা সংকীর্ণমনা ও স্বার্থপর যে, সব সময় কিছু না কিছু নিতে চায়, কিছুই দিতে চায় না, সে কখনো কোনো সৎকাজ বা কল্যাণমূলক কাজ করতে পারে না, আর যে ব্যক্তি মনের এই সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার উর্ধ্বে ওঠতে পারে, সে সৎকাজের পথের এই বাধা অতিক্রম করতে পারে এবং দান ও ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। এটাই হচ্ছে যথার্থ সাফল্য।

সকল যুগের মুসলিম উম্মাহর অভিন্ন চরিত্র

'আর যারা তাদের পরে আসবে তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরও আমাদের যেসব ভাই আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে তাদের ক্ষমা করো। আমাদের মনে মোমেনদের প্রতি খারাপ ধারণা রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি মমতাময়, দয়াময়।'

চমকপ্রদ এই তৃতীয় চিত্রটিতে তাবেঈন অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের অব্যবহিত পরবর্তী প্রজন্মের সর্বোত্তম গুণবৈশিষ্ট্য গুলো এবং সামগ্রিকভাবে সকল যুগের ও সকল দেশের মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ গুণবৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে।'

মোহাজের ও আনসারদের পরবর্তী এই মুসলিম প্রজন্মগুলো, যারা মদীনায় এই আয়াত নাযিলের সময় জন্ম গ্রহণ করেনি, তাদের অস্তিত্ব আল্লাহর জ্ঞানে এবং স্থান ও কালের অতীত বাস্তবতায় সব সময়ই বিদ্যমান ছিলো। তাদের অন্যতম লক্ষণ এই যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে যখন আল্লাহর শরণাপন্ন হয় তখন শুধু নিজেদের জন্যেই ক্ষমা প্রার্থনা করে না; বরং তাদের পূর্ববর্তী মোমেনদের জন্যেও ক্ষমা প্রার্থনা করে। অনুরূপভাবে কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ বা কুধারণা পোষণ থেকে মনকে মুক্ত রাখার জন্যেও দোয়া করে। সেই দোয়া হলো,

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের যেসব ভাই আমাদের আগে ঈমান এনেছে তাদের ক্ষমা করো, আমাদের মনে তাদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ খারাপ ধারণা রেখো না, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি দয়াময়, মমতাময়।

একমাত্র ঈমানই এখানে যোগসূত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহের মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহর চরিত্র ও তার উজ্জ্বল চিত্র ভাস্বর হয়ে ওঠেছে। স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে, এই উম্মাহর শেষ প্রজন্মকে প্রথম প্রজন্মের সাথে এবং প্রথম প্রজন্মকে শেষ প্রজন্মের সাথে সংযুক্ত সংহত করার, একাত্মতা, পারস্পরিক মমত্ব, সহানুভূতি ও নিরাপত্তার শক্তিশালী বন্ধনটি। মূর্ত হয়ে ওঠেছে সেই গভীর আত্মীয়তার বন্ধন, যা স্থান, কাল, জাতি ও বংশ অতিক্রম করে যুগ যুগ ধরে হৃদয়ের অভ্যন্তরে টিকে থাকে, যার কারণে শত শত বছর পরও এক মোমেন তার অপর মোমেন ভাইকে জীবিত ভাইয়ের মতোই স্মরণ করে, এমনকি কখনো কখনো তার চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালোবাসা সহকারে স্মরণ করে, পরবর্তী মুসলমানরা তা অনুকরণ অনুসরণ করে, যেমন তারা সব একই কাতারে ও একই বাহিনীতে সারিবদ্ধবাবে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ তাদের মাঝে স্থান ও কালের বিস্তার ব্যবধান রয়েছে। একই দয়াময় ও মমতাময় প্রভু আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টচিত্তে তারা সবাই অবস্থান করে একই পতাকার নীচে।

এটা একটা চোখ ধাঁধানো চিত্র। এতে একটা বাস্তব সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মানবতার শ্রেষ্ঠতম ও মহোত্তম দৃষ্টান্ত, যা একমাত্র মহৎ হৃদয়ের মানুষই কল্পনা করতে পারে। এটা যে কতো উজ্জ্বল ও মহৎ চিত্র, তা তখনই স্পষ্ট হয়ে আমাদের কাছে ধরা পড়ে, যখন কার্লমার্কসের গ্রন্থে কম্যুনিজম নামক মতবাদ কর্তৃক প্রচারিত জঘন্য শ্রেণী বিদ্বেষের সাথে এর তুলনা করা হয়। এ বিদ্বেষ অনবরত একজন মানুষের বিবেক ও মনকে ক্ষত বিক্ষত করতে থাকে এবং সব সময় এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আরেক শ্রেণীর মানুষকে উত্তেজিত করতে থাকে। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী যেসব মানব প্রজন্ম এবং বর্তমান যেসব জাতি এসব ঘৃনীত শ্রেণী এ বিদ্বেষ লালন করে না তাদের ঈমানের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ায়। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে এবং সকল ধর্মের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে তারা উস্কানি দিতে থাকে।

উল্লেখিত দুটো চিত্রের মধ্যে কোনো মিল নেই, আকৃতিতেও নয়, প্রকৃতিতেও নয় এবং প্রভাবেও নয়। এর একটা চিত্র মানুষের মর্যাদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করে। অপরটি তাকে নামিয়ে আনে সর্বনিম্নস্তরে। প্রথমটি স্থান, কাল, বর্ণ, বংশ, ভৌগোলিক এলাকা ইত্যাদির উর্ধ্বে উঠে এক প্রজন্মকে অপর প্রজন্মের সাথে একাত্ম করে দেয়। এক প্রজন্মের সাথে অপর প্রজন্মের প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে। পারস্পরিক প্রীতি ও বন্ধুত্বের পাশাপাশি সবাইকে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এমনকি মসজিদে নামায পড়ার সময়ও মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি এ আচরণ, দৃষ্টিভংগি অভিন্ন থাকে। আর অপর চিত্রটি মানব জাতিকে পরস্পরের রক্ত পিপাসু শত্রু এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ প্রচারকারী, শোষণকারী ও প্রতারক হিসেবে দেখায়। তাদের এ চিন্তাধারা পুরোটাই একটা জাল ছাড়া আর কিছু নয়, যা পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের ঠকানোর জন্যে বিছিয়ে রাখে। মোমেনদের মহান কাফেলা আল্লাহর কাছে যে দোয়া করে তা হচ্ছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, ক্ষমা করো আমাদের ও আমাদের সেই ভাইদের যারা আমাদের আগে চলে গেছে, তাদের প্রতি আমাদের মনে কোনো হিংসা বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মমতাময়, দয়াময়।'

এই আলোকোজ্জ্বল চিত্রটি তুলে ধরার পর পুনরায় সেই ঘটনার বিবরণ দেয়া হচ্ছে যে ঘটনা উপলক্ষে এই সূরাটি নাযিল হয়েছে। এতে সে ঘটনার অপর পক্ষ মোনাফেকদের চরিত্রের বিবরণ দেয়া হয়েছে,

'তুমি কি মোনাফেকদের দেখোনি, তারা তাদের কাফের আহলে কেতাব ভাইদের বলে, তোমাদের যদি বের করে দেয়া হয় তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো.......। (আয়াত ১১-১৭)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٢﴾ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ

রুকু ২

১১. (হে রসূল,) তুমি কি সেসব মোনাফেকদের (আচরণ) লক্ষ্য করোনি, যারা তাদের কাফের 'আহলে কেতাব' ভাইদের বলে, যদি তোমাদের (কখনো এ জনপদ থেকে) বের করে দেয়া হয়, তবে আমরাও তোমাদের সাথে (একাত্মতা দেখিয়ে এখান থেকে) বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের (স্বার্থের) বেলায় আমরা কখনো অন্য কারো আনুগত্য করবো না, আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া হয় তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবো; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (নিজেই) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এরা নিসন্দেহে কপট-মিথ্যাবাদী। ১২. (সত্য কথা হচ্ছে,) যদি তাদের বের করেই দেয়া হয়, তাহলে এরা (কখনো) তাদের সাথে বের হবে না; আবার (যুদ্ধে) আক্রান্ত হলে এরা তাদের (কোনো প্রকার) সাহায্যও করবে না, যদি এরা তাদের সাহায্য করেও, তবুও (নিসন্দেহে) এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অতপর এ লোকদের আর (কোনো উপায়েই) কোনো সাহায্য করা হবে না। ১৩. (আসলে) এদের অন্তরে আল্লাহর চাইতে তোমাদের ভয় বেশী বড়ো হয়ে বসে আছে; (এর কারণ হচ্ছে,) এরা এমন একটি জাতি, যারা (আসল কথাই) বুঝতে পারে না। ১৪. এরা কখনো ঐক্যবদ্ধ হয়েও তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসবে না, (যদি করেও তা করবে) অবশ্য কোনো সুরক্ষিত জনপদের ভেতর বসে, অথবা (নিরাপদ) পাচিলের আড়ালে থেকে; (আসলে) তাদের নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতা খুবই মারাত্মক; তুমি তো এদের মনে করো এরা বুঝি ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু (মোটেই তা নয়,) এদের অন্তর হচ্ছে শতধা বিচ্ছিন্ন, কেননা এরা হচ্ছে নির্বোধ সম্প্রদায়, ১৫. এদের অবস্থাও সেই আগের লোকদের মতো; যারা মাত্র কিছু দিন আগে নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম (হিসেবে বিতাড়িত হবার) শাস্তি ভোগ করেছে, (তাছাড়া পরকালেও) এদের জন্যে কঠিন আযাব রয়েছে, ১৬. এদের

قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّیْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِی النَّارِ خَالِدَیْنِ فِیْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِیْنَ ﴿١٧﴾

(আরেকটি) তুলনা হচ্ছে শয়তানের মতো, শয়তান এসে যখন মানুষদের বলে, (প্রথমে) আল্লাহকে অস্বীকার করো, অতপর (সত্যিই) যখন সে (আল্লাহকে) অস্বীকার করে তখন (মুহূর্তেই) সে (বোল পাল্টে ফেলে এবং) বলে, আমার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি (নিজে) সৃষ্টিলোকের মালিক আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি। ১৭. অতপর (শয়তান ও তার অনুসারী) এ দু'জনের পরিণাম হবে জাহান্নাম, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে; আর এটাই হচ্ছে যালেমদের শাস্তি!

তাফসীর

আয়াত ১১-১৭

এ হচ্ছে বনু নযীর গোত্রীয় ইহুদীদের সম্বোধন করে মোনাফেকরা যা বলেছে তার হুবহু উদ্ধৃতি। মোনাফেকরা সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেনি; বরং প্রতিশ্রুতি ভংগ করে তাদের বেকায়দায় ফেলে অপদস্থ করেছিলো। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে অকল্পনীয়ভাবে আল্লাহর আযাব এসেছিলো এবং আল্লাহ তাদের অন্তরে আতংক সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এখানে কোরআনের প্রতিটি বাক্যেই রয়েছে তাৎপর্যময় মর্মস্পর্শী তথ্য, যা হৃদয়রাজ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করে এবং দ্বীনী জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও সুগভীর ঈমানের উপকরণ যোগান দেয়।

মোনাফেকদের সাথে ইহুদী খৃস্টানদের সম্পর্কের স্বরূপ

এখানে আলোচিত হয়েছে মোনাফেকদের ইহুদীদের আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতার বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তুমি কি মোনাফেকদের দেখোনি যে, তারা তাদের ভাই কাফের আহলে কেতাবকে বলে .....' অর্থাৎ বনু নযীর নামক এই আহলে কেতাব গোত্রটি কাফের এবং মোনাফেকরা ইসলামের বেশ ধারণ করলেও তারা এ কাফের আহলে কেতাব গোত্রটিরই ভাই।

দ্বিতীয়ত মোনাফেকদের পক্ষ থেকে তাদের ভাইদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ভাষায় তাকীদ বা দৃঢ়তার উল্লেখ, 'যদি তোমাদের বের করে দেয়া হয় তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো, তোমাদের ব্যাপারে আমরা আর কারো হুকুম মানবো না এবং তোমাদাদের ওপর যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাহায্য করবো।' তাদের এই সব প্রতিশ্রুতির স্বরূপ আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন এবং তিনি প্রতিশ্রুতির মুখোশ খুলে দেন,

'আল্লাহ তায়ালা যা সাক্ষ্য দিয়েছেন বাস্তবে সেটাই হয়েছিলো। মোনাফেকরা তাদের ভাইদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এরপর মোনাফেকদের ও তাদের ভাই কাফের আহলে কেতাব গোষ্ঠীর একটা মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার উল্লেখ করা হয়েছে,

'নিশ্চয়ই তোমরা তাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে বেশী ভয়ের পাত্র। এর কারণ এই যে, তারা একটা নির্বোধ গোষ্ঠী।'

অর্থাৎ তারা আল্লাহ তায়ালার চেয়েও মুসলমানদের বেশী ভয় করে। তারা যদি আল্লাহকে ভয় করতো, তাহলে আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের ভয় করতে হতো না। কেননা ভয় একটাই হতে পারে, একাধিক নয়। আল্লাহর ভয় ও বান্দার ভয়– এই দুই ধরনের ভয় কোনো মোমেনের অন্তরে একই সাথে থাকতে পারে না। বিশ্ব জাহানের যা কিছু শক্তি ও পরাক্রম সবই আল্লাহর। বিশ্ব প্রকৃতির সমস্ত শক্তি একমাত্র আল্লাহর আদেশের অধীন। 'এমন কোনো প্রাণী নেই, যার লাগাম আল্লাহর হাতে নেই।' তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে আর কাকে ভয় করবে? কিন্তু যারা এ সত্য বুঝে না, তারা আল্লাহর চেয়েও তার বান্দাদের বেশী ভয় করে থাকে। 'কেননা তারা একটা নির্বোধ গোষ্ঠী।'

এভাবে বনু নযীরের প্রকৃত অবস্থা ও চরিত্র স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে এই মৌল তত্ত্বও ব্যক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ মোনাফেকদের ও কাফের আহলে কেতাব গোষ্ঠীর এই মানসিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর চেয়েও মোমেনদের বেশী ভয় করে।

'তারা সম্মিলিতভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তবে পারবে কেবল সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে অথবা প্রাচীরের আড়ালে অবস্থান করে। তাদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব। তুমি তাদের ঐক্যবদ্ধ ভাব, অথচ তাদের মন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। কেননা তারা আসলেই একটা নির্বোধ সম্প্রদায়।' (আয়াত ১৪)

পরবর্তীকালে যখনই কোথাও এ ধরনের মোনাফেক ও কাফের জনগোষ্ঠী একত্রে অথবা পাশাপাশি বসবাস করেছে, তখনই মোনাফেক ও কাফেরদের এই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, যা কোরআনের এই আয়াতে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে উদঘাটিত হয়েছে– অলৌকিকভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এটা একটা চাক্ষুষ সত্য হিসাবেও প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি মুসলিম গেরিলাদের সাথে ইহুদীদের যে সংঘর্ষ বায়তুল মাকদেসে সংঘটিত হয়েছে, তা থেকে বিস্ময়করভাবে এ সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে। ইহুদীরা ফিলিস্তীন ভূখন্ডে নির্মিত সুরক্ষিত কলোনীগুলোতে আশ্রয় নেয়া ছাড়া মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে পারেনি। কখনো প্রকাশ্য ময়দানে মুখোমুখি হলে তারা ইঁদুরের মতো পালিয়েছে। তা দেখলে মনে হয় যেন এ আয়াত সর্বপ্রথম তাদের ব্যাপারেই বুঝি নাযিল হয়েছে।(১)

তাদের বাইরের দৃষ্টিতে মনে হয় অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো যথারীতি আজো বহাল রয়েছে। 'অথচ তাদের মন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।' এটা মোনাফেক ও কাফেরদের বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে মুসলমানদের অবস্থা হচ্ছে এর বিপরীত। মুসলমানদের বিভিন্ন প্রজন্মের মাঝে স্থান, কাল, জাতি, বর্ণ, বংশ ও ভৌগোলিক এলাকার যতো ব্যবধানই থাকুক, সব অতিক্রম করে ঈমানী ঐক্য তাদের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করে। 'কাফের ও মোনাফেকদের ভেতরে এমন ঐক্য কখনো হয় না, কারণ তারা নির্বোধ।'

এদের উভয়ের বা বাহ্যিক হাবভাব কখনো কখনো আমাদের ধাকা দেয়। আহলে কেতাব গোষ্ঠীকে কখনো কখনো একাত্ম ও ঐক্যবদ্ধ দেখা যায়। অনুরূপভাবে মোনাফেকদেরকেও কখনো কখনো একই শিবিরে সমবেত হতে দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত খবর আমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালা

(১) এটা সে সময়ের কথা যখন ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্র গঠিত হবার পর ইখওয়ানুল মুসলেমুনের নেতৃত্বে মুসলমানরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। – সম্পাদক

আকাশ থেকে আগেই ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন। সে খবর হলো, তারা আসলে সে রকম নয়। তারা ঐক্যবদ্ধ নয়, বাহ্যত যদিও তা দেখা যায়, সেটা একটা প্রতারণাপূর্ণ দৃশ্য। সময়ে সময়ে এসব প্রতারণার মুখোশ আবার খসেও পড়ে, তখন বাস্তব ঘটনা স্পষ্ট হয়ে যায় এবং একই শিবিরের ভেতরে স্বার্থ, অভিরুচি ও মতামতের বিভিন্নতার কারণে যে বিবাদ-বিসম্বাদ ও অনৈক্য বিদ্যমান তাও ফাঁস হয়ে যায়। মুসলমানরা যখনই আন্তরিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জু ধারণ করেছে, তখনই তাদের সামনে তাদের প্রতিপক্ষের অনৈক্য, স্ববিরোধিতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কপটতা ধরা পড়ে গেছে। মুসলমানরা যখনই ধৈর্য ধারণ করেছে ও সত্যের ওপর অবিচল অবস্থান গ্রহণ করেছে, তখনই বাতিলপন্থীদের লোক দেখানো ঐক্য ভেংগে পড়েছে এবং তাদের ভেতরকার তীব্র বিরোধী বিদ্বেষ ও মনের অনৈক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে।

মোনাফেক ও কাফের ইহুদী খৃষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে সক্ষম হয় কেবল তখনই, যখন মুসলমানদের ভেতরে অনৈক্য ও বিরোধের সূচনা হয়। এই অনৈক্য ও বিরোধের কারণে তাদের সেই মৌলিক চরিত্র বহাল থাকে না, যা এই সূরায় পূর্ববর্তী পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নচেত মোনাফেকরা সব সময়ই মুসলমানদের চেয়ে দুর্বল ও অক্ষম। মুনাফেকরা ও ইহুদী-খৃষ্টানরা মানসিক, স্বার্থগত রুচিগত দিক দিয়ে পরস্পর থেকে অনেকটা বিভেদগ্রস্ত। তাদের ক্ষেত্রেই একথা বেশী প্রযোজ্য যে, 'তাদের ভেতরে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, তুমি তাদের ঐক্যবদ্ধ মনে করলেও তাদের হৃদয়গুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।'

কোরআন এ সত্য মুসলমানদের অন্তরে বদ্ধমূল করতে চায়। কেননা সে তাদের সামনে তাদের শত্রুর ভাবমূর্তি ক্ষীণ করতে এবং তাদের শত্রু-ভীতি থেকে মুক্ত করতে বদ্ধ পরিকর।

আসলে সে মুসলমানদের শাশ্বত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা ও তার ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক সচেতনতা দান করতে চায়। মুসলমানরা যখনই কোরআনকে নিজেদের চেতনা ও প্রেরণার উৎস হিসেবে গ্রহণ করবে, তখনই তাদের শত্রুরা ও আল্লাহর শত্রুরা তাদের কাছে আর ভয়ের পাত্র থাকবে না। এটা করতে পারলে তারা এক কাতাতে সমবেত হতে পারবে। তাদের সামনে দাঁড়ানোর মতো কোনো শক্তিই আর পৃথিবীতে থাকবে না।

যারা আল্লাহর ওপর যথার্থই ঈমান রাখে, তাদের নিজেদের অবস্থা ও তাদের শত্রুদের অবস্থা উপলব্ধি করা উচিত। এটা উপলব্ধি করতে পারলেই লড়াইয়ে অর্ধেক জয় অর্জিত হয়ে যাবে। একটা ঘটনার বিবরণদান, সেই ঘটনার পর্যালোচনা করা এবং সেই ঘটনার চাক্ষুষ দর্শকরা যাতে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সে জন্যে তাদের সামনে এই তথ্য প্রমাণগুলো বিশ্লেষণ প্রসংগে কোরআন এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা মুসলমানদের অবহিত করে। অনুরূপভাবে সে মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্মকেও এ ব্যাপারে অবহিত করাতে এবং এ নিয়ে চিন্তা গবেষণার সুযোগ দিতে চায়।

উল্লেখ্য, বনু নযীরের এ ঘটনাই এ জাতীয় প্রথম ঘটনা। এর আগে বনু কায়নুকার ঘটনাটিও ঘটেছিলো এবং পরবর্তী আয়াতে সম্ভবত সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে,

'তারা সে লোকদের মতো, যারা ইতিপূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে, আর তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'

বনু কায়নুকা নামে ইহুদী গোত্রের সাথে মুসলমানদের যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, তা ছিলো বদর যুদ্ধের পর ও ওহুদ যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। এই বনু কায়নুকার সাথে রসূল (স.)-এর চুক্তি ছিলো, কিন্তু বদর যুদ্ধে মোশরেকদের ওপর মুসলমানরা যখন বিজয়ী হলো, তখন ইহুদীরা তাতে ক্ষুব্ধ হলো। এতোবড়ো বিজয়লাভে মুসলমানদের ওপর তারা ঈর্ষান্বিত হলো। তাদের আশংকা

ছিলো, মুসলমানদের এ বিজয় মদীনায় তাদের অবস্থা প্রভাবিত করবে। মুসলমানদের যে পরিমাণ শক্তি বৃদ্ধি ঘটবে, সেই পরিমাণ ইহুদীদের শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তি কমবে। ইহুদীরা যে কানাঘুষা করে দুরভিসন্ধি ঘটাচ্ছিলো, সে কথা রসূল (স.) জানতে পেরে তাদের সতর্ক করে দিলেন এবং তাদের সাথে তার যে শান্তি চুক্তি রয়েছে, তার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সেই সাথে এরূপ মনোভাবের পরিণতি সম্পর্কেও তাদের হুঁশিয়ার করে দিলেন, কিন্তু বনু কায়নুকা গোত্রটি রসূল (স.)-কে পাল্টা হুমকি দিয়ে ধৃষ্টতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখালো। তারা বললো, 'হে মোহাম্মদ, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী নয় এমন একটা গোত্রকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তোমার অহংকার করা উচিত নয়। আমাদের সাথে যদি তোমার যুদ্ধ হয়, তাহলে বুঝবে আমরা সত্যিকার যোদ্ধা।'

এরপর তারা মুসলমানদের ক্রমাগত উস্কানি দিতে থাকলো। একটা বর্ণনা থেকে জানা যায়, জনৈক মুসলিম নারী বনু কায়নুকার বাজারে একদিন একটা পণ্য বিক্রি করে। সে একজন রং মিস্ত্রীর দোকানের সামনে বসে পণ্যটা বিক্রি করেছিলো। ইহুদীরা তার মুখ খোলার জন্যে তাকে উত্যক্ত করতে থাকে, কিন্তু সে কোনোক্রমেই মুখ খুলতে রাযী হয়নি। এদিকে রং মিস্ত্রী সুকৌশলে তার পরিধানের কাপড়ের এক প্রান্ত পিঠের সাথে বেঁধে দেয়। ফলে সে যখন ওঠে দাঁড়ালো তখন তার লজ্জাস্থান বেরিয়ে পড়লো। তা দেখে সবাই হেসে ওঠলো। মহিলাটি তখন চিৎকার দিয়ে ওঠলো। তার চিৎকারের সাথে সাথে জনৈক মুসলমান রংমিস্ত্রীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করে ফেললো। আবার ইহুদীরা মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মেরে ফেললো। এরপর মুসলমানের সাথীরা মুসলমানদের সাহায্য চেয়ে চিৎকার করলো। তখন মুসলমানরা রেগে গেলো, ফলে মুসলমানদের মধ্যে ও বনু কায়নুকার মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলো।

রসূল (স.) বনু কায়নুকাকে অবরোধ করলেন। তারা রসূল (স.)-এর ফায়সালা মানতে রাযী হলো। এই সময় মোনাফেক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল রসূল (স.)-এর সাথে তর্ক বিতর্ক শুরু করে দিলো, সে জানালো, খাযরাজ গোত্রের সাথে বনু কায়নুকার শান্তি চুক্তি রয়েছে কিন্তু আসলে এটা চিলো মোনাফেকদের ও আহলে কেতাব কাফেরদের মধ্যকার গাঁটছাড়া। অবশেষে রসূল (স.) বনু কায়নুকাকে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্য সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি সহকারে মদীনা থেকে নির্বাসন দিয়ে যুদ্ধ না করতে সম্মত হলেন। তারা প্রাণ নিয়ে সিরিয়ায় পালালো।

এখানে কোরআনে এই ঘটনার দিকেই ইংগিত করা হয়েছে এবং তাদের সাথে বনু নযীর ও মোনাফেকদের অবস্থার তুলনা করা হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে এই মোনাফেকদের সম্পর্কে একটা উদাহরণ দেয়া হয়েছে। মোনাফেকরা ইহুদীদের প্রতিরোধের উস্কানি দিয়ে তাদের শোচনীয় দুর্গতি ঘটিয়েছিলো, তাই তাদের সাথে শয়তানের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। কেননা শয়তান মানুষকে অনুরূপ উস্কানি দিয়ে থাকে এবং মানুষ সেই উস্কানিতে সম্মত হয়ে নিজের শোচনীয় দুর্দশা ডেকে আনে,

'শয়তানের মতো যখন সে মানুষকে বলে, তুমি কুফরী করো। তারপর যখন মানুষ কুফরী করে, তখন সে বলে, আমি তোমার কোনো ধার ধারি না। আমি তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি। তখন উভয়ের পরিণাম হয় এই যে, তারা উভয়ে চিরদিনের জন্যে জাহান্নামে চলে যায়। এটাই অপরাধীদের কর্মফল।'

এখানে শয়তান ও তার উস্কানির ফাঁদে পা দেয়। অথচ তার পরিণাম কারোই অজানা নয়।

আসলে এটা একটা চিরন্তন ব্যাপার। আর একটি সাময়িক ঘটনা দিয়ে কোরআন একটি চিরন্তন ব্যাপারের দিকে মানুষের দৃষ্টি ফেরায়। একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও একটা শাশ্বত সত্যের মাঝে

যোগসূত্র স্থাপন করে এবং তা করে একটি জীবন্ত বাস্তবতা সামনে রেখে। অন্তরে বিচ্ছিন্ন কিছু তত্ত্বই সে উপস্থাপন করে না। কেননা বিচ্ছিন্ন কোনো তত্ত্ব কখনো চেতনাকে প্রভাবিত করে না এবং তা গ্রহণে হৃদয়কে উদ্বুদ্ধও করে না। হৃদয়কে সম্বোধন করার ব্যাপারে কোরআনের রীতি এবং দার্শনিক, গবেষক ও তাত্ত্বিকদের রীতিতে এটাই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য।

চেতনার জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই উদাহরণটির মধ্য দিয়ে বনু নযীরের কাহিনী শেষ হলো। এর ফাঁকে ফাঁকে বিপুল সংখ্যক তত্ত্ব, দৃশ্য ও নির্দেশনার নীরব সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। সাময়িক ঘটনাবলী শাশ্বত সত্যগুলোর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এখানে বাস্তবতার জগতে ও বিবেকের জগতে এতো বড়ো একটা সফর সংঘটিত হয়ে গেছে, যা সীমানার বাইরে পর্যন্ত এমনি এমনিই সম্প্রসারিত হয়ে গেছে। আল্লাহর কেতাবে এই সফরের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার সাথে মানবীয় বই পুস্তকের বর্ণনার বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। মানুষের সৃষ্টি ও আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে যেমন অপরিমেয় পার্থক্য রয়েছে, এ পার্থক্যও ঠিক তদ্রূপ অপরিমেয়।

ঘটনার বর্ণনা, তার পর্যালোচনা ও মন্তব্য এবং সুদূরপ্রসারী তত্ত্বসমূহের সাথে তার সংযোগ সাধনের এই পর্যায়ে সূরাটি মোমেনদের সম্বোধন করছে। ঈমানের দোহাই দিয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। তাদের এমন একটা গুণের উল্লেখ করে আহবান করছে, যে গুণটি সম্বোধনকারীর সাথে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে এবং তার আদেশ পালন সহজতর করে তোলে। সে গুণটি হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। তাদের তাকওয়া অবলম্বন, আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ, সার্বক্ষণিক সচেতনতা, আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে না যাওয়ার আহবান জানিয়ে বলা হচ্ছে,

'হে মোমেনরা, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং প্রত্যেকের নযর দেয়া উচিত, সে আগামী কালের জন্যে কী পাঠিয়েছে........।' (আয়াত ১৮-২০)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ

রুকু ৩

১৮. (হে মানুষ), তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, (তোমাদের) প্রত্যেকেরই উচিত (একথাটি) লক্ষ্য করা যে, আগামীকাল (আল্লাহর সামনে পেশ করার) জন্যে সে কি (আমলনামা) পেশ করতে যাচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো; অবশ্যই তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ তায়ালা তার পূর্ণাংগ খবর রাখেন। ১৯. তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা (দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে) আল্লাহকে ভুলে গেছে এবং এর ফলে আল্লাহ তায়ালাও তাদের (নিজ নিজ অবস্থা) ভুলিয়ে দিয়েছেন; (আসলে) এরা হচ্ছে (আল্লাহর) না-ফরমান। ২০. জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসীরা কখনো এক হতে পারে না; (কেননা) জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। ২১. আমি যদি এ কোরআনকে কোনো পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি (অবশ্যই) তাকে দেখতে, কিভাবে তা বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে পড়ছে। আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্যে এ কারণেই বর্ণনা করছি, যেন তারা (কোরআনের মর্যাদা সম্পর্কে) চিন্তা ভাবনা করতে পারে। ২২. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, দেখা-অদেখা সব কিছুই তাঁর জানা, তিনি দয়াময়, তিনি করুণাময়। ২৩. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পূত পবিত্র, তিনি শান্তি (দাতা), তিনি বিধায়ক, তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল, তিনি মাহাত্ম্যের একক অধিকারী; তারা যেসব (ব্যাপারে আল্লাহর সাথে) শেরেক করছে, আল্লাহ তায়ালা সেসব কিছু থেকে অনেক পবিত্র। ২৪. তিনি আল্লাহ তায়ালা, তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টির উদ্ভাবক, সব কিছুর

الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

রূপকার তিনি, তাঁর জন্যেই (নিবেদিত) সকল উত্তম নাম; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (যেখানে) যা কিছু আছে তার সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর

আয়াত ১৮-২৪

তাকওয়া মনের একটা অবস্থার নাম, যার দিকে এই শব্দটি ইংগিত করে মাত্র, কিন্তু তার প্রকৃত ও পূর্ণ রূপ এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। এটি এমন এক অবস্থার নাম, যা প্রতি মুহূর্তে মনকে আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন, সংবেদনশীল, সদাজাগ্রত ও সদাসতর্ক রাখে। তাকে সর্বদা এই মর্মে ভীতসন্ত্র ও লজ্জাশীল রাখে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন অবস্থায় যেন না দেখেন, যা তিনি অপছন্দ করেন। প্রত্যেক হৃদয়ের ওপরই প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর দৃষ্টি রয়েছে। কাজেই কতোক্ষণ তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকার নিশ্চয়তা পাওয়া সম্ভব?

সময় থাকতে নিজের হিসাব নেয়া

'প্রত্যেকের নযর দেয়া উচিত সে আগামীকালের জন্যে কি পাঠিয়েছে?'

এখানে শব্দের চেয়ে মর্ম আরো প্রশস্ত, আরো ব্যাপক ও আরো সুদূরপ্রসারী। হৃদয়ের ওপর সতর্ক তদারকি দৃষ্টি রাখলে মোমেনের চোখের সামনে তার আমলনামাই শুধু নয়, তার গোটা জীবনের হিসাব নিকাশই উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই আমলনামার প্রতিটি লাইন সে পড়ে দেখতে পারে এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি থেকে বিস্তারিত বিষয় নিয়ে সে ভেবেও দেখতে পারে। এই আমলনামায় সে সহজেই দেখতে পারে আগামীকালের জন্যে কী জিনিস পাঠিয়েছে। এই চিন্তা-ভাবনা তার দুর্বলতা, ঘাটতি ও ভুলত্রুটির জায়গাগুলো সম্পর্কে তাকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে। সে যদি অনেক ভালো কাজও করে থাকে, তথাপি এরূপ চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস তাকে তার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে, আর যার সৎকাজের প্রচুর ঘাটতি রয়েছে, তার সম্পর্কে তো কথাই নেই। বস্তুত এটা এমন এক কাজ যা করার পর অন্তর আর কখনো শিথিল ও উদাসীন হবে না এবং কখনো নিজের কাজকর্মের হিসাব গ্রহণে অলসতা দেখাবে না।

আয়াতটি এভাবে অনুভূতি ও চেতনার মাঝে সাড়া জাগানোর পর ঈমানদারদের হৃদয়ে আবারো এই বলে করাঘাত করছে,

তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের তৎপরতা সম্পর্কে জ্ঞাত।'

এ বাক্য দুটো মানুষের হৃদয়কে আরো সচেতন, সতর্ক, লজ্জাশীল ও আরো আল্লাহভীরু করে তোলে।

এ আয়াতে যে সচেতনতা সতর্কতার আহবান জানানো হয়েছে, তারই প্রসংগ ধরে পরবর্তী আয়াতে সাবধান করা হয়েছে যেন তারা সেই লোকদের মতো না হয়, 'যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের আত্মভোলা বানিয়ে দিয়েছেন।'

এটা এক বিস্ময়কর অবস্থা হলেও সম্পূর্ণ বাস্তব। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে যায়, সে দুনিয়ার জীবন নিয়ে এতো মগ্ন হয়ে যায় যে, উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর জীবনের সাথে তার আর কোনো

সংযোগ থাকে না এবং তার জীবনের এমন কোনো মহত্তর লক্ষ্য থাকে না, যা তাকে ইতর প্রাণীর চেয়ে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর প্রাণী বানাতে পারে। এতে করে সে ভুলেই যায় যে সে মানুষ। এই সত্য থেকে আর একটা সত্যেরও উদ্ভব ঘটে। সেটি এই যে, নিজেকে ভুলে যাওয়ার কারণে সে তার পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে কোনো পাথেয় সংগ্রহ করে না এবং সে পাথেয় সংগ্রহ করার কথা ভাবেও না।

'তারাই ফাসেক।' অর্থাৎ তারা বিপথগামী।

পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা দোযখবাসী। মোমেনদের বলা হচ্ছে, তারা যেন জাহান্নামবাসীর পথ ছেড়ে দিয়ে জান্নাতবাসীর পথ অবলম্বন করে। জান্নাতবাসীর পথ জাহান্নামবাসীর পথ থেকে ভিন্ন।

'দোযখবাসী ও বেহেশতবাসী সমান নয়, বেহেশতবাসীরাই সফলকাম।'

অর্থাৎ তাদের স্বভাব চরিত্র, চাল চলন, মত পথ ও পরিণতি সবই পরস্পরের বিপরীত। কোনোটাই এক রকম নয়। দুটো পথ এমনভাবে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলে গেছে যে, কোথাও তা একত্রে মিলিত হয় না। আকার আকৃতিতেও নয়, প্রকৃতি এবং নীতিতেও নয়। দুনিয়া ও আখেরাতের কোথাও তা এক কাতারে মিলিত হয় না।

'জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।' এখানে কেবল জান্নাতবাসীর ফলাফল সম্পর্কেই বলা হয়েছে এবং জাহান্নামের অধিবাসীদের সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। ভাবখানা এই যে, ওটা তো একটা ব্যর্থ ও ভ্রান্ত পথ, ওটা নিয়ে আবার আলোচনার কী আছে?

আল কোরআনের প্রভাব

এরপর এমন একটা বক্তব্য আসছে যা সরাসরি হৃদয়ের অভ্যন্তরে ঢুকে যায় এবং তাতে তীব্র এক ঝাঁকুনির সৃষ্টি করে। এতে দেখানো হয়েছে, কোরআন জমাট পাথরের ওপর নাযিল হলে তাকেও প্রভাবিত করবে, 'যদি আমি পাহাড়ের ওপর এই কোরআন নাযিল করতাম, তবে তুমি সেই পাহাড়কেও আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে যেতে দেখতে।' এটা একটা কাল্পনিক দৃশ্য হলেও বাস্তবতাকে মোটামুটি প্রতিফলিত করছে। কেননা কোরআনের এমন একটা ভারিত্ব, শক্তি ও প্রভাব রয়েছে, যা অন্য জিনিসকে প্রকম্পিত করে এবং যে একে এর প্রকৃত মর্ম সহকারে গ্রহণ করে, সে স্থির থাকতে পারে না। একবার হযরত ওমর (রা.) যখন এক ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পড়তে শুনলেন, তখন তার ভেতরে এমন প্রতিক্রিয়া হলো যে, তিনি দেয়ালের ওপরে হেলে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর তিনি বাড়ীতে ফিরে গেলেন। এক মাস পর্যন্ত তার অসুস্থ ছিলেন এবং লোকজন তাকে দেখতে গিয়েছিলো। সে আয়াতগুলো ছিলো এই,

'তূর পাহাড়ের শপথ, লিপিবদ্ধ পুস্তকের শপথ, উন্মুক্ত পত্রের শপথ, বায়তুল মা'মুরের শপথ, সুউচ্চ আসমানের শপথ, উত্তাল সমুদ্রের শপথ, তোমার প্রভুর শপথ, নিশ্চয় তোমার প্রভুর শাস্তি অবধারিত, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না......।'

কিছু কিছু মুহূর্ত এমন আছে, যখন মানবসত্তা কোরআনের কিছু নির্যাস গ্রহণ করার জন্যে উন্মুক্ত ও উন্মত্ত হয়ে থাকে। কোরআন শোনার পর মানবসত্তা আপন মনে এমন কল্পনা ও ঝাঁকুনি অনুভব করে এবং তার ভেতরে এমন কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হয়, যা বস্তুজগতে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ন্যায় কাজ করে বা তার চেয়েও তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তায়ালা পাহাড়েরও সৃষ্টিকর্তা, কোরআনেরও নাযিলকারী। তিনিই বলেছেন, 'যদি আমি পাহাড়ের ওপর এই কোরআন নাযিল করতাম......' যারা তাদের সত্তায় কোরআনের পরশ

অনুভব করেছে, তারা এই সত্যটা এমনভাবে উপভোগ ও উপলব্ধি করে, যাকে এই আয়াতের ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব।

'এ হচ্ছে এমন সব উদাহরণ, যা আমি মানুষের জন্যে পেশ করে থাকি যাতে তারা চিন্তা করে।' অর্থাৎ এগুলো মানুষের মনে চিন্তার প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টির যোগ্যতাসম্পন্ন আয়াত।

আসমাউল হুসনা

সবার শেষে আসছে মহান আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহযুক্ত তাসবীহগুলো। এ তাসবীহগুলো যেন সমগ্র বিশ্বজগতের অস্তিত্বমূলে এবং তার যাবতীয় তৎপরতায় ও গুণবৈশিষ্ট্যে সুস্পষ্টভাবে বিরাজমান রয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতি শুধু আল্লাহর প্রশংসাই করে না; বরং সেই সাথে তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে দিয়ে তার স্বাক্ষরও দেয়,

'তিনি সেই মহান আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত। তিনি পরম দাতা ও দয়ালু। তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা, যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি মহা সম্রাট, পবিত্র, পরম শান্তিময়, নিরাপত্তাদাতা, আধিপত্যশীল, মহাপরাক্রমশালী, একনায়ক, অহংকারী এবং যাবতীয় শেরেক থেকে তিনি পবিত্র। তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা, যিনি সৃষ্টিকর্তা, আদি স্রষ্টা ও পরিকল্পনাকারী। সুন্দরতম নামগুলো শুধু তারই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তার গুণকীর্তন ও মহিমা ঘোষণা করে; তিনি মহা পরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।'

এ হচ্ছে পবিত্রতম গুণাবলী সম্বলিত এক বিস্তারিত প্রশংসা। এ প্রশংসা তিন পর্বে সম্পন্ন। প্রতিটি পর্বই তাওহীদের বক্তব্য দ্বারা সজ্জিত। যথা 'তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।'

এই সুন্দরতম নামগুলোর মধ্য থেকে প্রতিটি নামের প্রভাবই এ বিশ্বজগতে দৃশ্যমান এবং মানব জীবনেই অনুভূত। এই নাম ও গুণাবলী মানুষের হৃদয়কে তার কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত করে। মানবজগত ও জীবজগতের ওপর তার ইতিবাচক কার্যকারিতা বিস্তৃত হয়। এ গুণবাচক নামগুলো নেতিবাচক নয়, বিশ্বজগত থেকে বিচ্ছিন্নও নয়। বিশ্বজগতের সহজাত ও অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থা থেকে তা সংস্রবহীনও নয়।

'তিনিই সেই মহান আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।'

উক্তিটি দ্বারা মানুষের বিবেককে আকীদাগত একত্ব, এবাদাতের একত্ব এবং সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কর্তৃত্বের একত্ব ও একাধিপতিত্বের ধারণা দেয়া হয়েছে, আর এই একত্ব থেকে তাদের চিন্তা, চেতনা, কর্ম, আচরণ, বিশ্ব প্রকৃতি ও যাবতীয় প্রাণীর মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং সংযোগ সাধিত হয়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বের ভিত্তিতে একটা পূর্ণাংগ বিধান রচিত হয়।

'গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে তিনি অবহিত'– এ কথা দ্বারা মন মগযে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয়ে আল্লাহর জ্ঞান সর্বাত্মক। এ কারণে মন মগয গোপন ও প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ সম্পর্কে সাবধান হয়ে যায়। মানুষ সেই কাজই করে যা একমাত্র সর্বক্ষণ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সচেতন থাকলেই করা যায়। মানুষ একাকী অবস্থান করলেও সে একা নয়– এ চেতনা তার মনে বদ্ধমূল থাকে। আর এই চেতনার আলোকেই তার যাবতীয় আচরণ গঠিত হয়। এরপর তার মন কিছুতেই অসচেতন ও উদাসীন হয় না।

'তিনি পরম দাতা ও দয়ালু।' এ উক্তি দ্বারা আল্লাহর করুণা ও বদান্যতার ব্যাপারে এক দৃঢ় আস্থা তার অন্তরে বদ্ধমূল হয় এবং ভীতি ও আশা, উদ্বেগ ও নিশ্চিন্ততার মাঝে একটা ভারসাম্য

সৃষ্টি হয়। মোমেনের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের কখনো তাড়িয়ে দেন না, তাকে তিনি সতর্ক করেন আর তার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করেন। তাদের সৎপথে চলা তিনি পছন্দ করেন। তাদের অকল্যাণ, ক্ষতি ও অসৎ কাজে লিপ্ত হওয়া তিনি পছন্দ করেন না। তারা যখন অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তখন তাদের তিনি অসহায়ভাবে ছেড়ে দেন না। দ্বিতীয় আয়াতেও এ কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তিনিই সেই আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আসলে এই মূলনীতির ওপরই তাঁর যাবতীয় গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত।

'আল মালিক' বা সম্রাট ... এ দ্বারা অন্তরে এই ধারণা জন্মে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ যেমন নেই, তেমনি কোনো রাজাও নেই। তিনি যখন একাই রাজা ও একাই সম্রাট, তখন তিনি প্রজাদের একমাত্র প্রভুও। সবাই একমাত্র সেই প্রভুর অনুগত হবে, সেই প্রভুর সেবা করবে এটাই স্বাভাবিক। কোনো মানুষ একই সময়ে একাধিক প্রভুর সেবা বা দাসত্ব করতে পারে না। 'আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের অভ্যন্তরে দুটো হৃদয় সৃষ্টি করেননি।' (সূরা আহযাব)

'আল কুদ্দুস' বা 'মহাপবিত্র'- এই গুণবাচক নামটি মানুষের মনে সর্বত্রই ও সর্বাত্মক পরিচ্ছন্নতার ধারণা জন্ম দেয়। এ দ্বারা মানুষের মন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়, যাতে তা মহাপবিত্র সম্রাট আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভের যোগ্য হয়। 'আস সালাম' বা শান্তিময়। এ নামটিও বিশ্ব জগতে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার বিস্তার ঘটায়। মোমেনের অন্তরে তার প্রভু সম্পর্কে শান্তি এনে দেয়। তাই সে তার চারপাশের সকল বস্তু, প্রাণী ও মানুষের প্রতি শান্তিময় ও কল্যাণময় হয়ে যায়। এই নাম থেকে মানুষের মন লাভ করে পরম শান্তি, পরিতৃপ্তি ও নিরাপত্তা। তার প্রবৃত্তি এতে শান্ত হয়, তার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দূরীভূত হয় এবং তার সকল অতৃপ্তির নিরসন ঘটে।

'আল মোমেন' অর্থাৎ নিরাপত্তাদাতা ও ঈমানদাতা। এই নামটি উচ্চারণ করা মাত্রই হৃদয়ে ঈমানের গুরুত্ব অনুভূত হয়। কেননা এই নামটিতে সে আল্লাহর সাথে মিলিত হয় এবং আল্লাহর একটি গুণ 'মোমেন' দ্বারা নিজেও গুণান্বিত হয়। তাই সে ঈমান দ্বারা মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়।

'আল মোহাইমেন'- এ শব্দটি দ্বারা আল্লাহর গুণাবলীর আর একটা অধ্যায় সূচিত হয়। ইতিপূর্বে যে গুণগুলো শুধু আল্লাহর ব্যক্তিগত গুণ ছিলো, কিন্তু আল্লাহর এ গুণটি বিশ্ব প্রকৃতির সাথে ও মানব জাতির সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি গুণ। এগুলো বিশ্বময় কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট।

অনুরূপভাবে 'আল আযীয', 'আল জাব্বার' ও 'আল মোতাকাব্বের' অর্থাৎ যথাক্রমে মহাপরাক্রমশালী, একনায়ক ও অহংকারী। বস্তুত এগুলো আল্লাহর প্রতাপ, পরাক্রম, শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও একনায়কত্বের ধারণা দেয়। তিনি ছাড়া আর কেউ প্রতাপশালী নেই, কেউ একনায়ক নেই, আর কেউ অহংকারী নেই। তার এই গুণাবলীতে কেউ তার সাথে অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া আর কেউ এসব গুণে গুণান্বিত নয়। তিনি এককভাবে এসব গুণের অধিকারী। তাই আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে, 'তাদের শেরেক থেকে আল্লাহ পবিত্র।'

'তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা,' অর্থাৎ তিনি একক মাবুদ। তিনি ছাড়া আর কেউ মাবুদ নেই। 'আল খালেক' অর্থাৎ স্রষ্টা। সৃষ্টির পরিকল্পনা ও ভাগ্য নির্ধারণ এর অন্তর্ভুক্ত। আর 'আল বারেউ' শব্দের অর্থে ভাগ্য নির্ধারণ বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত। আর 'আল বারেউ' শব্দের অর্থও স্রষ্টা। তবে

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকটা এতে বেশী প্রাধান্য পায়। এই দুটো গুণ অত্যন্ত কাছাকাছি এবং এ দুটোর পার্থক্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

'আল মুসাওয়েরু'-এর অর্থও পরিকল্পক, অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসকে তার যথাযথ বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাদি দিয়ে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাদানকারী।

এই সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্বলিত, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত গুণাবলী মানুষের মন মগযকে, মানবীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী তার মনকে সৃষ্টি সৃষ্টির পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম ধাপে ধাপে পর্যবেক্ষণ করার প্রেরণা যোগায়, কিন্তু বাস্তব জগতে এসব পর্যায়ক্রমিকতা নেই। আমরা এই গুণবাচক নামগুলো থেকে শাব্দিকভাবে যা বুঝতে পারি, সেটাই তার প্রকৃত ও সর্বাত্মক রূপ নয়। প্রকৃত রূপ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। আমরা কেবল আমাদের সীমিত বোধশক্তির আওতায় তার কিছুটা নিদর্শন জানতে ও বুঝতে পারি মাত্র।

'সর্বোত্তম ও সুন্দরতম নামগুলো শুধু তার।' অর্থাৎ নামগুলো প্রকৃতপক্ষে সুন্দরতম, কেউ তাকে সুন্দরতম বলে স্বীকার করুক বা না করুক, তাতে কিছু এসে যায় না। সুন্দরতম তাকেই বলা হয়, যা অন্তরকে সর্বোত্তম সৌন্দর্যের ধারণা দেয় ও সৌন্দর্য দিয়ে মনকে ভরে দেয়। এই নামগুলো নিয়ে মোমেনের চিন্তা ভাবনা করা উচিত। যাতে এর প্রেরণা ও চেতনার আলোকে নিজেকে তারা গড়ে তুলতে পারে। কেননা সে এ দ্বারা জানতে পারে, আল্লাহ তায়ালা এ সব গুণ দ্বারা বান্দার গুণান্বিত হওয়া পছন্দ করেন। এ থেকে তার নিজেকে উন্নতি ও উৎকর্ষের দিকে ধাবিত করা উচিত।

সুন্দরতম নামগুলোর তাসবীহ বা প্রশংসা শেষ হলো। সূরার শেষাংশে এসে সমগ্র বিশ্বজগতকে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহে মুখরিত দেখানো হয়েছে,

'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সকলেই তার গুণগান ও প্রশংসা করে এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

বস্তুত এই গুণাবলীর উল্লেখের পরে স্বভাবতই প্রত্যেকের মনে এই দৃশ্যই প্রত্যাশিত হয়ে ওঠে এবং সকল জড় ও জীবের সাথে সে নিজেও এখানে অংশ গ্রহণ করে। আর এই একই বক্তব্য দিয়ে সূরা শুরু এবং শেষ হওয়ায় এর সমন্বয়েও পূর্ণতা লাভ করেছে।

সূরা আল মোমতাহেনা

আয়াত ১৩ রুকু ২

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ۗ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِىْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ۗ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝ اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۝ لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (কখনো) আমার ও তোমাদের দুশমনদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। (এটা কেমন কথা যে) তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাচ্ছো, (অথচ) তোমাদের কাছে যে সত্য (দ্বীন) এসেছে তারা তা অস্বীকার করছে, তারা আল্লাহর রসূল এবং তোমাদের– (তোমাদের জন্মভূমি থেকে) বের করে দিচ্ছে– শুধু এ কারণে, তোমরা তোমাদের মালিক আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো; যদি তোমরা (সত্যিই) আমার পথে জেহাদ ও আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (ঘরবাড়ি থেকে) বেরিয়ে থাকো, তাহলে কিভাবে তোমরা চুপে চুপে তাদের সাথে (আবার) বন্ধুত্ব পাতাতে পারো! তোমরা যে কাজ গোপনে করো আর যে কাজ প্রকাশ্যে করো আমি তা সম্যক অবগত আছি; তোমাদের মধ্যে যদি কেউ (দুশমনদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব গড়ার) এ কাজটি করে, তাহলে (বুঝতে হবে) সে (দ্বীনের) সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। ২. অথচ এরা যদি তোমাদের কাবু করতে পারে, তাহলে এরা তোমাদের শত্রুতে পরিণত হবে (শুধু তাই নয়), এরা নিজেদের হাত ও কথা দিয়ে তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে, (আসলে) এরা তো এটাই চায় যে, তোমরাও তাদের মতো কাফের হয়ে যাও; ৩. কেয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয় স্বজন ও সন্তান সন্ততি তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না, সেদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের

بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي

إِبْرَٰهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ

مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا

حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ

أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا

وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ ۖ

إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن

كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ۝

মাঝে বিচার ফয়সালা করে দেবেন; তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন। ৪. তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের (ঘটনার) মাঝে রয়েছে (অনুকরণযোগ্য) আদর্শ, যখন তারা তাদের জাতিকে বলেছিলো, তোমাদের সাথে এবং তোমরা যাদের আল্লাহর বদলে উপাসনা করো তাদের সাথে আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই, আমরা তোমাদের এ সব দেবতাদের অস্বীকার করি। (একারণে) আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরদিনের জন্যে এক শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেলো– যতোদিন তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে মাবুদ (বলে) স্বীকার না করবে, কিন্তু (এ ব্যাপারে) ইবরাহীমের পিতার উদ্দেশে বলা এ কথাটি (ব্যতিক্রম, যখন সে বলেছিলো), আমি তোমার জন্যে (আল্লাহর দরবারে) অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো, অবশ্য আল্লাহর কাছে থেকে (ক্ষমা আদায় করার) আমার কোনোই এখতিয়ার নেই; (ইবরাহীম ও তার অনুসারীরা বললো,) হে আমাদের মালিক, আমরা তো কেবল তোমার ওপর ভরসা করেছি এবং আমরা তোমার দিকেই ফিরে এসেছি এবং (আমাদের) তো তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে। ৫. হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের (জীবনকে) কাফেরদের নিপীড়নের নিশানা বানিয়ো না, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি পরাক্রমশালী ও পরম কুশলী। ৬. তাদের (জীবন চরিত্রের) মাঝে অবশ্যই তোমাদের জন্যে এবং সে লোকের জন্যে (অনুকরণযোগ্য) আদর্শ রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং শেষ বিচারের দিনে কিছু পাবার আশা করে; আর যদি কেউ আল্লাহ তায়ালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সকল প্রশংসার মালিক।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটি কোরআনের সেই সূরাগুলোর অন্যতম, যেগুলো ঈমানী যিন্দেগী, সামাজিক সংগঠন এবং কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে নাগরিক জীবন যাপনের জন্যে মুসলমানদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ঈমানী জীবনের প্রশিক্ষণদানের সুদীর্ঘ শেকলের মধ্য থেকে এ সূরাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কড়ি, অথবা বলা যায়, উম্মতে মুসলিমার সামাজিক জীবন যাপনের জন্যে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে যে ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়েছে, এ সূরাটিতে সেই শিক্ষা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে ওঠেছে এবং বাস্তব একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গোটা মানব জাতিকে সঠিক পথ পেতে সাহায্য করেছে। এই ভাবে আল্ কোরআন সামাজিক জীবন যাপনের জন্যে যে শিক্ষা উপস্থাপন করেছে তার থেকে মানব জাতি কখনও শিক্ষা গ্রহণ করেছে, আবার কখনও এ শিক্ষা থেকে সে দূরে সরে গেছে, কিন্তু আমরা যারা ইসলামকে একমাত্র সঠিক জীবন ব্যবস্থা হিসেবে বুঝতে পেরেছি, তারা সদা সর্বদা সর্বপ্রকার চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে সে জীবন ব্যবস্থা আঁকড়ে ধরে রয়েছি এবং আশায় বুক বেঁধে রয়েছি যে, একদিন গোটা পৃথিবীর বুকে অবশ্যই এই জীবন ব্যবস্থা একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কায়েম হবে।

অবশ্যই এক সময়ে এ জীবন ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যার ইংগিত সূরাটির শুরুতে দান করা হয়েছে। এ জন্যে ইসলামের সূচনালগ্নে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দান করা হয়েছে। এই দলীয় সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এবং আল্লাহর জানামতেই এসব ঘটনা ঘটেছে, অর্থাৎ যা কিছু ঘটেছে বা ঘটছে, সব আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটেছে।

পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান চালু করার ব্যাপারে যে সব মানুষ চেষ্টা সাধনা ও কর্মকান্ডে নিয়োজিত থেকেছে, তাতে কখনও দুঃখ কষ্ট এসেছে, আবার কখনও মানুষ জীবনের নিত্য নতুন স্বাদ লাভ করেছে। তাই সত্যের এই প্রদীপ্ত আলো যখন উদ্ভাসিত করে দেবে গোটা ধরণীকে, তখন ঈমানের নতুন এই চেতনার কারণে অন্য সব কিছু থেকে মানুষ পৃথক হয়ে যাবে এবং ঈমানদারদের দলভুক্ত থাকার জন্যে চমকপ্রদ যে কোনো ব্যক্তি বা জিনিসের সাথে সম্পৃক্ততা পরিত্যাগ করবে। সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী এই ঈমানী চিন্তাধারা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই প্রয়োজন ছিলো সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণই মানুষের মনমগয ও প্রকৃতিকে তৎকালীন বিরাজমান সকল প্রকার ভুল ভ্রান্তি ও সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত জাহেলিয়াতের চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করেছিলো; বিশেষ করে আরব উপদ্বীপের সকল পাপপূর্ণ চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলো। ঈমানের এই মহীয়ান চিন্তার বিকাশ যাদের মধ্যে ঘটে, তারা জীবনের বাস্তবতা থেকে কিছুতেই দূরে থাকতে পারে না এবং বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর ঘটনা তারা এড়িয়েও চলতে চায় না; বরং তারা দিনের পর দিন এবং একবারের পর আর একবার নানা প্রকার দুর্ঘটনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এবং তাদের কোনো একটি বিষয় ও একটি সৃষ্টির দিকে বার বার ফিরে যেতে হয়, নানা প্রকার প্রভাবপূর্ণ জিনিসের অধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালাই তো সকল ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি ভালো করেই জানেন সব জিনিসের প্রভাব এক রকম হয় না এবং সৃষ্টির প্রথম থেকেই একইভাবে সব কিছু থেকে মানুষ প্রভাব গ্রহণ করে না, একইভাবে সব কিছুতে সাড়াও দেয় না এবং এক নযরে সব কিছু তারা দেখতে পায় না। সে একথা জানে এবং স্বীকারও করে যে, অতীতের অনেক রীতিনীতি, মানুষের স্বভাব প্রকৃতির ঝোঁকপ্রবণতা, মানবীয় দুর্বলতা, বাস্তবে সমাজের লোকদের সাথে মেলামেশা, আপনজন ও সংগী-সাথীদের মতের গুরুত্বদান ও তাদের অভ্যাসের প্রভাব- এসব কিছুই মানুষের মধ্যে এমন কঠিন

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যে, একের পর এক সঠিক প্রশিক্ষণ অনুযায়ী কাজও বাধাগ্রস্ত হয়ে যায়। এই জন্যেই এ সকল বাধা বিপত্তির মোকাবেলার কথা বার বার স্মরণ করানোর প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় নিবিড় ও আকর্ষণীয় সম্পর্ক স্থাপন করার। এর ফলেই আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী অপ্রীতিকর ঘটনাসমূহ ঘটতে থাকে। এই কারণে উপর্যুপরি পরামর্শ দেয়া হয়, আর তারই আলোকে সে সতর্ক হতে থাকে এবং এই পথ প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বার বার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। রসূলুল্লাহ (স.) প্রকৃতপক্ষে বরাবরই জাগ্রত থাকতেন এবং আল্লাহর কাছ থেকে যে স্পষ্ট পথনির্দেশনা (এলহাম) পেতেন তারই আলোকে আগত সমস্ত সমস্যার সমাধান দান করতেন, আর তাঁর প্রিয় সাহাবাদের চূড়ান্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে গড়ে তোলার জন্যে কাজে লাগাতেন। রসূলুল্লাহ (স.)-এর যামানায় ওহী এবং এলহাম পরস্পর সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে এবং একটি অপরটিকে বলিষ্ঠ করেছে। এরই ফলে তাঁর হাতে এই মুসলিম জামায়াত আল্লাহর ইচ্ছাতেই তাঁর পছন্দনীয় দল হিসেবে গড়ে ওঠতে সক্ষম হয়েছিলো।

আলোচ্য সূরাটি এ দীর্ঘ প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ধারার মধ্যে একটি বিশেষ ধারা। সূরাটির বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে আনীত অন্যান্য বিষয়ের সাথে রয়েছে; মুসলমানদের একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি একান্তভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। এই বিশ্বাসের দৃঢ়তার ভিত্তিতেই মুসলমানরা পরস্পর নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ এমন এক রশির বাঁধন যা কখনও ছিন্ন হয় না। এ বন্ধনের কারণে সকল প্রকারের গোত্রীয় বা বংশীয় হিংসা বিদ্বেষ বিদূরিত হয়। এই মহান ঈমানী সম্পর্কের ফলে বংশীয় ও শ্রেণীগত আভিজাত্যবোধ, বিদ্বেষ এবং ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদী মনোভাব দূরীভূত হয়েছিলো এবং তাদের সবার মধ্যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর পতাকাতলে সমবেত হয়ে একটি দলে আবদ্ধ হয়ে থাকাই প্রাধান্য পেয়েছিলো।

ইসলাম যে জগত গড়তে চায় তা হচ্ছে সম্পূর্ণ এক আল্লাহমুখী জগত, মানুষের প্রতি মমত্ববোধের জগত। আল্লাহমুখীতার অর্থ হচ্ছে, মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির পথে ও তাঁর নির্দেশ পালনার্থে নিয়োজিত হবে। তার চিন্তা চেতনা ও কাজ হবে আল্লাহকেন্দ্রিক। আর মানবকেন্দ্রিক বলতে বুঝায় মুসলমানের সকল কাজ ও ব্যবহার হবে গোটা মানব জাতির শান্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে নিয়োজিত। সকল বিশ্বাসের মূল লক্ষ্য হবে এই মানব কল্যাণ। বর্ণ, ভাষা, এলাকা, দেশ ও রাষ্ট্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মুক্তি এবং কল্যাণ সাধনই হবে মুসলমানের চেষ্টা ও সকল সাধনার কেন্দ্রবিন্দু। এই উদ্দেশ্যেই মানুষে মানুষে পার্থক্য নির্ণীত হবে এবং তাদের কাছে ঈমান ব্যতীত অন্য কোনো সম্পর্কই প্রাধান্য পাবে না। এই আল্লাহমুখী মহান জগতই হবে আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান লোকদের জন্যে আরামদায়ক বাসস্থান, যেখানে আল্লাহর রহমতের বারিধারা অবিরত বর্ষিত হবে।

এই শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে গিয়ে আমাদের বহু পর্যায় ও দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়। তৎকালীন আরবের পরিবেশে যেমন এসব পর্যায় ও কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়েছিলো, তেমনি আজও বিশ্বের সবখানে অনেক পর্যায় ও কন্টকাকীর্ণ পথ পার হতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম জটিল পথ হচ্ছে নিজ বাড়ীর লোকের প্রতি দুর্বলতা, নিজ গোত্রের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ, নিজ জাতির প্রতি দুর্বলতা, নিজ শ্রেণী (নারী বা পুরুষ)-এর প্রতি দুর্বলতা এবং নিজ এলাকা ও এলাকাবাসীদের প্রতি দুর্বলতা এবং কোনো বিশেষ এলাকার জন্যে দুর্বলতা। এমনি করে মানসিক ঝোঁকপ্রবণতা এবং অন্তরের চাহিদা, লোভ লালসা, সংকীর্ণতা, ধনসম্পদ ও বিভিন্ন বিলাসদ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ, প্রাধান্য লাভের খাহেশ এবং অনেক সময় কৃচ্ছ্র সাধনের প্রবণতা পোষণ করা– এই ধরনের নানাবিধ অবস্থা ও পর্যায় মানুষকে অতিক্রম করতে হয়।

পৃথিবীর বুকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ইসলামী দলের মধ্যে বিরাজমান উপরোক্ত সর্বপ্রকার অবস্থা কার্যত সামাল দিয়েই পূর্ণাংগ ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা হয়েছে। আলোচ্য সূরাতে সামাজিক এসব সমস্যার মধ্যে একটি বিশেষ সমস্যার আলোকে সমাধান এসেছে।

যে সকল মোহাজের মুসলমান তাদের ঈমান আকীদা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের দেশ ও সহায় সম্পদ পরিত্যাগ করে মদীনার পথে পাড়ি জমিয়েছিলেন, তাদের অনেকেরই অন্তর প্রাণ পরিত্যক্ত মাতৃ-ভূমিতে আবদ্ধ বিবি-বাচ্চা ও আত্মীয়স্বজনের জন্যে উদ্বেলিত ছিলো, আর মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা ও অপমান সহ্য করা সত্তেও তারা আশা করতেন যে, তাঁদের ও মক্কাবাসীদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও ভালবাসা স্থাপনের কোনো দুয়ার যদি খুলে যেতো, পরিসমাপ্ত হতো যদি এই ঝগড়া বিবাদ ও নিষ্ঠুরতার, যার কারণে তাদের ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ-বিগ্রহের দাবানল জ্বলে ওঠেছিলো এবং তাদের সকল আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই লোকদেরকে সকল দিক দিয়ে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন তাদের এ সমস্ত ক্রটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করতে, যার কারণে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশ, এ ব্যবস্থার প্রতি অবিচল আস্থা এবং এর কল্যাণকর দিকগুলো তিনি পুরোপুরিভাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে নিহিত দুর্বলতাগুলো ভালো করেই জানেন। জানেন জাহেলী যামানায় গড়ে ওঠা তাদের নানা প্রকার সংকীর্ণতা সম্পর্কেও। বিশেষ করে আরবদের মধ্যে বংশীয় ও গোত্রীয় আভিজাত্যবোধ অত্যন্ত তীব্রভাবে বিরাজ করতো। ঘরে ঘরে ছিলো এসব সংকীর্ণ মনোবৃত্তি। তাই আল্লাহ পাক ধীরে ধীরে এক এক করে সেই সকল মানসিক ব্যাধি দূর করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, যাতে করে এ কঠিন ব্যাধিগুলো দূর করা তাদের জন্যে সহজ হয়ে যায়। এ সূরার মধ্যে যে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে আয়াত নাযিল হয়েছে, সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, প্রকৃতপক্ষেই সে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো, কিন্তু সরাসরি ওই ঘটনা সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলেও উক্ত আয়াতের বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী, শুধুমাত্র সে ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তায়ালা স্থায়ীভাবে একটি শিক্ষা দান করেছেন, যা মানুষের জন্যে চিরদিনের তরে এক দিকনির্দেশনা হয়ে থাকবে।

উক্ত ঘটনা সম্পর্কে যা জানা যায় তা হচ্ছে এই, হাতেব ইবনে আবী বালতায়' (রা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারী ব্যক্তিদের অন্যতম (মোহাজের) এবং বদর যুদ্ধে যোগদানকারী সাহাবীদের মধ্যেও একজন ছিলেন। মক্কা শরীফে তাঁর সন্তনাদি ও সহায় সম্পদ ছিলো। অথচ তিনি কোরায়শ গোত্র উদ্ভূত ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন হযরত ওসমানের মিত্র ও তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ একজন বিদেশী মানুষ। এ সময় মক্কাবাসীরা হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভংগ করায় রসূল (স.) মক্কা অভিযানের মনস্থ করলেন এবং মুসলমানদের যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে নির্দেশ দিলেন ও বললেন, 'ওদের থেকে খবরটি গোপন রেখো' (এই এ জন্যে, যেন প্রস্তুতি সম্পর্কে কোরায়শরা জানতে না পারে)। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতির কথা মুসলমানদের মধ্য থেকে যাদের জানালেন, তাদের মধ্যে হাতেব ইবন আবী বালতায় ছিলেন অন্যতম। অতপর হাতেব মক্কা নগরী থেকে আগত মোযায়না গোত্রোদ্ভূত এক মহিলার হাতে রসূল

(স.)-এর মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনা সম্বলিত একটি চিঠি মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে করে মক্কাবাসীদের প্রতি তাঁর এহসান প্রদর্শনের একটি প্রমাণ থাকে। এ মহিলাটি নাচ-গান করে তার জীবিকা নির্বাহ করতো এবং এই উদ্দেশ্যেই সে মদীনায় এসেছিলো। রসূল (স.) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন যেন তাঁর মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনার কথা গোপন থাকে। আল্লাহ তায়ালা এ দোয়া কবুল করেছিলেন এবং চেয়েছিলেন যেন মক্কা বিজিত হয়, তাই তিনি রসূল (স.)-কে এ খবর পাচারের ঘটনা জানিয়ে দিলেন। ফলে রসূল (স.) সে মহিলাটিকে ধরার জন্যে সংগে সংগে লোক পাঠালেন এবং তার থেকে পত্র উদ্ধারও করা হলো।

বোখারী শরীফে কেতাবুল মাগাযীতে (যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায়) এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিমও তাঁর কেতাব সহীহ মুসলিম শরীফে হোসায়ন ইবনে আবদুর রহমানের বরাত দিয়ে আলী (রা.) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) আমাকে, আবূ মারসাদ এবং যোবায়ের ইবনুল আওয়ামকে (একটি চিঠি উদ্ধারের জন্যে) পাঠালেন। আমরা সবাই ঘোড়-সওয়ার ছিলাম। আমাদের তিনি বলে দিলেন, 'তোমরা সে মহিলাটিকে ধরার জন্যে 'রওদাতুল খাক' নামক স্থানে যাবে। সেখানে তোমরা মোশরেক এই মহিলাকে পাবে। তার কাছে মোশরেকদের হাতেব ইবনে আবী বালতায়ার পক্ষ থেকে লিখিত একটি চিঠি পাবে।' আলী (রা.) বলেন, আমরা উক্ত মহিলাকে তার উটের ওপর সওয়ার অবস্থায় সেই স্থানে পেলাম, যেখানে পাবো বলে রসূল (স.) বলেছিলেন। আমরা বললাম, চিঠিটি কই? সে বললো, আমার কাছে কোনো চিঠি নেই। এরপর আমরা উটটিকে বসিয়ে দিয়ে চিঠিটি খোঁজ করলাম, কিন্তু চিঠি পেলাম না। তখন আমরা বললাম, এটা নিশ্চিত, রসূল (স.) মিথ্যা বলেননি, অবশ্যই তোমার চিঠি বের করে দিতে হবে, নচেত আমরা তোমাকে উলংগ করে চিঠি অনুসন্ধান করবো। আমাদের এই দৃঢ়তা দেখে সে নতি স্বীকার করলো এবং কাপড় দিয়ে বাঁধা তার চুলের বেণীর মধ্য থেকে চিঠিটি বের করে দিলো। আমরা চিঠিখানা নিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে পৌঁছে দিলাম। এ অবস্থা দেখে ওমর (রা.) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, এ ব্যক্তি (হাতেব) আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনদের সাথে গাদ্দারী করেছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান মেরে দেই।' তখন নবী (স.) সে ব্যক্তি (হাতেব)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করলো?' হাতেব বললেন, আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাসী ব্যতীত অন্য কিছু অবশ্যই নই। ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি চেয়েছিলাম উক্ত (কোরায়শ) জাতির প্রতি আমার কিছু এহ্সান থাকুক, যার ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা মক্কায় অবস্থিত আমার পরিবার ও ধন সম্পদ রক্ষা করবেন। আপনার অন্য সাহাবাদের সবারই মক্কাতে আত্মীয়স্বজন আছে, যারা (মক্কা বিজয়কালে) তাদের পরিবার ও ধনসম্পদ রক্ষা করতে পারবে। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হা, সে সত্য কথাই বলেছে, তাকে ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু বলো না।' তখন ওমর (রা.) বললেন (না, ইয়া রসূলাল্লাহ), সে অবশ্যই আল্লাহ, রসূল ও মোমেনদের সাথে খেয়ানত (বিশ্বাস ভংগ) করেছে। আমাকে ছাড়ুন, তাকে আমি কতল করে দেই। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'সে কি বদরী সাহাবী নয়?' আরও বললেন, সম্ভবত আল্লাহ বদরী সাহাবীদের (তাদের মর্যাদা সম্পর্কে) জানাতে গিয়ে বলেছেন, 'যা খুশী তাই করো, অবশ্যই তোমাদের জন্যে জান্নাত ওয়াজেব হয়ে গেছে, অথবা (এভাবে বলা হয়েছে), অবশ্যই আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি। বদরী সাহাবীদের এ মর্যাদার কথা শুনে হযরত ওমর (রা.)-এর চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো এবং তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। বোখারী শরীফে কেতাবুল মাগাযীতে

আর একটি কথা বেশী এসেছে, এরপর আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটি নাযিল করলেন, 'হে মোমেনরা, আমার দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে গিয়ে তাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করো না।' আর এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, যাদের (ওরা স্ত্রীলোকটির সন্ধানে) পাঠানো হয়েছিলো, তারা ছিলেন আলী, যোবায়র ও মেকদাদ।

এই ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে একটু থামুন এবং দেখুন, এ ঘটনা থেকে আল্লাহ তায়ালা কি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, যা এ কেতাব 'ফী যিলালিল কোরআনে' পাওয়া সম্ভব নয়। এ শিক্ষা একমাত্র কোরআনে বর্ণিত অভূতপূর্ব প্রশিক্ষণ ধারা, এর মধ্যে বর্ণিত ঘটনাবলী, ব্যাখ্যা এবং রসূলুল্লাহ (স.) থেকে প্রাপ্ত ধরপাকড়ের কাজ এই নিয়ম থেকে গ্রহণ করতে পারি, যেহেতু তিনিই আমাদের সবার একমাত্র নেতা, মহাপরিচালক ও মুরব্বী।

এ প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে মানুষ প্রথম যে অবস্থা দেখতে পায় তা হচ্ছে 'হাতেব'-এর আচরণ। তিনি ছিলেন একজন মোহাজের মুসলমান এবং সেই গুটিকয়েক ব্যক্তির একজন যাদের নিকট রসূলুল্লাহ (স.) মক্কাভিযানের বিষয় প্রকাশ করেছিলেন। এ অবস্থায় মানুষের যে সকল অদ্ভুত মানসিক অবস্থার প্রকাশ ঘটে, যে দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং তার মধ্যে যে পূর্ণত্ব ও শক্তির স্ফুরণ দেখা দিতে পারে তা সবই এখানে ফুটে ওঠেছে। এ কথা অবশ্যই সত্য, এমন সব দুর্বলতার মুহূর্তে ক্ষতিকর যে কোনো পদক্ষেপ বা কোনো ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই বাঁচাতে পারেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই এসব কঠিন অবস্থায় সাহায্য করেন।

এরপর রসূল (স.)-এর মহত্ত্বের সামনে মানুষ থমকে দাঁড়ায়। সে দেখতে পায়, রসূলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞেস না করে, আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না দিয়ে ব্যস্ত হয়ে হঠাৎ কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। বলছেন, কোন জিনিস তোমাকে এহেন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করলো! রসূলুল্লাহ (স.)-এর হৃদয়ে তাঁর সাহাবীর হৃদয়াবেগের প্রতি কী মধুর দরদ, কী চমৎকার সহানুভূতি। এ দরদ ও সহানুভূতি দ্বারা তিনি তাঁর সংগীকে, তার অন্তরে লুকায়িত সত্য ফুটিয়ে তোলার সুযোগ করে দিচ্ছেন এবং তার কথা সত্য বলে গ্রহণ করছেন। আরও লক্ষণীয়, অন্যদের শক্ত কথা বলা থেকে থামাতে গিয়ে রসূল (স.) বলছেন, 'হাঁ, সে সত্য কথাই বলেছে, তাকে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু বলো না।' এই ভুলের কারণে তিনি (হাতেব) অনুতাপের যে আগুনে দগ্ধীভূত হচ্ছিলেন তা রসূল (স.) সঠিকভাবে বুঝতে পেরেই তো সেই কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে এই কথাগুলো বললেন, আর এ জন্যে নিজে তো কোনো তিরস্কার করলেনই না, অন্য কাউকেও তিরস্কার করতে দিলেন না। অপরদিকে; হযরত ওমর (আ.)-এর সে কঠিন কথাতে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো ক্রোধের প্রকাশ ঘটেনি; বরং সে রাগ ছিলো তাঁর দৃঢ় ঈমান ও অকাট্য যুক্তিপূর্ণ কাজের প্রতি নিষ্ঠার বহিপ্রকাশ। 'অবশ্যই এই আচরণ দ্বারা সে আল্লাহ, রসূল ও মুসলমানদের সাথে বে-ঈমানী করেছে, অতএব আমাকে অনুমতি দিন তাকে আমি কতল করে দেবো।' একথা বলার কারণ, ওমর (রা.)-এর নযরে হাতেবের এই পদস্খলন প্রকটভাবে ধরা পড়াতেই তাঁর অনুভূতি টনটন করে ওঠেছে এবং তাঁর বলিষ্ঠ ঈমানে তীব্রভাবে সাড়া জেগেছে। অপরদিকে রসূল (স.) অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে সকল দিক বিচার বিবেচনা করে অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন এবং মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সঠিক মূল্যায়ন করে দরদ সহানুভূতির সাথে চিন্তা করেছেন এবং কী প্রেরণাদায়ক কথা বলেছেন, যার ফলে প্রকৃত সত্য কথা বেরিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে। এই ছিলো সেই মহান ও মুরব্বী নেতার ভূমিকা, যিনি সমস্যার গভীরে তাকিয়ে সকল সত্য বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এরপর যখন মানুষ 'হাতেব'-এর কথাগুলো সামনে রাখে, তখন বুঝতে পারে, এক দুর্বল মুহূর্তে তার দ্বারা এ ভুল সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ পাকের প্রতি তার নিষ্ঠা এবং তার নির্দেশ পালনের ব্যাপারে তার একাগ্রতার মধ্যে কোনো ত্রুটি বা কমতি নেই, আর এই নিষ্ঠাই প্রকাশ

পেয়েছে এ কথায় যখন তিনি বলেছেন, 'আমি শুধু মাত্র চেয়েছিলাম সে (কোরায়শ) জাতির প্রতি আমার এহ্সান দেখাতে, যার ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা আমার পরিবার ও ধন-সম্পদ হেফাযত করবেন।' তাঁর কথায় এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিলো যে, সহায় সম্পদ ও পরিবার হেফাযত করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এই এহ্সানই নিজে কোনো হেফাযতকারী নয়, এর ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা হেফাযত করবেন। তাঁর পরবর্তী কথায় এ বিশ্বাসের প্রতিফলন জোরদারভাবে ঘটেছে যখন তিনি বলেছেন, 'আপনার সাহাবীদের যারাই সেখানে আছে তাদের সবারই আত্মীয়স্বজন সেখানে রয়েছে, যাদের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা তাদের ও তাদের সম্পদ রক্ষা করবেন।' একথায়, তাঁর ধ্যান ধারণায় আল্লাহর চেতনা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে তিনিই যে পরিবারের একমাত্র রক্ষাকারী, আত্মীয়স্বজন রক্ষাকারী নয়, বরং তারা হচ্ছে ওসীলা, তার অন্তরের এ বিশ্বাস পরিষ্কার বুঝা যায়।

আর সম্ভবত এই কারণেই রসূল (স.)-এর তীব্র অনুভূতি একথা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলো যে, তিনি (হাতেব) কোনো মিথ্যা বা বানাওটি কথা বলেননি, এটিই হচ্ছে রসূল (স.)-এর এই বলার কারণ, 'সে সত্য বলেছে, তাকে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু বলো না।'

কোনো ঘটনার মধ্যে আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালাই চূড়ান্তভাবে কাজ করে– তাকদীরের এ বিধান কেউ লংঘন করতে পারে না। হাতেব ইবনে আবী বালতায়া তাঁর নিজ সংকটের কারণেই মক্কা আক্রমণের খবর পূর্বাহ্নে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো না এ খবর মক্কাবাসীর কাছে পৌঁছে যাক যার জন্যে তিনিই এ পাচারের সংবাদ মুসলমানদের স্বার্থে রসূল (স.)-কে জানানোর ব্যবস্থা করলেন। এটাই তাকদীর, যা আল্লাহর ইচ্ছাতেই নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সে ইচ্ছার কাছে অন্য সবার ইচ্ছা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই দেখা যায়, আল্লাহ তায়ালা এ খবর পাচার শুধু বন্ধই করলেন না; বরং এ সম্পর্কে কানাকানি জানাজানিও বন্ধ করে দিলেন। এভাবে এ ঘটনা থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, কাউকে কোনো তথ্য গোপন রাখার দায়িত্ব দিলে সে যদি খেয়ানতও করে, তবু তার প্রতি একমাত্র ধারণার ভিত্তিতে কোনো কঠিন পদক্ষেপ নেয়া উচিত হবে না। বিশেষ করে মুসলমানদের নেতৃবৃন্দের জন্যে এ বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্ব বহন করে। নেতৃবৃন্দ যেন তার ভাইদের ত্রুটি বিচ্যুতির ব্যাপারে সতর্ক থাকে। এ ঘটনাটি মোতাওয়াতের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত (অর্থাৎ, এতো অধিক সংখ্যক লোক এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে যে, তারা সবাই একযোগে একটি ভুল কথা প্রচার করতে পারে তা মানুষের কল্পনাতেও আসে না)। এ বিষয়টির ওপর কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, তাও বোখারী শরীফের একটি রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়। এ রেওয়ায়াতের সত্যতাকে আমরা দূরে নিক্ষেপ করতে পারি না; বরং আমরা তো বলেছি, কোরআনের আয়াতের ভাষা সন্দেহ দূর করার ব্যাপারে সব থেকে বেশী সহায়ক এবং হাতেবের যে ঘটনাটি সম্পর্কে মোতাওয়াতের বর্ণনাধারা এসেছে তা সে ঘটনার সত্যতা সেভাবে প্রমাণ করে যেভাবে কোরআনের আয়াত প্রমাণ করে।

এ ঘটনাটি পারিবারিক জীবনের জটিলতা এবং পরিবারের নিকটস্থ লোকদের জন্যে মানুষের দুর্বলতা যে কত বেশী তা তুলে ধরেছে এবং সে ক্ষেত্রে তাদের প্রতি কতটা রেয়ায়াত করা যেতে পারে তাও তুলে ধরা হয়েছে, যাতে করে বিশ্ব মুসলিমের জীবনকে সংকট সমস্যা থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

হাদীসটি এসব পরিবারের কর্তাদের এক নতুন চিত্র তুলে ধরেছে, নতুনভাবে তাদের মূল্যায়ন করেছে, নতুনভাবে তাদের পরিমাপ করেছে। গোটা সৃষ্টির জীবন ও মানবতা সম্পর্কে নতুন এক চিন্তাধারা পেশ করেছে । পেশ করেছে পৃথিবীতে মোমেনরা কি দায়িত্ব পালন করবে সে সম্পর্কে এবং মানব জাতির মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ।

আর এ যেন আল্লাহরই সাহায্যে তৈরী সৃষ্টি মল্লিকার মধ্যে গ্রথিত সর্বপ্রকার পত্রপল্লবের এক বিপুল সমারোহ, যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে তাদের মৌলিক সত্য সম্পর্কে জানাতে এবং তার সৃষ্টি ও জীবন লক্ষ্য সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করতে চেয়েছেন। এ ঘটনার মাধ্যমে তিনি তাদের দুশমনদের শত্রুতার ধরন ও নানা প্রকার চক্রান্তের প্রকৃতি তাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন, আর স্পষ্টভাবে তাদের বলে দিতে চেয়েছেন, তারা তো তাঁরই মানুষ, তাঁরই দল এবং তাদের দ্বারা তিনি বিশেষ একটি কাজ নিতে চান এবং তাদের দ্বারা জীবনের একটি মহান মূল্যবোধ রচনা করতে চান। এভাবেই বিশ্ব-মানবতার দরবারে মুসলিম জাতি এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে, এক অতুলনীয় জীবনের রূপরেখা পেশ করেছে এবং অতি সুন্দর এক জীবনধারার আলোকেই তারা বিশ্বের দরবারে আপন পরিচিতি তুলে ধরেছে, আর এভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে তারা সফলকাম হয়েছে। অতএব সকল মুসলমানকে নিজেদের আদর্শ ও নবী (স.)-এর শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান হতে হবে, নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ক্ষতিকর সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছাড়া চিন্তা চেতনা ও ব্যবহারের দিক দিয়ে অন্য সকল সম্বন্ধ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে।

এ উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণ সূরাটি নাযিল হয়েছে, এমনকি সূরার একেবারে শেষের দিকে বর্ণিত শরীয়ত ও সংগঠন সম্পর্কিত আয়াতগুলো মোমেন মোহাজের মহিলাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজেদের রসূল (স.)-এর মাধ্যমে আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দিয়েছিলো এবং এ কারণে তাদের ও তাদের কাফের স্বামীদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিলো। বিচ্ছেদ ঘটেছিলো সে সকল মোমেন স্বামী ও তাদের কাফের স্ত্রীদের মধ্যে, যারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ের সবটুকু এ একই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির পরিসমাপ্তিতে আল্লাহর দুশমন, আল্লাহর নবীর দুশমন ও আল্লাহর কাছ থেকে আগত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিরোধীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং নতুন করে যে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে যা আল্লাহর আক্রোশ ডেকে আনতে পারে। তা এ সব ব্যক্তি মোশরেক, ইহুদী, নাসারা যেই হোক না কেন। এ সম্পর্ক ছিন্ন করা দ্বারা একথা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য যে, কোনো মোমেন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান আকীদার সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে না।

তাফসীর

আয়াত ১-৬

'হে ঈমানদাররা, আমার দুশমন ও তোমাদের দুশমনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না .... ওরা তো চায় তোমরা (যে ঈমানী যিন্দেগী গ্রহণ করেছো তা তোমরা অস্বীকার করে) কুফরীর দিকে ফিরে যাও।' (আয়াত ১-২)

ইসলামবিরোধীদের সাথে সর্বাত্মক অসহযোগিতার নির্দেশ

সূরাটি শুরু হয়েছে অত্যন্ত আবেগ ও মহব্বতপূর্ণ এক আহবান দ্বারা 'হে ঈমানদাররা', এ ডাক সেই পাক পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে, যাঁর ওপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে। যে ঈমান তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট সেই ঈমান গ্রহণ করার নামেই ডাকা হচ্ছে। তিনি তাদের নিজেদের অবস্থানের যথার্থতা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যে আহবান জানাচ্ছেন এবং তাদের দুশমনদের কাছ থেকে কোনো প্রকার সাহায্য সহানুভূতির আশা পোষণ থেকে সতর্ক করছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের আরো

স্মরণ করাচ্ছেন সে সকল দুশমনের কাঁধের ওপর ভর করে কোনো সফলতা পাওয়ার মনোবৃত্তি ছুঁড়ে ফেলতে। প্রকৃতপক্ষে এখানে যে মহাগুরুত্বপুর্ণ কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, মোমেনদের আল্লাহ তায়ালা আহবান জানাচ্ছেন যেন তাঁর দুশমনকে ওরা দুশমন মনে করে এবং ওদের দুশমনকে তাঁর দুশমন মনে করে। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'আমার ও তোমাদের দুশমনকে তোমরা দোস্ত বলে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করতে চাও?'

এরপর মোমেনদের একথা বুঝাতে আহবান জানানো হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। যে তাঁর সাথে শত্রুতা করছে সে তাদের সাথেও শত্রুতা করবে, কিন্তু তারা তো সেসব ব্যক্তি যারা আল্লাহর পছন্দমতো গুণাবলী ও ধাঁচে নিজেকে গড়ে তুলেছে এবং পৃথিবীতে তাঁর খলীফা হওয়ার দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছে এবং তারাই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রিয়পাত্র ও বন্ধু। সুতরাং তাদের জন্যে আল্লাহর দুশমন ও তাদের নিজেদের দুশমনদের দিকে মহব্বতের হাত প্রসারিত করা কোনো অবস্থাতেই সমীচীন নয়।

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের পাপ সম্পর্কে স্মরণ করাচ্ছেন এবং তাদের আরও জানাচ্ছেন যে, তারা তো সেসব ব্যক্তি যারা তাদের নিজেদের দুশমন, তাদের দ্বীনের দুশমন এবং তাদের রসূলের দুশমন, আর তাদের পক্ষ থেকে রসূলকে পাগল খেতাব দেয়া ও তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচারের মাধ্যমে এই দুশমনী প্রকাশ পেয়েছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'এবং অবশ্যই তারা তাদের কাছে সত্য সমাগত হওয়ার পর কুফরী করেছে। তারা রসূলকে (তাঁর দেশ থেকে) বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরও বের করে দিয়েছে। এসব কিছুর পেছনে অপরাধ শুধু একটিই, আর তা হচ্ছে সেই আল্লাহর প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছো যিনি তোমাদের রব- প্রতিপালক।'

আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে এই নির্যাতন ও পাপপূর্ণ আচরণ এবং হিংস্র ব্যবহারের পর তাদের মধ্যে মানবতার আর কি অবশিষ্ট থাকতে পারে?

তারা তো জেনে বুঝে সত্য অস্বীকার করেছে এবং রসূল ও মোমেনদের দেশ থেকে বের করে দিয়েছে, কিন্তু এই বের করার পেছনে কারণ তো এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা তাদের রব আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে। আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মাধ্যমে মোমেনদের অন্তরের মধ্যে একটি আন্দোলন গড়ে দিয়েছেন যা তাদের ঈমান ও আকীদার সাথে একান্তভাবে জড়িত। একমাত্র এই কারণেই এ মোশরেকেরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, দ্বিতীয় অন্য কোনো কারণে নয়। আর যে কারণে মতভেদ, ঝগড়া ও যুদ্ধ বেধেছে তা একমাত্র আকীদার বিভিন্নতার কারণেই বেধেছে। সত্য-সঠিক বিষয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ঝগড়া বেধেছে এবং আল্লাহর রসূলকে তারা দেশ থেকে বের করে দিয়েছে, আর তারা ঈমান আঁকড়ে ধরার কারণেই ওরা তাদের দেশছাড়া করেছে।

বিবাদ শুধু এই কারণেই সৃষ্টি হয়েছে এবং এ বিবাদ যখন চরম আকার ধারণ করেছে তখনই তাদের স্মরণ করানো হয়েছে যে, তাদের ও মোশরেকদের মধ্যে কোনো ভালবাসার সম্পর্ক আর গড়ে ওঠতে পারে না- যদি প্রকৃতপক্ষেই তারা তাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ার ছেড়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তোষপ্রাপ্তি ও তাঁর পথে জেহাদ করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে এসে থাকে। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'যদি তোমরা আমার পথে ও আমার সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এসে থাকো।'

সুতরাং এমন একটি হৃদয়ের মধ্যে একথা একত্রিত হতে পারে না যে, সে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের কথা জানাবে আবার সাহায্যের জন্যে মানুষের ওপর নির্ভর করবে। আর নিছক আল্লাহর জন্যে যারা সব কিছু ত্যাগ করেছে এবং তাদের সকল কাজ ও ব্যবহারে তা প্রকাশিত হয়ে গেছে,

তখনই তাদের তিনি উপদেশ দিচ্ছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্তি ও তাঁর পথে জেহাদের জন্যে ঘর-বাড়ী জীবনের মতো ত্যাগ করে বেরিয়ে তাদের পক্ষে পেছনের দিকে তাকানো ও মোশরেকদের সাথে কোনো প্রকার মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে তোলার আর কোনো সুযোগ নেই।

এমতাবস্থায় কোন্ এমন জিনিস থাকতে পারে যা আল্লাহ্র পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে হিজরত করা হৃদয়ের মধ্যে এ ব্যক্তির জন্যে এতটুকু মহব্বত পয়দা করবে, যে একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে তাদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে। সে তো আল্লাহ তায়ালা ও রসূল উভয়ের দুশমন!

এরপর মনের গোপন কন্দরে যে কথা গোপন করে রাখা হয়েছিলো তার জন্যে মৃদুভাবে ও গোপনে তিরস্কার করা হচ্ছে, এ জন্যেও তিরস্কার করা হচ্ছে যে, তাদের নিজেদের দুশমন, আল্লাহর দুশমন ও রসূলুল্লাহ (স.)-এর দুশমনের কাছ থেকে অনুকম্পা লাভ করার জন্যে মনে আকাংখা পোষণ করা হয়েছে। অথচ আল্লাহর কাছে অন্তরের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সব কিছু সমানভাবেই জানা রয়েছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অনুকম্পা লাভের উদ্দেশ্যে গোপনে ওদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করছো? অথচ আমি তো তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তা সবই জানি।'

এরপর এমন ভয়ংকরভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের ধমক দিচ্ছেন যে, যে কোনো মোমেন ব্যক্তির অন্তরই এতে ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। বলা হচ্ছে,

'যে এ কাজ করবে সে সরল সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে যাবে।'

হেদায়াতপ্রাপ্তি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার পর সে পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ভয় থেকে বড় ভয় কি আর কিছু হতে পারে! আর এই ধমক এবং হুশিয়ারী সংকেত তাদের শত্রুদের প্রকৃতি বুঝার জন্যে এক প্রকৃষ্ট ওসীলা হিসেবে কাজ করেছে। আয়াতটি নিখুঁতভাবে জানিয়ে দিচ্ছে, দুশমনেরা তাদের বিরুদ্ধে গোপনে কি ধরনের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের জাল বিছিয়ে রেখেছিলো। অবশেষে আরও কিছু কথা আসছে। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা তোমাদের ওপর বিজয়ী হয়ে তোমাদের চরম শত্রুতে পরিণত হয়ে যাবে এবং তোমাদের বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়ার জন্যে তাদের হাত ও জিহ্বা ব্যবহার করবে (অর্থাৎ কাজ ও কথা দিয়ে তোমাদের কষ্ট দেবে)। তখন একেবারে জাত শত্রুর মতো ব্যবহার করা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবহার তাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না এবং কাজ, কথা, ব্যবহার ও সর্ব উপায়ে, সকল অজুহাতে তোমাদের যথাসম্ভব কষ্ট দেবে, আর এসব থেকে আরও ধ্বংসাত্মক আরও কঠিন যে আচরণ তারা করবে তা হচ্ছে, সর্বতোভাবে তারা চাইবে যে, তোমরা (ঈমানের মহামূল্যবান রত্নটুকু হারিয়ে) কাফের হয়ে যাও।' এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে চায়, হায় যদি তোমরা (ওদের মতো) কাফের হয়ে যেতে।'

আর একজন মোমেনের জন্যে এ অবস্থা হচ্ছে সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে বড় কষ্ট। হাত ও কথার কষ্ট থেকেও এ কষ্ট অনেক কঠিন। সুতরাং যে ব্যক্তি তার এই প্রিয় ধন কেড়ে নিতে চাইবে এবং চাইবে সে মোরতাদ (দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করে পুনরায় কাফের) হয়ে যাক, সে ওই সকল শত্রু থেকে বড় শত্রু, যারা হাত ও কথা দ্বারা কষ্ট দেয়!

আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার ফলে কুফরী অবস্থা থেকে ঈমানী যিন্দেগীর স্বাদ পেয়েছে এবং ভুল পথ পরিত্যাগ করে সত্য পথের দিকে এগিয়ে আসার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, সব চাইতে বড় কথা, একজন মোমেনের জীবন যাপন করতে পেরে ধন্য হয়েছে, কথা, কাজ, ব্যবহার

ও চিন্তা-চেতনায় নিজেকে মোমেন হিসেবে পরিচিত করে এবং যে এ পথে দৃঢ়তা অবলম্বনে শান্তি লাভ করেছে, প্রশান্তিতে তার অন্তর-প্রাণ ভরে গেছে, সে এই ঈমানী যিন্দেগী পরিত্যাগ করে পুনরায় কুফরী জীবনের দিকে ফিরে যেতে তেমনি অপছন্দ করবে, যেমন কেউ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপছন্দ করে। অথবা এর থেকে আরও বেশী অপছন্দ করবে। সুতরাং একথা অতীব সত্য, যে আল্লাহর দুশমন তার সব চাওয়ার বড় চাওয়া হচ্ছে, একজন মোমেন ঈমান-রূপী জান্নাত থেকে বেরিয়ে এসে কুফরী-রূপী জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাক এবং আল্লাহর নেয়ামতে ভরপুর ঈমানী যিন্দেগী ত্যাগ করে এগিয়ে যাক কুফরীর খোকলা জীবনের দিকে।

এভাবেই আল কোরআন ধীরে ধীরে কাফেরদের বিরুদ্ধে মোমেনদের উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের আন্দোলনমুখী বানিয়ে অবশেষে চূড়ান্ত বাসনা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। কোরআন বলছে,

'আর ওরা বড় হৃদয়াবেগ নিয়ে কামনা করে, হায়, তোমরা যদি কাফের হয়ে যেতে!'

যে ধ্বংসের দিকে কাফেররা এগিয়ে যাচ্ছে সেই দিকেই ঈমানদারদের টেনে নেয়ার জন্যে তারা বিভিন্ন কায়দায় নিরন্তর যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার প্রথম বিবরণ এখানে পেশ করা হলো। এরপর আসছে, প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখার যে প্রবণতা বিরাজ করে, যার আকর্ষণ ক্রমান্বয়ে তাকে কর্তব্য থেকে গাফেল করে দেয়, অবশেষে তাকে তার ঈমান আকীদার পরিপন্থী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে– তার বিবরণ। এই পর্যায়ে সতর্ক করতে দিয়ে ঈমানদারদের প্রতি যে কথাগুলো এসেছে তা হচ্ছে,

'না, কিছুতেই তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং সন্তানাদি কোনো কাজে আসবে না। কেয়ামতের দিন তোমাদের একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে এবং (আজ) তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তায়ালা তা সবই দেখছেন।'

একজন মোমেনের কাজ হচ্ছে, সে যে কাজই করুক না কেন, তার ফল সে এখানে যতোটা পাবে বলে আশা করে, তার থেকে বেশী আখেরাতে পাওয়ার আশা রাখে। সে এখানে চাষাবাদ করে, কিন্তু কার্যত তার জমির ফসল সে চায় আখেরাতে। সুতরাং যে সম্পর্ক রাখতে গিয়ে তার আকীদা বিশ্বাসের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে তার থেকে অবশ্যই সে বিরত থাকে। দুনিয়ার এই স্বল্পস্থায়ী জীবনের সম্পর্কের খাতিরে বা আত্মীয়তার বন্ধন টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সে কিছুতেই তার আকীদা ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় না; বরং সেই স্থায়ী সম্পর্কই সে গড়ে তুলতে চায় যার বন্ধন দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই টিকে থাকবে। এ কারণে সে এমন কোনো সম্পর্ক রাখবে না যার ফলে আখেরাত বরবাদ হয়ে যাবে।

এই জন্যেই তাদের সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'তোমাদের আত্মীয়স্বজন ও সন্তানাদি (আখেরাতে) কোনো কাজেই লাগবে না। অথচ এদের দিকেই সর্বদা তোমরা ঝুঁকে থাক এবং এদেরই জন্যে তোমাদের অন্তর ব্যাকুল হয়ে থাকে, আর এদেরই নিরাপত্তার জন্যে তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের সাথে মহব্বত দেখানোর জন্যে অস্থির হয়ে যাও! হাতেব ইবনে আবী বালতায়ার ঘটনাও তার সন্তান সম্পত্তির নিরাপত্তার লক্ষ্যেই সংঘটিত হয়েছিলো এবং হিজরত করে আসা এলাকায় তার আত্মীয়স্বজন সম্পদ সম্পত্তির ও অপর ব্যক্তিদের নিরাপত্তার কথা বেমালুম তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। অথচ, প্রকৃত সত্য হচ্ছে ভবিষ্যতে এসব আত্মীয়স্বজন ও সন্তানসন্ততি (ইসলাম থেকে দূরে থাকার কারণে তোমাদের) কোনোই কাজে আসবে না। 'কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। এর কারণ হচ্ছে, সেদিন যে সম্পর্কের কারণে তাদের প্রতি আকর্ষণ ছিলো সেই সম্পর্কই ভেংগে যাবে। আল্লাহ্‌র কাছে সেদিন আজকের এই সম্পর্কের কোনোই মূল্য থাকবে না।

'আর যা কিছু তোমরা করছো আল্লাহ তায়ালা তা সবই দেখছেন। তিনি মানুষের বাহ্যিক কাজ সম্পর্কে যেমন ওয়াকেফহাল, তেমনি তার অন্তরের গভীরে যে গোপন ইচ্ছা এরাদা বিরাজ করে, তাও তিনি পুরোপুরিভাবে অবগত।'

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ইসলাম বিবর্জিত ব্যবস্থা অস্বীকার করা

এরপর শুরু হচ্ছে আলোচনার তৃতীয় পর্যায়। এখানে সেই সকল প্রথম পর্যায়ের মুসলমানের মর্যাদার কথা পেশ করা হয়েছে, যারা 'তাওহীদে'র ধারক বাহক হিসাবে ছিলেন প্রথম কাতারে। এরা ছিলেন ঈমান আকীদার আলোকবাহী প্রথম কাফেলা, যারা সকল যামানার সকল মানুষের সেরা মানুষ, তাদের ঈমানী মর্যাদা সবার উপরে, যেহেতু তারা সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহর মহব্বতে ঈমানের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন। এই ছিলো সেই জাতি, যাদের নিগূঢ় সম্পর্ক বিস্তৃত ছিলো তাদের মহান পিতা, সত্যের ধারক ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত। শুধু আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়েই প্রথম দিকের এই সাহাবারা ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরসূরী ছিলেন না; বরং চরিত্র বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও তারা ছিলেন প্রথম সত্যাশ্রয়ী, ইবরাহীম (আ.)-এর সঠিক অনুসারী। ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি আসা বিভিন্ন পরীক্ষার মতোই চূড়ান্ত বিপদ আপদ সহ্য করে তারা তাদের পূর্বপুরুষের পরিত্যক্ত আদর্শকে সমাপ্তি পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার জন্যে ছিলেন বদ্ধপরিকর। দ্বীনের খাতিরে তারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দৃষ্টান্ত পর্যন্ত স্থাপন করেছেন। তারপর একমাত্র তাদের সাথে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে সম্পর্ক জুড়েছেন, যারা তাদের সাথে ঈমান গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের ঈমান আকীদা বিশ্বাস টিকিয়ে রাখার জন্যে অন্য সকল বন্ধন ছিন্ন করেছেন। তাদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন,

'অবশ্যই তোমাদের জন্যে রয়েছে চমৎকার আদর্শ ইবরাহীম ও তার সংগীদের মধ্যে, সেই কঠিন দুঃসময়ে যখন তারা জাতিকে বলেছিলো, আমরা তোমাদের ও তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত হলাম আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের গোলামী করো.......যে, আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে যে রুজু করে নিশ্চয়ই তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা বড়ই উদার, তিনি চির প্রশংসিত।

এরপর যখন মুসলমানরা তাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের দিকে তাকায় যেন অবাক বিস্ময়ে তারা দেখতে পায় যে, অতীত মুসলমানরা গভীর এক সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ, রয়েছে তাদের দীর্ঘ ঐতিহ্য, রয়েছে তাদের যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা সুবিস্তীর্ণ আদর্শ, যা ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ আদর্শ শুধু বিশ্বাস স্থাপন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং বাস্তব কার্যক্রমের মধ্যে একইভাবে এ আদর্শের ছোঁয়াচ পাওয়া যায়, আর তখন মানুষ অনুভব করে, ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত ইসলামের এ আদর্শ যতোটুকু ফলপ্রসূ তার থেকে অনেক বেশী সুফলদায়ক হয় সামাজিক জীবনে, যেখানে সবার সাথে মিলে মিশে মানুষ বাস করে। আল্লাহর পতাকাতলে সমবেত থাকার ফলে আজও ইসলামী সমাজ বিভিন্ন যুগের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আল্লাহর দ্বীনের ওপর টিকে রয়েছে। ভবিষ্যতে যত প্রকার প্রতিকূলতা আসতে পারে তার সকল ভয়াবহতাই এ পর্যন্ত আঘাত হেনেছে এবং ইসলামী কাফেলা সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে চলেছে। নতুন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া এবং নতুন এমন কোনো সংকট আর আসার মতো নেই যার অভিজ্ঞতা পেছনে হয়নি। মোমেনদের জীবনের ওপর অভূতপূর্ব আর কোনো সমস্যার উদ্ভব হবে না যা তাদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দিতে পারে। এ জাতির সামনে রয়েছে ঈমান আকীদার ওপর টিকে থাকার সংগ্রাম সংঘাতের এক দীর্ঘ ইতিহাস। যখনই ইসলামের দুশমনদের সাথে ইসলামী বিশ্বাসের মোকাবেলা হয়, তখনই ইসলামের বিজয় ডংকা বেজে ওঠে এবং এই মহান জীবন

ব্যবস্থার সুবিস্তীর্ণ শাখা প্রশাখা ছেয়ে যায় গোটা পরিবেশের ওপর ও এর সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্যে সকল দিক থেকে এগিয়ে আসে শ্রান্ত ক্লান্ত যাযাবরের দল। আর এই মহান মহীরুহের বীজ বপন করে গেছেন প্রথম যুগের মুসলমানরা, যারা ছিলেন মহানবী ইবরাহীম (আ.)-এর যথার্থ অনুসারী।

ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সংগী-সাথীরা তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলে গেছেন, রেখে গেছেন মোহাজেরদের জন্যে উজ্জ্বলতম পথের দিশা। আর রয়েছে প্রথম যুগের সেসব মুসলমানের মধ্যে আজকের শতধাবিভক্ত মুসলমানদের জন্যে উৎকৃষ্ট আদর্শ। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো সেই জনপদের কথা, যারা তাদের জাতিকে ডেকে বলেছিলো, অবশ্যই আমরা তোমাদের থেকে এবং তোমরা অন্ধভাবে যেসব অপশক্তির বা জড় পদার্থের পূজা করো সেসব কিছু থেকে সম্পর্কমুক্ত। আজ তোমাদের এবং তোমাদের সকল শক্তিকে আমরা অস্বীকার করার ঘোষণা দিলাম। জেনে নাও, আজ থেকে শুরু হয়ে গেলো তোমাদের এবং আমাদের মাঝে ঘোরতর বিদ্বেষ ও শত্রুতার সম্পর্ক, ততো দিন এই তিক্ততা চলতে থাকবে যতো দিন না তোমরা এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।'

বাতিলপন্থী জাতি ও তাদের মনগড়া অলীক মাবুদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের এই-ই ছিলো স্পষ্ট ঘোষণা। ক্ষমতাগর্বী, মিথ্যার ধ্বজাধারী ও তাদের শক্তিকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কথা জানানোই ছিলো এ ঘোষণার উদ্দেশ্য। এক আল্লাহর ওপর ঈমান না আনা পর্যন্ত এই শত্রুতা, বিদ্বেষ ও সম্পর্কচ্ছেদ সদা-সর্বদা বিরাজ করতে থাকবে। এ হচ্ছে সেই চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদ, যা ঈমান আকীদার পার্থক্যের কারণে গড়ে উঠে এবং যার কারণে পারিবারিক বন্ধন ও আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের যাবতীয় সম্পর্ক কেটে যায়, আর এই কারণে প্রত্যেক যুগে মোমেনদের এই অভিজ্ঞতার আলোকে পৃথক পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং ইতিহাস সাক্ষী যে, ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা কেয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমানের জন্যে সুন্দরতম আদর্শ হয়ে থাকবেন।

কোনো কোনো মুসলমানের মনে একথা জাগে যে, ইবরাহীম (আ.) তাঁর মোশরেক বাপের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার ওয়াদা কেমন করে করলেন! এর দ্বারা তো মোশরেক আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখা ও তাদের জন্যে দরদ-সহানুভূতি দেখানোর একটি সুযোগ রয়েছে বলে মনে হয়। এজন্যে ইবরাহীম (আ.)-এর উচ্চারিত বাক্য, 'অবশ্যই আপনার জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী হবো' কথাটির পেছনে কি দৃষ্টিভংগি ছিলো তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল কোরআন বলছে, ইবরাহীম (আ.) উক্ত কথা তখন বলেছিলেন যখন তাঁর পিতা আযরের শেরেকের ওপর যিদ ধরে টিকে থাকাটা নিশ্চিতভাবে তিনি বুঝতে পারেননি। যখন কথাটি তিনি বলেছিলেন, তখন চাচ্ছিলেন, পিতা ঈমান আনুক এবং এ ব্যাপারে তিনি আশাবাদী ছিলেন। 'তারপর যখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, প্রকৃতপক্ষেই সে আল্লাহর দুশমন, তখন এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেলেন।' এই বিবরণটি অন্য আর একটি সূরায়ও এসেছে। এখানে বিষয়টি প্রমাণ হয়ে গেলো যে, ইবরাহীম (আ.) বিষয়টি পুরোপুরিভাবে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর ওপরই পরিপূর্ণভাবে ভরসা করেছিলেন এবং সর্বাবস্থায় তাঁর দিকে রুজু করেছিলেন।

'না, আপনাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর মতো কোনো ক্ষমতা আমার নেই। হে আমাদের রব, তোমার ওপর আমরা ভরসা করেছি, তোমারই দিকে আমরা রুজু করেছি এবং তোমার দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।'

এভাবে আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা হয়েছে। ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে এইভাবে ঈমানের দিকটি দেদীপ্যমান হয়ে ফুটে ওঠেছে যেন তাঁর উত্তরসুরী মুসলমানদের মধ্যে ঈমানের দিকটিই যথাযথভাবে গুরুত্ব লাভ করে। প্রশিক্ষণদান ও মানুষের মন মগযকে আল্লাহর দিকে ফেরানোর জন্যে এ ঘটনা তুলে ধরা এক বিশেষ পদ্ধতি হিসাবে কাজ করে। এ বিষয়ে পাকড়াও করারও দৃষ্টান্ত রয়েছে যাতে করে বিষয়টি ইবরাহীম (আ.) যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন এবং আল কোরআনের দৃষ্টিভংগি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। (১)

এরপরই ইবরাহীম (আ.)-এর প্রার্থনার অপর অংশ আসছে, যার মধ্যে তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলছেন,

'হে আমাদের রব, কাফেরদের জন্যে আমাদের পরীক্ষার বস্তু বানাবেন না (তাদের কাছে আমরা খেলার বস্তুতে পরিণত না হই)'।

ওদের আমাদের ওপর জয়যুক্ত করো না, তাহলেই তাদের এ বিজয়ী অবস্থা আমাদের জন্যে একটা পরীক্ষার বিষয় হয়ে যাবে, আর তখন তারা বলতে শুরু করবে, ঈমান যদি তাদের সহায়তা করে থাকে, তাহলে আমরা তাদের ওপর বিজয়ী হই কেমন করে এবং তাদের প্রতি জবরদস্তিপূর্ণ ব্যবহার করি কেমন করে! তাদের সামনে আমরা হেয় হয়ে গেলে অন্তরের মধ্যে নানা প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সাময়িকভাবে সত্যের ওপর মিথ্যার বিজয়ী হওয়া এবং অহংকারী ও আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহি পোষণকারী ব্যক্তিদের ঈমানদারদের ওপর শক্তিমান হওয়া– এর মধ্যে রয়েছে এমন এক রহস্য যা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। মোমেন যে কোনো আপদ বিপদে অবশ্যই সবর করবে, তার অর্থ এ নয় যে, বিপদ মুক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাবে না। যেসব কারণে মনের মধ্যে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়ে মনকে দুর্বল করতে পারে তার থেকে বাঁচার জন্যে অবশ্যই সে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। দোয়ার অবশিষ্ট অংশ হচ্ছে,

'এবং আমাদের মাফ করে দাও।'

কথাগুলো উচ্চারণ করছেন মহাদয়াময় প্রভুর বন্ধু ইবরাহীম (আ.)। এই দোয়া করার সময় তিনি অবশ্যই অনুভব করছেন যে, তিনি সেভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে চলেছেন যা তাঁর পাওনা। আল্লাহ পাকের নেয়ামত ও রহমত লাভ করার জন্যে যোগ্যতা হিসাবে মানুষের পক্ষে যে বিনয় প্রকাশ করা প্রয়োজন এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণায় যে ব্যবহার আশা করা যেতে পারে তা সবই ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে বর্তমান ছিলো, যার কারণে তিনি তাঁর রবের কাছে বড় আশা নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তাঁর এই প্রার্থনার ভাষা ও ভংগি এমন মধুর যা বড়ই হৃদয়স্পর্শী এবং যা অপর যে কোনো ব্যক্তির জন্যে অনুকরণীয়।

এরপর ইবরাহীম (আ.) তাঁর দোয়া শেষ করতে গিয়ে আল্লাহর সেই গুণাবলী তুলে ধরছেন যা দোয়া কবুলের জন্যে বড়ই উপযোগী।

'হে আমাদের রব, অবশ্যই তুমি মহাশক্তিমান এবং যাবতীয় জ্ঞানের অধিকারী।'

'আল্ আযীয' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, তিনি যে কোনো কাজ করতে সক্ষম এবং 'আল-হাকীম' বলতে বুঝায়, চিন্তা ভাবনা করে কর্ম সম্পাদনকারী।

ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সংগীরা তাদের নিজ নিজ অবস্থানে থেকে অবশেষে অত্যন্ত বিনয় নম্রতার সাথে এবং পুরোপুরিভাবে নিজেদের আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে এমন হৃদয়াবেগ নিয়ে

(১) 'আত্তাসবীরুল ফান্নু ফিল কোরআন', অধ্যায়ঃ 'আল কেস্সাতু ফিল কোরআনে ফী কেতাব।'

প্রার্থনা করছেন যা অনুসরণের জন্যে মোমেনদের মধ্যে এক নতুন প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে। তাই আল্লাহ পাক সে মহান ব্যক্তিদের কথা বলতে গিয়ে এরশাদ করছেন, 'অবশ্যই তোমাদের জন্যে রয়েছে সে ব্যক্তিদের মধ্যে উৎকৃষ্ট আদর্শ। আদর্শ তাদের জন্যে যারা আল্লাহকে পেতে চায় ও আখেরাতের সাফল্য আশা করে। আর যে ব্যক্তি এ আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জেনে রাখা দরকার, আল্লাহ তায়ালা চির অভাবমুক্ত এবং চির প্রশংসিত।

তাহলে বুঝা গেলো, ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সংগী সাথীদের জীবন তাদের জন্যেই আদর্শ, যারা আল্লাহকে পেতে চায় ও আখেরাতের শান্তিময় জীবন লাভ করার জন্যে লালায়িত থাকে। এরাই হচ্ছেন সেসব মহান ব্যক্তি, যারা সকল প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তার সুফলও লাভ করেন। এই পরীক্ষার মধ্যেই তারা অনুসরণযোগ্য আদর্শ লাভ করেন এবং সঠিক পথে চলার ব্যাপারে অগ্রগামী হয়। অতএব, যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে পেতে চাইবে ও আখেরাতের যিন্দেগীতে শান্তিতে থাকার কামনা করবে সে যেন এ মহান ব্যক্তিদের আদর্শ অনুসরণ করে। আজকের যুগের মোমেনদের জন্যে অবশ্যই এটা একটা সুসংবাদ।

সুতরাং যে ব্যক্তি এ পথ পরিহার করবে, ইসলামের এই কাফেলার বাইরে যে যেতে চাইবে এবং এই ঈমানী সম্পর্ক ছিন্ন করে যে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে, মহান আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই তাকে জোর করে কাছে টেনে আনার। 'কারণ আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় অভাব-অভিযোগের উর্ধ্বে এবং চির প্রশংসিত।'

ইসলামের প্রথম যুগ যখন সমাপ্তি পর্যায়ে এসে গেলো এবং ইতিহাসের শুরুতে মোমেনরা তাদের সুদূরপ্রসারী উন্নতি লাভ করলো, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো তাদের সুনাম। তাদের ওপর আগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সেগুলো বলিষ্ঠভাবে অতিক্রম করার ইতিহাস পৃথিবীর জাতিসমূহের কাছে সংরক্ষিত হলো এবং এসব পরীক্ষা শেষে তাদের সুমহান মর্যাদার আসনে সমাসীন হতে দেখা গেলো। যারা কোনো দিন মানুষকে সাফল্যের পথে কিছুমাত্র দিকদর্শন দিতে দেখেনি, তাদের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য প্রদর্শন করা হতে লাগলো।

কোরআনুল করীম তাদের সম্পর্কে এই গুরুত্বের ধারণা দিয়ে বার বার তাদের আনুগত্য করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে এবং তাদের সাথে গভীরভাবে সম্পর্ক স্থাপন করার কথা বলেছে। সুতরাং পরিচালকের আসনে সমাসীন এই জাতি যেন মানুষের কাছে আগন্তুক অথবা যে কোনো দিক দিয়ে ভয়ংকর বলে বিবেচিত না হয়, যদিও পৃথিবীতে তারা বিচ্ছিন্ন একক জাতি হিসেবে থাকে। তাদের কার্যকলাপ ও ব্যবহার যেন এমন হয় যে, তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুকরণ করতে কাউকে কোনো প্রকার কষ্ট পেতে না হয়।

عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ
قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي
الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ
وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ
الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ

রুকু ২

৭. এটা অসম্ভব কিছু নয়, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এবং যাদের সাথে আজ তোমাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে তাদের মাঝে (একদিন) বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা তো (সবই) করতে পারেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৮. যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং কখনো তোমাদের নিজেদের বাড়িঘর থেকেও বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি দয়া দেখাতে ও তাদের সাথে ন্যায় আচরণ করতে আল্লাহ তায়ালা কখনো নিষেধ করেন না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। ৯. আল্লাহ তায়ালা কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং (একই কারণে) তোমাদের– তারা ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে এবং তোমাদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, (এর পরও) যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা অবশ্যই যালেম। ১০. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যখন কোনো ঈমানদার নারী হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে, তখন তোমরা তাদের (ঈমানের ব্যাপারটা ভালো করে) পরখ করে নিয়ো; (যদিও) তাদের ঈমানের বিষয়টা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, অতপর একবার যদি তোমরা জানতে পারো তারা (আসলেই) ঈমানদার, তাহলে কোনো অবস্থায়ই তাদের তোমরা কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না; কারণ (যারা ঈমানদার নারী) তারা তাদের (কাফের স্বামীদের) জন্যে (আর কোনো অবস্থায়ই) 'হালাল' নয় এবং (যারা কাফের) তারাও তাদের (ঈমানদার স্ত্রীদের) জন্যে হালাল নয়; (তবে এমন

لَهُنَّ ۖ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۖ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ۖ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾ وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ

হলে) তোমরা তাদের (আগের স্বামীদের দেয়া) মোহরানার অংশ ফেরত দিয়ে দিয়ো; অতপর তোমরা (কেউ) যদি তাদের বিয়ে করো, তাহলে এতে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না, অবশ্য তোমাদের (এ জন্যে) তাদের মোহর আদায় করে দিতে হবে; (একইভাবে) তোমরাও কাফের নারীদের সাথে (দাম্পত্য) সম্পর্ক বজায় রেখো না, (এ ক্ষেত্রে) তোমরা তাদের যে মোহর দিয়েছো তা তাদের থেকে চেয়ে নাও, একই নিয়মে (যারা কাফের স্বামী) তারা তাদের (মুসলমান স্ত্রীদের) যে মোহর দিয়েছে তাও ফেরত চেয়ে নেবে; এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিধান; এভাবেই তিনি তোমাদের মাঝে (এ বিষয়টির) ফয়সালা করে দিয়েছেন; আর আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী ও পরম কুশলী। ১১. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ যদি তোমাদের হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে চলে যায় (পরে যখন সুযোগ আসবে), তখন যারা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদের– তারা যে পরিমাণ মোহর দিয়েছে তোমরাও তার সমপরিমাণ মোহর আদায় করে দেবে; তোমরা সে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যাঁর ওপর তোমরা ঈমান এনেছো। ১২. হে নবী, যখন কোনো ঈমানদার নারী তোমার কাছে আসবে এবং এই বলে তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করবে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, নিজ হাত ও নিজ পায়ের মাঝখান সংক্রান্ত (বিষয়– তথা অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের স্বামীর বলে দাবী করার) মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আসবে না এবং কোনো সৎকাজে তোমার না-ফরমানী করবে না, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য গ্রহণ করো এবং তাদের (আগের

مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

কার্যকলাপের) জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু । ১৩. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আল্লাহ তায়ালা যে জাতির ওপর গযব দিয়েছেন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, তারা তো শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে সেভাবেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, যেমনিভাবে কাফেররা (তাদের) কবরের সাথীদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে।

তাফসীর

আয়াত ৭-১৩

এরপর সেই উন্নত জাতি পুনরায় ফিরে গেছে তাদের পূর্ববর্তী স্থানে। তাদের সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টি ভংগির পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের প্রতি পূর্বের মতো মানুষের আর কোনো আকর্ষণ নেই, নেই তাদের ব্যাপারে কারও কোনো আগ্রহ। ইসলামের ঝান্ডাতলে সমবেত হওয়ার জন্যে যারা এককালে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলো, মুসলমানদের সারিতে স্থান লাভ করার জন্যে যারা ছিলো লালায়িত, তাদের অনুসরণের সেই পথ আজও আছে, কিন্তু যে কার্যকলাপ ও ব্যবহার দ্বারা ইসলামের দুশমনদের ইসলামের পতাকার সুশীতল ছায়াতলে একত্রিত করা যায়, মুসলমানদের সারিতে তাদের হাযির করা যায়, সেই কাজ ও ব্যবহার আজ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, যে জীবনাদর্শ বাস্তবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে শত্রুতা বন্ধুত্বে পরিণত করা যেতো এবং মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হতো, তা আজ আর নেই। অবশ্য এটাও ঠিক যে, আর একবার ইসলামের সুমহান সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে একতা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে এবং অন্যদের মধ্যেও শত্রুতার মনোভাব দূর করা, ঝগড়া ফাসাদ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা এগিয়ে চলেছে। এইভাবে শত্রুতার মনোভাব দূর হয়ে গেলে পারস্পরিক কল্যাণ কামনা জন্ম নেবে এবং তা বাস্তবায়িত হবে লেনদেনের স্বচ্ছতা ও সুবিচার কায়েম হওয়ার মাধ্যমে। আল্লাহর মহান বাণী–

'হয়ত অচিরেই আমাদের ও তোমাদের বিরোধীদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মহব্বত পয়দা করে দেবেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু করতে সক্ষম এবং মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও মেহেরবান.......এমতাবস্থায় যারা তাদের সাথে হৃদ্যতা গড়ে তুলতে চাইবে, তারাই হবে যালেম।' (আয়াত ১)

মোমেনের হৃদয় সবার জন্যে উন্মুক্ত

অবশ্যই ইসলাম হচ্ছে শান্তির জীবন ব্যবস্থা, সবাইকে মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ করায় বিশ্বাসী এবং এমন এক শৃংখলাপূর্ণ ব্যবস্থা কায়েমে বিশ্বাসী, যার লক্ষ্য হবে গোটা বিশ্বকে শান্তির ছায়াতলে নিয়ে আসা, সেখানে ইসলামের সম্মোহনী ব্যবস্থা চালু করা এবং আল্লাহ্র পতাকাতলে সবাইকে সমবেত করে তাদের এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা, যেন তারা একে অপরের মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে পারে এবং পরস্পরকে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। ইসলাম এমন এক কল্যাণময় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে মানুষে মানুষে এই মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার পথে কোনো বাধা থাকবে না। এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে তারাই বাধা সৃষ্টি করতে পারে, যারা সত্যের দুশমন এবং প্রকারান্তরে তারা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারের দুশমন। সুতরাং এই

শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে বাধাদানে যারা বিরত থাকবে এবং তাদের নিরাপত্তা দেবে, কিছুতেই ইসলাম তাদের সাথে বিরোধিতা বা তাদের সাথে বিবাদ বাধাতে চায় না। এমনকি ঝগড়া বিবাদের সময়ে বা যুদ্ধকালেও সুন্দর ব্যবহার ও লেনদেনের পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে মহব্বত গড়ে তোলার কারণগুলো অক্ষুণ্ন রাখতে চায়। মুসলমানরা সেই সুন্দর সুবাসিত দিনের অপেক্ষায় রয়েছে, যখন মানুষের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের মনোভাব দূর হয়ে যাবে এবং মহান ইসলামী পতাকার ছায়াতলে সমবেত হয়ে সবার জন্যে কল্যাণকামিতার জ্যোতি উদ্ভাসিত করে দেবে গোটা পরিবেশকে। সেদিন যে এক সময়ে আসবেই সে বিষয়ে ইসলাম মোটেই হতাশ নয়। সে দিন অবশ্যই মানুষ সত্যাশ্রয়ী হবে এবং সরল সঠিক পথ মানুষ মনে-প্রাণে গ্রহণ করবে।

এই অধ্যায়ের প্রথম আয়াতে এমন এক আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে যে, নৈরাশ্য সেখানে বিজয়ী হবে আশা করা যায় না। অবশ্য কিছু সংখ্যক মোহাজেরের মনে ভীতির সঞ্চার হওয়ায়, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দূরত্বের কারণে আত্মীয়স্বজন এবং পরিবার পরিজনের সাথে বিচ্ছেদ ব্যথায় তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। এই অবস্থাটা তুলে ধরে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন, 'হয় তো শীঘ্রই সে সকল ব্যক্তি যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা বিরাজ করছে তাদের সাথে মহব্বত পয়দা করে দেবেন।'

এ আশাবাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ খুবই স্পষ্ট। মোমেনদের মধ্যে যারাই এই আশাব্যঞ্জক কথাটি শুনেছে তারা দৃঢ়ভাবে এ কথা বিশ্বাস করেছে। আর এর অল্প কিছুদিন পরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এই আশা বাস্তবায়িত হলো। কোরায়শরা সবাই (একই সময়ে) ইসলাম গ্রহণ করলো। একই পতাকাতলে সমবেত হয়ে গেলো সকল মক্কাবাসী, পরস্পর কলহ বিবাদ এবং একে অপরকে পদানত করার চেষ্টার অবসান হলো, পরস্পর সবাই গভীর মহব্বতের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে তারা আবদ্ধ হয়ে গেলো। 'একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এ সব কিছু করতে সক্ষম।' তিনি যা চান তাইই করেন, এতে তাঁর কাছে কৈফিয়ত তলব করার কেউ নেই।

'এবং আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল মেহেরবান।' শেরেক ও অন্যান্য যেসব অপরাধ ইতিপূর্বে হয়েছে তা তিনি মাফ করে দেবেন। রাজা (আশা) শব্দটি আল্লাহর যে ওয়াদা পূরণ করার দাবী জানায় তা পূরণ করার জন্যে যারা দ্বীন-ইসলাম কায়েমের প্রশ্নে তাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তাদের বাড়ীঘর থেকে বের করে দেয়নি তাদের ক্ষমা করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের এখতিয়ার দিয়েছেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের সাথে সৎ ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করায় কোনো অসুবিধা নেই। মুসলমানদের তাগিদ দেয়া হয়েছে যে, লেনদেনের ক্ষেত্রে যেন তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা হয় এবং তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে কখনো কোনোভাবে যেন তাদের বঞ্চিত করা না হয়, কিন্তু যে সকল লোক দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তাদের তাদের বাড়ী ঘর থেকে বের করে দিয়েছে অথবা বহিষ্কারে সহায়তা করেছে, তাদের সাথে কোনো প্রকার মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করতে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং যারাই তাদের সাথে কোনো হৃদ্যতা গড়ে তুলেছে তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তারা যালেম, আর আল্লাহ পাকের কথা অনুসারে যুলুমের এক অর্থ হচ্ছে শেরেক, যেমন- এরশাদ হয়েছে, 'অবশ্যই শেরেক হচ্ছে মহা যুলুম।' এ হচ্ছে ভয়ানক তিরস্কার, যা জানার সাথে সাথে যে কোনো মোমেনের হৃদয় ভীষণভাবে কেঁপে ওঠে এবং সে ইসলামের দুশমনদের সাথে সম্পর্ক রাখার ভয়ানক কঠিন পরিণাম থেকে বাঁচার জন্যে সচেষ্ট হয়।

অমুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে এ হচ্ছে সব থেকে সুবিচারপূর্ণ বিধান, যা এই দ্বীন (ইসলাম)-এর প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। মানুষের জীবনে সুখ শান্তি আনয়নের

উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভংগির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। আরও সত্য কথা হচ্ছে, এ ফয়সালা সমগ্র মানব জাতির মংগলের জন্যে, বরং পরম ও চরম বাস্তব সত্য হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে গোটা সৃষ্টির কল্যাণের জন্যেই এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে এবং তা তাঁর তরফ থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য মানুষকে নিরংকুশভাবে আল্লাহমুখী বানানো। আল্লাহর এ বিধান চালু করার ব্যাপারে তাঁর নিজের কুদরত ও সাহায্য অবশ্যই রয়েছে এবং এ বিধান তিনি চালু করবেনই, এটা তাঁর চিরন্তন সিদ্ধান্ত। তাতে যে কোনো ব্যক্তি যতো প্রকার মতভেদ করুক না কেন। (১)

এটাই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আইনের মূলকথা, যা তাঁর ও সকল মানুষের মধ্যে আত্মসমর্পণের অবস্থা গড়ে তুলতে শেখায় এবং এই আত্মসমর্পণের অবস্থাই হচ্ছে স্থিতিশীল অবস্থা আনয়নকারী।

একমাত্র শান্তি, ভালবাসা, কল্যাণই মানুষের মধ্যে ইনসাফ আনয়ন করতে পারে।

নিরীহ লোকদের ব্যাপারে ইসলামের নীতি

তারপর বলা যায়, এ হচ্ছে এমন একটি নিয়ম যা ইসলামের মূল চেতনার সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল এবং এ সমস্যাটি মোমেনরা ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কিত এবং বিষয়টা ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ এ বিষয়টির সঠিক ব্যবহারের ওপর ঈমানদার থাকা না থাকা নির্ভর করে। এরই ওপর নির্ভর করে একজন মোমেনের কোনো কিছু মূল্যায়ন করা। এই আকীদার অভাবের কারণেই সে কারও সাথে যুদ্ধ করে। মোমেনদের ও অন্যদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বাধার একটিই মাত্র কারণ, আর তা হচ্ছে, মোমেনরা তাদের আকীদা বিশ্বাস অটুট রাখতে চায় এবং অপরকেও সেই আকীদার দিকে আহবান জানানোর স্বাধীনতা দাবী করে, আর আল্লাহর রাজ্যে তাঁরই আইন চালু করার মাধ্যমে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করতে চায়।

আলোচ্য সূরাটির সকল কথার মধ্যেই এই আকীদা বিশ্বাসের গুরুত্ব বিবৃত হয়েছে এবং একমাত্র সেই পতাকা সমুন্নত করার প্রেরণা দান করা হয়েছে যার নীচে সামগ্রিকভাবে গোটা মুসলিম জাতি একত্রিত হতে পারে। সুতরাং সেই পতাকার ছায়াতলে যারা আশ্রয় নেবে, তারাই হবে মুসলিম জামায়াতের লোক, আর যারা তাদের সাথে বিরোধ বা লড়াই করবে, তারা হবে তাদের দুশমন। যে কোনো ব্যক্তি তাদের (মুসলমানদের) নিরাপত্তা দেবে, তাদেরকে তাদের আকীদা বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে দেবে এবং তাদের দাওয়াত অপরের কাছে পেশ করায় কোনো বাধা দেবে না, মানুষকে ইসলামের দিকে এগিয়ে আসতেও মানা করবে না, আগ্রহী কোনো ব্যক্তি ও মুসলমানদের সাথে (শয়তানের পাল্লায় পড়ে) মেলামেশায়ও কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না, তাদের কথা শুনতেও কোনো বাধা দেবে না, মোমেনদের কোনো প্রকার বিপদগ্রস্ত করবে না, সে অবশ্যই নিরাপদ থাকবে এবং তার প্রতি সদ্ব্যবহার ও সুবিচার করতে ইসলাম কখনই মানা করে না।

মুসলমানরা পৃথিবীতে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বাস করতে পারে একমাত্র তার মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতেই। নিজেদের সকল কাজ তারা সম্পাদন করে এই আকীদা ঠিক রেখে এবং তার আশেপাশের জনগণের সাথে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলে। কারও সাথে বিবাদ বিসম্বাদ করা, আত্ম-প্রতিষ্ঠা বা গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্যে মুসলমানরা সংগ্রাম বা যুদ্ধ করে না। এখন এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন বলতে কি বুঝায়? শ্রেণীগত আভিজাত্য, এলাকাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ অথবা পরিবার ও বংশগত অভিজাত্য কায়েমের জন্যে ইসলামের জেহাদ? না তা নয়। ইসলামের জেহাদ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর কাজ ও কথা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে এবং তার এই আকীদার ভিত্তিতেই মুসলমান রচনা করতে চায় জীবনের সমস্ত আইন কানুন।

(১) দেখুন আস্ সালামুল আলামী অল্ ইসলাম, অধ্যায়ঃ তাবীয়াতুল ইসলাম ফিল ইসলাম

এ সূরার পর সূরা তাওবা নাযিল হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সকল দায়িত্বমুক্তির কথা ঘোষণা করা হলো সেই সকল মোশরেকের জন্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছো.......।' এ আয়াত দ্বারা ইতিপূর্বে মুসলমান ও মোশরেকদের মধ্যে গড়ে ওঠা সকল চুক্তি পুরোপুরিভাবে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছিলো। যে সকল লোকের সাথে মুসলমানরা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে আক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলো তাদের জানানো হলো, যেন চার মাসের মধ্যে তারা তাদের সকল কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নেয়। চার মাস পার হওয়ার পরই অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল বলে ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে যে কোনো পক্ষ অপর পক্ষের ওপর আক্রমণ করাটা কোনো নীতিবিরোধী কাজ হবে না। এ ঘোষণা দ্বারা তাদের সাথেও কৃত চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করা হলো যাদের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে চুক্তি করা হয়েছিলো। এই বাতিল ঘোষণা করার কারণ অতীতের অনেক অভিজ্ঞতা থেকে এটা জানা গিয়েছিলো যে, মোশরেকরা মুসলমানদের সাথে কৃত কোনো চুক্তির পরওয়া করে না। তারা লাভবান হওয়ার জন্যেই চুক্তিতে আবদ্ধ হতো এবং যখন দেখতো চুক্তি তাদের স্বার্থের অনুকূল থাকছে না, তখনই তারা তা ভংগ করতো। এজন্যে তাদের ব্যবহার উপযোগী দ্বিতীয় নিয়ম চালু করে দেয়া হলো।

'যখনই তোমরা কোনো জাতি বা দল থেকে চুক্তিভংগের আশংকা অনুভব করবে, তখনই (তাদের চুক্তি বাতিল ঘোষণার পূর্বে) তোমরা চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে দেবে, কারণ আল্লাহ তায়ালা আমানতের খেয়ানত করা (চুক্তি বাতিলের ঘোষণা না দিয়ে আক্রমণ করা) পছন্দ করেন না।' ইসলামী নিয়ম ঠিক রাখার জন্যে এই চুক্তি বাতিল ঘোষণার প্রয়োজন ছিলো। এ সময়ে গোটা আরব উপদ্বীপের মোশরেক ও আহলে কেতাবদের মধ্যে সহ-অবস্থানকালে এভাবে চুক্তি রদ করার নিয়ম চালু ছিলো। অবশ্য তারা বাতিল ঘোষণা না করেই অতীতে বার বার (চুক্তি বিরোধী কার্যকলাপ করে) বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অর্থাৎ চুক্তির শর্তের বিরোধী কাজ তারা বার বার করেছে। এই ভাবে তারা বার বার সীমালংঘন করেছে এবং কোনো প্রকার নিয়ম কানুন মেনে চলার প্রয়োজনবোধ করেনি। বিশেষ করে তৎকালীন পৃথিবীর দুটি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা ও প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলো। এ উদ্দেশ্যে তারা আরব উপদ্বীপের সেই আমীরদের সাথে যোগাযোগ করতে শুরু করেছিলো, যারা ছিলো রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত। সর্বনাশা এক মহাযুদ্ধ আসন্ন হয়ে ওঠেছিলো'। যুদ্ধ ছাড়া শক্তিদর্পী এ সাম্রাজ্যবাদীদের দমন করার আর কোনো উপায় ছিলো না।

মোহাজের নারীদের ব্যাপারে ইসলামের নীতি

এ পর্যন্ত আলোচনার পর আমরা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ের দিকে ফিরে যাই, যার থেকে কিছুক্ষণের জন্যে আমরা অন্য প্রসংগে চলে গিয়েছিলাম। আমাদের প্রসংগ ছিলো মোমেন স্ত্রীলোক যারা মক্কা থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে ইসলাম কি বিধান দিয়েছে সে সম্পর্কিত? এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যখন মোমেন স্ত্রীলোকরা তোমাদের নিকট হিজরত করে চলে আসে, তখন তাদের (হিজরত করার মূল কারণ) পরখ করে নিশ্চিতভাবে জেনে নাও ... এবং ভয় করো আল্লাহকে যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছো।' (৭-১১ আয়াত)

মোহাজের মহিলাদের সম্পর্কে এ বিধান নাযিল হয়েছিলো হোদায়বিয়ার সন্ধির পর। সেখানে বলা হয়েছে, '(সন্ধির শর্তের মধ্যে এটা থাকতে হবে যে,) তোমাদের দ্বীন-এর ওপর আস্থা স্থাপনকারী কোনো মুসলমান ব্যক্তি যদি আমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে চলে যায়, তাহলে

অবশ্যই তাকে ফেরত দিতে হবে।' এ চুক্তি সম্পাদনের পর পরই যখন মোহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর মুসলমান সাহাবারা হোদায়বিয়া প্রান্তর অতিক্রম করে চলে আসছিলেন, সেই মুহূর্তেই কয়েকজন মোমেন মহিলা মক্কা থেকে হিজরত করে এসে তাঁদের কাছে হাযির হলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র মদীনায় যাওয়ার জন্যে আশ্রয়প্রার্থী হলেন। সংগে সংগে কোরায়শের লোকজন হাযির হয়ে সন্ধির শর্ত উল্লেখ করে তাদের ফেরত দেয়ার দাবী জানান। প্রকাশ থাকে যে, সন্ধি-শর্তের মধ্যে মহিলাদের সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত কথা ছিলো না, যার কারণে উপরোক্ত আয়াত দুটি নাযিল হওয়া জরুরী হয়ে পড়েছিলো। আয়াত দুটিতে মোহাজের মহিলাদের কাফেরদের নিকট ফেরত দিতে নিষেধ করা হলো এবং প্রকৃতিগতভাবে তারা কিছু দুর্বল বিধায় তাদের হিজরতের প্রকৃত কারণ জানার জন্যে তাদের একটু পরীক্ষা করে নেয়ার জন্যে বলা হলো।

এ প্রসংগে কিছু রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনও নাযিল হলো। এসব আইনের মধ্যে সকল প্রকার কার্যকলাপ সর্বাধিক সুবিচারপূর্ণ নীতির ওপর নির্ধারণ করা হলো, তাতে প্রতিপক্ষ কি মনে করবে বা বাড়াবাড়ি অথবা যুলুম করতে পারে, এসব কিছুর কোনো তোয়াক্কাই করা হলো না। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সকল প্রকার আদান-প্রদানে ইসলামের সুদৃঢ় নীতি অবলম্বন করা হলো। হোদায়বিয়ার সন্ধি-শর্ত পালনে প্রথম পরীক্ষা এসে গেলো, কিছু সংখ্যক মুসলিম মোহাজের মহিলাকে ফিরিয়ে দেয়ার প্রশ্ন সামনে এলো। এ ব্যাপারে কারো বিবাহ-বন্ধনে জোর করে ধরে রাখার জন্যে, বা ব্যক্তিগত সুবিধার্থে তলব করা অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে ব্যক্তিগত কারো ভালোবাসার মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে কোন নীতির পরিবর্তন করা হয়নি!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত মহিলাদের পরীক্ষা করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, 'আল্লাহর কসম খেয়ে বলো, স্বামীর প্রতি ঘৃণার কারণে হিজরত করেছো? এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছো? দুনিয়ার কোনো স্বার্থ পাওয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছো, না কি একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের মহব্বতে হিজরত করেছো?'

ইকরামা (রা.) বলেন, তাকে (উক্ত মহিলাকে) বলা হবে, আল্লাহ-রসূলের মহব্বতে হিজরত করেছো, না কোনো ব্যক্তির প্রেমে পড়ে হিজরত করেছো, না তোমার স্বামীর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে হিজরত করেছো?

এইভাবে পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। তাদের বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে এবং আল্লাহর কসম খেয়ে তাদের নিজের স্বীকারোক্তির ওপর নির্ভর করে ফয়সালা দেয়া হয়েছে। অন্তরে কিছু গোপন করা হলে তা আল্লাহ পাকই বুঝবেন, মানুষের সে বিষয়ে কোনো হাত নেই। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালাই তাদের ঈমান সম্পর্কে ভাল জানেন। কাজেই তারা যদি আল্লাহ-রসূলের মহব্বতেই হিজরত করে এসেছে বলে তাদের স্বীকারোক্তিতে জানা যায়, সে অবস্থায় কাফেরদের নিকট তাদের আর ফিরিয়ে দিয়ো না।'

'এ স্ত্রীলোকরা ওদের (কাফের স্বামীদের) জন্যে হালাল নয়, অথবা এ পুরুষরাও ওদের জন্যে হালাল নয়।'

আলোচ্য আয়াতে আকীদাকেই প্রথম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে– যেহেতু মুসলমানদের প্রথম সম্পর্ক গড়ে ওঠে আকীদার ভিত্তিতে। অন্য সম্পর্ক সেখানে গৌণ বিধায় সেটার কোনো মূল্যই এ প্রসংগে দেয়া হয়নি। অন্য সম্পর্ক যে কোনো সময় কেটে যেতে পারে। বৈবাহিক সম্পর্ক হচ্ছে পারস্পরিক মিলন, একে অপরের ঘনিষ্ঠ হওয়া এবং স্থায়ীভাবে মিলেমিশে জীবন যাপন করা। মুসলমানের প্রথম (ঈমানের) সম্পর্কই যদি কেটে যায়, তাহলে পারস্পরিক সহ-অবস্থান আর সম্ভব

হয় না, যেহেতু মুসলমানের অন্তরের জীবন-পরিচালিকা শক্তিই হচ্ছে ঈমান, যার বিকল্প অন্য কোনো সম্পর্ক হতে পারে না। সুতরাং, সেই ঈমানের সম্পর্কই যদি নষ্ট হয়ে যায় আর অন্তর থেকে ঈমান রূপ রত্ন যদি হারিয়ে যায়, সে অবস্থায় মোমেনের অন্তর অন্য কোনো কিছুতে সাড়া দিতে পারে না। না তাকে সে ভালোবাসতে পারে। না তার প্রতি কোনো আকর্ষণ অনুভব করে, না তার সাথে বসবাস করতে পারে, আর না তার কাছ থেকে কোনো শান্তি পেতে পারে। আর বৈবাহিক সম্পর্কই হচ্ছে পারস্পরিক মহব্বত, দয়া-সহানুভূতি ও এক সাথে শান্তিতে বসবাস করার জীবন।

হিজরতের গোড়ার দিকে এ প্রসংগে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নাযিল না হওয়ার কারণে এ বিষয়টি পরিত্যক্তই ছিলো, অথবা এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া হয়নি, আর এজন্যে মোমেন ও কাফের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদও ঘটানো হয়নি। মোমেন স্ত্রীকে কাফের স্বামী থেকে অথবা মোমেন পুরুষকে কাফের স্ত্রী থেকে পৃথক করা হয়নি। কারণ তখনও ইসলামী সমাজের পূর্ণাংগ প্রতিষ্ঠা হয়নি এবং এ সম্পর্কে পূর্ণাংগ বিধানও নাযিল করা হয়নি। তারপর হোদায়বিয়ার সন্ধি অথবা অন্য বর্ণনায় হোদায়বিয়ার বিজয়ের পর পূর্ণাংগ ফয়সালা এসে গেলো এবং মোমেন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের বিবেকের মধ্যে একথা স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হলো, যা সত্যিকারে ইতিমধ্যেই জানাজানি হওয়া (সম্ভবত) দরকার ছিলো। স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হলো যে, ঈমানের সম্পর্কই আসল সম্পর্ক, আকীদার বন্ধনই আসল বন্ধন এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কের খাতিরেই অন্যান্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ইনসাফ ও সমান সমান ব্যবহারের দাবী হচ্ছে, যখন বিচ্ছেদ ঘটানোর নীতি চালু করা হবে, তখন উভয় পক্ষে একই নীতি চালু করা হবে। এর ফলে কাফের স্বামী মোমেন স্ত্রীর জন্যে যা কিছু মোহর বাবদ খরচ করেছে তা পরিত্যাগ করার কারণে যে কষ্ট দেয়া হবে তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উক্ত অর্থ ফিরিয়ে দিতে হবে। একইভাবে মোমেন পুরুষ কাফের স্ত্রীর জন্যে যা কিছু মোহর বাবদ খরচ করেছে, বিচ্ছেদজনিত কষ্টের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাকে তাও ফেরত দিতে হবে।

এভাবে লেনদেন সমাপ্তির মাধ্যমে যখন বিচ্ছেদ কার্যকর হবে, তখনই মোমেনদের জন্যে সেসব মোহাজের মহিলাকে মোহর দান করে বিয়ে করা হালাল হবে। অবশ্য গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত বা বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত কোনো ইদ্দত পালন করতে হবে কিনা, অথবা তিন তুহ্র (তিন মাস)-এর ইদ্দত পালন করা লাগবে কিনা, অথবা জরায়ু পরিষ্কার পাওয়ার জন্যে একবার হায়েয হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করা কি যথেষ্ট হবে এসব প্রশ্নে একটি ব্যাপারে বুঝার তারতম্যের কারণে কিছু মতভেদ আছে! (এ বিষয়টি যেহেতু অতীত হয়ে গেছে এবং এ ধরনের ঘটনা খুবই সীমিত আকারে ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে এসব সমস্যা আর আসার মতো নেই, এজন্যে সুনির্দিষ্ট কোনো কথা এ সম্পর্কে আসেনি।) পরবর্তীতে এরশাদ হচ্ছে,

'দাও তাদেরকে (মহিলাদের) যা তারা (পূর্বের স্বামীরা) খরচ করেছে (এবং যে মোহর ওই মহিলারা ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছে), তাদের মোহর বাবদ পাওনা যখন তোমরা দান করবে তখন তাদের বিয়ে করায় তোমাদের কোনো অসুবিধা নাই। তোমরাও কাফের স্ত্রীদের তোমাদের বিবাহ বন্ধনে আটকিয়ে রেখো না। যা তোমরা খরচ করেছো তোমরা তা চেয়ে নাও। কাফের স্বামীরাও তালাক দেয়ার সময় তাদের পাওনা চেয়ে নিক (যা তারা স্ত্রীর জন্যে খরচ করেছে)।

তারপর মোমেন ব্যক্তির বিবেকের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আল্লাহর হুকুম পালন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করানো হচ্ছে, তাকে নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে যে, অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা সব কিছু তদারকী করছেন। সুতরাং তাঁকে সকল অবস্থায় ভয় করে চলতে হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'এইই হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ ও ফয়সালা, তিনিই সব কিছুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ তায়ালা সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, বিজ্ঞানময়।'

আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার মনোভাবই হচ্ছে একমাত্র নিশ্চয়তা, যা মানুষকে অন্যায়ের কাছে নতিস্বীকার হতে রক্ষা করে, কোনো কিছুর চাপে ভেংগে পড়তে দেয় না এবং কোনো অজুহাত তালাশ করতেও বলে না। আল্লাহর হুকুম মানেই মহাজ্ঞানী ও চির বিজ্ঞানময় আল্লাহর হুকুম। এ হুকুম সকল অন্তরেই অনুভূত হয়। এ হুকুমই সকল শক্তির আধার এবং এই হুকুমই সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহর হুকুম। এ হুকুমপ্রাপ্ত হওয়াই একজন মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে সাড়া দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। যখন কোনো ব্যক্তি গভীরভাবে বুঝতে পারে, এ হুকুম কোত্থেকে এসেছে, তখন সে এ হুকুম পালন করার ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে পারে এবং অপরকে এ হুকুম সম্পর্কে জানাতে পারে। আর তখনই সে স্থিরভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত তাকে আল্লাহ পাকের কাছে ফিরে যেতে হবে।

এমতাবস্থায় মোমেনদের খরচ করা কোনো সম্পদ কোনো ব্যক্তির কাফের হওয়ার কারণে যদি হারিয়ে যেতে চায়, তাহলে তা চেয়ে নিতে হবে অথবা কাফের স্ত্রীদের পরিবারের লোকেরা যদি মোমেন স্বামীর পাওনা বুঝিয়ে দিতে না চায়, যেমনটি কোনো কোনো অবস্থায় ঘটেছেও, সে অবস্থায় মুসলমানদের নেতার কর্তব্য হবে তার দাবী জানিয়ে আদায় করে লওয়া। আবার কোনো স্ত্রী মোমেনা হয়ে গেলে তার কাফের স্বামী তার পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে, যেহেতু তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করায় ও দারুল ইসলামে (ইসলামী রাষ্ট্রে) চলে আসায় আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অথবা তার সম্পদ গনীমতের মাল হিসাবে মুসলমানদের হস্তগত হয়ে যাওয়ার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কাফেরদের কাছে তোমাদের স্ত্রীদের থেকে যাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকো, সে অবস্থায় তোমাদের খরচকৃত অর্থ ফিরে পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করো........ যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো।'

মোমেনদের অন্তরে এই আল্লাহ্‌ভীতিই গভীরভাবে বিরাজ করে। এইভাবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যে সর্বোত্তম পন্থা হিসাবে এসব নির্দেশ জারি করা হয়েছে এবং জীবনের মূল্যবোধ ও জীবনের বিভিন্ন সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্যে ইসলামী চিন্তা চেতনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ইসলামী রীতিনীতির কথা জানিয়ে দিয়ে এটা যে অন্যান্য সকল রীতি নীতি থেকে ভালো, তার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, গোটা জীবনের সৌধ রচিত হয়েছে আল্লাহর প্রতি ঈমানের ওপর এবং ঈমানকে কেন্দ্র করেই সকল বিশ্বাস আবর্তিত হয়।

মানব জগতের সৃষ্টির মধ্যে শ্রেণী, রং, ভাষা, বংশ ও এলাকার ভিত্তিতে অবশ্যই কিছু পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু এ সব পার্থক্যের ওপর তাদের মান-মর্যাদা নির্ভর করে না; বরং একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাদের মর্যাদাবান বানায়, আর তা হচ্ছে আল্লাহভীতি, যার ভিত্তিতে কেউ হয় আল্লাহ্‌র দল, আর কেউ হয় শয়তানের দল। এভাবে কারও অগ্রগতি হয় আর কারো হয় অধোপতন।

মোহাজের নারীদের থেকে বায়াত গ্রহণের নীতি

এরপর রসূলুল্লাহ (স.)-কে জানানো হয়েছে, হিজরতকারী মহিলাদের থেকে ঈমানের ভিত্তিতে কিভাবে বায়য়াত গ্রহণ করা হবে, তারা এবং অন্য যারা ইসলাম গ্রহণ করছে তাদের কোন্ জিনিসের ভিত্তিতে বায়য়াত করানো হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে নবী, যখন তোমার নিকট মোমেন মহিলারা এসব শর্তে বায়য়াত হতে আসে যে, তারা শেরেক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারও ওপরে নিজেদের ব্যভিচারের অপবাদ চাপিয়ে দেবে না এবং কোনো নেক কাজের নির্দেশ দিলে তা অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়য়াত করাও এবং তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, মেহেরবান।'

এইই হচ্ছে সেসব মূল কাজ, যা ইসলামী আকীদা গ্রহণ করার পর পালন করা জরুরী হয়ে যায় এবং যা নতুন এক সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। এর মধ্যে সকল প্রকার শেরেক পরিত্যাগ করতে, যেসব অপরাধ করলে শাস্তি পাওয়া জরুরী হয়ে যায় তা পরিত্যাগ করতে এবং সন্তানাদি হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ দ্বারা জাহেলী যুগে জ্যান্ত কন্যা পুঁতে ফেলার প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একইভাবে অন্যান্য অপরাধের মধ্যে ভ্রূণ হত্যার প্রতিও নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কারণ এসব ভ্রূণ তো মায়ের পেটের মধ্যে আল্লাহর দেয়া আমানত...... 'এবং কেউ কারও প্রতি নিজেদের ব্যভিচারের মিথ্যা দোষ যেন চাপিয়ে না দেয়।' এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, শেষের এ কথার অর্থ হচ্ছে, অবৈধভাবে ধারণ করা অন্যদের সন্তানদের নিজেদের স্বামীর সন্তান বলে দাবী করে মিথ্যা বলা। মোকাতেলও উক্ত কথার এই একই অর্থ বলেছেন। আর সম্ভবত বায়য়াত হওয়ার পর এসব অপরাধ থেকে পরহেয করার অংগীকার করার কথা বলা হয়েছে। জাহেলী যামানায় মহিলারা একাধিক পুরুষের কাছে নিজেদের সমর্পণ করতো। তারপর সন্তান জন্ম নিলে (সেসব পুরুষকে হাযির করে) দেখত কে সে সন্তানের সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এভাবে যার সাথে বেশী সাদৃশ্য হতো, তাকেই তারা সে সন্তান দিয়ে দিতো। এইভাবে তারা উক্ত সন্তানদের বাপদের চিনে নিতো।

এই অবস্থার প্রতি সাধারণভাবে এখানে ইংগিত করা হয়েছে এবং এই রকম আরও অনেক মিথ্যা দাবী জাহেলী যুগে করা হতো, যার প্রতি এখানে ইংগিত করা হয়েছে। আর এ কারণেই সম্ভবত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মোকাতেল সে সময়কার অবস্থা সামনে রেখে উক্ত অর্থ বুঝেছেন।

মোহাজের মহিলাদের কাছ থেকে বায়য়াত গ্রহণকালে তাদের প্রতি শেষ যে শর্তটি আরোপ করা হতো তা হচ্ছে, 'তারা কোনো নেক কাজে তোমার অবাধ্যতা করবে না।' একথা দ্বারা তাদের কাছ থেকে ওয়াদা নেয়া হয়েছে, তারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর সকল নির্দেশ পালন করবে। আর নিশ্চিতভাবে একথা সত্য যে, রসূলুল্লাহ (স.) মানুষের জন্যে যা কিছু কল্যাণকর হতে পারে তারই নির্দেশ দিতেন। তবু ইসলামী সংবিধানে এ কথাটিকে অন্যতম শর্ত হিসাবে পেশ করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, এ কথা স্থির করে দেয়া যে, যে কোনো ব্যক্তির আনুগত্য করা হবে, চাই সে ইমাম হোক বা প্রশাসক হোক, তার ভালো ও কল্যাণকর কাজের জন্যে দেয়া সকল নির্দেশ পালন করতে হবে, কোনো মন্দ (জনহিতকর নয় এমন) কাজের জন্যে প্রদত্ত নির্দেশ পালন করা যাবে না, অর্থাৎ সে নির্দেশ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ও শরীয়তের পরিপন্থী না হলেই কেবল তা মানা যাবে। একথা দ্বারা প্রমাণিত হলো, বাছবিচার না করে নেতা বা শাসকের সকল নির্দেশ পালন করা যাবে না। এইই হচ্ছে আল্লাহর আইনের অধীনে থেকে আইন রচনার মূলনীতি। আল্লাহর বিধানের খেলাফ হলে সে বিষয়ে নির্দেশদাতা বা নির্দেশ পালনকারী উভয়ের জন্যে এ নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যেমন নির্দেশদানকারীর নির্দেশ শরীয়াতসংগত হতে হবে, তেমনি শরীয়তসম্মত কাজেই সে নির্দেশ মানা জরুরী হবে। উভয়ের মধ্যে কেউই শরীয়তের এ সীমা লংঘন করতে পারবে না। এ সীমার মধ্যে থেকে নির্দেশ দিলে তা পালন করা ফরয হবে এবং এর বাইরের

নির্দেশ, অর্থাৎ আল্লাহর আইনের বিপরীতে যে কোনো আইন অমান্য করাই তখন ফরয হবে।

অতএব, এসব মূলনীতি মেনে নিয়ে যারা বায়য়াত করতে চাইবে, তাদের বায়য়াত করানো হবে এবং রসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহর দরবারে তাদের পেছনের সমুদয় অপরাধের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হবেন। 'অবশ্যই আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল মেহেরবান।' তিনি মাফ করে দেবেন এবং রহমও করবেন। তার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।

পরিশেষে আসছে সাধারণ নির্দেশ, যা সর্বসাধারণের জন্যেই সমভাবে প্রযোজ্য। 'হে ঈমানদাররা, সেই জাতির সাথে বন্ধুত্ব করো না যাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা গযব নাযিল করেছেন। ওরা অবশ্যই পরকাল সম্পর্কে তেমনি করে হতাশ হয়ে গেছে যেমন করে কবরবাসীরা হতাশ হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর আক্রোশ তাদের ওপর এমনভাবে নেমে এসেছে যে, আখেরাতে মুক্তির আশা তারা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে, ঠিক যেমন করে অন্যায়কারী কবরবাসীদের মুক্তির কোনো আশা থাকে না। লক্ষণীয়, এখানে ঈমানদার হওয়ার কারণেই ঈমান নামের দোহাই দিয়ে মোমেনদের ডাকা হয়েছে। তাদের এমন গুণের কথা বলা হয়েছে যা অন্য সকল জাতি থেকে তাদের পৃথক করে। এই গুণ তখনই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যখন তারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আল্লাহ্র দুশমনদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক কেটে দেয়।

এ প্রসংগে কোনো কোনো রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, গযবপ্রাপ্ত এ জাতি হচ্ছে ইহুদী। এর কারণ স্বরূপ বলা যায়, কোরআনের অনেক জায়গায় তাদের গযবপ্রাপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু তাই বলে একমাত্র তারাই গযব প্রাপ্ত, আর কেউ নয়, এ কথা ঠিক নয়; বরং ইহুদী মোশরেক যারাই আল্লাহর নাফরমানীতে অগ্রগামী হবে, তারাই এ আয়াতের লক্ষ্য হবে এবং আলোচ্য সূরাতেও এই কথারই ইংগিত পাওয়া যায়। আল্লাহর সকল দুশমন এবং সেসব জাতি, যাদের ওপর আল্লাহ্র আক্রোশ এসে পড়েছে, তারা সবাই এ আযাবের লক্ষ্য এবং তারা সবাই আখেরাতের জীবনে মুক্তির ব্যাপারে হতাশ। অত্যধিক অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকায় তারা নিজেরাই আখেরাতে মুক্তি পাবে বলে মনে করে না এবং কবরস্থ মৃত কাফেরদের ন্যায় তাদের কাছ থেকে কোনো সহজ হিসাব গ্রহণ করা হবে বলে তারা মনে করে না। যেহেতু তাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মে গেছে, তাদের কাজ ও ব্যবহার এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তাদের তাওবা করার বা অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসার আর কোনো উপায় নেই বলে তাদের বিশ্বাস। অতএব, কোনো সহজ হিসাব আর তাদের হতে পারে না।

সূরার মধ্যে বর্ণিত সকল ঘটনা ও বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘোষণা।

সুতরাং যেভাবে সূরাটির মধ্যে আলোচনার সূচনা করা হয়েছিলো সেই একইভাবে আলোচনা শেষ করা হয়েছে যাতে করে অপরাধীরা বুঝতে পারে যে, শেষ অবস্থা তাই হবে যার আওয়ায অন্তরের মধ্যে সদা সর্বদা গুঞ্জরিত হয়ে চলেছে।

সূরা আস্ সাফ

আয়াত ১৪ রুকু ২

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٢ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٣ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝٤ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۚ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٥ وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর (পবিত্রতা ও) মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়। ২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা এমন সব কথা বলো কেন যা তোমরা (নিজেরা) করো না। ৩. আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা এমন সব কথা বলে বেড়াবে— যা তোমরা করবে না! ৪. আল্লাহ তায়ালা তাদের (বেশী) পছন্দ করেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে, যেন তারা এক শিশাঢালা সুদৃঢ় প্রাচীর। ৫. (মূসার ঘটনা স্মরণ করো,) যখন মূসা নিজের জাতিকে বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছো, অথচ তোমরা এ কথা জানো, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো একজন রসূল; অতপর লোকেরা যখন বাঁকা পথে চলতে আরম্ভ করলো, তখন আল্লাহ তায়ালাও তাদের মন বাঁকা করে দিলেন; আল্লাহ তায়ালা কখনো না-ফরমান লোকদের সঠিক পথের দিশা দেন না। ৬. (স্মরণ করো,) যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা তাদের বললো, হে বনী ইসরাঈলের লোকেরা, আমি তোমাদের কাছে পাঠানো আল্লাহর এক রাসূল, আমার আগের তাওরাত কেতাবে যা কিছু আছে আমি তার সত্যতা স্বীকার করি এবং তোমাদের জন্যে

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

আমি হচ্ছি একজন সুসংবাদাতা, (তার একটি সুসংবাদ হচ্ছে), আমার পর এক রসূল আসবে, তার নাম আহমদ; অতপর (আজ) যখন সে (আহমদ সত্য সত্যিই) তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে হাযির হলো তখন তারা বললো, এ হচ্ছে এক সুস্পষ্ট যাদু! ৭. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, (অথচ) তাকে ইসলামের দিকেই দাওয়াত দেয়া হচ্ছে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা কখনো সীমালংঘনকারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না। ৮. এ লোকেরা মুখের ফুৎকারেই আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়; অথচ তিনি তার এ নূর পরিপূর্ণ করে দিতে চান; তা কাফেরদের কাছে যতোই অপছন্দনীয় হোক না কেন। ৯. তিনি তাঁর রসূলকে একটি স্পষ্ট পথনির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন সে (রসূল) একে দুনিয়ার (প্রচলিত) সব কয়টি জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে দিতে পারে, তা মোশরেকদের কাছে যতোই অপছন্দনীয় হোক না কেন!

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য এ সূরাটিতে দুটি মৌলিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, যা এর বর্ণনাধারার মধ্যে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠেছে, এ মৌলিক বিষয় দুটি বুঝানোর জন্যে বারবার ইশারা-ইংগিতের পন্থাও অবলম্বন করা হয়েছে।

আলোচনার প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানের মনের মধ্যে একথা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেয়া যে, মানুষের জন্যে যে জীবন ব্যবস্থা প্রেরণ করা হয়েছে তা হচ্ছে তার শেষ অবস্থা সামনে রেখে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান কায়েম করা। মানবেতিহাসে ইতিপূর্বে মানুষের পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রেক্ষিতে এই জীবন বিধানই বার বার এসেছে। এসেছে বহু রসূলের জীবনে এবং তাদের অনুসরণে বহু মানব গোষ্ঠীর মধ্যে এ জীবন ব্যবস্থা চালু করার অভিজ্ঞতা মানুষ লাভ করেছে, যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে শেষ নবীর জীবনে এসে। তাঁকে তিনি সমাপ্তকারী রসূল বানাতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে তিনি মানব নির্মিত সকল জীবন ব্যবস্থার ওপর তাঁর প্রদত্ত এই জীবন ব্যবস্থাকে বিজয়ী করতে চেয়েছিলেন।

এই প্রসংগে মূসা (আ.)-এর রেসালাতের কথা উল্লেখিত হয়েছে যাতে একথা স্থিরভাবে জানিয়ে দেয়া যায় যে, যে জাতির কাছে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা তাঁকে মারাত্মক কষ্ট

দিয়েছিলো এবং এর ফলে তারা গোমরাহ হয়েছিলো। অতপর তারা আর পৃথিবীর বুকে এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। এরশাদ হচ্ছে, 'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন মূসা (আ.) তার জাতিকে ডেকে বললো, হে আমার জাতি, কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছো, অথচ তোমরা তো জানো, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল হয়ে এসেছি। এরপর যখন তারা (সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে) বাঁকা পথ ধরল, তখন আল্লাহ তায়ালাও তাদের অন্তরগুলোকে বাঁকা করে দিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা এমন কোনো অপরাধী জাতিকে হেদায়াত করেন না (যারা উপর্যুপরি অপরাধ করে চলে এবং কখনো লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় না)।

এরপর আল্লাহর যমীনে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে মূসা (আ.)-এর জাতির নেতৃত্বের অবসান হয়ে গেলো। তারপর তারা আর কখনও আল্লাহ্র অনুগত হতে পারেনি। যেহেতু তারা সঠিক পথ পরিত্যাগ করে বাঁকা পথ অবলম্বন করেছিলো। ফলে আল্লাহ তায়ালাও তাদের বাঁকা পথে চালিয়ে দিয়েছিলেন। ইচ্ছাকৃতভাবে তারা ভুল পথ বেছে নিয়েছিল। এজন্যে আল্লাহ তায়ালাও তাদের জন্যে ভুল পথে চলা সহজ করে দিয়েছিলেন। আর আল্লাহ তায়ালা অপরাধী জাতিকে হেদায়াত করেন না।

এরপর ঈসা (আ.)-এর রেসালতের কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যেন একথা জানানো যায়, তিনি মূসা (আ.)-এর সাহায্যের জন্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি তাঁর সামনে যে তাওরাত কেতাব বর্তমান ছিল তার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে এবং সর্বশেষ রসূল (স.)-এর পূর্বাভাস ও সুসংবাদ দান করার জন্যেও প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী আহলে কেতাব এবং পরবর্তী আহলে কেতাব ব্যক্তিগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্যেও প্রেরিত হয়েছিলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ কারো সে সময়ের কথা, যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা বললো, হে বনী ইসরাঈল জাতি, অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র রসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমি সত্যায়নকারী তাওরাত কেতাবের, যা আমার সামনে রয়েছে এবং সুসংবাদদানকারী সেই (অনাগত) রসূলের, যিনি আমার পরে আসবেন, যাঁর নাম হবে আহমাদ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মূসা (আ.)-এর পর আল্লাহর কাছ থেকে তিনি দ্বীন ইসলামের যে আমানত পেয়েছিলেন তাই তিনি পরবর্তী সেই রসূলের কাছে হস্তান্তর করতে এসেছিলেন যার সুসংবাদ তিনি দিচ্ছিলেন। আর আল্লাহর জ্ঞানভান্ডারে একথা মওজুদ ছিলো এবং স্থির করা ছিল যে, তাঁর দ্বীনকে শেষ বারের মতো দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করা হবে এবং শেষ রসূলের হাতে আল্লাহ্র যমীনে এই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে, যদিও মোশরেকরা এটা পছন্দ করে না।

এ সূরার মধ্যে আলোচিত প্রথম স্পষ্ট লক্ষ্যের ওপর স্থাপিত হয়েছে দ্বিতীয় লক্ষ্য। অতএব মুসলমানদের চেতনার মধ্যে একথা দৃঢ়তার সাথে স্থাপন করা হচ্ছে এবং তাদের ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যে আকীদা বিশ্বাস তারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে তারই ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠবে তাদের জীবন ব্যবস্থা, সেই জীবন ব্যবস্থাকে পৃথিবীর বুকে চালু করাই তাদের আসল দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রয়োজন চূড়ান্ত সংগ্রামের এবং মানব নির্মিত সকল জীবন ব্যবস্থার ওপর ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হবে তাদের এই জেহাদ। এই চূড়ান্ত প্রচেষ্টাই আল্লাহর কাম্য। তিনি চান মুসলমানদের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য না থাকুক। তিনি চান না এই ওয়াদা পালনে তারা কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করুক। তিনি চান তারা ঈমান আনার দাবী করে যে ওয়াদায় আবদ্ধ হয়েছে এই জেহাদের মাধ্যমেই তা পূরণ করুক।

তিনি কিছুতেই পছন্দ করেন না যে, মোমেনরা জেহাদ করার আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং তারপর বাস্তব জেহাদ যখন হাযির হবে, তখন তারা পেছন দিকে ফিরে দাঁড়াবে, যেমনটি অতীতে ঘটেছিলো মুসলমানদের একটি দলের পক্ষ থেকে; যা বেশ কিছু রেওয়ায়াতের মাধ্যমে জানা যায়। আর এভাবেই সূরার শুরুতে সৃষ্টির সব কিছু যে আল্লাহর প্রশংসায় রত একথা ঘোষণার পর নাযিল হচ্ছে, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, কেন বলছো এমন সব কথা যা তোমরা করো না? আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু সেই কথা বলা যা তোমরা করো না। নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা তাদের পছন্দ করেন যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে যেন তারা এক শীশাঢালা প্রাচীর।'

এরপর সূরাটির মধ্যভাগে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে সব থেকে লাভজনক ব্যবসার দিকে আল্লাহ তায়ালা তাদের ডাকছেন। বলছেন, 'হে ঈমানদাররা, আমি কি তোমাদের বলবো এমন একটি ব্যবসার কথা যা তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবে? ...... আল্লাহর সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। সুতরাং সুসংবাদ দাও মোমেনদের।'

তারপর মোমেনদের প্রতি শেষ আহবান রেখে সূরাটি শেষ করা হচ্ছে। যেন তারা সেইভাবে আল্লাহর সাহায্যকারী দলে পরিণত হয়ে যায়, যেমন ঈসা (আ.)-এর একদল সাহায্যকারী ছিলো, আল্লাহর দিকে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করত। বনী ইসরাঈল জাতির বিরোধিতা ও চরম শত্রুতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই দলটি তাঁকে সাহায্য করত। এরশাদ হচ্ছে, 'হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন করে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরকে তিনি বলেছিলেন ....ফলে তারা চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হলো।'

এ সূরার মধ্যে শেষের এ দুটি লাইন অত্যন্ত স্পষ্ট। এখানে আল্লাহর প্রায় সব কথাই এসে গেছে। শুধু শেষ রসূল (স.)-কে অস্বীকারকারীদের কঠোর সমালোচনার কথাটিই বাকি রয়ে গেছে। এই হচ্ছে সূরাটির কাহিনী ও বক্তব্যের লক্ষ্য এবং হঠকারী কাফেরদের সমালোচনার কথা এই মৌলিক আয়াত দুটির মধ্যে পরোক্ষভাবে অবশ্যই এসে গেছে, তা একটু খেয়াল করলে বুঝা যায়। রসূলুল্লাহ (স.)-এর সুসংবাদ দিতে গিয়ে ঈসা (আ.)-এর উক্তি আল্লাহর বাণীতে কি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে। 'তারপর যখন তাদের কাছে স্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে সে এসে গেলো, তখন তারা বলে ওঠলো, এটা তো স্পষ্ট জাদু.........অথচ অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নূরকে পূর্ণত্ব দানকারী, যদিও কাফেররা এটা পছন্দ করে না।

এখানে একজন মুসলিম ব্যক্তির অন্তরে একথা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাই তার জন্যে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা, যা শেষ রসূলের আমলে সমাপ্ত হয়েছে এবং সমগ্র পৃথিবীর বুকে পরিচিত হয়েছে। গোটা মানব জাতির কাছে এ ব্যবস্থা পৌঁছে দেয়া তাঁর দায়িত্ব। তিনি জানেন, তাঁকে অবশ্যই আল্লাহর পথে জেহাদ করতে হবে (অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে চালু করার জন্যে মাল ও জানের কোরবানী নিয়ে চূড়ান্ত সংগ্রামে নামতে হবে)। যেহেতু এটাই আল্লাহর পছন্দ। এভাবে এ চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং তাঁর ধারণায় আর কোনো অস্পষ্টতা থাকার অবকাশ নেই, বা একাজ করতে গিয়ে তাঁর জীবনে এমন কোনো ভয় ভীতি নেই যাতে তাঁর স্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে যাবে, অথবা তিনি দুর্বিষহ দুঃখভারে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। নেই তাঁর সংকল্পের মধ্যে দৃঢ়তার অভাব বা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করার ব্যাপারে কোন জড়তা । আল্লাহ পাকের দেয়া জ্ঞান ও তাঁর নির্ধারিত পরিণাম বিলম্বে হলেও যে আসবেই, এ বিষয়ে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই।

এই স্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে মুসলমানদের তাদের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে আহবান জানানো হচ্ছে, তার মননশীলতার প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের চিন্তা করতে বলা হচ্ছে। সুতরাং এমন কথা একজন মুসলমান বলবে না যা সে করে না, প্রকাশ্যে গোপনে, একাকিত্বে, সর্বসমক্ষে সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সে কথা বলবে, কথা বলবে মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে। তার কথা ও কাজের মধ্যে থাকবে স্বচ্ছতা, তার প্রতিটি পদক্ষেপে সে হবে দৃঢ়, সে তার ভাইদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে হবে আবেগময়, এইভাবে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠবে তা হবে শীশাঢালা প্রাচীরের মতোই মযবুত।

তাফসীর

আয়াত ১-৯

'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর প্রশংসায় রত এবং তিনি মহাশক্তিমান মহাজ্ঞানী।'

গোটা সৃষ্টির সব কিছু থেকে আল্লাহর এই প্রশংসা নিশিদিন উত্থিত হয়ে চলেছে (নিরন্তর আনুগত্য করার মাধ্যমে)। তারা জানাচ্ছে যে, তিনি মহাশক্তিমান, মহাজ্ঞানী। সূরার শুরুতে মুসলমানদের জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের মধ্যে তাদের কাছে আগত জীবন পদ্ধতিই হচ্ছে শেষ সংস্করণ। আল্লাহ তায়ালার একত্ব প্রতিষ্ঠায় তারাই শেষ দায়িত্বশীল। তাদেরই দায়িত্ব, কাফের-মোশরেকদের কুফরী কাজ ও যাবতীয় শেরেক আচরণ প্রতিহত করা। তিনি (মহান আল্লাহ) তাদের জেহাদ করার জন্যে, তাঁর সাহায্যের জন্যে আহবান জানিয়েছেন এবং আল্লাহ তায়ালা নিজেই নিশ্চিতভাবে স্থির করে দিয়েছেন যে, তিনি অন্যান্য জীবন ব্যবস্থার ওপর এই জীবন ব্যবস্থাকে বিজয়ী করে দেবেন, যদিও মোশরেকরা এটা পছন্দ করে না। আর যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা জেহাদ করবে সেই একই আকীদা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে বিরাজ করছে। আর অন্যান্য জীবন প্রণালীর ওপর এই জীবন প্রণালীর বিজয় অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু এই জীবন ব্যবস্থাই সৃষ্টির সব কিছুর সাথে সংগতিপূর্ণ এবং সবাই সেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কাজ করে চলেছে যিনি মহাশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী।

কথায় কাজে অমিল আল্লাহর ক্রোধ জাগায়

আল্লাহ তায়ালা এখানে অত্যন্ত কঠোরভাবে ঈমানদারদেরকে তিরস্কার করছেন এমন একটি বিষয়ের ওপর, যা তাদের মধ্য থেকে একটি দলের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো। বিষয়টি এমন কঠিন যা আল্লাহ তায়ালা ভীষণভাবে অপছন্দ করেন এবং তাকে সব থেকে বেশী ঘৃণা করেন। এমন আচরণ বিশেষ করে মোমেনদের জন্যে ভয়ানক অপরাধ বলে গণ্য। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, কেন বলছো এমন কথা যা তোমরা করো না? আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় হবে যদি এমন কথা বলো যা তোমরা পালন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের পছন্দ করেন যারা তাঁর রাস্তায় এমন সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে যেন তারা শীশাঢালা একটি প্রাচীর।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে আলী ইবনে তালহা বলেন, জেহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে মোমেনদের একটি দল বলতো, আল্লাহর কাছে কোন্ কাজটি সব থেকে প্রিয় তা যদি তিনি আমাদের জানিয়ে দিতেন, তাহলে তা আমাদের কাছে কতই না ভালো লাগতো! তাহলে তা আমরা পালন করতাম। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর

ওপর ঈমান আনা এবং যারা একথা মানে না ও বিরোধিতা করে সেই অপরাধীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা নিসন্দেহে সব থেকে ভালো কাজ, কিন্তু যখন জেহাদের আয়াত নাযিল হলো, তখন মোমেনদের একটি দল তা আর পছন্দ করলো না, বরং এ নির্দেশ তাদের নিকট বড়ই কঠিন লাগলো। কাজেই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তখন এরশাদ করলেন, 'হে ঈমানদাররা, কেন বলছো তোমরা এমন কথা যা তোমরা পালন করো না? আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় হবে (ওই আচরণ) যদি তোমরা বলো এমন কথা যা বাস্তবে পালন করো না।' ....

ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে এ কথাটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ইবনে কাসীরও তাঁর তাফসীরে বলেছেন, 'ওলামায়ে কেরামের অধিকাংশ এ আয়াতটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, আয়াতটি তখনই নাযিল হয়েছে যখন তারা তাদের ওপর জেহাদ ফরয হওয়া কামনা করছিল, কিন্তু যখন জেহাদ তাদের ওপর ফরয করে দেয়া হলো, তখন তাদের কেউ কেউ এ হুকুম এড়িয়ে গেলো। যেমন আল্লাহর এরশাদে জানা যায়, 'তুমি কি দেখনি সেসব ব্যক্তির দিকে যাদের বলা হয়েছিলো, তোমাদের হাতকে যুদ্ধ থেকে থামিয়ে দাও, নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তাদের জেহাদ করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হলো, তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল মানুষকে এতো ভয় করতে লাগলো যেমন আল্লাহকে ভয় করা দরকার। অথবা আল্লাহ তায়ালা থেকে তারা সেসব বিরোধী মানুষকে বেশী ভয় করতে শুরু করলো এবং তারা বলতে লাগলো, 'হে আমাদের রব, আমাদের ওপর কেন জেহাদ ফরয করে দিলেন? হায়, আমাদের নিকটবর্তী একটি সময় পর্যন্ত যদি জেহাদে যাওয়া থেকে রেহাই দিতেন তা হলে কতই না ভালো হতো! বলো (হে নবী), দুনিয়ার সুখ-সম্পদ অতি তুচ্ছ এবং আল্লাহকে যারা ভয় করে এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখে যারা জীবন যাপন করে, তাদের জন্যে আখেরাতই উত্তম (স্থান) এবং তাদের প্রতি একটি সুতা পরিমাণও যুলুম করা হবে না। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের স্পর্শ করবেই। যদি তোমরা অত্যন্ত মযবুত কেল্লার মধ্যেও লুকিয়ে থাকো, সেখানেই মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবে।

কাতাদা ও দাহ্হাক বলেন, এ আয়াতটি সেই জাতিকে ধমক দিতে গিয়ে নাযিল হয়েছে যারা বলে, আমরা হত্যা করেছি, মারপিট করেছি, নানা প্রকার দোষারোপ করেছি এবং আরও কত কি করেছি; কিন্তু কই তারা তো কিছুই করতে পারলো না।

কিন্তু আয়াতগুলোর বর্ণনাভংগিতে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে কথা থাকায় বুঝা যায়, নাযিল হওয়ার প্রসংগ তাই যা ইবনে জারীর বলেছেন এবং অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামও এই কথাই মনে করেন। তবে এটা মনে রাখতে হবে, কোরআন করীমের বর্ণনা কোনো একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হলেও আরও বহু বিষয়ের ওপর তা প্রযোজ্য, যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তা নাযিল হয়েছে সেটি ছাড়াও আরও বহু অবস্থার ওপর তার থেকে দলীল গ্রহণ করা যায়। আর এ কারণেই আমরা এই ঘটনাগুলো সামনে রেখে এর থেকে আরও বহু বিষয়ের ওপর শিক্ষা গ্রহণ করি।

সূরাটি একটি বিশেষ ঘটনা বা ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে তিরস্কার করতে গিয়ে নাযিল হয়েছে। এরশাদ হয়েছে,

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, কেন তোমরা বলো এমন কথা যা তোমরা করো না?'

জিজ্ঞাসার সুরে এ কথা জিজ্ঞেস করে যে আচরণের ওপর কথাটি বলা হয়েছে তার ঘোরতর আপত্তিকর হওয়ার কথা জানানো হয়েছে। তাই বলা হয়েছে,

‘এটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা বাস্তবে করবে না।’

যে ঘৃণার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সব থেকে বড়, আসলেই তা সব থেকে বড় ঘৃণার বিষয় এবং যতো প্রকার অপ্রিয় জিনিস থাকতে পারে সেসব কিছু থেকে বেশী অপ্রিয়। এ বিষয় এবং কোনো কাজের জন্যে এই অভ্যাস চরম ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, বিশেষ করে একজন সেই মোমেনের জন্যে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যার ঈমানের সৌন্দর্যের কারণেই তার দিকে মানুষকে ডাকা হয় এবং যিনি ডাকছেন তিনি হচ্ছেন তার প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা, যার প্রতি সে নিজে ঈমান এনেছে।

তৃতীয় আয়াতটিতে সরাসরি সেই বিষয়টির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা তারা বলেছে, কিন্তু করেনি, অর্থাৎ তা হচ্ছে জেহাদ। আর এটা সাফ সাফ জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই জেহাদই আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন এবং এই কাজেই তিনি সন্তুষ্ট হন।

‘অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের পছন্দ করেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, যেন তারা শীশাঢালা এক প্রাচীর।’

এতে বুঝা গেলো, এ কাজ শুধুমাত্র একটি যুদ্ধ নয়, বরং এটি আল্লাহর পথে যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধ করার মধ্যে মুসলমানদের সাথে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে, ‘এমন সারিবদ্ধভাবে যেন তারা শীশাঢালা এক প্রাচীর।’

মুসলিম সমাজের সামষ্টিক বৈশিষ্ট্য

আলোচ্য এই পারার মধ্যে বিভিন্ন প্রসংগে বার বার এ কথা বলা হয়েছে যে, কোরআনে করীম নাযিল হয়েছিলো এক বিশিষ্ট জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে। পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আমানত বহন করার জন্যেই এই জাতিকে গড়ে তুলেছিলেন। এ জাতির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া এই জীবন ব্যবস্থা যেমন চালু করতে হবে, তেমনি গোটা মানবমন্ডলীর মধ্যে এ ব্যবস্থা চালু করার জন্যে নিরন্তর চেষ্টা করে যেতে হবে, আর এই লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যক্তিকে যেমন এ আমানত বহন করার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে, তেমনি গঠন করতে হবে এমন একটি দল, যারা বাস্তব কর্মকান্ডের মাধ্যমে এর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলবে। এসব কাজ একই সময়ে চলতে থাকবে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, দলীয় জীবনের মধ্যে মানুষ হওয়া ব্যতীত একজন ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ মুসলমানরূপে গড়ে তোলা সম্ভব নয় এবং একটি সুসংগঠিত দলের মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনোভাবে এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা কল্পনাই করা যায় না। এ জাতির গঠন পদ্ধতি হবে সুনির্দিষ্ট এবং সামষ্টিক জীবনের কল্যাণই হবে এর লক্ষ্য, কিন্তু সাথে সাথে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন সে কল্যাণের অধিকারী হতে পারে সেদিকেও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর দেয়া এই জীবন বিধান যেমন হবে বিবেক বুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য, তেমনি পৃথিবীর বুকে বাস্তব কর্মের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অবশ্যই একথা সত্য যে, যে সমাজে মুসলমানরা বাস করবে, নড়াচড়া করবে ও কাজ করবে, সেই সমাজেই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করার কারণে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ফল পাওয়া যাবে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকে তীব্রভাবে সাড়া জাগাবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সাগ্রহে তা অনুসরণ করতে পারবে। এ ব্যবস্থা সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের কোনো আনুষ্ঠানিক উপাসনা নয় যে, তারা নিজ নিজ উপাসনালয়ে তা পালন করবে। কোনো মানুষের জীবনে

ব্যক্তিগত কাজ হিসাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে না, বা জীবনের বিশেষ কোনো অবস্থার সাথে এ ব্যবস্থাকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে তাও নয়। অথবা এও সত্য নয় যে, জীবনের সকল স্বাভাবিক অবস্থা থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার জন্যে ইসলাম এসেছে; বরং ইসলাম এসেছে মানব জীবনকে পরিচ্ছন্নভাবে পরিচালনা করতে এবং সকল দিক ও বিভাগে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে তার যোগ্যতার স্ফুরণ ঘটাতে। মানুষের জীবন একাকী অবস্থায় চলতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা তাকে সৃষ্টিই করেছেন সামাজিক জীব হিসাবে, এজন্যে তারা সমাজবদ্ধভাবে বা জাতি হিসাবে একত্রে বাস করে। তাই এই সমাজের মধ্যে থেকে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে চলার শিক্ষাই ইসলাম মানুষকে দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই ইসলাম তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে আর এই কারণেই তার নিয়ম শৃংখলা, আইন কানুন এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থা এ মূল লক্ষ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তির বিবেকে এই বিষয়ের ওপর চিন্তা ভাবনা আসে, তখন সে নিজেকে একজন সামাজিক জীব হিসাবেই চিন্তা ভাবনা করে। তবে, মুসলমান হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে ও সামাজিক জীবন যাপন করা কালে সর্বদাই সে আল্লাহমুখী হয়ে থাকে। মুসলমানরা ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে তাদের জীবনের আইন কানুন গড়ে তোলে এবং অন্য মানুষকে পরিচালনা করে।

ইসলামী দাওয়াতের সূচনা থেকেই ইসলামী সমাজ গড়ে ওঠেছে অথবা বলা যায় গড়ে ওঠেছে মুসলমানদের একটি এমন মযবুত দল, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন খোদ রসূলুল্লাহ (স.)-এর অনুগত ব্যক্তিবর্গ। তারা এই দলের ব্যক্তিদের মধ্যে দলীয় জীবন যাপন করার বৈশিষ্ট্য বরাবর কায়েম করে রেখেছিলেন এবং এই দলের মধ্যে এমন ক্ষমতা ছিলো, যা তাকে আশেপাশের সকল দল থেকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে তুলেছিলো। এমন আদব শৃংখলা এ দলে বিরাজ করতো যা দলের সকল সদস্যের হৃদয়কে সদা সর্বদা আকর্ষণ করেছিলো। এই গুণাবলীর ওপর নির্ভর করে ইসলামী দলের স্থায়িত্ব। আর মুসলিম জামায়াতের মধ্যে এসব দলীয় বৈশিষ্ট্য মদীনায় মুসলমানদের রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিলো, বরং সত্য বলতে কি, এই গুণাবলীর ওসীলাতেই মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিলো।

এই তিনটি আয়াতের দিকে তাকাতেই আমরা দেখতে পাই, এর মধ্যে অতি চমৎকারভাবে দলীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাথে ব্যক্তিগত জীবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে। আয়াতগুলোতে আরও ফুটে ওঠেছে যে, এসব গুণ লালিত হয়েছে দ্বীনী আকীদা বিশ্বাসের ছায়াতলে। এই আকীদার প্রকৃত দাবীই হচ্ছে, সারা জগতের সকল মানুষের মধ্যে সুশৃংখল ও ভারসাম্যপূর্ণ এক জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং এই জীবন ব্যবস্থা যাতে টিকে থাকে তার জন্যে এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং এর জন্যে সদা সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

প্রথম দুটি আয়াতে সেই সকল মোমেনের প্রতি তিরস্কার ও ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে, যারা এমন কথা বলে যা বাস্তবে তারা পালন করে না। প্রকারান্তরে এ আয়াত দুটিতে বলা হয়েছে, একজন মুসলিম ব্যক্তির চরিত্রে সত্যবাদিতা ও সত্য পথে দৃঢ়তা অবলম্বনের গুণ অবশ্যই থাকতে হবে, তাদের প্রকাশ্য ও গোপন এক হতে হবে এবং সকল কথায় কাজে মিল থাকতে হবে। আলোচ্য আয়াত তিনটির শেষোক্ত আয়াতে যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কিত কথা উচ্চারিত হয়েছে।

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংগ্রামের এই মনোভাব থাকতেই হবে যার উল্লেখ আল কোরআনের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায় এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসেও বহু জায়গায় এর বর্ণনা পাওয়া যায়। আল কোরআনে ইহুদী সম্প্রদায়কে ডেকে বলা হয়েছে, তোমরা কি মানুষকে

ভালো কাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদের ভুলে যাও, অথচ তোমরাও তো (তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ) কেতাব তেলাওয়াত করো, তোমরা কি কিছুই বুঝো না। 'আবার মোনাফেকদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'ওরা বলে (হাঁ আমরা) 'আনুগত্য' (করছি)। তারপর তোমার কাছ থেকে সরে গিয়ে তোমার সম্পর্কে এমন কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে যা তুমি বলোনি।' এই কারণে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'আর মানুষের মধ্যে এমন কোনো কোনো ব্যক্তিকে দেখতে পাবে, দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে তার কথা তোমাকে মুগ্ধ করে ফেলবে, কিন্তু তার অন্তরে যা কিছু আছে তা অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দেখছেন। তাই তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন, সে নিকৃষ্টতম দুশমন। এহেন ব্যক্তি যখন তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে সরে যায়, তখন সে পৃথিবীর বুকে নানা প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এবং মানুষের ফসল ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতিতে লিপ্ত হয়ে যায়, আর আল্লাহ তায়ালা অশান্তি পছন্দ মোটেই করেন না। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, মোনাফেকের লক্ষণ ৩টি,

(১) কথা বলার সময় মিথ্যা কথা বলা, (২) কোনো ওয়াদা করলে তা খেলাফ করা, (৩) আর কখনও তার কাছে কোনো আমানত রাখলে তার খেয়ানত করা। (আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ীতে)।

এই অর্থে আরও বহু হাদীস পাওয়া গেছে এবং এখন যে হাদীসটি আমরা উল্লেখ করবো, তা এ প্রসংগে বর্ণিত সব থেকে সূক্ষ্ম এবং অর্থবহ হাদীস বলে আমরা মনে করি, যেহেতু তা নবী জীবনের সব থেকে মহান দিক তুলে ধরেছে। ইমাম আহমাদ এবং আবু দাউদ আবদুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণনা করেন. 'একদিন নবী করীম (স.) আমাদের বাড়ীতে এলেন, তখন আমি ছোট বালক। খেলতে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। আম্মা ডাক দিয়ে বললেন, আবদুল্লাহ, শোনো, আমি তোমাকে দিচ্ছি। তখন রসূলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, ওকে কি দিতে চাইলে? আম্মা বললেন, কিছু খেজুর। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, দেখো, যা দিতে চেয়েছো, তা যদি না দাও, তাহলে তোমার আমলনামায় কিন্তু একটি মিথ্যা বলার গুনাহ লিখিত হয়ে যাবে। সম্ভবত নবী (স.)-এর শিক্ষার এই ঝর্ণাধারা থেকে গভীরভাবে পান করতে পেরেছিলেন বলেই আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) সেই ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করেননি যে তার খচ্চরকে পাথরের পাত্র দেখিয়ে খাবারের লোভ দিয়ে কাছে ডেকেছিলো, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেছেন পাত্রটি শূন্য। এই অবস্থা দেখে এতো দূর থেকে হাদীস সংগ্রহের জন্যে তার কাছে পৌঁছেও তিনি তার থেকে কোনো হাদীস গ্রহণ করেননি, তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে চলে এসেছেন, কারণ সে তার খচ্চরের সাথে প্রতারণা করেছে।

এই ছিলো সেই সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ আখলাকী বুনিয়াদ, যা একজন মুসলমানের বিবেক ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্যে সহায়ক হয়েছে এবং উপযোগী ভূমিকা পালন করেছে, যেহেতু পৃথিবীতে সে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে দায়িত্বশীল হিসেবে কাজ করছে। আর এই কথাই বক্ষ্যমাণ সূরাটি বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছে। আর এই শিক্ষাই সেই সকল মৌলিক শিক্ষার অন্যতম, যা মুসলিম জামায়াতকে দুনিয়ার বুকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করার উপযোগী বানিয়েছে।

আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা সর্বোচ্চ এবাদাত

এখন আমরা সরাসরি সেই বিষয়টি আলোচনার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যার কথা কোরআন করীমের অবতরণকালের শুরুতেই প্রকাশ করা হয়েছিল। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর রাজ্যে তাঁর প্রভুত্ব কায়েম করার লক্ষ্যে চূড়ান্ত সংগ্রাম তথা জেহাদ। সুতরাং আসুন হাদীসটির বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আমরা একটু দৃষ্টিপাত করি এবং এর থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করি।

প্রথমেই আমরা মানব জীবনের স্বাভাবিক দুর্বলতার দিকে একটু খেয়াল করবো। যে দুর্বলতা থেকে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া এবং নিরন্তর তাঁর উপদেশ স্মরণ করা ব্যতীত কিছুতেই রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্যে সার্বক্ষণিক খেয়াল এবং নিরন্তর প্রশিক্ষণ গ্রহণ প্রয়োজন। সুতরাং, কোনো কোনো রেওয়ায়াত বলা হয়েছে যে, 'এই হচ্ছে সেই মুসলিম জামায়াত'– এ কথা দ্বারা ইংগিত করা হচ্ছে, মক্কা থেকে আগত সেই মুসলিম জামায়াতের দিকে, যারা অতি উৎসাহ ও স্বভাবের কারণে আকাংখা করছিলো যে, তাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হোক। অথচ তখন তাদের প্রতি যুদ্ধ থেকে হাত গুটিয়ে রাখার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার নির্দেশ ছিলো। কিন্তু মাদানী যিন্দেগীতে আল্লাহর নির্ধারিত সঠিক সময়ে যখন তাদের প্রতি যুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হলো, তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল মানুষকে এমনভাবে ভয় করতে শুরু করলো যেমন আল্লাহকে ভয় করা দরকার, বরং বলতে কি, তারা আল্লাহর থেকেও বেশী মানুষকে ভয় করতে শুরু করলো। তারা বলে ওঠলো, হে আমাদের রব, কেন আমাদের প্রতি যুদ্ধ ফরয করে দিলে। আমাদের নিকটবর্তী এক সময় পর্যন্ত বিলম্ব করার অবসর দিলে না কেন? অথবা এরা ছিলো মদীনার মুসলমানদের একটি দল, যারা বার বার জিজ্ঞেস করে জানতে চাচ্ছিলো আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্‌টি, যাতে করে তারা তা করতে পারে, কিন্তু এ সর্বাধিক প্রিয় কাজ ছিলো জেহাদ। এর নির্দেশ যখন তাদের দেয়া হলো, তখন মোটেই তাদের আর তা ভালো লাগলো না!

জেহাদ সম্পর্কে এই স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগির কারণে আমাদের বুঝা সহজ হবে এবং এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের চোখ খুলে যাবে যে, মানুষে মানুষে হৃদ্যতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলাই আমাদের আসল কাজ। আমাদের এই দৃষ্টিভংগি জোরদার করতে হবে, এর ওপর দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে এবং এ বিষয়ে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে হবে, যদিও এটা কোনো সহজ কাজ নয়, এ পথে দৃঢ় থাকা ও এ পথে মযবুতীর সাথে চলতে পারাটা অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন কাজ, এর জন্যে অনেক দুর্বল মুহূর্তকে জয় করতে হবে এবং দৃষ্টিকে সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত করতে হবে। আল্লাহর রহমতে এবং রসূল (স.)-এর শিক্ষার আলোকে আমরা যে জ্ঞান লাভ করেছি তাতে বুঝতে পেরেছি, যখন কোন কঠিন কাজের জন্য দায়িত্ব দেয়া না হয়, তখন সে কঠিন কাজ করতে চাওয়া বা তার জন্যে কোনো আকাংখা প্রকাশ করা আমাদের জন্য উচিত নয়। কিন্তু সে গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্যে যখন আমাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হবে, তখন নিজের মত প্রকাশ করার অধিকার বা কোনো পরামর্শ দেয়ার অধিকার আমাদের থাকবে না। প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্য থেকে একটি দল এই দুর্বলতা দেখিয়েছিলো এবং এমন সব কথা বলেছিলো যা তারা নিজেরা পালন করেনি। শেষ পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের ভাষায় অত্যন্ত কঠোরভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের তিরস্কার করেছেন এবং যাদের কথা ও কাজে মিল নেই, তাদের জন্যে অত্যন্ত ভয়াবহভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর আক্রোশের কথা ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহর ঘোষণা,

'তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহর মহব্বত, যারা শীশাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে লড়াই করে।' আমরা দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তায়ালা কি কঠিনভাবে তাঁর পথে যুদ্ধ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করছেন। এই পর্যায়ে প্রথম যে জিনিসটি প্রকাশ পেয়েছে তা হচ্ছে, ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে তাদের অনীহা প্রকাশ পেয়েছে, যুদ্ধের ডাকে সাড়া দিতে বিনা কারণে বিলম্ব করা হয়েছে, এর প্রয়োজন সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছে এবং যুদ্ধকে ঘৃণা করা

হয়েছে। তবে এটাও সত্য, এই অদ্ভুত মনোভাব সবার ছিলো না, সব সময় ছিলো না এবং এ আশ্চর্য মনোভাবের কারণে নিষ্ঠাপূর্ণ সাধারণ মুসলমানের মনে তেমন কোনো ভাবান্তর দেখা দেয়নি, যেহেতু এর পেছনে স্থায়ী এক বুদ্ধিমত্তা সক্রিয় ছিলো, যার কারণে খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তিরা কর্তব্যচ্যুত হয়নি।

ইসলাম অবশ্যই যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করে না বা যুদ্ধ-বিগ্রহ কেউ ভালবাসুক তাও চায় না, তবু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায় বলে কোন কোন সময়ে একে ইসলাম ফরয ঘোষণা করেছে। যেহেতু এর পেছনে যে লক্ষ্য রয়েছে তা অতি বৃহৎ। এ জন্য আল্লাহ্ তায়ালার আইন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ইসলাম সর্বশেষ অবস্থার কাজ, অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবেলা করে। যুদ্ধের এ আইন সম্পূর্ণ প্রকৃতিসংগত হওয়া সত্তেও এটা মানুষের জন্য কিছু কষ্টদায়ক, তবু তা সুমহান লক্ষ্যের কারণে অনেক সময়ে অনিবার্য হয়ে যায়। মানুষের মংগলার্থে ইসলামী ব্যবস্থা চালু হওয়া জরুরী হওয়া সত্তেও পৃথিবীর বহু শক্তি এর বাস্তবায়ন পছন্দ করে না। কারণ তাতে তাদের বিশেষ বিশেষ সুবিধা ভোগের পথ বন্ধ হয়ে যাবে বলে তারা মনে করে। তারা স্পষ্ট দেখতে পায়, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের বিলাসিতার দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। এ জন্যই এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা লড়াই করে এবং মানুষের জীবনে এর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখলে এর বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়ায়। এই শক্তিগুলো মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ঈমান ছিনিয়ে নিতে চায়, থামিয়ে দিতে চায় তাদের ইসলামের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কার্যক্রম, এমনকি তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত তারা বিলুপ্ত করে দিতে চায়। কোন কোন সময়ে তারা মানুষের বুদ্ধিহীনতার সুযোগ নেয় এবং এই আইনের বিরোধিতা করে বিভিন্ন পরিবারের অসহায় ওয়ারিসদের কাছ থেকে স্বার্থ বাগানোর উদ্দেশ্যে এ আইন প্রতিষ্ঠার পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই সীমাহীন অন্যায় সর্বত্র এবং সর্বযুগে বিরাজ করে। নির্লজ্জ মিথ্যার দাপটে পৃথিবীর বাসিন্দারা পেরেশান থাকে এবং শয়তান হচ্ছে তাদের সামনে মূর্তিমান ধোকা। আর এই কারণে ঈমানের ওপর হামলাকারীকে প্রতিরোধ করা মোমেনের দায়িত্ব হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং অন্যায়কারী ও শয়তানের দোসরদের ওপর মোমেনদের বিজয়ী করার লক্ষ্যে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করাই তার প্রধান কাজ হিসাবে স্থির করা হয়েছে। এই লক্ষ্যেই মযবুত করা হয়েছে মোমেনদের চরিত্রকে এবং তাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের যোগ্য বানানো হয়েছে। মানব নির্মিত আইন পর্যুদস্ত করে নবীর মাধ্যমে আগত এই নতুন ব্যবস্থার দিকে দাওয়াত দানের পথ নিষ্কন্টক করার জন্য সঠিক আকীদার প্রচার প্রসারের আযাদীলাভ এবং ইসলামের বিধিমতে কর্মের স্বাধীনতা বহাল করা ও রাখার জন্য যুদ্ধ করাকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, উপরোক্ত উদ্দেশ্যে কাজ করার কারণে শত্রুপক্ষ থেকে যুদ্ধ যদি বাধানো হয়, তবেই যুদ্ধ করা যাবে। পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য যুদ্ধ বাধানো বা কাউকে আক্রমণ করা যাবে না। তাই বলা হচ্ছে,

'তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে (তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে)', তাদের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ বা দেশ, বর্ণ, গোত্র, বংশ বা ঘর অথবা অন্য কোন আভিজাত্যবোধের কারণে যুদ্ধ করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহ্র পথে, অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব. প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব তাঁরই যমীনে কায়েমের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করার অনুমতি রয়েছে। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেন, 'যে যুদ্ধ করে শুধুমাত্র এই জন্য যে, আল্লাহ্ তায়ালার কথাই বুলন্দ হবে, সে ব্যক্তিই আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ

করে, অর্থাৎ আল্লাহর কথা সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ করে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র পথে রয়েছে।'(১)

আর আল্লাহ্র ইচ্ছার বহির্প্রকাশই হচ্ছে আল্লাহ্র কথার বাস্তবায়ন, যেহেতু এ কথাগুলোর মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। আমরা মানুষ, আল্লাহর একথাগুলোই আমাদেরকে সেই খবর দেয় যার ওপর সৃষ্টির সকল কিছু কাজ করে যাচ্ছে। এই সৃষ্টির প্রতিটি জিনিস আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা অনুযায়ী চলার মাধ্যমে তার প্রতিপালকের প্রশংসাগীতি গেয়ে চলেছে এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতির সর্বশেষে আগত রূপই হচ্ছে আল্লাহর সেই বিধান, যা কায়েমের উদ্দেশ্যে যুগে যুগে ইসলামের আগমন ঘটেছে। এই বিধান কায়েমের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টিমল্লিকার এই বিপুল সমারোহ, আর তার মধ্যে থেকেই মানুষ আল্লাহ্র আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে শান্তি পায়। নিজেদের মনগড়া কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে শান্তি পাওয়া বা শান্তি দেয়া কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাতিল শক্তির মোকাবেলা করা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাজ নয়; বরং এ দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের। কারণ, বিরোধী রাষ্ট্রসমূহের মোকাবেলায় শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সর্বাত্মকভাবে ইসলামী কার্যক্রম চলতে পারে না। এখানে মনে রাখতে হবে, ইসলামের কিছু কিছু নিয়ম পদ্ধতি চালু করার জন্যই ইসলামের আগমন ঘটেনি, আর এই ধরনের আংশিক কাজে সহায়তা করার জন্যও মুসলমানদের প্রতি জেহাদ ফরয করা হয়নি; বরং ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে, গোটা বিশ্বে আল্লাহ্ পাকের বিধান পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই কারণেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের পছন্দ করেছেন, যারা শীশাঢালা প্রাচীরের মত সারিবদ্ধভাবে আল্লাহ্ তায়ালার পথে যুদ্ধ করে। (২)

তৃতীয়ত, আমরা দেখি, সেই মোজাহেদদের অবস্থার দিকে, যাদের আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধ করার কারণে পছন্দ করছেন, '(যুদ্ধ করছে তারা) শীশাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে।' যুদ্ধ করার জন্য যদিও প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে দায়ী, কিন্তু একটু খেয়াল করলে বুঝা যাবে, আসলে একাজ দলীয়ভাবে করতে হয়। এমন এক দলের সদস্য হিসেবে এ কাজ করতে হয় যার মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলা। যারা ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করবে বলে মনস্থ করেছে তাদের মধ্যে অবশ্যই এই দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলা সহজ। তারা সবাই মিলে এক সাথে একত্রিত হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, ইসলামী বাহিনীকে শত্রুর বিরুদ্ধে অবশ্যই সারিবদ্ধভাবে পর্বতসম দৃঢ়তা নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে (আর এটা নিশ্চিত, একই সময়ে সবাই একত্রিত না হলে এই সারিবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব নয়)। এই সারি হবে সুশৃঙ্খল এবং একদম সোজা, সুদৃঢ়, অনমনীয় এবং লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাদের সংকল্প দ্বারা তারা প্রমাণ করবে যে, তারা দলীয় শৃঙ্খলা মানে এবং দলের নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করে না।

এটাও তারা প্রমাণ করবে যে, তারা সুদৃঢ় দলের মধ্যে আবদ্ধ থেকে সুসমঞ্জস ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী। সুতরাং সে ব্যক্তি যে একাকী থাকতে চায়, একাকীই আল্লাহর আনুগত্য করা পছন্দ করে, এককভাবেই যুদ্ধ-জেহাদ করায় বিশ্বাসী এবং একাকী নিরিবিলি জীবন যাপন করার পক্ষপাতী, সে প্রকৃতপক্ষে এই দ্বীনের মেযাজ ও জেহাদকালীন অবস্থার দাবী থেকে অনেক দূরে এবং ইসলামের নিশানবরদারদের যে নেতৃত্বের আসনে বসানোর জন্য আল্লাহর রসূল (স.) চেয়েছিলেন তার ধারে-কাছেও সে নেই।

(১) সহীহ পাঁচটি হাদীসের কেতাবেই এ হাদীস উল্লিখিত হয়েছে।
(২) দেখুন 'আস-সালামুল আলামিয়্যে অল ইসলাম, অধ্যায় ঃ 'সালামুল আলম'।

সংঘবদ্ধভাবে দ্বীন ইসলাম কায়েম করার জন্য সংগ্রামী মোমেনের দলকেই আল্লাহ পাক ভালোবাসেন এবং আলোচ্য সূরাতে তাদের চলার পথ তিনি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। এ প্রসংগে তাদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে আল কোরআন জানাচ্ছে, '(তারা লড়াই করে) সারিবদ্ধভাবে যেন তারা সিমেন্ট নির্মিত এক মযবুত ইমারত।' এমন ইমারত যার ইটগুলো একে অপরকে সাহায্য করে, একটির সাথে অপরটি মিশে থাকে এবং একে অপরকে আঁকড়ে রাখে। প্রত্যেকটি ইটের মাঝের ফাঁকগুলো সিমেন্ট দ্বারা পূরণ করে দেয়ার ফলে গাথুনিগুলো শীশার মত মযবুত হয়ে যায়। এই ফাঁকগুলো সিমেন্ট দ্বারা বন্ধ না করলে যে ফাঁক হয়ে থাকে, অথবা কোন ইট যদি সরে যায় তাহলে তা তলাবিহীন গর্তের ওপরে অবস্থিত ইমারতের মত হয়ে যায় এবং আজ অথবা কাল তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে বাধ্য। এখন এই ইট সামনে, পেছনে বা পাশে যেখান থেকেই সরে যাক না কেন, বিল্ডিংটি যে দুর্বল হবেই, তার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এটা কোন বাহ্যিক সাদৃশ্য বা তুলনা নয়। মুসলিম জামায়াতের মধ্যে ফাটল ধরার কারণে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় এই তুলনা দ্বারা তা ছবির মত স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে, ফুটে ওঠেছে দলীয় জীবনের প্রকৃতি এবং দলের মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, মুসলমানদের মধ্যে যে নিগূঢ় বন্ধন গড়ে ওঠে এবং একই লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আদর্শবাদী এ দলের মধ্যে পারস্পরিক যে সহযোগিতা সৃষ্টি হয়, তা এ প্রসংগে মূর্ত হয়ে ওঠেছে।

ইহুদী নাসারাদের ঘৃণ্য স্বভাবের কিছু নমুনা

এরপর আল্লাহ পাকের এ আইনের উপলক্ষ এবং ইসলাম-পূর্ব যুগে যাদের রসূল হিসাবে পাঠানো হয়েছিল তাদের বর্ণনা এবং সেই সময়কার অবস্থার বিবরণ দেয়া হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করো সে সময়কার অবস্থা, যখন মূসা তার জাতিকে ডেকে বললো, হে আমার জাতি, কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, অথচ তোমরা জান যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকটে রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি ......তার আগমনের সুসংবাদদানকারী।'

মূসা (আ.)-এর প্রতি বনী ইসরাঈলের দুর্ব্যবহার ও কষ্টদানের অবস্থাও লক্ষণীয়। অথচ তিনি তো ছিলেন তাদের ফেরাউন ও তার আমলাদের দৌরাত্ম্য থেকে উদ্ধারকারী রসূল, নেতা ও শিক্ষক। তবু দীর্ঘ বহু বছর ধরে বিভিন্নভাবে তাঁকে তারা কষ্ট দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে নিরন্তরভাবে তারা বাঁকা পথে চলেছে। তাই আল কোরআন বহুভাবে তাদের এই নিগ্রহের কাহিনী তুলে ধরেছে।

তিনি যখন ফেরাউনের কবল থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেই একই সময়ে তারা মূসাকে কষ্ট দেয়ার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করছিলো, তাঁকে বিপদগ্রস্ত করার চেষ্টা করছিলো এবং নানাভাবে তাঁর ওপর চড়াও হয়ে চলেছিলো। তাঁকে অপমাণিত করে তারা নিজেরা নিরাপদ হতে চেয়েছিলো। তাই তারা তাঁকে দোষারোপ করার ও ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে বলত, তুমি আমাদের কাছে আগমন করার পূর্বেও যেমন আমাদের কষ্ট দেয়া হয়েছে, তোমার আগমনের পরেও তেমনি কষ্ট দেয়া হচ্ছে। ভাবখানা এই, তারা বলতে চাইছিল যে, রসূল আসায় তাদের আদৌ কোন উপকার হয়নি; বরং একেবারে শেষে যে কষ্টটা তারা পেল তার জন্যও সেই (মূসাই) দায়ী! অথচ তারা তো স্পষ্টভাবে দেখে নিয়েছিল, ফেরাউনের অপমান ও যুলুম থেকে তিনিই এক আল্লাহর নামে তাদের উদ্ধার করে মিসর থেকে নিয়ে গেলেন, আর আল্লাহ পাক তাদের চোখের সামনে ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারলেন। এই উদ্ধার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরেও তারা ফেরাউন ও তার জাতির গোলামী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশেষে তারা এমন এক জাতির নিকট পৌঁছুলো, যারা তাদের তৈরী মূর্তির সামনে মাথা ভুলুণ্ঠিত করছিলো। তাদের এই মূর্তিপূজা করতে দেখে এ বনী ইসরাঈলরা বলে ওঠলো, 'আমাদের জন্যও তাদের মতো কিছু সংখ্যক দেব-মূর্তি বানিয়ে দাও।'

আর যখন তিনি তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশে, নির্দষ্ট সময়ে তাঁর পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে প্রেরিত ফলক গ্রহণ করার জন্য গেলেন, তখন তাদের সামেরী নামক এক ব্যক্তি পথভ্রষ্ট করল। সে তাদের জন্য এমন একটি গো-শাবকের দেহমূর্তি তৈরী করে আনল, যার থেকে হাম্বা হাম্বা রবের ন্যায় এক প্রকার শব্দ বের হচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে উপস্থিত ব্যক্তিরা বলে ওঠল, এই তো তোমাদের মাবুদ ও মূসার মাবুদ (উপাস্য), তারপর সে (তার) প্রকৃত রবকে ভুলে গেল।'

এরপর নীল নদ পার হয়ে সিনাই মরুভূমিতে পৌঁছে গিয়ে বিচরণরত অবস্থায় 'মান ও সালওয়া' নামক যে খাদ্য পাচ্ছিল তার কারণে তারা রাগান্বিত হয়ে বলতে থাকল, 'ও মূসা, আমরা কিছুতেই এই একটি মাত্র খাদ্য খেয়ে থাকতে পারবো না। তোমার রবের কাছে দোয়া করো না, যেন তিনি আমাদের জন্য এই যমীন থেকে শাক-সব্জি, শসা, গম, মসুরের ডাল এবং পেঁয়াজ উৎপাদন করে দেন!'

আলোচ্য সূরাতে গাভীর ঘটনায় তাদের গাভী যবাই করার নির্দেশ দেয়া হল, এতে তারা নানা প্রকার বিতর্ক তুলল। তারা এর কারণ জিজ্ঞেস করতে লাগল এবং তাদের নবীর সাথে বেয়াদবী করতে থাকল আর বলল, 'তোমার রবকে ডেকে বলো না আমাদের বলে দিক এর রং কি হবে, বলো না আমাদের বলে দিক এই গরুটা আমাদের কোন্ গরুর মতো দেখতে হবে।' এসবের জওয়াব দেয়া হলে তারা ঐ গরু সংগ্রহ করে যবাই করল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুতেই তারা যবাই করতে চাচ্ছিল না।

এরপর তারা একটি ছুটির দিন চাইলো এবং সে দিনটিকে পবিত্র দিন হিসাবে মানতে থাকবে বলে জানালো, কিন্তু যখন শনিবারকে তাদের জন্য পবিত্র দিন বলে ঘোষণা করা হলো, তখন তারা সীমালংঘন করে সে দিনের পবিত্রতা নষ্ট করলো।

যে এলাকায় তারা প্রবেশ করবে বলে আল্লাহ পাক সুসংবাদ দিয়েছিলেন তার সামনে তারা অসহায় অবস্থায় মুখ বাঁকা করে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে কোরআনের ভাষায় মূসা (আ.)-কে বলছিল, এরশাদ হচ্ছে, 'তারা বলল, ওখানে তো এক ভীষণ শক্তিশালী জাতি বাস করছে। ওখান থেকে তারা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই আমরা ওখানে প্রবেশ করবো না। তারা বেরিয়ে গেলে তবেই আমরা প্রবেশ করবো। এরপর তাদের বার বার সেই শহরে প্রবেশ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করা হলে তারা সেখানে ঢুকতে অস্বীকার করে বসলো ও অহংকারভরে চিৎকার করে ওঠে বললো, 'হে মূসা, শোনো যতদিন তারা ওখানে আছে ততদিন আমরা কিছুতেই (ওখানে) প্রবেশ করবো না। সুতরাং যাও তুমি ও তোমার প্রতিপালক, (তোমরা দুজনে) গিয়ে ওদের সাথে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকলাম।'

এইভাবে তারা কষ্টদায়ক ব্যবহার করে নানা প্রকার প্রশ্ন করে, নাফরমানী করে ও অহংকার দেখিয়ে মূসা (আ.)-কে ক্লান্ত করে ফেলেছিলো এবং কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে, তারা মূসা (আ.)-কে ব্যক্তিগতভাবে মিথ্যা দোষারোপ করেছিলো, অর্থাৎ তাঁর প্রতি নানা প্রকার মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলো এবং তারা দাবী করেছিলো যে, তাদের দুর্দশার জন্য মূলত মূসা (আঃ)-ই দায়ী।

এজন্য আলোচ্য আয়াতে মূসা (আ.)-এর তিরস্কার ও আদরের সাথে তাদের দোষগুলো তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'হে আমার জাতি, কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছো, অথচ তোমরা তো জান যে, তোমাদের কাছে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'

একথার ভংগি ও ভাষায় তারা নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলো, মূসা (আ.) উপদেশ দিতে গিয়েই তাদের এইভাবে তিরস্কার করছিলেন।

এ প্রসংগ শেষ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তাদের সত্য পথে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকার জন্য শত প্রকার প্রচেষ্টা চালানো সত্তেও তারা বাঁকা পথই অবলম্বন করলো, যার ফলে আল্লাহ পাকও তাদের বাঁকা পথে চলার দিকে এগিয়ে দিলেন। তাদের অন্তরগুলোকে বাঁকা করে দিলেন, যার কারণে কোন ভালো কথা তাদের কানে প্রবেশ করলো না এবং তারা কিছুতেই ভালো পথ ধরলো না। তারা নিজেরা ভুল পথ গ্রহণ করলো যার কারণে চিরদিনের জন্য ভুল পথে চলাই তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিলেন এবং আল্লাহ পাক কোন অপরাধী (ও অপরাধপ্রবণ) জাতিকে সঠিক পথ দেখান না।

এইভাবেই আল্লাহ প্রেরিত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের যে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা কেড়ে নিলেন, আর এরই ফলে চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুকে তাদের নেতৃত্বের অবসান হলো। এরপর কোন দিন এর সংশোধন আসবে না এবং সর্বদা বাঁকা ও ভুল পথ অবলম্বনের স্বভাবের কারণে তারা চিরদিন বক্র পথ ও গোমরাহীর মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকবে।

তারপর এলেন মারইয়াম-পুত্র ঈসা (আ.)। তিনি আবির্ভূত হয়ে বনী ইসরাঈল জাতিকে ডেকে বললেন, 'হে বনী ইসরাঈল জাতি, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট রসূল হয়ে এসেছি।' খেয়াল করুন, তিনি এ কথা বলেননি যে, তিনিই আল্লাহ, একথাও বলেননি যে, তিনি আল্লাহর ছেলে বা আল্লাহর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোন আত্মীয়। তাঁর পরিচয় পেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তাঁর সামনে অবস্থিত তাওরাত কেতাবের সত্যতার সাক্ষ্যদানকারী এবং সুসংবাদদানকারী তাঁর পরবর্তীতে আগমনকারী এক রসূলের, যাঁর নাম হবে 'আহমাদ'।

এই বর্ণনাভংগিতে রসূলদের পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও তাঁদের দীর্ঘ আগমন পরম্পরার কথা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেছে। তাঁরা সবাই সত্য পথের পথিক, সত্যের ধারক বাহক এবং তাঁদের সবার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ আকাশ থেকে আগত বার্তা দুনিয়ার মানুষের কাছে পৌঁছানোই ছিল তাঁদের সাধারণ লক্ষ্য। রেসালাতের এই দীর্ঘ শেকলের প্রত্যেকটি কড়ি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটিই হচ্ছে আল্লাহর কাজ ও লক্ষ্যের বাস্তব চেহারা। মূলত সকলের পথ একই, যদিও বাহ্যিক চেহারায় মনে হয় ভিন্ন। তাঁদের কর্মধারার মধ্যে কোনো কোনো ব্যাপারে যে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে, সেগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, তার মূল কারণ হচ্ছে, যাদের নিকট রসূলদের দাওয়াত পৌঁছানো হয়েছে তাদের যোগ্যতা, প্রয়োজন ও গ্রহণশক্তির বিভিন্নতা। আরও কারণ হচ্ছে বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান, সত্য সন্দর্শনের শক্তি ও অভিজ্ঞতার তারতম্য, যার কারণে যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা কেউ সত্যকে তাড়াতাড়ি চিনতে পেরেছে ও গ্রহণ করতে পেরেছে, কেউ চিনতে বিলম্ব করেছে বা গ্রহণ করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত থেকেছে। রেসালাতের শেকলের শেষ কড়িটি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ, সুদৃঢ়, পেছনের সকল অভিজ্ঞতার আলোকে যুক্তি-বুদ্ধি আকর্ষণকারী। এই যুক্তি-বুদ্ধি সত্য গ্রহণ করেই ক্ষান্ত নয়; বরং নিজ সীমার মধ্যে থেকে এ বুদ্ধি সত্যকে বাস্তবে প্রয়োগকারী। গোটা মানবমন্ডলীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করা এবং সংঘবদ্ধভাবে এ সত্যের অনুসারীদের সকল শক্তি ও যোগ্যতাকে কাজে লাগানোই এই যুক্তি-বুদ্ধির

লক্ষ্য। ঈসা (আঃ) কর্তৃক আহমাদ (সঃ)-এর আগমনবার্তা আল কোরআনের ভাষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। ইনজীল কেতাবের নানা সংস্করণের মধ্যে এ সম্পর্কে উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক তাতে কিছু আসে-যায় না। কারণ, এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে পদ্ধতিতে ইনজীলের এই পুস্তকগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং যারা এগুলো রচনা করেছে, তাদের বিশ্বস্ততা প্রশ্নের উর্ধ্বে না থাকায় আল-কোরআনের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য এসব পুস্তকের দিকে তাকানো চলে না।

আল-কোরআনের সুমধুর বাণী আরব উপদ্বীপের ইহুদী-নাসারাদের পড়ে শোনানো হয়েছে, সেখানে আহমাদ-এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'তিনি নিরক্ষর নবী, যার বিবরণ ওরা (ইহুদী-নাসারারা) তাদের নিকট অবস্থিত তাওরাত ও ইনজীল কেতাবদ্বয়ে লিপিবদ্ধ পায়।'

কতিপয় আহলে কেতাব আলেম, যেমন আবদুল্লাহ ইবন সালাম ইসলাম গ্রহণ করার পর একথার সত্যতা (অর্থাৎ তাওরাত ও ইনজীল কেতাবে নবী আহমাদ-এর আগমনবার্তার কথা) স্বীকার করেছেন। তিনি এও স্বীকার করেছেন যে, তারা একথাগুলো গোপন রাখার জন্য একে অপরকে বিশেষভাবে উপদেশ দিতো ও অনুরোধ করতো!

এইভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনায় জানা যায়, ইহুদীরা দীর্ঘ দিন থেকে একজন নবীর আগমন প্রতীক্ষায় দিন গুনছিল। একইভাবে আরব-উপদ্বীপের কতিপয় একত্ববাদী নাসারা আলেমও একজন নবীর আগমনের কথা বলতো, কিন্তু ইহুদীরা চাইতো, এই নবীর আগমন তাদের মধ্যে ঘটুক। তারপর যখন আল্লাহ পাক চাইলেন যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর দুই শাখার মধ্যে দ্বিতীয় শাখায় শেষ নবীর আগমন হোক, তখন ওদের কাছে এটা খারাপ লাগলো এবং তারা নবী (সঃ)-এর সাথে নানা প্রকার কূটতর্ক শুরু করে দিলো। অবস্থা যাই হোক না কেন, অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত সংবাদের সাথে প্রমাণের জন্য এ সম্পর্কিত আল-কোরআনের সিদ্ধান্তকারী আয়াতই যথেষ্ট এবং এ প্রসংগে এই শেষের কথাটিই চূড়ান্ত প্রমাণ।

আলোচ্য সূরার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত অধিকাংশ আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা যায়, বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে ইহুদী ও নাসারাদের বিরোধিতার মোকাবেলায় আয়াতে উল্লিখিত এ কথাগুলো বলা হয়েছে। কারণ তাদের নিকট অবস্থিত কেতাবগুলো অবশ্যই তাঁর (নবীর) আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছে, যা তারা ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে রাখছিলো। নবাগত এই যে দ্বীন (ইসলামী জীবন ব্যবস্থা), যাকে আল্লাহ পাক মানব নির্মিত যাবতীয় জীবন ব্যবস্থা ও আইন-কানুনের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ও পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং স্থির করেছিলেন যে, শেষবারের মতো প্রেরিত এই ব্যবস্থাই হবে সমাপ্তকারী ও চূড়ান্ত। সেই জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই ইহুদী-খৃস্টানরা নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলো যা এখনও চালু আছে।

এরশাদ হচ্ছে, 'তারপর যখন তাদের কছে আল-কোরআনের সত্যতা ও সঠিকতা সম্পর্কে সকল প্রকার দলীল-প্রমাণ হাযির হয়ে গেল (এবং এর সম্মোহনী বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো), তখন তারা বলে ওঠলো, এতো স্পষ্ট এক জাদু। আর সে ব্যক্তি থেকে বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে বানিয়ে বলে, অথচ তাকে তো ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার দিকে ডাকা হচ্ছে এবং আল্লাহ্ তায়ালা যালেম জাতিকে সঠিক পথ দেখান না। ওরা তো চায় আল্লাহর বাণীকে তাদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে, কিন্তু কাফেররা অপছন্দ করলেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর বাণীকে পূর্ণ করবেনই। তিনি তো সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে সত্য পথের দিশা (আল-কোরআন) দিয়ে পাঠিয়েছেন, আরও দিয়েছেন

তাঁর রসূল প্রদর্শিত সত্য-সঠিক জীবন ব্যবস্থা, যাতে তিনি এই জীবন ব্যবস্থাকে প্রচলিত মানব রচিত আইন-কানুন ও সকল জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করতে পারেন, যদিও মোশরেকরা এটা পছন্দ করে না।

মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ইহুদী নাসারাদের অবিরাম চক্রান্ত

ইসলামের এই মোহিনী জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে বনী ইসরাঈল জাতি চরম শত্রুতা প্রদর্শন করেছে, নানা প্রকার চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হয়েছে এবং নানা প্রকার বিভ্রান্তির পথ অবলম্বন করেছে। রসূল (সঃ)-এর যমানা থেকে নিয়ে তারা নানাভাবে, নানা উপায়ে ও পদ্ধতিতে এই দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে বহ্নিশিখা ছড়িয়ে দিয়েছে, তা আজও অবিকল সেই প্রথম দিনের মতই দাবানলের মতো জ্বলছে। অনির্বাণ এই বহ্নিশিখাকে উদ্দীপিত রাখার জন্য নানারূপ মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যখন সে (নবী স.) তাদের নিকট স্পষ্ট দলীল, প্রমাণাদি সহকারে এলো, তখন তারা বলে ওঠলো, এতো স্পষ্ট জাদু।' তারা সেইভাবে এই কথাগুলো বলে ওঠলো যেভাবে আসমানী কেতাবের জ্ঞান বিবর্জিত এবং এই দ্বীনের আগমন সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা বলতো। তারা যুদ্ধরত ইসলামী জনগণের মধ্যে ঢুকে সত্য-মিথ্যা বানিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো, মদীনার মধ্যে একত্রে বসবাসরত মোহাজের এবং তাদের দ্বীনী ভাই আনসারদের মধ্যে ঝগড়া বাধানোর জন্য তারা নানা প্রকার চক্রান্ত শুরু করলো এবং আনসারদের আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যেও ভুল-বুঝাবুঝি সৃষ্টি করার কাজে ব্যাপৃত হল, কখনও মোনাফেকদের এবং কখনও মোশরেকদেরকে নেতৃত্বের নেশায় মাতিয়ে তুললো। আবার কখনও তারা ইসলামের দুশমনদের একত্রিত করে মুসলমানদের একযোগে আক্রমণ করার কাজে লাগিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দিলো, যেমন দেখা যায় আহ্যাবের যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর তৎপরতার সময়। তাদের বিভিন্নমুখী ইসলাম বিধ্বংসী চক্রান্ত মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমেও চলেছে, যেমন তাদেরই প্ররোচনায় মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মিথ্যা রটনার কাজে লেগে গিয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবনে সাবার কূট চক্রান্তে পড়ে ওসমান (রা.)-এর আমলে মদীনা ও আশেপাশের মুসলমানরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে জড়িয়ে পড়েছিলো এইভাবে আরও বহু প্রকারের মিথ্যা ছড়িয়ে এবং ইসরাঈলীদের শ্রেষ্ঠ জাতি বানানোর ব্যর্থ ষড়যন্ত্রে এ ইহুদীচক্র বহু হাদীস জাল করে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে ফেলেছিলো এবং সীরাত (রসূল (স.)-এর জীবনচরিত) ও তাফসীরের মধ্যে বহু ভুল হাদীস ঢুকিয়ে দেয়ার কাজ করেছিলো। এ সকল নানা প্রকার চক্রান্ত ও তৎপরতায় তখনই তারা লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, যখন আল কোরআনের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ষড়যন্ত্রে তারা চরম ভাবে ব্যর্থ হয়।

তারা কোনো দিন এক মুহূর্তের জন্যও যুদ্ধের এই হাতিয়ার কোষবদ্ধ করেনি; বরং আজও নিরন্তর গতিতে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র-চক্র সমভাবে সক্রিয় রয়েছে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক চরমপন্থী 'ইহুদীবাদ' (যায়োনিষ্ট) চক্র এবং আন্তর্জাতিক খৃস্টান চক্র ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য নবতর উদ্যোগে মেতে ওঠেছে। এই উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের নীতিতে কিছু পরিবর্তন করে এমনভাবে একত্রিত হয়েছে যা ইতিপূর্বে অন্য সময়ে দেখা যায়নি। মুসলমানদের সাথে তারা কোন শান্তি চুক্তিতে আসতে এখন রাযি নয়, যদিও বাহ্যিকভাবে আলাপ-আলোচনার কথা বলে চলেছে। ইতিপূর্বে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যের আন্দালুসিয়ায় (স্পেনে) সম্মিলিতভাবে তারা ক্রুসেড যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে

শেষ খলীফা পরিচালিত রাষ্ট্রে (তুরস্কে) এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছে এবং অবশেষে রাষ্ট্রটিকে ভেংগে কয়েকটি টুকরা বানিয়ে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিয়েছে। অবশিষ্ট যে অংশটুকু রয়ে গেছে পরে তা ইউরোপের 'অসুস্থ ব্যক্তি' বলে পরিচিত হয়েছে। এরপর ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য মুসলমানদের মধ্যে নানা প্রকার বিভেদ এমনভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, বর্তমানে মুসলমানরা মুসলমানদের কারো ওপরই আস্থা রাখতে পারছে না। খেলাফতকে যখন তারা ধ্বংস করার মনস্থ করেছে এবং মুসলমানদের একের বিরুদ্ধে অপরকে লেলিয়ে দিতে চেয়েছে, তখন মুসলিম জনগণের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা নিয়েছে, তাদের মধ্যে পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষের আগুন উদ্দীপিত করেছে এবং ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন তুলে মুসলমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আঞ্চলিকতার বিষ ছড়ানো হয়েছে, যার ফলে মুসলমানরা পরস্পরের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করে চলেছে। অথচ এর পূর্বে তাদের একের বিরুদ্ধে অপরকে আক্রমণ করাতে তারা বার বার ব্যর্থ হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে খেলাফতের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ করাতে। আরবী ভাষা উচ্ছেদ করতেও তারা ব্যর্থ হয়েছে, মুসলমানদেরও নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এরপর যখন ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের কথা বাদ দিয়ে মুসলমানরা শুধু মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল, এর ফলে অন্যান্য ফল যাইই হোক না কেন, দ্বীনের কোন স্বার্থ রক্ষিত হলো না এবং অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি হলেও দ্বীনের পতাকা কোথাও উড্ডীন হলো না। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে আহলে কেতাবরা দ্বীনের বাতি নিভিয়ে দিতে তৎপর হয়ে ওঠলো। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'ওরা চায় তাদের মুখের ফুৎকারে দ্বীন ইসলামের বাতি নিভিয়ে দিতে, অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁর বাতি পূর্ণ করবেনই, যদিও কাফেররা তা পছন্দ করে না।'

আল কোরআনের এই আয়াতটি বড় সত্য কথা তুলে ধরেছে যে, ক্রোধ উপশমের জন্য তারা ঠাট্টা, মস্কারি করতো আর এটা সত্য কথা যে, তারা মুখে বলতো 'এটা তো স্পষ্ট জাদু' এবং নতুন আগত এই জীবন ব্যবস্থাকে দাবিয়ে দেয়ার জন্য তারা নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করতে থাকলো। এটা যে তাদের জন্য কতো বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে তা তারা জানতো না, আর এ জন্যই তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর বাতি নিভিয়ে দিতে চাইছিলো, অথচ তারা একথা জানে না, তারা কতো দুর্বল, কতো অসহায়!

তাই আল্লাহ পাকের ঘোষণা হচ্ছে, 'আল্লাহ তায়ালা অবশ্য অবশ্যই তাঁর বাতিকে পরিপূর্ণ করবেনই যদিও কাফেররা এটা পছন্দ করে না।' আল্লাহ পাক তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন। রসূল (স.)-এর জীবদ্দশাতেই তিনি তাঁর নূরকে পূর্ণ করেছেন। অতপর তিনি ইসলামী জামায়াতকে আল্লাহ পাকের দেয়া আইন-কানুন চালু করার মাধ্যমে জীবন্ত রূপ দান করেছেন। এমন এক চমৎকার উপায়ে তিনি এই জীবন ব্যবস্থা চালু করেছেন, যা এক স্পষ্ট ও অতি স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে আজও বর্তমান রয়েছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ আল্লাহ পাকের দ্বীনের এই বিজয়কে এমনভাবে স্মরণ করে চলেছে যে, তার কোনো নযীর পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। এটা একটা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহ পাক তাঁর নূর-কে পূর্ণ করেছেন এবং মুসলমানদের জন্য তাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। তাদেরকে যে নেয়ামত দিতে চেয়েছিলেন তা পূর্ণাংগভাবেই দান করেছেন। তারা এই দ্বীনকে মহব্বত করে বলে আল্লাহ তায়ালাও তাদের এই সত্য জীবন ব্যবস্থা দান করে সন্তুষ্ট হয়েছেন। মোমেনরা তাঁর পথে টিকে থাকার জন্য চূড়ান্ত সংগ্রাম করে চলেছে। তাদের কেউ দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়া পছন্দ করে না এবং কিছুতেই কুফরীর দিকে ফিরে যেতে চায় না। সুতরাং দ্বীনের এই তাৎপর্য তাদের অন্তরের মধ্যেও সারা পৃথিবীতে সমানভাবে পূর্ণ করে দেয়া হলো।

যুগে যুগে ইসলামের এই দীপশিখা বার বার জ্বলে ওঠেছে। মুসলিম জাতির ধমনীতে ইসলামের রক্ত প্রবাহ আজও বিদ্যমান এবং এখনও মুসলমান অন্তরে আল্লাহ পাকের এই বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম রয়েছে, যদিও ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো বরাবরই ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্র ও চরম আক্রমণের অভিযান চালিয়ে গেছে। ইসলামের বাতিকে শত চেষ্টা করেও এর দুশমনরা একেবারে নিভিয়ে দিতে পারেনি। কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহর বাতি, যা মুখের ফুৎকারে কিছুতেই নিভানো যায় না, না কোন বান্দার পক্ষ থেকে প্রয়োগ করা কোন অগ্নিবাণ বা লৌহশলাকা আল্লাহ পাকের এই শক্তিকে দমন করতে পারে। দুনিয়ার শক্তিমান রাজা-বাদশাহরা, যালেম অধিপতিরা বার বার ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে খৃষ্টানচক্র ক্রুসেড অভিযান চালিয়ে এবং ইহুদীরা নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে ইসলামের ধ্বংস সাধনে চেষ্টার কোন কসুরই করেনি।

অবশ্যই এই দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রয়েছে এবং বিজয়ী করার কর্মধারা নিরন্তর গতিতে এগিয়েও চলেছে। সুতরাং এই কাজ করার জন্য আল্লাহ পাক তাঁর সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে বলছেন,

'তিনি সেই সত্ত্বা, যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য জীবন ব্যবস্থা সহ, যাতে করে তিনি এই জীবন ব্যবস্থাকে মানব নির্মিত যাবতীয় আইন-কানুনের ওপর বিজয়ী করতে পারেন, যদিও মোশরেকরা এটা পছন্দ করে না।'

এই দ্বীনের পক্ষে আল্লাহ পাকের সাক্ষ্য ও সাহায্য এই জন্য রয়েছে যে, এটিই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সঠিক দিক-নির্দেশনা এবং এটিই প্রকৃত সত্য জীবন ব্যবস্থা, যা মানুষের জীবনে সর্বদিক দিয়ে শান্তি আনতে পারে, এরই সাক্ষ্য আল্লাহ পাক দিচ্ছেন আলোচ্য এই আয়াতে। এটিই চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকর কথা, যার বাইরে বা যার থেকে উত্তম আর কোনো কথা হতে পারে না। আর আল্লাহ তায়ালার চূড়ান্ত ইচ্ছা সমাপ্ত হয়েছে এবং এই দ্বীন বিজয়ীও হয়েছে অন্যান্য সকল জীবন বিধানের ওপর। আল্লাহ তায়ালার আইন অবশ্যই বিজয়ী হয়েছে। সুতরাং অন্য কোন দ্বীন বা আইন-কানুন (চিরদিনের জন্য) কিছুতেই বিজয়ী হবে না। এক্ষেত্রে পৌত্তলিক ধর্ম রাষ্ট্র পরিচালনা বা মানুষকে জীবন ব্যবস্থা দেয়ার কোন ক্ষমতা রাখে না। আহলে কেতাবদের প্রাধান্য-কর্তৃত্বও সমাপ্ত হয়েছে, আর যে উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে কেতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিলো, তার পরিপূর্ণতা দান করার জন্য আগত ইসলাম আজ ষোলকলায় পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে বিশ্ব-দরবারে হাযির এবং এর কর্তৃত্ব চলতে থাকবে পৃথিবীর শেষ যমানা অবধি।

ইতিপূর্বে যেসব ধর্ম এসেছে তার আসল রূপ পরিবর্তিত হয়ে মূল শিক্ষা থেকে সেগুলো বহু দূরে চলে যাওয়ার কারণে এখন সেগুলো ভেংগে খানখান হয়ে গেছে। সেগুলোর মধ্যে মানব নির্মিত অনেক মতবাদ প্রবেশ করেছে। সেগুলোর বহু শিক্ষাকে কাট-ছাঁট করে ফেলা হয়েছে। যার ফলে সেগুলো আর মানুষের জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট থাকেনি। আর যদি সেগুলো অপরিবর্তিত অবস্থাতেও থাকত, তবু সেগুলো পরিবর্তিত অবস্থার প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট হত না। কারণ, সেগুলো বিশেষ এক সময়ের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রেরিত হয়েছিলো। সুতরাং এটাই হচ্ছে দ্বীন ইসলামের তাৎপর্য ও প্রকৃতি। মানব জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে জীবন বিধান দেয়ার ওয়াদা আল্লাহ পাক করেছিলেন তা পরিপূর্ণ শক্তি, সৌন্দর্য ও যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর বাস্তব ব্যবহার প্রণালী এবং মানব জীবনের ব্যবহারোপযোগী সর্বোত্তম ব্যবস্থা রূপে আজ সমাগত। শাসন ব্যবস্থা হিসাবে এ দ্বীন অন্যান্য মানব নির্মিত সকল শাসন

ব্যবস্থা থেকে উত্তম। সর্বযুগে এবং সকল দেশে এ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে চালু হয়েছে। তারপর যারাই পূর্বের মতো জেহাদী মনোবৃত্তি নিয়ে সংগ্রাম করেছে, প্রাণান্ত চেষ্টা করেছে এবং পরিপূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করে গেছে, তাদের দাওয়াত পূর্ব থেকে পাঁচ গুণ বেশী ফলপ্রসূ হয়েছে এবং একটি রাষ্ট্র থেকে আশেপাশের অপর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এ দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে চরমপন্থী আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ ও আন্তর্জাতিক খৃষ্টবাদ একত্রিত হয়ে তুরস্কের ওপর আক্রমণ করার পর এবং পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ ও চক্রান্তের আগুন ছড়িয়ে দেয়া সত্ত্বেও ইসলামের দাওয়াত অনিরুদ্ধ গতিতে এগিয়েই চলেছে। সকল ইসলামী দেশে আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ ও খৃষ্টানচক্র সর্বপ্রকার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও ইসলামের প্রচার প্রসার থেমে যায়নি।

মানবেতিহাসের সর্বযুগে আল্লাহ পাকের ওয়াদা-অনুসারে, তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম হয়ে এসেছে এবং কারো কোনো উপহাস বিদ্রূপে কোনোকালে এ চেষ্টা থেমে যায়নি বা কোন শক্তির দাপট, ষড়যন্ত্রের তীব্রতা এবং বিভ্রান্তিকর প্রচেষ্টা ইসলামের গতি থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়নি।

ইহুদী ও নাসারাদের পরিচালনার দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মোমেনদের দ্বীন ইসলামের এই আমানত বহন করার দায়িত্ব দিয়েছেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে এই দায়িত্ব পালনের কথা অপরের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁর যে দ্বীনকে বিজয়ী করতে চেয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যে তারা যে পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছে, তাতে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রশান্তি বিরাজ করছে। দ্বীনকে বিজয়ী করার মালিক তো আল্লাহ পাক নিজেই, তারা তো নিছক যন্ত্রমাত্র। তারা তাদের রবের সাথে করা এ ওয়াদা পূরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং আল্লাহর হুকুমে বাস্তব জীবনের সর্বত্র অনাগত কালের সকল সময়ে এ ওয়াদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে তীব্র অনুভূতি নিয়ে কাজ করে যাবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّۦنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ ﴿١٤﴾

রুকু ২

১০. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আমি কি তোমাদের এমন একটি (লাভজনক) ব্যবসার সন্ধান দেবো যা তোমাদের (মহাবিচারের দিনে) কঠোর আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবে! ১১. (হ্যাঁ, সে ব্যবসাটি হচ্ছে,) তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) পথে তোমাদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করবে; এটাই তোমাদের জন্যে ভালো, যদি তোমরা (কথাটা) বুঝতে পারতে, ১২. (ঠিকমতো একাজগুলো করতে পারলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন এবং (শেষ বিচারের দিন) তোমাদের তিনি প্রবেশ করাবেন এমন এক (সুরম্য) জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে, (সর্বোপরি) তিনি তোমাদের আরো প্রবেশ করাবেন জান্নাতের স্থায়ী নিবাসস্থলের সুন্দর ঘরসমূহে; আর এটাই হচ্ছে সবচাইতে বড়ো সাফল্য, ১৩. আরো একটি (বড়ো ধরনের) অনুগ্রহ (রয়েছে) যা হবে তোমাদের একান্ত কাম্য (এবং তা হচ্ছে), আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য ও (ময়দানের) আসন্ন বিজয়; (যাও, তোমরা মোমেন বান্দাদের) এ সুসংবাদ দাও। ১৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা সবাই আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমনি করে মারইয়াম পুত্র ঈসা (তার) সংগী সাথীদের বলেছিলো, কে আছো তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) পথে আমার সাহায্যকারী? তারা বলেছিলো, হাঁ, আমরা আছি আল্লাহর (পথের) সাহায্যকারী, অতপর বনী ইসরাঈলের একটি দল (সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার ওপর) ঈমান আনলো, আরেক দল (তা সম্পূর্ণ) অস্বীকার করলো, অতপর আমি (অস্বীকারকারী) দুশমনদের ওপর ঈমানদারদের সাহায্য করলাম, ফলে (যারা ঈমানদার) তারাই বিজয়ী হলো।

তাফসীর

আয়াত ১০-১৪

এই ঐকান্তিক আকীদা-বিশ্বাসের আলোকে এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পাদিত ওয়াদা অনুযায়ী সর্বশেষে প্রেরিত এই জীবন ব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে কোরআনুল করীম মোমেনদের উদাত্ত কন্ঠে আহ্বান জানাচ্ছে। আজকে যারা কোরআনুল করীমের আহ্বানের লক্ষ্য এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা যারাই এই মিশনে কাজ করার জন্য পাক কালামের লক্ষ্যে পরিণত হবে, তাদের সবাইকেই আল কোরআন দুনিয়া ও আখেরাতের এক লাভজনক ব্যবসার দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। সে ব্যবসা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর পথে জেহাদ। এরশাদ হচ্ছে, 'হে ইমানদার ব্যক্তিরা, বলবো নাকি তোমাদের এমন একটি ব্যবসা সম্পর্কে, যা তোমাদের ভীষণ বেদনাদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবে? ..... মোমেনদের একথার সুসংবাদ দিয়ে দাও।'

আলোচ্য আয়াতটিতে যে বিচ্ছেদ ও মিলনের ভাব ফুটে ওঠেছে, প্রশ্ন ও তার যে উত্তর দেয়া হয়েছে, পূর্বাহ্নে ঘটবে ও পরে ঘটবে বলে যে তথ্য দেয়া হয়েছে, কথার ভাষা ও ভংগিতে প্রথমে ইচ্ছা ব্যক্ত করা থেকে নিয়ে যে দৃঢ় সংকল্প ফুটে ওঠেছে এবং অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার আহ্বানের যে সকল প্রভাব পড়েছে, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

কোরআনের দৃষ্টিতে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা

আয়াতটি শুরু হয়েছে ঈমানের নাম নিয়ে আহ্বান জানিয়ে, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা', তার সাথে সাথেই অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণভাবে জিজ্ঞাসার সুর ধ্বনিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজেই জিজ্ঞেস করছেন এবং জওয়াব পাওয়ার জন্য তাদের উৎসাহিত করে তুলছেন, সৃষ্টি করছেন তাদের মধ্যে সঠিক উত্তর পাওয়ার দারুণ আগ্রহ। এরশাদ হচ্ছে,

'বলবো নাকি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের কথা, যা তোমাদের ভীষণ বেদনাদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবে?' কে আছে এমন যে জানতে চাইবে না সেই ব্যবসায়ের কথা, যা আল্লাহ পাক নিজেই জানাতে চাইছেন? এখানেই এই আয়াতটি শেষ হচ্ছে। দুটি আয়াতকে পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করা হয়েছে যেন তাৎক্ষণিকভাবে এক মুহূর্তের মধ্যেই শ্রোতারা আগ্রহান্বিত হয়ে যায় এবং উত্তর পাওয়ার জন্য মোমেনের মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। তারপর আসছে মধুর সেই জওয়াব, যার জন্য মোমেনদের অন্তর ও কানগুলো খাড়া হয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে, 'ঈমান আনবে আল্লাহ ও রসূলের ওপর।' তাদেরই ঈমান আনতে বলা হচ্ছে যারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসী। সুতরাং এই আহ্বানের তাৎপর্য জানার জন্য প্রতিটি কান উৎকর্ণ হয়ে ওঠেছে। উদ্বেলিত হয়ে ওঠেছে অন্তরসমূহ, যখন তারা জওয়াবের একটি অংশমাত্র শুনতে পেয়েছে, এখন সুনির্দিষ্টভাবে তারা জানতে ব্যগ্র কথাটির মূল তাৎপর্য! তাই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কথার বাকি অংশে বলা হচ্ছে, 'আল্লাহর পথে তোমাদের মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করবে।'

ঈমান আনার পর আল্লাহ তায়ালার পথে জেহাদ অবশ্যম্ভাবী। নচেৎ ঈমানের কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে থাকে না। এটিই হচ্ছে মূল বিষয়, যা এই সূরার মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। জেহাদ ব্যতীত যে ঈমান তা বেদনাদায়ক আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না একথা জানিয়ে দিয়ে জেহাদের যে গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কথাটি বার বার বলা হয়েছে যেন পাঠকবর্গ যথাযথভাবে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে। আল্লাহ পাকই বেহ্তর জানেন, মানুষের নিকট কোনো বিষয়কে গুরুত্ববহ করে তুলতে হলে এভাবে বার বার বলতে হয়, নানাভাবে, নানা প্রকার উৎসাহব্যঞ্জক কথায় তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হয়, যাতে করে তারা এই কঠিন দায়িত্ব পালন করতে পারে। আল্লাহ তায়ালার দেয়া জীবন ব্যবস্থা পৃথিবীর বুকে বাস্তবায়িত করতে হলে এই

জেহাদ অপরিহার্য, যার থেকে দূরে সরে থাকার কোন সুযোগ ইসলামে নেই, আর এজন্য সদা-সর্বদা ইসলামের শত্রুদের তৎপরতা সম্পর্কে খবর রাখতে হবে এবং সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে জেহাদ-রূপ এই ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে, তবেই গিয়ে আসবে সেই কল্যাণ যার খবর আল্লাহ পাক রাখেন। তাই তিনি জানাচ্ছেন, 'ঐটিই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর, তোমরা তোমাদের জ্ঞানকে কাজে লাগালে তবেই বুঝতে পারবে।' সুতরাং, সেই সত্যটি জানানো হয়েছে, যা সে গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিতে পারে। এরপর পরবর্তী একটি পৃথক আয়াতে সে কল্যাণ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ এসেছে। কারণ, সংক্ষিপ্তভাবে কোন কিছু জানানোর পর সেই বিষয়টিকে অন্তরের কাছে গুরুত্ববহ করে তোলার জন্য অনেক সময় বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়। তাই আল্লাহ পাক বলছেন, 'তিনি তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন।' জেহাদের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য এই একটি কথাই যথেষ্ট। এ বিষয়ে এইভাবে চিন্তা করা দরকার যে, গুনাহ মাফ করার জামানত আল্লাহ ছাড়া আর কে দিতে পারে? আর তিনিই যদি এই দায়িত্ব নেন, তাহলে এরপর আর কোন্ জিনিসের প্রয়োজন বা সফলতা লাভ করার জন্য আর কোন্ পুঁজির দরকার? বরং এটাই পরম ও চরম সত্য কথা যে, আল্লাহ পাকের মেহেরবানী হাসিল করাই আসল পুঁজি, যার লাভের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সেই জন্যই তিনি এ ব্যবসার চূড়ান্ত সাফল্যের কথা জানাতে গিয়ে বলছেন, 'তিনি তোমাদের প্রবেশ করাবেন সেই সকল বাগ-বাগিচায়, যার নীচু ও পাশ দিয়ে এবং অভ্যন্তর ভাগে ছোট ছোট নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখানে সেই চিরস্থায়ী বাগিচায় থাকবে পাক-সাফ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে বাসগৃহসমূহ। এটা বলা বাহুল্য, এক মোমেনের যিন্দেগীতে এর থেকে বড় লাভজনক ব্যবসা আর কি হতে পারে যে, এই ক্ষণস্থায়ী ও অতি অল্প দিনের মধ্যে জেহাদের বিনিময়ে চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করবে। এমন কি যখন এ জীবনের সব কিছু হারিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে সব কিছু চাওয়া-পাওয়ার অবকাশ, তখন তাকে দেয়া হবে ফুলে-ফলে ভরা বাগ-বাগিচাসমূহ এবং তার মধ্যে স্থায়ী নেয়ামত-ভরা সুশোভিত বাস-গৃহ। আর অবশ্য এটাই সত্য যে, সেটিই হচ্ছে মহা সাফল্য।

লাভজনক ব্যবসায়ের হিসাব-নিকাশ যেন এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এটা অতি বড় সাফল্য, যা পাওয়ার জন্য একজন মোমেন দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে বিলিয়ে দেবে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি এক দেরহাম বা এক টাকার পণ্যদ্রব্যে দশ টাকা লাভ করে, অবশ্যই তার সমব্যবসায়ী বাজারের অন্যান্য সবাই তাকে অভিনন্দন জানাবে। তাহলে যে ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ার জীবনের বিনিময়ে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন খরিদ করে, তাকে কি মানুষ অভিনন্দিত করবে না? অবশ্যই করবে, কারণ দুনিয়ার জীবনের এ সুখ-সম্পদ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, আর এর বিনিময়ে সে উপার্জন করছে চিরন্তন এমন যিন্দেগী, যার সীমা-পরিসীমা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউই জানে না। সে সুখ-সম্পদ এমন চিরস্থায়ী যা কোন দিন কমও হবে না বা শেষও হয়ে যাবে না।

আকাবার বায়য়াতের রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর মধ্যে এই ধরনের ব্যবসায়ের লেনদেন হয়েছিল। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলেন, 'আপনার রবের জন্য এবং আপনার জন্য আপনি যা চান তাই দেয়ার জন্য আমি নিজেকে পেশ করছি। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'আমি আমার রবের জন্য এই শর্তে তোমার দান গ্রহণ করছি যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই পূর্ণাংগ ও নিঃশর্ত আনুগত্য (এবাদাত) করবে এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করবে না। আর আমি আমার নিজের জন্য তোমার দানকে এই শর্তে গ্রহণ করছি যে, তোমরা সেসব

বিষয় থেকে বিরত থাকবে, যা তোমাদের নিজের জন্য এবং তোমাদের সম্পদের জন্য খারাপ মনে কর। আবদুল্লাহ বললেন, যদি আমরা এসবগুলোর সকল কিছুই করতে থাকি তাহলে কি ফল পাব? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, জান্নাত। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে, চমৎকার এই ব্যবসায়ের লাভ, আমরা এর থেকে কমও দেব না আর কোন অংশে কম নেবও না!

কিন্তু আল্লাহ পাকের মেহেরবানীই আসলে বড়, আর তিনি জানেন সে ব্যক্তিদের, যারা এই পৃথিবীর কিছু জিনিসের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে। সীমাবদ্ধ এই পৃথিবীর সব কিছু মানুষের গঠন প্রণালীর উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি মানুষের ডাকে সাড়া দেন এবং তিনি তাদের সেসব জিনিসের সুসংবাদ দান করছেন, যা তিনি তাদের ভাগ্য লিখন হিসাবে নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তাঁর গোপন জ্ঞানভান্ডারে লুকিয়ে রেখেছেন। আর তা হচ্ছে, 'আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ব্যবস্থা এক সময়ে পৃথিবীর বুকে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে চালু হয়ে যাবে এবং জীবনের সর্বত্র সকল ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে।' আর এটা হবে আল্লাহরই সাহায্যক্রমে, যে সম্পর্কে তিনি বলছেন, আর অন্য যে জিনিসটি তোমরা ভালবাস তা হচ্ছে, আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আর সুসংবাদ দাও মোমেনদের।

এখানে জানা গেলো, যে ব্যবসায়ের কথা আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তার লাভ হচ্ছে সর্বোচ্চ। যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই এই লাভ দান করবেন। আল্লাহ পাক তো সেই মহান সত্ত্বা, যাঁর সম্পদের কোন অন্ত নেই বা সে সম্পদ কোন দিন ফুরিয়েও যাবে না, তাঁর রহমত কেউ ঠেকাতে পারবে না যে, তিনি দিতে চাইলে দিতে পারবেন না। তাঁর করুণাপূর্ণ দানের মধ্যে রয়েছে মাগফেরাত (ক্ষমা), (পুরস্কারস্বরূপ) বাগ বাগিচা, পাক-পবিত্র বাসস্থান এবং পরকালীন জীবনে নেয়ামতভরা স্থায়ী আবাস। আরো রয়েছে, সকল লাভজনক ব্যবসায়ের ওপরে সব উপার্জনের বড় উপার্জন আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। এমতাবস্থায় এমন কোন ব্যক্তি কি থাকতে পারে যাকে আল্লাহ পাক এ ব্যবসায়ের দিকে ডাকছেন, অথচ সে বিলম্ব করবে অথবা পিছিয়ে থাকবে?

এসব কথা দ্বারা এখানে মানুষকে জেহাদের ব্যাপারে যেমন উৎসাহিত করা হচ্ছে, তেমনি তাদের মধ্যে জেহাদের মহব্বতও পয়দা করা হচ্ছে। একজন মোমেন ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টিজগত ও জীবনের সাফল্যের জন্য ঈমানী ধ্যান-ধারণার তাৎপর্যের অনুভূতি রয়েছে এবং আন্তরিকতার সাথে এ বিষয়ে সে চিন্তাও করে, তারপর ঈমানী জীবন যাপন করার ফল কত সুন্দর তাও খেয়াল করে। পাশাপাশি ঈমানবিহীন জীবনের অবস্থাও সে দেখে, খেয়াল করে সে জীবন কতো সংকীর্ণ, কতো সীমাবদ্ধ তার বিস্তৃতি, লক্ষ্য করে ঈমানবিহীন জীবনের পতন ও হাবুডুবু খাওয়া অবস্থা, আরও দেখে ঈমানবিহীন জীবনে সুখী সমৃদ্ধশালী হওয়ার কি হাস্যকর আকুতি ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা। যে হৃদয়টি এই তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে ঈমানবিহীন জীবনের অসারতা অনুধাবন করে, সে এক মুহূর্তের জন্যও ঈমানের মহাসম্পদ থেকে দূরে থাকতে পারে না বা এক মুহূর্তের জন্যও সে বাস্তব জীবনে ঈমানভিত্তিক মহান জীবন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না; বরং তখন সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ঈমানী যিন্দেগী যাপন করতে চায় এবং আশেপাশে অবস্থিত অপরকেও এই মধুর পথে এগিয়ে আনার জন্য তার সকল প্রচেষ্টাকে কাজে লাগায়। এই প্রচেষ্টার নামই জেহাদ। নিজের গরজেই সে জেহাদ করে। অর্থাৎ এই জেহাদের বাস্তব ফল এই দুনিয়ার জীবনেই সে হাতেনাতে পাবে বলে দিব্যি চোখে দেখতে পায়। সে জন্যই হয়ত সে আখেরাতে কি পাবে না পাবে, সে চিন্তাও করে না। ঈমানের মজা সে অন্তরের গভীরে অনুভব করে বলেই তার মন খুশীতে ভরে যায়, আসে পরম নিশ্চিন্ততা। তারপর সে আর কখনই ঈমানমুক্ত থাকতে পারে না, পারে না সে ইহজগতে ঈমানী যিন্দেগী প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে দূরে

থাকতে। সে তখন জেহাদী জীবন যাপন করার জন্য নিজের থেকেই এগিয়ে যায় এবং অবলীলাক্রমে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি গ্রহণ করে নেয়।

এতদসত্তেও মানুষের মন মাঝে মাঝে দুর্বল হয়ে যায়, অনেক সময় এ দুর্বলতা সে উপেক্ষাও করতে পারে না, প্রচেষ্টারত মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, একটু নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত জীবন যাপন অভিলাষ তাকে পেয়ে বসে। এই কারণেই প্রকৃতিগত এই দুর্বলতা তাকে বাস্তব পতনোন্মুখ অবস্থার কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য করে।

এই কারণেই আল কোরআন মানুষের মনের মধ্যে এই জেহাদী চেতনা দান করার চেষ্টা করছে এবং তার জন্য যত প্রকার উৎসাহব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার করা প্রয়োজন তা সবই করছে। বিভিন্ন কায়দায়, নানা ভংগিমায়, সর্বপ্রকারের যুক্তির মাধ্যমে এবং অনেক প্রসংগ সামনে এনে তার ভিত্তিতে জেহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাই দেখা যায়, এখানে মোমেনদের ডাক দিয়ে শুধু ঈমান আনার কথা বলে থেমে যাওয়া হয়নি; বরং ঈমানের সাথে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে ওতপ্রোতভাবে জেহাদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ সহযোগীতা

অতপর এখানে নতুন আর একটি আহ্বান জানানোর মাধ্যমে সূরাটি শেষ করা হয়েছে। অবশ্য নতুন এ প্রসংগটিতে নবতর প্রেরণার খোরাক রয়েছে, যার কারণে সূরাটি পাঠ করার সাথে সাথে নবতর উদ্দীপনার ...... সৃষ্টি হয়। আল্লাহ পাকের আবেগমাখা আহ্বান, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, হয়ে যাও তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্যকারী, যেমন করে ঈসা ইবনে মারইয়াম তার একনিষ্ঠ সাথীদের ডেকে বলেছিল, কে আছ তোমরা আল্লাহর দিকে যাওয়ার জন্য, আল্লাহর কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আমার সাহায্যকারী? সেই সাহাবীরা বলেছিলেন, 'আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী। অতপর বনী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে একটি দল ঈমান আনল এবং কুফরী করল অপর একটি দল, আমি (সর্বশক্তিমান আল্লাহ) ঈমানদারদের তাদের শত্রুদের ওপর সাহায্য করলাম, ফলে তারা চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হয়ে গেলো।'

এই হাওয়ারীরা ছিলেন ঈসা (আঃ) এর শিষ্য। বলা হয়, এঁরা ছিলেন বার জন। এঁরা বনী ইসরাঈল জাতির অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য ঈসা (আঃ)-এর নিকট আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁর সংগে সর্বদা থাকার উদ্দেশ্যে অন্য সবার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। ঈসা (আঃ)-কে আকাশে তুলে নেয়ার পর এঁরা তাঁর নির্দেশগুলোর হেফাযত করেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষা বিস্তার করে চলেছিলেন।

আলোচ্য আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর মূল কাজ সম্পর্কে ইংগিত দান করা হয়েছে, বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। সুতরাং আমরাও সূরাটির আলোচনায় মূল যে উদ্দেশ্যে ঈসা (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন সেই বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব। এরশাদ হচ্ছে, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও।' এখানে সেই স্থানে আল্লাহর সাহায্যকারী হতে বলা হচ্ছে, যেখানে আল্লাহ পাক তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন। তাহলে কি আল্লাহ পাক যে স্থান থেকে তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন, সেখানে তিনি (আল্লাহর সেই বান্দা) আল্লাহ তায়ালার সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন? এই যে তাঁকে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে আকাশে তুলে নেয়া, এ এমন এক সম্মান যার মর্যাদা জান্নাত ও তার নেয়ামত থেকে কোন অংশে কম নয়, বরং অনেক গুণে বেশী। 'হয়ে যাও আল্লাহর সাহায্যকারী, যেমন মারইয়ামপুত্র ঈসা হাওয়ারীদের বলেছিল, কে আছ তোমরা আল্লাহর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে আমার সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারীরা বলেছিল, আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী।' সুতরাং এ দায়িত্ব বহন করার জন্য তাদের নিকট প্রতিনিধি দল পাঠানো হলো এবং তারা এই বিরাট সম্মানের অধিকারী হয়ে গেলো। ঈসা (আঃ) তো মুখ্যত এসেছিলেন নতুন নবী ও

শেষ 'দ্বীন'-এর আগমন সংবাদটুকু দিতে। সুতরাং ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীরা এই চিরস্থায়ী দায়িত্ব পালনের জন্য (সাময়িকভাবে) বেশী যোগ্য ছিলো না! এ প্রসংগে এই প্রতিনিধিত্বের কথাটাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এর পরিণতি কি হয়েছিলো?

এর পরিণতিতে দেখা যায়, হাওয়ারীদের মধ্য থেকে একটি মাত্র দল ঈমান আনলো এবং অন্য এক দল এ দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানালো। সুতরাং ঈমান যারা আনল, তাদের আমি মহান আল্লাহ সাহায্য করলাম, ফলে তারা বিজীয় হয়ে গেলো।

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুটি অর্থের যে কোন একটি গ্রহণ করা যেতে পারে। এক, যে সকল ব্যক্তি ঈসা (আঃ)-এর রেসালাতের ওপর ঈমান এনেছিলো, হয়ত তারা সবাই ছিলো তাঁর হাওয়ারী (শিষ্য)। এর মধ্যে যারা ঈমান আনার পর মযবুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো এবং যারা এ বিশ্বাস থেকে ফিরে গিয়েছিলো, তাদের সবার ওপরই হাওয়ারী কথাটি প্রযোজ্য, যেহেতু তারা সবাই ইহুদীদের ওপর বিজয়ী হয়েছিলো, যারা ঈমান আনেনি এবং আল্লাহ পাক তাদের অবশ্যই ইহুদীদের ওপর বিজয় অর্জনে সাহায্য করেছিলেন, ইতিহাসও একথার সাক্ষ্য দেয়। অতপর দেখা যায়, যেসব ব্যক্তি ঈমান এনেছিলো তারাই অবতার-বাদী(১) ও তৃত্ববাদীদের মোকাবেলায় তাওহীদের ওপর দৃঢ়তার সাথে টিকে ছিলো, টিকে ছিলো অন্য সব সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে যারা তাওহীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিলো।' প্রভাত করলো বিজয়ী অবস্থায়'— একথার অর্থ হচ্ছে, যুক্তি-প্রমাণ সহকারে তারা বিভ্রান্ত লোকদের ওপর বিজয় অর্জন করলো। অথবা অর্থ হবে, যে তাওহীদ (একত্ববাদ)-এর ওপর তারা দৃঢ়ভাবে টিকে ছিলো সেই সকল শক্তি-ক্ষমতার মালিক এবং আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাসের কারণেই আল্লাহ পাক তাদের কাছে শেষ 'দ্বীন' প্রকাশ করে দিয়েছেন। একত্ববাদী এই জাতি সম্পর্কেই ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে। এই শেষের ব্যাখ্যাই এ প্রসংগে সঠিক অর্থের বেশী নিকটে এবং বেশী গ্রহণযোগ্য।

এখানের এই ইংগিত এবং আহ্বান থেকে আমরা সেই উপদেশ ও সেই শিক্ষা পাই, যার দিকে আমরা ইতিপূর্বে ইংগিত করেছি; আর তা হচ্ছে, মোমেনদের হিম্মতকে নতুন দ্বীন গ্রহণ করার ব্যাপারে পুনরুজ্জীবিত করা। কারণ, তারাই তো পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তায়ালার আইন-কানুন চালু করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তারাই সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের অধিকারী এবং আল্লাহর রসূলদের ওয়ারিস! এই মহা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার জন্য তাদেরই বেছে নেয়া হয়েছে। তাদের সাহসকে নতুন বলে বলীয়ান করা হয়েছে যেন তারা আল্লাহকে ও তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করতে পারে। 'যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম তার শিষ্যদের বলেছিল, আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপারে বা আল্লাহর দিকে যাওয়ার ব্যাপারে কে হবে আমার সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারীরা বলে ওঠেছিল, আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী। অবশেষে সাহায্য তাদেরই জন্য অবধারিত, মোমেনদের মধ্যে যারা আল্লাহর সাহায্যকারী। আলোচ্য সূরাতে এটিই শেষ কথা এবং এ প্রসংগে শেষ হৃদয়স্পর্শী বিষয় এটিই। এই কথাটিই নানা রংয়ে ও নানাভাবে আকর্ষণীয় করে তুলে সূরার মূল ভাবধারা ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাথে সংগতিসম্পন্ন করে তুলে ধরা হয়েছে। এর সাথে এটাও সত্য কথা যে, এ সূরার মধ্যে উপস্থাপিত এ রং ও স্বাদ সম্পূর্ণভাবে যেন নতুনভাবে তৈরী করা হয়েছে।

---

(১) অবতারবাদী বলতে বুঝায় সেই সকল ব্যক্তিকে যারা ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর অবতার মনে করে এবং তৃত্ববাদী বলতে তাদের বুঝায়, যারা বলে, God the father God the mother and God the son, অর্থাৎ পিতা, মাতা ও পুত্র মিলে তিন খোদায় এক আল্লাহ। মারইয়াম (আ.)-আর বিয়ে হয়নি এবং কোনো পুরুষের স্পর্শ ব্যতীত ঈসা (আ.) তার গর্ভে (আল্লাহর খাস ইচ্ছায়) পয়দা হন। তৃত্ববাদীরা বুঝতে না পেরে এ কথা বলে।

সূরা আল জুমুয়া

আয়াত ১১ রুকু ২

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ
الْحَكِيْمِ ⊙ هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ
ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ⊙ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⊙
ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ⊙ مَثَلُ الَّذِيْنَ
حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ط بِئْسَ
مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⊙

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পূত পবিত্র, তিনি মহাপরাক্রমশালী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়। ২. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি (একটি) সাধারণ জনগোষ্ঠীর (নিরক্ষর লোকদের) মাঝে থেকে তাদেরই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদের জীবনকে পবিত্র করবে, তাদের (আসমানী) কেতাবের (কথা ও সে অনুযায়ী দুনিয়ায় চলার) কৌশল শিক্ষা দেবে, অথচ এ লোকগুলোই (রসূল আসার) আগে (পর্যন্ত) এক সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো, ৩. তাদের মধ্যকার সেসব ব্যক্তিও (গোমরাহীতে নিমজ্জিত), যারা এখনো (এসে) এদের সাথে মিলিত হয়নি; তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম কুশলী। ৪. (রসূল পাঠানো—) এটা (মানুষদের ওপর) আল্লাহ তায়ালার বিরাট অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা মহা অনুগ্রহশীল। ৫. যাদের (আল্লাহর কেতাব) তাওরাত বহন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারা কখনো এটা বহন করেনি, তাদের উদাহরণ হচ্ছে সেই গাধার মতো, যে (কেতাবের) বোঝাই শুধু বহন করলো (এর কিছুই বুঝতে পারলো না); তার চাইতেও নিকৃষ্ট উদাহরণ সে জাতির, যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করলো; আল্লাহ তায়ালা (এ ধরনের) যালেম জাতিকে হেদায়াত করেন না।

قُلْ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

৬. (হে রসূল,) তুমি বলো, হে ইহুদীরা, যদি তোমরা মনে করে থাকো, অন্য সব লোক বাদে কেবল তোমরাই হচ্ছো আল্লাহর বন্ধু, তাহলে (আল্লাহর পুরস্কার পাওয়ার জন্যে) তোমরা মৃত্যু কামনা করো– যদি তোমরা সত্যবাদী হও! ৭. কিন্তু (সারা জীবন) এরা নিজেদের হাত দিয়ে যা করেছে (তার পরিণাম চিন্তা করে) এরা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না; আল্লাহ তায়ালা এ যালেমদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত। ৮. (হে নবী,) তুমি এদের বলো, যে মৃত্যুর কাছ থেকে তোমরা আজ পালিয়ে বেড়াচ্ছো, একদিন কিন্তু তোমাদের সে মৃত্যুর সামনা সামনি হতেই হবে, তারপর তোমাদের সে মহান আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে, যিনি মানুষের দেখা অদেখা যাবতীয় কিছু সম্পর্কেই জ্ঞান রাখেন, অতপর তিনি সেদিন তোমাদের সবাইকে বলে দেবেন তোমরা দুনিয়ার জীবনে কি করে এসেছো।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

মদীনায় অবতীর্ণ এ সূরাটি সূরা 'সফ'-এর পরেই অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা 'সফ'-এর মধ্যে যে বিষয়ের ওপরে আলোচনা এসেছে এ সূরার মধ্যে আলোচনার বিষয়ও প্রায় সেই একই প্রকার, তবে ভিন্ন এক পদ্ধতিতে সে বিষয়টিকে এ সূরার মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই এর প্রভাবও নতুন এবং আর একভাবে মানুষের মনে দাগ কাটে।

এ সূরা মদীনার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মনে ঈমানের আকীদা-বিশ্বাস অত্যন্ত গভীরভাবে প্রোথিত করতে চেয়েছে। রসূল (স.)-এর যমানায় বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত মুসলমানরা ঈমানের সম্পদ হাসিল করায় যে অভংগুর একতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলো, তা একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানীতেই সম্ভব হয়েছিলো। নিরক্ষর আরববাসীদের মধ্যে পাঠানো হয়েছে শেষ রসূলকে, এটা আরবদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যই এক বিরাট এহসান, যার জন্যে আরববাসীদের অবশ্যই আকাশ থেকে অবতীর্ণ এ আমানতের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান ও মনোযোগী হওয়া দরকার এবং বিশেষভাবে আল্লাহর শোকরগোযারী করা দরকার। একই ভাবে যে জনগোষ্ঠী রসূল (স.)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং ঈমানের আমানত বহন করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে তাদের ওপর কিছু দায়িত্বও বর্তায় এবং এই একই দায়িত্ব ভবিষ্যতেও যুগের পর যুগ ধরে মুসলমানদের ওপর আসতে থাকবে। আল্লাহর নেয়ামতের শোকরগোযারী স্বরূপ তাদের আল্লাহ রসূলের বিধানমতো জীবন যাপন করতে হবে এবং অপরের কাছেও এই আমানত পৌঁছে দিতে হবে। এ দায়িত্ব কোনো সময়েই শেষ হয়ে যাবে না; বরং হেদায়াতের যে বীজ রসূল (স.) বপন করে গিয়েছেন তার বৃক্ষকে লালন পালন করতে হবে এবং বাড়াতে হবে। চার হাজার বছর ধরে এই দায়িত্ব বনী ইসরাঈল জাতির হাতে ছিলো, কিন্তু এর হক আদায় না করার কারণে তারা আকাশ

থেকে আসা আমানত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো এবং তাদের থেকে এ দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে উম্মতে মোহাম্মদীকে দেয়া হলো। তাওরাত ছিলো মূসা (আ.)-এর কাছে প্রেরিত আল্লাহরই কেতাব, বনী ইসরাঈল জাতি গাধার মতো এই কেতাবের বোঝা বহন করেছে বটে, কিন্তু এর থেকে কোনো ফায়দা নিতে পারেনি। গাধা তো বোঝা বহন করে খাদ্যস্বরূপ কিছু মজুরি পায়, কিন্তু বনী ইসরাঈলরা সে মজুরিও পায়নি এবং বোঝা বহন করার সময় তাদের কেউ সাহায্যও করেনি।

মুসলমানদের অন্তরের মধ্যে এই মূল সত্যটিই আলোচ্য সূরাটি বদ্ধমূল করে দিতে চায়। বিশেষ করে মদীনাবাসী তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাদের দ্বারাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এভাবে তাদের পরে যারা এসেছেন– তাবেঈ, তাব্য়ে তাবেঈ, পর্যায়ক্রমে সবার ওপরেই পর্যায়ক্রমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব এসেছে।

এখন আমরা দেখতে পাই ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানদের এমন কিছু বাস্তব অবস্থা এই সূরার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে, যা ওই কঠিন সময়ে ব্যক্তি চরিত্র গড়ে তোলার ব্যাপারে দীর্ঘ দিন ধরে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কাজ করেছে এবং ধীরে ধীরে মানুষকে লোভ লালসা ও পার্থিব ফায়দা হাসিলের আকাংখা, পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার মনোবৃত্তি এবং সুনাম অর্জন করার বাসনা থেকে মুক্ত করেছে, বিশেষ করে মুক্ত করেছে ধন দৌলতের আসক্তি থেকে এবং সেই খেল তামাশার আকর্ষণ থেকে যা মানুষকে প্রদত্ত আমানতের মহান দায়িত্ব পালন থেকে গাফেল করে দেয়, দূরে সরিয়ে দেয় খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে ব্যক্তিগত যোগ্যতা প্রদর্শন করা থেকে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্যে সূরাটি ইশারা করেছে বিশেষ একটি ঘটনার দিকে।

ঘটনাটি হচ্ছে, এক জুময়ার নামাযে মসজিদে রসূলুল্লাহ (স.) খোতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক বাণিজ্য কাফেলা ব্যবসা-দ্রব্য নিয়ে দেশে ফিরলো এবং শহরে এসে হাযির হলো। তাদের আগমন সংবাদ জানার সাথে সাথে যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর খোতবা শুনছিলো, সেই শ্রোতারা হঠাৎ করে সেই কাফেলার দিকে ছুটে গেলো। কাফেলার আগমন সংবাদ ঘোষণাকারী বাদ্যধ্বনি তাদের আবেগমুগ্ধ করে ফেললো। অবশ্য এভাবেই আরববাসীরা (ইসলাম-পূর্ব) জাহেলী যুগে বাণিজ্য ফেরতা কাফেলাকে অভিনন্দন জানাতো। কাফেলার মধ্য থেকে দফ নামক বাদ্যযন্ত্র (তবলা) সহ উট-হাঁকানো গান ও সম্মিলিত কলরব ভেসে আসছিলো! এতদ্ শ্রবণে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে রসূলুল্লাহকে দন্ডায়মান অবস্থায় পরিত্যাগ করে চলে আসে। এদের মধ্যে বারো জন ব্যক্তি ছিলেন ব্যতিক্রম। এরা ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত সাহাবা, ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব, যারা সর্বাবস্থায় রসূলুল্লাহ (স.)-কে ঘিরে থাকতেন। সুতরাং তারা স্থান ত্যাগ না করে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন। বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, এদের মধ্যে আবু বকর ও ওমর (রা.)-ও ছিলেন। যদিও সংখ্যার দিক দিয়ে এরা একেবারে নগণ্য ছিলেন না, কিন্তু কোরআনুল করীমে আসা সতর্কবাণী থেকে জানা যায়, উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ওঠে চলে গিয়েছিলো। এ ঘটনাটি বিশেষভাবে পীড়াদায়ক ছিলো এজন্যে যে, যে প্রথম ইসলামী দলটিকে এতো কষ্ট করে ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিলো, তার এমন দশা হলো! ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, ইসলামের ইতিহাসে এটা একটা বিশেষ ঘটনা এবং গোটা মানব জীবনের ইতিহাসেও এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এ ঘটনা থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, যে কোনো সময়ে এবং যে কোনো কঠিন অবস্থাতে আমাদের সবর করতেই হবে। আসলে যে মুসলিম জামায়াত ইসলামের এই মহামূল্যবান আকীদার প্রচার প্রসারের

দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছে, তাকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন অবিচল দৃঢ়তার। এই সবর দ্বারাই পরবর্তী কালের মুসলমানরা ইসলামকে বাস্তব জগতে সেভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে, যেভাবে প্রথম যুগের ইসলামী জামায়াত এই আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আলোচ্য সূরাটিতে ইহুদীদের সাথে 'মোবাহালা' করার দৃশ্যও দেখা যায়, অর্থাৎ কারা সত্য পথে আছে তার জন্যে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে উভয় পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করা, হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যে ভুল পথে আছে তার প্রতি তোমার লা'নত বর্ষণ করো এবং সে ধ্বংস হয়ে যাক। ইহুদীদের সাথে যে প্রতিযোগিতার কথাও এ সূরার মধ্যে ফুটে ওঠেছে, তা ছিলো উভয় পক্ষ থেকে মিথ্যাপন্থীদের জন্যে মৃত্যু কামনা করা, আর ইহুদীরা অন্যান্য যে কোনো জাতির তুলনায় নিজেদের আল্লাহর বন্ধু ও অধিক প্রিয়পাত্র বলে দাবী করতো, আর বলতো যে, অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে রসূলের আগমন ঘটবে না- সেই দাবী প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই এই মোবাহালা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবে আল কোরআনও চূড়ান্ত ভাবে দাবী করেছে যে, ওদের মোবাহালার জন্যে ডাকলে এই প্রতিযোগিতায় ওরা কিছুতেই সাড়া দেবে না, যেহেতু তাদের চেতনার মধ্যে গভীরভাবে একথা রয়েছে যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাপন্থী এবং তাদের দাবী মিথ্যা। এর পর আল কোরআন মৃত্যুর তাৎপর্য জানাতে গিয়ে বলছে, এমন ভয়ানক বিপদ যার থেকে বাঁচার জন্যে ওরা সব সময়েই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে চায়; কিন্তু সে মৃত্যু অবশ্যই ওদের সাথে সাক্ষাত করবে তা ওরা যেখানেই থাকুক না কেন। অবশেষে তাদের অনুপস্থিত ও উপস্থিত সব কিছুর জাননেওয়ালা যে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর কাছে হাযির করা হবে। আর তখন তিনি তাদের সেই সকল বিষয়ে অবগত করবেন, যা অতীতে তারা করতে থেকেছে। এ কথাগুলো শুধু ইহুদীদের জন্যেই নয় বরং সবার জন্যে, কেননা এ কথাগুলো খাস করে ইহুদীদের নাম নিয়ে বলা হয়নি। কাজেই মোমেনদের ওপরেও কথাগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য। যেহেতু ঈমান আকীদার আমানত বহন করার প্রশ্নেই এ কথাগুলো এসেছে, এজন্যে যারাই এ আমানতের হক আদায় না করবে, তাদের ওপরেই কথাগুলো প্রযোজ্য হবে। কারণ, তারা এ আমানত সম্পর্কে জানে ও তার গুরুত্বও যথাযথভাবে বুঝে। তবু নিছক পার্থিব স্বার্থের কারণে তারা সে দায়িত্ব পালন করা থেকে পিছিয়ে থাকে।

এই হচ্ছে সূরার মুখ্য আলোচ্য বিষয়। ইতিপূর্বে সূরা 'সফ'-এ যে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে, তা এখানে আলোচিত বিষয়ের খুবই কাছাকাছি। তবে প্রত্যেক সূরার বর্ণনাভংগি পৃথক এবং প্রতিটি সূরা ভিন্ন ভিন্নভাবে হৃদয়কে আকর্ষণ করে। যদিও উদ্দেশ্য তাদের এক অভিন্ন। সুতরাং এখন আমরা দেখি এ সূরার মাধ্যমে কোরআনুল কারীম কি পদ্ধতি পেশ করেছে।

তাফসীর

আয়াত ১-৮

'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই নিরংকুশ আনুগত্য দান করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করে চলেছে। বিশ্বলোকে তিনি একচ্ছত্র অধিপতি, তিনি সকল প্রকার দুর্বলতা ও অক্ষমতার উর্ধ্বে, তিনি মহা শক্তিমান, মহাবিজ্ঞানময়।'

আলোচ্য আয়াতটি এখানে স্পষ্টভাবে এই সত্য তুলে ধরেছে যে, সৃষ্টিলোকে যা কিছু আছে তা সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রশংসায় রত রয়েছে, অর্থাৎ নিরন্তর তাঁর নির্দেশমতো চলার মাধ্যমে এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে যে, সকল শক্তি ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, আর এই সূরার

মধ্যে আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসাবে অতি সূক্ষ্মভাবে এই কথাই আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করছেন। তিনি সূরাটির নাম রেখেছেন 'আল্ জুমুয়া'। এখানে জুমআর নামায সম্পর্কে কিছু শিক্ষাও রয়েছে, সময় হওয়ার সাথে সাথে এ নামাযে শরীক হওয়ার জন্যে সকল কাজকর্ম পরিত্যাগ করে ছুটে আসতে বলা হয়েছে। পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে সকল প্রকার বে-ফায়দা কাজ ও ব্যবহার এবং যাবতীয় ব্যবসা বাণিজ্য। আর সেই মহামূল্যবান নেয়ামত চাইতে বলা হয়েছে যা একমাত্র আল্লাহর কাছেই বিদ্যমান। তাদের একথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হৃদয় মনকে প্রলুব্ধকারী এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন ব্যস্ততা এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের ধন সম্পদের তুলনায় আল্লাহর কাছে অবস্থিত নেয়ামত অতি উত্তম। এই জন্যেই তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনিই 'বাদশা–' ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি, তিনিই সব কিছুর মালিক। এমনকি ব্যবসা বাণিজ্য করে মানুষ যা কিছু উপার্জন করে সে সকল পণ্যদ্রব্যের মালিকও তিনি। তিনি আরও স্মরণ করাচ্ছেন যে, তিনি সকল প্রকারে দুর্বলতার উর্ধ্বে এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যে সকল জিনিস মানুষের নিকট গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এবং যেসব জিনিসের প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সেসব কিছু থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। একথাগুলো বিশেষভাবে এই জন্যেই বলার প্রয়োজন হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স.) যখন খোতবা দিচ্ছিলেন, তখন কাফেলার আগমনবার্তা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে খোতবা শোনার গুরুত্ব তাদের মনে কমে গেলো এবং অহেতুক খুশীতে অস্থির হয়ে তারা মসজিদ ত্যাগ করে চলে গেলো। সাময়িকভাবে হলেও তারা একথা ভুলে গেলো যে, এ সব কিছুর ব্যাপারে একদিন তাদের আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে।

নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মাঝে নবী প্রেরণ

ইহুদীদের দাবী যে তারাই আল্লাহর নিকবর্তী লোক, সেই কথার প্রেক্ষাপটে মহাশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের সাথে মোবাহালা করার জন্যে নবী (স.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন। এই মোবাহালার মধ্যে আরও একটি কথা রয়েছে, 'বেশ তো, তোমরা যদি আল্লাহর বিশেষ প্রিয়পাত্রই হয়ে থাকো তাহলে আসন্ন মৃত্যু কামনা করো, যেহেতু মৃত্যুর পরেই তোমরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হিসেবে তাঁর কাছে হাযির হতে পারবে এবং হিসাব নিকাশের পর মহা পুরস্কার লাভ করতে পারবে, কিন্তু এ কপট আহলে কেতাবরা জানতো যে, প্রকৃতপক্ষে তারা সঠিক কাজ ও ব্যবহার করছে না, এজন্যে তারা এইভাবে মোবাহালা করতে রাযি হতে পারেনি। অপরদিকে মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহ তায়ালা উম্মী (নিরক্ষর) লোকদের মধ্য থেকে রসূল পাঠাতে চাইলেন যাতে করে সেই রসূল তাঁর আয়াতগুলো তাদের পড়ে শোনাতে পারেন, তাদের নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী বানাতে পারেন এবং কেতাব ও বুদ্ধিমত্তার কথা তাদের শিক্ষা দিতে পারেন। এসব উপযুক্ত ও সূক্ষ্ম কথা তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করতে পারে এবং মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়। তারপর এ সূরার মধ্যে যে মূল বিষয়বস্তুর আলোচনা করতে চাওয়া হয়েছে তা শুরু হচ্ছে।

আল্লাহ তো সেই মহান সত্ত্বা, যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর রসূলকে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে রসূল বানিয়ে যেন তিনি তাদের আল্লাহর আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে শুনান, কলুষ-কালিমা ও নৈতিক অপরাধসমূহ থেকে তাদের মুক্ত করেন, তাদের আল-কোরআনের কথাগুলো এবং বুদ্ধিমত্তাভরা বিদ্যা শেখান, যদিও এর পূর্বে তারা ছিলো স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে। তিনি রসূল হয়ে এসেছেন অন্যদের জন্যেও, যারা এখন ও মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়নি। আর তিনিই মহা শক্তিমান, বিজ্ঞানময়।

কথিত আছে, আরবদের উম্মী বলা হতো। তাদের এই জন্যে নিরক্ষর বলে অভিহিত করা হতো যে, সাধারণভাবে তারা পড়ালেখা করতো না। নবী (স.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে জানা যায়, তিনি একদিন বললেন, মাস এই রকম, এই রকম এবং এই রকম। কথাগুলো বলার সময় তিনি তাঁর আংগুলগুলো দ্বারা ইশারা করে দেখাচ্ছিলেন। তারপর বললেন, আমরা তো এক নিরক্ষর (উম্মী) জাতি, আমরা হিসাবও করতে পারি না, গুনতেও পারি না।(১) আরও একটি কথা বলা হয়েছে, তাঁকে উম্মী এ জন্যেই বলা হয়েছে যে, তিনি জন্মগ্রহণ করার পর লেখাপড়া শিখতে পারেননি এবং তাঁর মায়ের কাছ থেকেই তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানা গেছে, এ জন্যেও তাঁকে উম্মী বলা হতে পারে। লেখাপড়া জানতে হলে তো অবশ্যই কারো কাছে শিখতে হয় এবং কারো সাহায্য নিতে হয়। এই সুযোগ তিনি পাননি।

নবী (স.)-কে লোকেরা উম্মী হয়তো এ জন্যেও বলে থাকবে যে, ইহুদীরা নিজেদের ছাড়া অন্য সবাইকে উম্মী বলতো। তারা অন্যদের সম্পর্কে বলতো, ওরা হচ্ছে, 'জুওয়াইয়েম।' এই শব্দটি ইব্রানী ভাষা থেকে এসেছে,। এর অর্থ হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক' একথা দ্বারা 'জাতিসমূহ' অর্থও বুঝায়। একথা দ্বারা তারা বলতে চাইতো যে, তারাই আল্লাহর গোত্র, বাকি সবাই সাধারণ জাতি।

আর আরবী ভাষায় 'উম্মী' একবচন, এর বহুবচন 'উম্মিউন'। সম্ভবত এই উম্মিউন (বহুবচন) শব্দটি সূরাটির মধ্যে আলোচিত বিষয়বস্তুর সাথে বেশী সংশ্লিষ্ট, এই জন্যে এই শব্দটিই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

ইহুদীরা অপেক্ষায় ছিলো যে, শেষ রসূল তাদের থেকেই প্রেরিত হবেন এবং তিনি আগমন করে তাদের মধ্যে বিরাজমান দল, উপদলের যে কোন্দল রয়েছে, সেগুলো দূর করে দেবেন এবং তাদের পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত করে সম্মানের আসনে সমাসীন করবেন। তারা বলতো, শীঘ্রই শেষ যমানার নবী আসবেন এবং তাঁর সাহায্যে আরবদের ওপর তারা জয় লাভ করবে, অর্থাৎ শেষ নবীর সাহায্য তারা সবাই কামনা করতো।

কিন্তু আল্লাহর প্রজ্ঞার দাবী ছিলো যে, এই নবীকে আরব দেশে পাঠানো হোক এবং উম্মীদের মধ্যেই পাঠানো হোক, ইহুদীদের মধ্য থেকে নয়। কারণ, আল্লাহর জানা হয়ে গিয়েছিলো যে, ইহুদীরা নবুওতের বোঝা বহন করতে অক্ষম হয়ে গেছে এবং গোটা মানব জাতিকে পরিচালনার যে নতুন দায়িত্ব আসছে, তা পালন করার যোগ্যতা ওদের নেই। এ বিষয়ে আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় বর্ণনা আসছে। সে জাতি সত্য সঠিক পথ থেকে সরে গেছে এবং সূরা 'সফ'-এর বর্ণনামতে তারা গোমরাহ হয়ে গেছে। এ জাতির দীর্ঘ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ওদের এতো বড়ো আমানতের বোঝা বহন করার দায়িত্ব আর দেয়া ঠিক হবে না।

অপরদিকে রয়েছে আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া। সে দোয়া অনুযায়ী জানা যায়, এই পবিত্র ঘরের ছায়াতলে থেকে যিনি এর কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, তিনি হবেন ইসমাঈল (আ.)। 'যখন এ ঘরটির ভিত্তি রচনা করলো ইবরাহীম ও ইসমাঈল (বাপ-বেটা) দু'জনে মিলে (এবং তারা বললো), হে আমাদের রব, আপনি আমাদের নিকট থেকে এ কাজ কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই, আপনি দোয়া শুননেওয়ালা, জাননেওয়ালা। হে আমাদের রব, আমাদের দুজনকে মুসলমান (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) বানিয়ে দিন এবং বানিয়ে দিন আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও মুসলিম উম্মত, দেখিয়ে দিন আমাদের হজ্জের কার্যক্রম পদ্ধতি এবং আমাদের তাওবা

(১) 'আহকামুল কোরআন' কেতাবের প্রণেতা ইমাম জাস্সাস এ কথাটি উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি কোনো হাদীসের কেতাবের বরাত দেননি।

কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী, মেহেরবান। হে আমাদের রব, ওদের (আমাদের বংশধরদের) মধ্য থেকেই পাঠান এমন একজন রসূল, যে তাদের আপনার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদের কেতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা শিক্ষা দান করবে এবং তাদের পবিত্র (কলুষমুক্ত) করবে। অবশ্যই তুমি মহাশক্তিমান, বিজ্ঞানময়।' অদৃশ্য মহাশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে এ দোয়া পৌঁছে গিয়েছিলো এবং যুগ যুগ ধরে এ দোয়া প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো আকাশে-বাতাসে অন্তরালে। এ দোয়া অবিস্মরণীয় এবং এমনভাবে আল্লাহর দরবারে সুরক্ষিত ছিলো, যা কোনো দিন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে না এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর ফয়সালা এ দোয়া আল্লাহর জ্ঞানভান্ডারের মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকবে, তারপর সঠিক ও উপযুক্ত সময়ে এ দোয়া অনুযায়ী কাজ হবে– এটাই আল্লাহর ফয়সালা এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা এবং অবশেষে সৃষ্টিজগতে নবুওতের দায়িত্ব পালনের কাজ নির্ধারিত ও সঠিক সময়ে আল্লাহর মর্জিমতোই গৃহীত হবে, তার আগেও নয়, পরেও নয়।

তাই দেখা যায়, আল্লাহর নিজ কুদরত ও পরিচর্যায় এ দোয়ার বিকাশ ঘটেছে, বাস্তবায়িত হয়েছে মহান দুই নবীর আকুল আবেদন। কি চমৎকারভাবে এই সূরার মধ্যে ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, 'তাদের মধ্য থেকে যেন আগমন করেন এমন একজন রসূল, যিনি তাদেরকে 'তাঁর' আয়াতগুলো পড়ে শোনাবেন, পবিত্র করবেন তাদের এবং শেখাবেন তাদের কেতাব ও হেকমত। এটা আল্লাহরই দান, যেমন ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়াতেই আল্লাহর এই ক্ষমতার কথা ধ্বনিত হয়েছে– 'অবশ্য তুমিই মহাশক্তিমান প্রজ্ঞাময়।'

আর রসূলুল্লাহ (স.)-কে তাঁর নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, 'আমি তো আব্বা ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার বাস্তব রূপ এবং ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদের বাস্তবায়ন। আমি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই আমার আম্মা দেখেছিলেন এমন এক জ্যোতি, যার আলোতে সিরিয়ার রাজধানী বসরা শহর উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিলো।(১)

অন্ধকার পেরিয়ে আলোর জগতে মানবজাতির অগ্রযাত্রা

'তিনিই তো সেই মহান সত্ত্বা, যিনি উম্মীদের মধ্যে তাদের থেকেই একজন রসূল পাঠাবেন। তার দায়িত্ব হবে, সে তাঁর আয়াতগুলো ওদের পড়ে শোনাবে, তাদের পবিত্র করবে এবং তাদের আল্লাহর কেতাব ও জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা শেখাবে। যদিও এর পূর্বে তারা খোলাখুলি ভুল পথের মধ্যেই ছিলো।'

এখানে উম্মীদের আল্লাহর কেতাবের ধারক বাহক বানানোর উদ্দেশ্যেই তাদের প্রতি আল্লাহর এহসানের কথা প্রকাশ করেছেন। এ এহ্সান প্রদর্শন এজন্যেও বটে যে, তাদের মধ্য থেকেই তিনি এমন একজন রসূল পাঠিয়েছেন যাঁকে তারা আল্লাহরই ইচ্ছাতে সুমহান মর্যাদার আসনে বসিয়েছে এবং তিনি তাদের নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে বের করে এনেছেন, অথবা তাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াতের মাধ্যমে তাদের সাধারণ উম্মতের মধ্য থেকে মর্যাদাশীল উম্মতে পরিণত করেছেন, তাদের সাবেক অবস্থা থেকে উন্নীত করেছেন এবং সারা জগতে তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বানিয়েছেন।

'এবং পবিত্র করেছেন'। এর দ্বারা মনের পবিত্রতা বুঝায় এবং রসূল (স.)-এর শেখানো পাক সাফ থাকাও বুঝায়। এ পবিত্রকরণ দ্বারা যেমন বিবেক বুদ্ধি, চেতনা, কাজ ও ব্যবহার বুঝায়, তেমনি বুঝায় দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা ও সামাজিক জীবনের মধ্যে বসবাসকালীন

(১) ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াত অনুযায়ী জানা যায়, তিনি বলেন, আমাকে এ হাদীসটি সওর ইবনে যায়দ উর্ধ্বতন বিভিন্ন রেওয়ায়াতকারীর বর্ণনা ধারা ও রসূল (স.)-এর সাহাবাদের বরাত দিয়ে জানিয়েছেন। ইবনে কাসীর বলেন, এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সঠিক ও সুন্দর। আরও বিভিন্ন উপায়ে হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানা গেছে।

আদান-প্রদানের পরিচ্ছন্নতাকেও। এ পবিত্রকরণ দ্বারা মানুষের মন মগয শেরেকের কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে তাওহীদী বিশ্বাসকে ধারণ করে এবং ভুল চিন্তা চেতনা থেকে মুক্তি লাভ করে সঠিক বিশ্বাসের দিকে মানুষ এগিয়ে যায়।

এই পবিত্রকরণ দ্বারা সমস্ত প্রকারের সন্দেহ পূর্ণ কাহিনী ও মনগড়া কথা থেকেও পবিত্র করা এবং নিশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে দেয়াও বুঝায়। প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মনে যেসব খারাপ কথার উদয় হয় এবং চারিত্রিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, সেসব থেকে পবিত্র করে ঈমানী চরিত্র গড়ে তোলার দ্বারা পরিশুদ্ধকরণের কথা বলা হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করার পর সূদ ও অন্যান্য হারাম পদ্ধতির মাধ্যমে রোযগার বন্ধ করে মুসলমানদের হালাল রুযি খেতে শেখানো হয়েছে। এভাবে ব্যক্তি ও দলীয় জীবনে, কল্পনা ও বাস্তবতার ক্ষেত্রে সবখানেই যেন মুসলমানরা পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পবিত্রকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে মানবতাবোধ সৃষ্টি করা হয়েছে, জীবন সম্পর্কে সুস্থ সঠিক চিন্তা চেতনা পয়দা করা হয়েছে এবং মন-মগযকে এমনভাবে উন্নত করতে চাওয়া হয়েছে, যেন এ সুন্দর মন নিয়ে মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে এবং পৃথিবীর সংকীর্ণতার গন্ডি থেকে মুক্ত হয়ে মহান আল্লাহর মহব্বত হাসিল করার জন্যে এগিয়ে যেতে পারে এবং মহান রব্বুল আলামীনের কাছে জওয়াবদিহি করার জন্যে তার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হয় ও প্রত্যেকটি কাজ সেভাবে পরিচালিত হয়। (১)

'এবং তাদের তিনি কেতাব ও হেকমত (বুদ্ধিপূর্ণ কথা) শিক্ষা দিচ্ছেন। কেতাব শিক্ষা দেয়ার কারণে তারা আহলে কেতাব বা কেতাবের অধিকারী হচ্ছে এবং হেকমত শিক্ষা দেয়ায় তারা বস্তুজগতের বিভিন্ন তথ্য জানতে পারছে ও সেগুলো যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারছে। এভাবে তারা তাদের ভাগ্য উন্নয়ন করতে পারছে, উন্নত হচ্ছে তাদের মন ও জীবন যাপনের মান। এসব কিছু মিলেই ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে মানুষ সার্বিক কল্যাণের অধিকারী হয়েছে।

'যদিও এর পূর্বে তারা ছিলো স্পষ্ট ভুল পথে।' এই ভুল পথ বা গোমরাহী ছিলো অজ্ঞানতার (জাহেলিয়াতের) গোমরাহী। হযরত জাফর ইবনে আবু তালেবের ব্যাখ্যায় এ কথা জানা যায়। মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করে নাজ্জাশীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করলে তাদের ফিরিয়ে আনার জন্যে কোরায়শরা আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনে রবীয়াকে সেখানে পাঠায়। এই কোরায়শ প্রতিনিধিরা যখন মুসলমান মোহাজেরদের সম্পর্কে নানা প্রকার ভুল কথা বলে তাদের ফেরত দেয়ার অনুরোধ করলো, তখন নাজ্জাশী মুসলমানদের কাছে সঠিক অবস্থা জানতে চাইলেন। জওয়াবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে জাফর বললেন,

'হে বাদশাহ, আমরা জাহেলিয়াতবাসী ছিলাম (অর্থাৎ অজ্ঞানতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম)। বিভিন্ন পুতুলের পূজা করতাম, মৃত জীবজন্তু খেতাম, নানা প্রকার লজ্জাকর কাজে লিপ্ত ছিলাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীদের কষ্ট দিতাম এবং আমাদের সমাজের শক্তিশালী লোকেরা গরীবের ধন সম্পদ কেড়ে খেতো, দীর্ঘকাল ধরে আমরা এই অবস্থার মধ্যে থেকে কষ্ট পাওয়ার পর আমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল এলেন, যাঁর বংশ-পরিচয় ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে আমরা জানতাম, জানতাম তাঁর আমানতদারী ও চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্ক। তিনি আমাদের এক আল্লাহকেই হুকুমদাতা ও মালিক বলে মানতে শেখালেন এবং একমাত্র তাঁরই হুকুম পালনের আহ্বান জানালেন। আমরা এবং আমাদের বাপ দাদারা আল্লাহ ব্যতীত যে সব জড় পাথর ও দেব দেবীর পূজা করতাম, সেগুলো তিনি পরিত্যাগ করতে বললেন। তিনি আমাদের সত্য কথা বলার নির্দেশ দিলেন, আমানতের হক আদায় করতে বললেন এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি

(১) এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, মোহাম্মদ কুতুব রচিত 'আল ইনসানু বাইনাল মাদ্দিয়াতে অল-ইসলাম।'

সদয় হতে বললেন, প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে শেখালেন, সম্মানী লোকদের ওবেইয্যত করতে মানা করলেন এবং খুন খারাবী করা থেকে আমাদেরকে বিরত করলেন এবং নিষেধ করলেন লজ্জাকর কাজ করতে, মিথ্যা কথা বলতে, এতীমের সম্পদ ভক্ষণ করতে এবং পাক সাফ মহিলাদের বদনাম করতে। তিনি আমাদের একমাত্র আল্লাহর নিরংকুশ আনুগত্য ও পরিপূর্ণ দাসত্ব করতে নির্দেশ দিলেন এবং তাঁর সাথে শক্তি ক্ষমতায় অন্য কাউকে অংশীদার করতে মানা করলেন, আর তিনি আমাদের নামায পড়তে, যাকাত আদায় করতে এবং রোযা রাখতে আদেশ করলেন।

জাহেলিয়াতের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে তারা গোমরাহীর মধ্যে ডুবে থাকা সত্তেও আল্লাহ তায়ালা জানতেন, ভুল আকীদা বিশ্বাসের কারণেই তারা ওই ভুল পথে চলছিলো। তাঁর জানা ছিলো যে, তাদের অন্তরের মধ্যে কল্যাণ ও সংশোধনী গ্রহণ করার শক্তি রয়েছে, যদি যুক্তি সহকারে তাদের সত্য সঠিক পথের দিকে দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে তা গ্রহণ করার মতো যোগ্যতা তাদের মধ্যে আছে। ইতিপূর্বে মিসরে ইহুদীদের অপমানজনক জীবন যাপন তারা দেখেছে, ভুল আকীদা গ্রহণ ও সত্য পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে তাদের অধোপতন এবং কিছুতেই দুনিয়ার কোনো জায়গাতেই এই অভিশপ্ত ইহুদী জাতিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করতে না পারার করুণ অবস্থাও তারা প্রত্যক্ষ করেছে। এমনকি আল্লাহর নবী মূসা (আ.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর উম্মত ও অনুসারী হওয়া সত্তেও তাদের নাফরমানীর কারণে কোথাও তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেনি এবং পরবর্তীকালেও কোনো দেশে তাদের স্থায়ী ঠিকানা ছিলো না। অবশেষে তাদের অভিশপ্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত জাতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের দায়িত্বও কেড়ে নেয়া হয়েছে, যা কেয়ামত পর্যন্ত আর তাদের ফেরত দেয়া হবে না।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জ্ঞানভান্ডারে একথা ছিলো যে, এই সময়ে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে পৃথিবীবাসীকে মুক্ত করার জন্যে এবং তৎকালীন বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যসমূহের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে দাওয়াতী কাজের কেন্দ্রভূমি হবে এই আরব উপদ্বীপ। তৎকালীন ওই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে ছোট খাটো গোত্রীয় শক্তিগুলো তেমনি করে মিশে গিয়েছিলো যেমন করে প্রদীপের মধ্যে পতংগরা ঝাঁপ দিয়ে আত্মোৎসর্গ করে, এমনকি মানুষের সাধারণ বুদ্ধিও তখন অকেজো হয়ে গিয়েছিলো। তৎকালীন এই অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈক ইউরোপীয় লেখক বলছেন,

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে গোটা পৃথিবী এতো বেশী বস্তুবাদী হয়ে পড়েছিলো যে, বস্তুর মহব্বতের কারণে ও আধিপত্য লাভের প্রতিযোগিতায় মানুষ চরম নীতি বিবর্জিত হয়ে গিয়েছিলো। কারণ, যে আখেরাতকেন্দ্রিক আকীদা বিশ্বাসের কারণে মানুষ নীতিবান হয়, তা নিশেষ হয়ে যাওয়ার ফলে মানবতার চরম অধোপতন হয় এবং মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে ধস নেমে আসে। এ কারণেই বনী ইসরাঈলদের হাতে চার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা সভ্যতার প্রাসাদে ধসের সূচনা শুরু হয়ে যায়। তাদের সীমা লংঘন ও যুলুমের কারণে সাধারণভাবে মানুষ তাদের নাগপাশ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে মনে প্রাণে কামনা করতে থাকে এবং গোটা মানব জাতি পুনরায় বর্বরতার দিকে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। গোত্রে গোত্রে মারামারি, কাটাকাটি, রাহাজানি, খুনখারাবী নিত্যদিনের সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। আইন কানুন ও সুষ্ঠু কোনো শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে সর্বত্র স্বৈরাচার, স্বেচ্ছাচার ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। খৃষ্ট ধর্মের প্রচার প্রসারে যে শাসন ব্যবস্থা ও শৃংখলা গড়ে ওঠেছিলো, তার বুনিয়াদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ভেংগে পড়ে এবং গড়ে ওঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থা। অথচ ইতিপূর্বে গড়ে ওঠা

শাখা-প্রশাখা-পল্লবিত মহা বৃক্ষের ন্যায় নগর-সভ্যতা সারা পৃথিবীর বুকে প্রভাবশীল অবস্থায় বিরাজ করতো।

এই কেন্দ্রীয় রাজ্য থেকে বিচ্ছুরিত হত চতুর্দিকে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো, কিন্তু জাহেলিয়াতের যুগে কেন্দ্রীয় কোনো শাসন ব্যবস্থা না থাকায় সামাজিক সংহতি বলতে কোনো কিছু থাকে না এবং সর্বত্র ধ্বংস ও বিপর্যয় নেমে আসে, এমনকি মানুষের সাধারণ বিবেক বুদ্ধি পর্যন্ত বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। এমন কঠিন যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন এমন এক মহাপুরুষ যিনি (তাওহীদের) এক পতাকাতলে সমবেত করেন গোটা পৃথিবীর মানুষকে।(১)

এই হচ্ছে আরব দেশের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে ইসলামের চরম বিরোধী ইউরোপীয় লেখকের কলমের আঁকা ছবি!

অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন আরব মরুর বুকে বিচরণরত সেই বেদুইন জাতিকে আল্লাহ তায়ালা বেছে নিলেন এই বিশ্বপ্লাবী দ্বীনের পতাকা সমুন্নত করার জন্যে। এই মহান সংশোধনী কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে নিজেরা সংশোধিত হওয়ার ও অপরের কাছে এই আহ্বান পৌঁছে দেয়ার যোগ্যতা ও সক্ষমতা তাদের মধ্যে কতটুকু ছিলো ও আছে তা আল্লাহ তায়ালা ভাল জানেন।

এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে তাঁর রসূল পাঠালেন। তিনি তাদের তাঁর আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে শোনালেন, তাদের যাবতীয় অসৎ ব্যবহার, বদঅভ্যাস ও খারাপ কাজ থেকে পবিত্র করলেন এবং তাদের মহান এ কেতাব ও যুক্তি-বুদ্ধিপূর্ণ কথা শেখালেন, যদিও এর পূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জমান ছিলো। 'এ সংশোধনী' প্রচেষ্টা ও এ শিক্ষা ছিলো পরবর্তী সেসব লোকের জন্যেও, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর তিনিই মহাশক্তিমান মহা বিজ্ঞানময়। মরুবাসী এ বেদুইনদের সম্পর্কে ইতিহাস ও অন্যান্য বিভিন্ন সূত্র থেকে আরও বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। ইমাম বোখারী (র.) আবু হোরায়রা (রা.)-এর হাদীস রেওয়ায়াত করতে গিয়ে একটি ঘটনার কথা বলেন, 'আমরা একদিন নবী (স.)-এর কাছে বসে ছিলাম, তখন তাঁর কাছে সূরা জুমুয়া নাযিল হলো, যার মধ্যে 'ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকূ বিহিম' অর্থাৎ এরা বাদে অন্যান্য আরও ব্যক্তিদেরও পবিত্র করতে চাইলেন, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি আয়াতটিও রয়েছে। আয়াতটি শোনার সাথে সাথে সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ইয়া রসূলাল্লাহ? কথাটির উত্তর দেয়ার পূর্বে তাঁরা তিন বার কথাটি জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমাদের সাথে সালমান ফারেসীও উপস্থিত ছিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স.) সালমান ফারেসী (রা.)-এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ঈমান যদি সুরাইয়া তারকার কাছেও থাকে, তাহলে অবশ্যই সেখান থেকেও এ সকল ব্যক্তি অথবা ওদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি তা পেয়ে যা'বে।' রসূলুল্লাহ (স.)-এর এই আচরণ এবং এই কথায় ইশারা পাওয়া গেলো, 'অন্যান্য লোক' বলতে পারস্যের লোকদের বুঝানো হয়েছে, যেহেতু সালমান ফারেসী ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। আর প্রখ্যাত আলেম মোজাহেদ এই আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'এ আয়াতে আরব দেশের বাইরের যারাই নবীকে সত্য বলে জেনেছে ও মেনে নিয়েছে, তাদের সবাইকে বুঝানো হয়েছে।'

ইবনে আবী হাতেম সাহল ইবনে সাদের বরাত দিয়ে রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'আমার উম্মতের আওলাদ, তাদের আওলাদ, তাদের আওলাদের মধ্য থেকে

(১) Dinesan রচিত গ্রন্থ 'আল আওয়াতিফু কাআসাসুন লিল হাজারাহ।' এই পুস্তকটি মৌলবী মোহাম্মদ আলী রচিত 'আল ইসলাম ওয়ান্নেযামুল আলামল জাদীদ' এবং এর অনুবাদক অধ্যাপক আহমাদ জুদাত আস সাহ্হার অবলম্বনে লিখিত।

বহু পুরুষ ও নারী বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' এরপর তিনি পাঠ করলেন, 'ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকূ বিহিম', অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীর (উপস্থিত এই ব্যক্তিরা ছাড়া) অবশিষ্ট অংশ সবাই এই আয়াতের অন্তর্গত। এই আয়াত সম্পর্কে রসূল (স.)-এর উল্লিখিত দুটি কথাতেই উভয় শ্রেণীর লোকদের বুঝায়, অর্থাৎ অনারব ও রসূল (স.)-এর যমানার পরবর্তী সকল উম্মত। এ কথাগুলো থেকে এও বুঝা যায় যে, পৃথিবীর সকল এলাকায় সকল যমানায় যারাই এই ঈমান ও ইসলামের আমানত বহন করতে থাকবে এবং এই দ্বীন (ইসলামী জীবন ব্যবস্থা) অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, তারা সবাই এই আয়াতের লক্ষ্য।

'আর তিনিই মহাশক্তিমান মহাবিজ্ঞানময়'। তিনিই সকল শক্তির মালিক, সব কিছু করতে সক্ষম ও সকল কিছুর ওপর একমাত্র তাঁরই অধিকার বিদ্যমান। তিনিই জ্ঞানী ও সকল জ্ঞানের অধিকারী এবং তিনিই সবখান থেকে তাঁর পছন্দমতো লোক বাছাই করে তাদের দায়িত্ব দান করেন। তাঁর মেহেরবানী ও সম্মান তিনি পূর্ববর্তী পরবর্তী সবাইকে দান করেছেন ও করেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'এই হচ্ছে আল্লাহর সেই মেহেরবানী, যা তিনি দান করেন যাকে ইচ্ছা তাকে।'

তাঁর বাণী ও শিক্ষা বহন করার দায়িত্ব যে কোনো উম্মত, দল বা ব্যক্তি, যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি দেন। আল্লাহর এ বাতি কার হাতে দিতে হবে, কার হাতে রাখা হবে, কার হাতে সোপর্দ করা হবে এ গুরুদায়িত্ব, আর কোন্ কেন্দ্রে এবং কোন্ স্থানে আসমান ও যমীনের মিলন হবে তা সবই তাঁর জানা। এ দায়িত্বের বোঝা বহন করা এমন এক মর্যাদা যার কোনো তুলনা নেই। এ মহান মর্যাদাবোধ গড়ে ওঠে একজন মোমেনের মধ্যে তার নিজের অন্তর থেকে, তার বিষয়-আশয় এবং জীবনের সব কিছু থেকে সে এ মর্যাদা পেতে থাকে। এমনকি জীবন পথে চলতে গিয়ে মানুষকে যেসব অসুবিধার মোকাবেলা করতে হয়, দুঃখ সংকট ও সংসারের নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে পড়তে হয় এবং সত্য পথে থাকতে গিয়ে যে কঠিন সংগ্রাম করতে হয় এসব কিছুর মধ্যে সে এই মর্যাদা অনুভব করতে থাকে।

মদীনার মুসলমান জামায়াত, আশেপাশের লোক ও অনাগত ভবিষ্যতের সকল মানুষকে আল্লাহ তায়ালা একথা জানাচ্ছেন, স্মরণ করাচ্ছেন যে, তাঁর এই কেতাব তেলাওয়াত করে শোনানো, মানুষকে দোষক্রটিমুক্ত করার কাজ এবং আল কোরআন ও এর সংশ্লিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের এই আমানত যারাই বহন করবে, তারাই এই মহান মর্যাদার অধিকারী হবে। রসূলকে অবশ্যই এই একই উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিলো। তাঁর প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তিনি আল্লাহর কেতাব পড়ে শোনাতেন, তাঁর নিজের মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাদের যাবতীয় দোষ, ক্রটি ও কদর্য খাসলত থেকে পবিত্র করার কাজ করতেন এবং তাঁর সাহাবাদের যুক্তি-বুদ্ধিপূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা শেখাতেন। অনাগত ভবিষ্যতের সকল মানুষের জন্যে এই দুটি আয়াত আল্লাহর এমন মহান নেয়ামতভরা ভান্ডারের দরজা খোলা রেখে দিয়েছে, যেখানে যে কোনো মানুষ প্রবেশ করে এ মহামূল্যবান সম্পদ হাসিল করতে পারে। এর সাথে আরও রয়েছে প্রথম যুগের ইসলামী দলের লোকদের বাস্তব জীবনের কর্মধারা। আল্লাহ তায়ালা তাদের এই মহান নেয়ামতের কথা স্মরণ করাতে গিয়ে জানাচ্ছেন যে, তাঁর দেয়া এই নেয়ামতের পাশাপাশি মানুষের তৈরী যতো প্রকার মূল্যবোধ ও নেয়ামত লাভ করার জন্যে যতো ত্যাগই স্বীকার হোক এবং যতো দুঃখ-বেদনাই ভোগ করা হোক না কেন, সে নেয়ামতের মর্যাদার তুলনায় তা একেবারেই তুচ্ছ।

দ্বীনী দায়িত্ব অবহেলার পরিণতি

এরপর গোটা মানব জাতির উপকারার্থে আল্লাহ পাক আর একটি কথা স্মরণ করাচ্ছেন যে, তাঁর এই আমানত বহন করার জন্যে ইহুদী জাতিকে তিনি যে দীর্ঘ সময় দান করেছিলেন, তা সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেছে। আর কোনো দিন তাদের এই আমানত বহন করার দায়িত্ব দেয়া হবে না এবং এই দায়িত্বভার বহন করার জন্যে তাদের মধ্যে আর কখনও কোনো অন্তরও তৈরী হবে না, যেহেতু এই আমানত বহন করার জন্যে এমন যিন্দাদিল লোকের প্রয়োজন, যারা সঠিক বুঝ গ্রহণ করতে সক্ষম, অন্তরে আগত সঠিক বুঝ ধরে রাখতেও সক্ষম এবং সেই বুঝ অনুসারে কাজ করতেও প্রস্তুত। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যাদের তাওরাতের আমানতের বোঝা বহন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু এ দায়িত্ব লাভ করার পর তারা এর হক আদায় করলো না, তারা এমন একটি গাধার মতো, যা বড় বড় বইয়ের বোঝা বহন করে বটে, কিন্তু তারা নিজেরা তা কিছুই বুঝে না। এর থেকেও নিকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে সে ব্যক্তিদের, যারা আল্লাহর আয়াতগুলো অস্বীকার করেছে এবং নবীকে মিথ্যাবাদী বলে দোষারোপ করেছে! এমন যালেম জাতিকে আল্লাহ তায়ালা কখনও হেদায়াত করেন না।'

বনী ইসরাঈল জাতিকে তাওরাত কেতাব দেয়া হয়েছিলো এবং তাদের ঈমান আকীদা ও শরীয়তের বিধি বিধানের আমানত দান করা হয়েছিলো, 'কিন্তু এ দায়িত্বের হক তারা আদায় করলো না।' এ দায়িত্বের দাবী ছিলো, ওই কেতাবটিকে আল্লাহর কেতাব হিসাবে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করা, বিবেক বুদ্ধি খরচ করে বুঝতে চেষ্টা করা এবং অন্তরের গভীরে অনুধাবন করা, আর পরিশেষে বিবেকের কাছে গৃহীত ও বাস্তবতার নিরিখে যথার্থ বলে প্রমাণিত সত্যকে বাস্তব কর্মে রূপায়িত করা, কিন্তু আল কোরআনে বর্ণিত বনী ইসরাঈল জাতির ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এবং আজও বাস্তবে তাদের যে আচরণ দেখা যাচ্ছে, তাতে কিছুতেই বুঝা যায় না যে, তারা এই মহান আমানতের কিছুমাত্র মূল্যায়নও করেছে, বরং এটাই সত্য কথা যে, তারা এর সত্যতা অনুধাবন তো করেইনি আর না তারা এ কেতাব অনুসারে কোনো কাজ করেছে। এই কারণেই বলা হয়েছে যে, গাধার মতো তারা বড় বড় কেতাব বহন করেছে বটে, কিন্তু সেই ভারী বোঝা বহন করা ছাড়া এ কেতাব তাদের কোনোই উপকারে আসেনি। আসলে এ কেতাবের অধিকারী হওয়ার যোগ্যই তারা নয় এবং এর লক্ষ্যও তারা জানে না। তাদের এই চরম নিকৃষ্ট চরিত্র ও কদর্যতম ব্যবহার তুলে ধরে আল কোরআন তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে আহবান জানিয়েছে।

'চরম নিকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে সেই জাতির, যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে এবং সেগুলো মিথ্যা বলে অস্বীকারও করেছে। আর কখনই আল্লাহ তায়ালা এই সব যালেম জাতিকে হেদায়াত করেন না।'

যাদের তাওরাত কেতাব বহন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু এ মহান ও পবিত্র দায়িত্ব লাভ করেও যারা এর হক আদায় করেনি, তাদের মতোই আজকের পৃথিবীতে এক জাতির উদাহরণ পাওয়া যায়, যাদের ঈমান ও ইসলামের আমানত দেয়া হয়েছে, কিন্তু তারা তার হক আদায় করছে না। ইতিপূর্বে যুগ যুগ ধরে মুসলমানদেরও অনেক সম্প্রদায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে এবং আজও যারা বর্তমান রয়েছে, তারা মুসলমান নাম ধারণ করে রেখেছে বটে, কিন্তু বাস্তবে মুসলমানের মতো কোনো কাজই তারা করছে না, বিশেষ করে সেসব ব্যক্তি যারা আল কোরআন এবং অন্যান্য বহু ইসলামী বইপত্র পড়ছে, কিন্তু এগুলোর শিক্ষা অনুসারে তাদের মধ্যে কোনো জাগরণ আসছে না, এরা সবাই হচ্ছে সেই গাধার মতো, যা বড় বড় বইয়ের বোঝাই বহন করে চলে, কিন্তু সেই বইগুলোর কোনো মর্ম সে বুঝে না। এ ধরনের গাধাসম ব্যক্তি আজ সমাজে বহু বহু সংখ্যায় বিরাজ করছে। অবশ্য প্রশ্ন এটা নয় যে, তারা বইয়ের বোঝা বহন করছে বা

অধ্যয়ন করছে। প্রশ্ন তো হচ্ছে এই যে, তারা এসব কেতাবপত্র বুঝেছে কিনা বা এসব কেতাব অনুসারে আমল করছে কিনা।

ধর্মব্যবসায়ীদের সাথে মোবাহালার পদ্ধতি

আগেও ইহুদীরা মনে করতো এবং এখনও মনে করে, তারাই একমাত্র আল্লাহর প্রিয় জাতি এবং অন্যান্য সকল জাতি থেকে তারাই আল্লাহর বেশী মহব্বতধন্য, আর অন্যান্য মানুষ তারা তো সব অশিক্ষিত জাহেল, অথবা বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অতি সাধারণ কতিপয় মানুষ। এসব সাধারণ মানুষের সাথে তারা দ্বীনী হুকুম আহকামের ব্যাপারে কোনো মতৈক্যে পৌঁছতে বা আপসে আসতে চায় না। তাই 'তারা বলে, এই উম্মী লোকদের (মুক্তি ও উন্নতির) জন্যে আমাদের কাছে কোনো পথ খোলা নেই।' এতোটুকু বলেই তারা ক্ষান্ত নয়, বরং কোনো দলীল প্রমাণ ছাড়াই তারা আল্লাহর ওপর নির্জলা মিথ্যা আরোপ করতে দ্বিধাবোধ করে না। আর সেই জন্যেই তাদের মোবাহালা করতে আহবান জানানো হয়েছে। আহবান জানানো হয়েছে নাসারা ও মোশরেকদেরও এই মোবাহালা করতে।

'বলো, হে ওসব ব্যক্তিরা, যারা নিজেদের ইহুদী বলে মনে করো অথবা মনে করো নিজেদের হেদায়াতপ্রাপ্ত, তোমরা যদি মনে করো যে...... ব্যবহার সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন যা তোমরা পৃথিবীর বুকে করছিলে।'

মোবাহালা বলতে বুঝায় একই কথা বলার উদ্দেশ্যে দুটি বিবদমান দলের মুখোমুখি দাঁড়ানো এবং উভয় দলের পক্ষ থেকে একই সাথে আল্লাহর কাছে প্রকৃত মিথ্যাবাদীর ওপর গযব নাযিল করার জন্যে দোয়া করা। রসূলুল্লাহ (স.) যখনই এইভাবে কাউকে মোবাহালা করার জন্যে আহবান জানিয়েছেন, তখনই তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেছে এবং প্রতি বারই তারা এই কঠিন প্রতিযোগিতা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে এবং কিছুতেই এই প্রতিযোগিতায় নামতে রাযি হয়নি। কারণ তাদের অন্তরের মধ্যে তো অবশ্যই তারা রসূলুল্লাহ (স.)-কে সত্যবাদী বলে জানতো এবং প্রকৃতপক্ষেই তিনি যে আল্লাহর রসূল, তাদের মনের গভীরে অবশ্যই এ বিশ্বাস ছিলো এবং এই দ্বীনই যে সত্য জীবন ব্যবস্থা তাও তারা বুঝতো।

ইমাম আহমাদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস রেওয়ায়াত করতে গিয়ে বলেন, একদিন আবু জাহল বললো, ওর ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক, কাবা ঘরে ওকে যদি আমি দেখতে পাই, তাহলে অবশ্যই ওর গর্দানের ওপরে পা রেখে ওকে আমি দলিত মথিত করে ফেলবো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) একথা শুনে বললেন, ওরা যদি সত্য সত্যই মোবাহালা করতো তাহলে ফেরেশতারা তৎক্ষণাৎ তাদের পাকড়াও করে বসতো। আর যদি ইহুদীরা মৃত্যু কামনা করতো, তাহলে সাথে সাথেই মৃত্যু এসে যেতো এবং এর পর পরই তারা নিজেদের দোযখে দেখতে পেতো। যদি তারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে মোবাহালা করার জন্যে বের হয়ে আসতো, তাহলে তারা এমন অবস্থায় ফিরে যেতো যে, তারা তাদের মাল-সম্পদ ও পরিবারের কাউকে আর খুঁজে পেতো না।(১)

এই মোবাহালা করার উদ্দেশ্য ছিলো সে হঠকারী ব্যক্তিদের মুখ বন্ধ করে দেয়া, যারা মনে করতো যে, তারাই একমাত্র আল্লাহর বন্ধু ও প্রিয়পাত্র, অন্য কেউ এই মর্যাদার অধিকারী নয়। তারাই যদি একমাত্র প্রিয়পাত্র হবে, তাহলে তাদের মৃত্যুর এতো ভয় কেন? সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সব থেকে তারা এতো ভীরুই বা কেন? মৃত্যুর পর পরই তো তারা সেই মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাবে, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়পাত্র ও তাঁর আপন জনের জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন।

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজেদের কথাতে তাদের আটকিয়ে দেয়ার পর তাদের বুঝার সুযোগ করে দিচ্ছেন যে, যে জিনিসের দাবী তারা করছে তা সত্য নয়। আর এটাও তারা জানে যে, যে কথাগুলো তারা বলছে তাতে তারা নিজেরাও তৃপ্ত বা নিশ্চিন্ত নয়। এসব কথা দ্বারা কোনো সওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার আশাও তারা করে না। তারা এমন নাফরমানীর কথা বলছে, যা তাদেরকেই মৃত্যুর ভয় ও মৃত্যুর পরবর্তী কঠিন অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং এ আচরণ জীবনের বন্ধুর পথের ভয়াবহতা কম করার ব্যাপারে তাদের সামান্যতম সাহায্যও করতে পারবে না। 'তাদের সামনে তাদের যে কাজের ফিরিস্তি রয়েছে, তার কারণেই তো তারা কিছুতেই মৃত্যু কামনা করে না, করতে পারে না এবং আল্লাহ তায়ালা যালেমদের সম্পর্কে ভালো করেই জানেন।'

আলোচনার সমাপ্তি টানতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থার সঠিক চিত্র ও তাৎপর্য তুলে ধরতে গিয়ে বলছেন, যে মৃত্যু থেকে পালানের চেষ্টা তারা করছে, তাতে আসলে তাদের কোনো ফায়দা নেই; বরং এ ভয়ংকর অবস্থা আসবেই আসবে। এ অবস্থা থেকে তাদের বাঁচারও কোনো উপায় নেই। মৃত্যু এসে গেলে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়া ও তাঁর কাছে নিজেদের কাজে হিসাব নিকাশ দেয়া ছাড়া অন্য কোনো গত্যন্তরও তাদের নেই। এ হিসাবের দিন যে আসবেই আসবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একথা বুঝাতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'বলে দাও (হে রসূল)! যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছো, তা তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবেই, তারপর তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে অনুপস্থিত ও উপস্থিত জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহর দিকে এবং তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের অতীতের সকল কীর্তিকলাপ সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন, যা তোমরা জীবনভর করতে থেকেছো।

আল কোরআন যাদের সরাসরি সম্বোধন করছে এবং যাদের পরোক্ষভাবে বলেছে, তাদের প্রত্যেকের জন্যে এ মহাগ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভংগি তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে এ এক বিশেষ দৃষ্টিভংগি। আল কোরআন সকল কথার মধ্যেই চিরন্তন এ সত্য বার বার তুলে ধরেছে যে, আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত করতেই হবে, এ ছাড়া তাদের কোনো উপায় নেই এবং তাঁর আশ্রয় ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয়ও নেই। তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তাঁর কাছেই তাদের ফিরে যেতে হবে এবং তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে অতীতের যাবতীয় কাজের হিসাব পেশ করতে হবে। এ হিসাব দান করা থেকে পালানোর বা তার থেকে মুক্তি লাভ করারও কোনো উপায় নেই।

ইমাম তাবারী তাঁর রচিত অভিধান গ্রন্থে একটি বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন,

মৃত্যু থেকে পলায়নপর ব্যক্তি হচ্ছে এমন একটি শেয়ালের মতো, যাকে পৃথিবীর মাটি তার দেনা পরিশোধ করার জন্যে খুঁজে বেড়াতে থাকে, কিন্তু সে এ দাবী এড়ানোর জন্যে এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়ায়, শেষ পর্যন্ত কোনো জায়গায় আশ্রয় না পেয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে আবার সে নিজের গর্তের মধ্যেই ঢুকে পড়ে। তখন আবার তাকে মাটি বলে, কোথায় হে শেয়াল পন্ডিত, আমার পাওনাটা কই? এরপর ছুরি বের করা হয় তাকে কতল করার জন্যে। তখন সে আবার পালায়, আবারও ঘুরে-ফিরে এসে সেই গর্তের মধ্যে আশ্রয় নেয়, অবশেষে তার গর্দান কেটে দিলে সে মারা যায়।

মানুষকে তাদের পরিণতি সম্পর্কে গভীরভাবে সজাগ করার জন্যে এ উদাহরণ বড়ই হৃদয়গ্রাহী।

---

(১) বোখারী, তিরমিযী এবং নাসাঈও অনুরূপ হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١﴾

রুকু ২

৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, জুমুয়ার দিনে যখন তোমাদের নামাযের জন্যে ডাক দেয়া হবে তখন তোমরা (নামাযের মাধ্যমে) আল্লাহর স্মরণের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাও এবং (সে সময়ের জন্যে) কেনাবেচা ছেড়ে দাও, এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা তা উপলব্ধি করো! ১০. অতপর যখন (জুমুয়ার) নামায শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা (কাজেকর্মে) পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো, আর আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। ১১. (আল্লাহ তায়ালার এসব নির্দেশ সত্ত্বেও) এরা যখন কোনো ব্যবসায়িক কাজকর্ম কিংবা ক্রীড়াকৌতুক দেখতে পায়, তখন সেদিকে দ্রুত গতিতে দৌড়ায় এবং তোমাকে (নামাযে) একা দাঁড়ানো অবস্থায় ফেলে যায়; তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালার কাছে যা কিছু রয়েছে তা অবশ্যই খেলাধুলা ও বেচাকেনার চাইতে (বহুগুণে) উৎকৃষ্ট, (মূলত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন (তাঁর সৃষ্টির) সর্বোত্তম রেযেকদাতা।

তাফসীর

আয়াত ৯-১১

এখন আমরা উপনীত হতে চলেছি সূরাটির শেষ অধ্যায়ের আলোচনায়। এ অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে সে ঘটনাকে কেন্দ্র করে জুমার নামায সম্পর্কে কথা এসেছে, যার উল্লেখ বার বার করা হয়েছে। এখানে যে ভাষায় কথাটি ব্যক্ত হয়েছে তাতে বার বার বর্ণনার কথাই বুঝা যায়। এরশাদ হচ্ছে, 'হে ঈমানদারা, জুমার দিনে নামাযের জন্যে আহবান জানান হলে দ্রুতবেগে মসজিদের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনার সকল......

হে ::মূল, আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা এসব ঢোলডগর এবং তেজারতী মাল সামান থেকে উত্তম এবং আল্লাহ তায়ালাই উত্তম রেযেক দানকারী।'

জুমুয়ার আযান ও বৈষয়িক কাজের নিষেধাজ্ঞা

জুমার নামায হচ্ছে সমষ্টিগতভাবে আদায় করার নামায। সাপ্তাহিক এ নামাযে মহল্লার লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহর দরবারে হাযিরা দিয়ে নিজেদের একতা ও সংহতির প্রমাণ দেয়, এজন্যে একাকী অবস্থায় জুমার নামায শুদ্ধ হয় না। এ নামাযে তারা একত্রিত হয়ে একে অপরের সাথে

সাক্ষাতের সুযোগ পায়। সবাই মিলে ইমাম সাহেবের খোতবা মনোযোগ দিয়ে শোনে। আল্লাহকে স্মরণ করে দুনিয়ার জীবন সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্যে ও আখেরাতে হাসিমুখে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার লক্ষ্যে ইসলামী পদ্ধতিতে সুসংগঠিতভাবে আল্লাহর আনুগত্য করার এ এক অনুপম উপায়। এ হচ্ছে এমন একটি আনুষ্ঠানিক এবাদাত যা একাধারে মুসলমানদের একত্রিত করে এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন পেশ করে, আর বস্তুত (সংগঠন ও আনুগত্য) এ দুটি কাজই সমান ভাবে আল্লাহর কাছে এবাদাত হিসেবে কবুল হয়।(১) আর এই এবাদাত সূরা 'সফ'-এ উল্লেখিত ইসলামী জামায়াতের আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে যে মূল প্রকৃতি রয়েছে, তা বিশেষভাবে তুলে ধরেছে। আর জুমার নামাযের মর্যাদা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এবং এ নামাযের জন্যে উৎসাহ দিতে গিয়ে গোসল করে পাক-সাফ কাপড় পরে খোশবু মেখে এ নামাযের জন্যে প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশসূচক বহু হাদীস এসেছে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখিত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে জানা যায়, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যখন জুমার নামায পড়তে যাবে, তখন সে যেন গোসল করে নেয়।'

চার জন বিজ্ঞ সাহাবা (খোলাফায়ে রাশেদীন) আওস ইবনে আওস আস্ সাকাফী থেকে একটি হাদীস পেয়েছেন যাতে তিনি বলেছেন, 'আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জুমার দিনে গোসল করলো এবং সুন্দরভাবে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে সমস্ত শরীর ধুয়ে মুছে নিলো, তারপর মসজিদে যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়লো এবং সব থেকে আগে হেঁটে গেলো, কোনো যানবাহন ব্যবহার করলো না এবং ইমামের কাছাকাছি গিয়ে বসে খোতবা শুনতে থাকলো, আর কোনো প্রকার বেফায়দা কাজে লিপ্ত হলো না, তার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্যে এক বছরের রোযা ও নামাযের সওয়াব তাকে দেয়া হবে।'

ইমাম আহমাদ (র.) আবু আইয়ুব আনসারীর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি বলেন, আমি রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তির স্ত্রী আছে, জুমার দিনে গোসল করে তার কাছ থেকে আতর নিয়ে মেখে সে যদি সুন্দর কাপড় চোপড় পরে মসজিদে যায়, সময় পেলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু'রাকআত নামায পড়ে নেয় এবং কাউকে কষ্ট না দেয় বা কারও কোনো অসুবিধার সৃষ্টি না করে, এর পর ইমাম খোতবা দেয়ার জন্যে বেরিয়ে আসলে পরিপূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে খোতবা শুনে এবং জুমার নামায আদায় করে নেয়, তার এ কাজগুলো পরবর্তী জুমার দিন আসার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে যেসব গুনাহখাতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি (সগীরা গুনাহ) হবে, তার জন্যে কাফফারা হিসাবে কবুল হয়ে যাবে।

এ অধ্যায়ে প্রথম আয়াতটি দ্বারা আযান শোনার সাথে সাথে মুসলমানদের বেচাকেনা (ব্যবসা বাণিজ্য) বা অন্য যে কোনো পেশাগত কাজ পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

হে ঈমানদাররা, জুমার দিন যখন নামাযের জন্যে আহ্বান জানানো হয়, তখন দ্রুতগতিতে আল্লাহর 'স্মরণ'-এর দিকে এগিয়ে যাও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও।'

এ আয়াত দ্বারা জীবিকা অর্জনের যাবতীয় উপায় উপাদান যা কিছু আছে সেসব কিছুই পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে এবং এ সময়টিতে পুরোপুরিভাবে আল্লাহর স্মরণে নিজেদের মগ্ন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে,

---

(১) দেখুন, মোহাম্মদ কুতুব রচিত 'আন্নাফসু অল্ মুজতামাউ' পুস্তকের অধ্যায়, 'আল এবাদাতুল ইসলামিয়্যাহ'।

'এটাই তোমাদের জন্যে মংগলজনক, তোমরা বুঝবে যদি তোমাদের জ্ঞানকে কাজে লাগাও।'

এখানে এই নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ পেশাগত যেসব কাজে লিপ্ত থাকে, তার থেকে বের করে নিয়ে তাদের আল্লাহর স্মরণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে উৎসাহ দান করা ও তাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি মহববত পয়দা করা– এই কাজটি সকল মানুষের জন্যেই একটি স্থায়ী শিক্ষা।

সুতরাং মাঝে মাঝে মানুষের মনোযোগ আয় রোযগারের কাজ ও এ পৃথিবীর আকর্ষণীয় বস্তুসমূহের মহব্বত থেকে সরিয়ে নিছক আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে আসার জন্যে এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী রব্বুল আলামীনের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার জন্যে বড়ই চমৎকার এক ব্যবস্থা। এ মহব্বতের আমেজে এবং আল্লাহর সাথে নৈকট্য লাভের সুরভিতে মোমেনদের দিল ও মন মগয পুলকিত এবং খুশীতে বক্ষ প্রসারিত হয়ে যায়।

'তারপর নামায শেষ হয়ে গেলে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর রহমত তালাশ করো।'

হালাল রেযেক অনুসন্ধানও আল্লাহর এবাদাত

এরপর আয়াতটি আল্লাহর স্মরণের সাথে সাথে মানুষের জীবিকা অর্জনের উপায় উপকরণের দিকে ফিরে এসে আমাদের জানাচ্ছে,

'নামায সমাপ্ত হলে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহর রহমত তালাশ করো এবং বেশী বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করো, হয়ত এভাবেই তোমরা সাফল্যমন্ডিত হবে।'

এই হচ্ছে সেই মহা সমন্বয় সাধন বা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে গোটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। এ ভারসাম্য হচ্ছে জীবনের প্রয়োজনে, কাজ, পরিশ্রম, প্রচেষ্টা ও উপার্জন এবং মাঝে মাঝে এসব কিছু থেকে মানুষের আত্মা-মনকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আল্লাহর স্মরণ ও মহব্বতে নিমগ্ন করে দেয়া। অন্তর ও আত্মাকে জীবিত রাখার জন্যে এই পদ্ধতি অত্যন্ত জরুরী। এ পদ্ধতি ব্যতীত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁর দেয়া আমানতের বোঝা বহন করা সম্ভব নয়। রোযগারের জন্যে চেষ্টা করার কালে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ অতীব জরুরী। এই স্মরণের কারণেই যা কিছু কাজকর্ম করা হয় এবং আয় রোযগারের যে চেষ্টা চালানো হয়, তা সব কিছুই এবাদাতে পরিণত হয়ে যায়। এ স্মরণ সর্বক্ষণ তো থাকতেই হবে, তবু বিশেষভাবে কিছু সময় নিছক আল্লাহর জন্যে বের করে নেয়া এবং একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে নিজেকে নিবেদিত করে দেয়ার জন্যেই এ আয়াত দুটিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইরাক ইবনে মালেক (রা.) জুমার নামায শেষ করে যখন বের হতেন, তখন তিনি এসে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন,

'হে আল্লাহ, আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, আপনার নির্দেশমতো (ফরয) নামায আদায় করেছি এবং আপনার নির্দেশ মতোই আমি রুযীর তালাশে বেরিয়ে পড়েছি। অতএব, আপনার মেহেরবানী দ্বারাই আমার রুযির ব্যবস্থা করে দিন। অবশ্যই আপনি সর্বোত্তম রেযেকদানকারী' (ইবনে হাতেম হাদীসটি রেওয়ায়াত করেন)। রুযি রোযগারের তালাশে কিভাবে বেরুতে হবে, তা উক্ত হাদীস সে চিত্রটি আমাদের কাছে অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। আল্লাহর হুকুম কি ভাবে পালন করতে হবে, তা বুঝার জন্যে একথাগুলো শোনার পর আমাদের মধ্যে আর কোনো প্রকার অস্পষ্টতা থাকে না, থাকে না এ কথাগুলোর তাৎপর্য বুঝতে কোনো সংকট।

জাহেলিয়াতের যমানায় ধন দৌলতের তালাশে মানুষ যেসব প্রচেষ্টা চালাতো, তার মধ্যে থাকতো না কোনো নীতি নৈতিকতা, মানবতাবোধ বা কারও কাছে কোনো জওয়াবদিহিতার মন

মানসিকতা। সেই সমাজ থেকে বের করে নিয়ে আসা এই ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর কাছে জওয়াবদিহিতার মানসিকতা দান করে তাদের তিনি সোনার মানুষরূপে গড়ে তুলেছেন, যারা সামাজিক জীবনের মৌলিক উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে গোটা সমাজকে সুখ শান্তি, সমৃদ্ধি, পারস্পরিক বিশ্বাস ও মহব্বতের আমেজে ভরে দিলেন। জাহেলী সমাজের ছবি তুলে ধরে প্রকৃত সোনার মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার চেতনাকে পরবর্তী আয়াত জীবন্ত রূপ দিয়েছে, 'যখন তারা দেখতে পেলো বাণিজ্য কাফেলাটিকে দীর্ঘ সফর থেকে ফিরে আসছে, অথবা শুনতে পেলো মন মাতানো আগমনবার্তাসূচক সংগীতধ্বনি, তখন তারা লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেলো সেই দিকে, তারা তোমাকে একাকী দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ফেলে গেলো। বলে দাও (হে রসূল), যা কিছু আল্লাহর কাছে রয়েছে, তা এসব খেল তামাশার মন মাতানো জিনিস ও যা কিছু বাণিজ্য দ্রব্য সম্ভার, সেসব কিছু থেকে অনেক ভালো এবং (জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম রেযেকদানকারী।'

জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমরা নবী (স.)-এর সাথে নামায পড়ছিলাম, এমন সময় রসদ বোঝাই (কাফেলার) উটের বহরের আগমন ঘটলো, তখন সবার মনোযোগ সেই দিকে গিয়ে পড়লো এবং শেষ পর্যন্ত বার জন ব্যক্তি ব্যতীত নবী (স.)-এর সাথে আর কেউ অবশিষ্ট রইলো না, যাদের মধ্যে আবু বকর এবং ওমর (রা.)-ও ছিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এ আয়াতটিতে দুটি মন্তব্য পাওয়া যায়। এক, আল্লাহর কাছেই রয়েছে সকল রুযি রুটির ভান্ডারের চাবিকাঠি। দুই, আল্লাহর ভান্ডারের সে নেয়ামত, দুনিয়ার মন মাতানো খেল তামাশা, বাদ্য বাজনা ও ব্যবসা বাণিজ্যলব্ধ মাল সামান এসব কিছু থেকে অনেক ভালো। এখানে রয়েছে সেসব লোক, যারা অর্থ সম্পদের লোভে কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে যায়, তাদের জন্যে একটি উপদেশ যে, রেযেক সবই আসে আল্লাহর কাছ থেকে। 'আর আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম রেযেকদানকারী।'

যে ঘটনা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা করেছি, সে ঘটনাটি বিশেষভাবে এই জন্যেই ঘটানো হয়েছিলো যেন এর আলোকে মানুষকে পরিপূর্ণ মোমেন রূপে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দেয়া যায় এবং তাদের মধ্যে এমন চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি করা যায়, যার স্পর্শে এক অভূতপূর্ব ও অদ্বিতীয় সমাজ গড়ে ওঠে, যা মানবেতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। যা সর্বকালে আল্লাহর পথে দাওয়াতী কাজে দৃঢ়তা অবলম্বনকারীদের জন্যে শত প্রকার দুর্বলতা, ক্ষতি, লোকসান, মতবিরোধ, বিবাদ বিসম্বাদ ও ভীষণ ভাংগন বিপর্যয়ের মধ্যেও পর্বতসম দৃঢ়তা সরবরাহ করতে পারে । মানুষের মন এই ভালো ও মন্দ গ্রহণ করার আধার। ঈমানের এই সুবাসে সুরভিত এই মনই তাকে ঈমান আকীদার পরিপূর্ণতা লাভের স্তরে, সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে পৌছে দেয় এবং তাকে সীমাহীন পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করার মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। এই পবিত্র মনই তাকে সবর, সঠিক বুঝ শক্তি, তীব্র অনুভূতি, পর্বতসম দৃঢ়তা, মন্দ পরিহার করার মনোবল ও অধ্যবসায়, অপরাজেয় মনোভাব এবং সব কিছুতে মধ্যম পথ অবলম্বন করার মতো ভারসাম্যবোধ দান করে। আর আল্লাহ রব্বুল আলামীনই আমাদের একমাত্র সহায়।

সূরা আল মোনাফেকুন

আয়াত ১১ রুকু ২

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ﴿۱﴾ اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿۳﴾ وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۫ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿۴﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. যখন মোনাফেকরা তোমার কাছে আসে, (তখন) তারা বলে (হে মোহাম্মদ), আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। (হাঁ,) আল্লাহ তায়ালা জানেন তুমি নিসন্দেহে তাঁর রসূল; (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মোনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী, ২. এরা তাদের এ শপথকে (স্বার্থ উদ্ধারের একটা) ঢাল বানিয়ে রেখেছে এবং তারা (এভাবেই মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; কতো নিকৃষ্ট ধরনের কার্যকলাপ যা এরা করে যাচ্ছে! ৩. এটা এ কারণেই, এরা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করেছে, ফলে ওদের মনের ওপর সিল মেরে দেয়া হয়েছে, ওরা (আসলে) কিছুই বুঝতে পারছে না। ৪. তুমি যখন তাদের দিকে তাকাবে, তখন তাদের (বাইরের) দেহাবয়ব তোমাকে খুশী করে দেবে; আবার যখন তারা তোমার সাথে কথা বলবে তখন তুমি (আগ্রহভরে) তাদের কথা শোনবেও; কিন্তু (তারা ও তাদের সেই দেহের উদাহরণ হচ্ছে)— যেমন দেয়ালে ঠেকানো কতিপয় (নিষ্প্রাণ) কাঠের টুকরো; (শুধু তাই নয়, তারা এতো ভীত সন্ত্রস্ত থাকে যে,) প্রতিটি (বড়ো) আওয়াযকেই তারা মনে করে তাদের ওপর বুঝি এটা (বড়ো) বিপদ; এরাই হচ্ছে (তোমাদের আসল) দুশমন, এদের থেকে তোমরা হুশিয়ার থেকো; আল্লাহর মার তো তাদের জন্যেই, (বলতে পারো?) কোথায় কোথায় এরা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে? ৫. এদের যখন বলা হয়, তোমরা আসো (আল্লাহর রসূলের কাছে), তাহলে আল্লাহর রসূল

رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۞ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞

তোমাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন এরা (অবজ্ঞাভরে) মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি (এও) দেখতে পাবে, তারা অহংকারের সাথে তোমাকে এড়িয়ে চলে। ৬. (আসলে) তুমি এদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো কিংবা না করো, (এ দুটোই) তাদের জন্যে সমান; (কারণ) আল্লাহ তায়ালা কখনোই তাদের ক্ষমা করবেন না; আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো না-ফরমান জাতিকে হেদায়াত দান করেন না। ৭. এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা (আনসারদের) বলে, রসূলের (মোহাজের) সাথীদের জন্যে তোমরা (কোনো রকম) অর্থ ব্যয় করো না, (তাহলে আর্থিক সংকটের কারণে) এরা (রসূলের কাছ থেকে) সরে পড়বে; অথচ (এরা জানে না,) আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় ধনভান্ডার তো আল্লাহ তায়ালারই, কিন্তু মোনাফেকরা কিছুই বুঝতে পারে না। ৮. তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার সবল দলটি (মুসলমানদের) দুর্বল দলটিকে সে শহর থেকে অবশ্যই বের করে দেবে; (আসলে) যাবতীয় শক্তি সম্মান তো আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও তাঁর অনুসারী মোমেনদের জন্যে, কিন্তু মোনাফেকরা এ কথাটা জানে না!

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটির নাম আল মোনাফেকূন। এই নাম দ্বারাই এর আলোচ্য বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে মোনাফেকদের আলোচনা এবং তাদের স্বভাব চরিত্র ও চক্রান্তের বিবরণ শুধু যে এই সূরাতেই এসেছে তা নয়; বরং বলতে গেলে মদীনায় নাযিল হওয়া কোনো সূরাতেই মোনাফেকদের প্রসঙ্গ বাদ যায়নি। তা প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক। কিন্তু এই সূরা মোনাফেকদের এবং তাদের কথিত কিছু কথাবার্তা ও তাদের দ্বারা সংঘটিত কিছু ঘটনার আলোচনায় সীমাবদ্ধ।

তাছাড়া মোনাফেকদের চরিত্র, মিথ্যাচার, জালিয়াতি, ষড়যন্ত্র, তাদের অন্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সঞ্চিত আক্রোশ, চক্রান্ত, নীচাশয়তা, কাপুরুষতা এবং চোখ ও মনের অন্ধত্ব সম্পর্কেও এই সূরায় তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া এ সূরায় অন্য কোনো প্রসংগ আলোচিত হয়নি বললেই চলে। কেবল শেষের দিকে মোমেনদের অতি সংক্ষেপে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেন মোনাফেকদের সামান্যতম দোষেও

দুষ্ট না হয়। এই সাথে কয়েকটি জিনিসকে মোনাফেকদের ন্যূনতম চারিত্রিক দোষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহর জন্যে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদিত না হওয়া, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকার কারণে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য প্রদর্শন করতে থাকা, যতোক্ষণ না মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসে– যেদিন কোনো দানশীলতাই কাজে আসবে না।

মোনাফেকী নামক রোগটা মুসলমানদের মধ্যে ঢুকতে শুরু করে মদীনায় ইসলামের আগমনের সাথে সাথেই। রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের সময় পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে এবং বলতে গেলে কোনো সময়েই তা পুরোপুরি নির্মূল হয়নি। অবশ্য সময়ে সময়ে তার বৈশিষ্ট্য, নিদর্শনাবলী ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় ইসলামের যে ঐতিহাসিক যুগটা অতিবাহিত হয়েছে, তার বিভিন্ন ঘটনাবলীতে এই রোগটার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। মুসলমানদের চেষ্টা-সাধনা, সময় ও শক্তির এক বিরাট অংশ এই রোগের কবলে পড়ে নষ্ট হয়েছে। কোরআন ও হাদীসে এ রোগ সম্পর্কে এতোবার আলোচনা করা হয়েছে যে, তা দ্বারা বুঝা যায়, এ রোগটি কতো সাংঘাতিক এবং তৎকালীন ইসলামী আন্দোলনের ওপর এর প্রভাব কতো বেশী ছিলো।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইযযত দারুযা লিখিত 'সীরাতুর রসূল, সুয়ারুম মুকতাবাসাতুম মিনাল কোরআনিল কারীম' (কোরআনে রসূল জীবনের কয়েকটি চিত্র) নামক গ্রন্থে মোনাফেকী সম্পর্কে একটি চমৎকার অধ্যায় রয়েছে। নিম্নে সেই অধ্যায় থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি–

'মদীনায় এই ব্যাধিটি ছড়িয়ে পড়ার কারণ সুবিদিত। রসূল (স.) ও প্রথম যুগের মুসলমানরা মক্কায় থাকাকালে এমন শক্তি সামর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন না যে, তাদের ভয়ে বা তাদের কাছ থেকে সুবিধা লাভের আশায় কেউ প্রকাশ্যে তাদের চাটুকারিতায় লিপ্ত হবে ও তাদের সাথে মিতালী পাতাবে, আর গোপনে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাবে, ফন্দিফিকির আঁটবে ও ধোকাবাজি করবে, যেমনটি ছিলো মোনাফেকদের সাধারণ স্বভাব। মক্কাবাসীরা ও বিশেষত তাদের নেতারা রসূল (স.)-এর বিরোধিতা প্রকাশ্যেই করতো, মুসলমানদের মধ্যে যাকে যতোটা পারতো কঠোর নির্যাতন করতো এবং কোনো রকম রাখঢাক না করেই ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরোধ করতো। শক্তিসামর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তি যা কিছু ছিলো মক্কাবাসী কাফেরদেরই ছিলো। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা নিজেদের প্রাণ ও ঈমান বাঁচানোর জন্যে প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়। কেউবা কাফেরদের নৃশংসতা ও বল প্রয়োগের কারণে, কেউবা প্রলোভন ও সন্ত্রাসের দরুন ইসলাম পরিত্যাগে বাধ্য হয়েছে, কেউবা পদস্খলিত হয়েছে, কেউবা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ উচ্চারণ করতে ও মোশরেকদের সাথে কপটতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি কেউ কেউ ইসলামকে অবিচলভাবে আঁকড়ে ধরার ফলে নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেছে।

কিন্তু মদীনার পরিস্থিতি ছিলো একেবারেই ভিন্ন রকমের। রসূল (স.) মদীনায় হিজরত করার আগেই আওস এবং খাযরাজ গোত্রদ্বয় থেকে বেশ কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী ও জোরালো সমর্থক লোক পেতে সক্ষম হয়েছিলেন। মদীনায় নিজের অবস্থান সুসংহত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এবং প্রায় প্রতিটি পরিবারে ইসলাম প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি হিজরত করেননি। এরূপ পরিবেশে ইসলাম গ্রহণ করেনি এমন লোকদের পক্ষে এটা মোটেই সহজ ছিলো না যে, তারা রসূল (স.), মদীনার আদি অধিবাসী মুসলমান (আনসার) ও হিজরত করে আসা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিরোধিতা ও শত্রুতামূলক অবস্থান গ্রহণ করবে, চাই তাদের

ইসলাম গ্রহণ না করার কারণ অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাই হোক অথবা ইচ্ছাকৃত হঠকারিতা, গোয়ার্তুমি, প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষই হোক। সম্ভাব্য এই হঠকারিতা ও বিদ্বেষের কারণ এই যে, রসূল (স.)-এর আগমনে তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হওয়া যে অবধারিত তা তারা আঁচ করতে পেরেছিলো। প্রকাশ্য শত্রুতা করতে না পারার আরো একটা কারণ এই যে, ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে মদীনাবাসীর এক ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্কও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। কেননা, আওস ও খাযরাজের বেশীর ভাগ মানুষ মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো এবং তাঁকে সাহায্য করা ও সংরক্ষণ করার অংগীকারে আবদ্ধ ছিলো। শুধু তাই নয়, তাদের অধিকাংশ ইসলামের প্রতি এত আন্তরিক ও একনিষ্ঠ ছিলো যে, রসূল (স.)-কে তারা শুধু আল্লাহর রসূলই মনে করতো না, বরং নিজেদের সর্বোচ্চ নেতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শকও মনে করতো এবং তাঁর আনুগত্য অনুসরণ অপরিহার্য বলে বিবেচনা করতো। তাই যারা তখনো শেরকের প্রতি অধিকতর ঝোঁক ও অনুরাগ পোষণ করতো, অহংকার ও হিংসার ন্যায় মানসিক ব্যাধি তাদের মনের ওপর প্রবলতর প্রভাব বিস্তার করে রাখতো এবং এই ব্যাধি তাদের রসূল (স.), তাঁর আন্দোলন ও তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্ররোচিত করতো, তাদের পক্ষে তাদের উক্ত ঝোঁক ও বিরোধিতার মনোভাব খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা সম্ভব ছিলো না। ইসলামের প্রতি আনুগত্য লোক দেখানোভাবে হলেও জাহির না করে তাদের উপায় ছিলো না। ইসলামের মৌলিক এবাদাতসমূহ পালন এবং তাদেরই স্বগোত্রীয় মুসলমানদের প্রতি সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিলো না। আর তাদের ধোকা, শঠতা ও ষড়যন্ত্রগুলো চরম জালিয়াতির মাধ্যমে ভিন্ন মোড়কে পেশ করতে তারা বাধ্য ছিলো। কদাচিত তারা কোনো প্রকাশ্য মোনাফেকী ও ভন্ডামিপূর্ণ আচরণ এবং ধোকা ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করতো বটে, তবে সেটা করতো শুধুমাত্র কতিপয় সংকটজনক অবস্থাতেই– যা রসূল (স.) ও মুসলমানদের ওপর সময় সময় আপতিত হতো। আর এসব সংকটজনক পরিস্থিতিকে তারা তাদের আচরণের অজুহাত হিসাবে দাঁড় করাতো। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তারা তাদের কুফরী বা মোনাফেকীর কথা স্বীকার করতো না। তথাপি তাদের কুফরী, মোনাফেকী ও চক্রান্ত রসূল (স.) ও তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের কাছে গোপন থাকতো না। আর এই সংকটজনক অবস্থা তাদের প্রকাশ্য ইসলাম বিরোধী ভূমিকা ও আচরণ, তাদের কুফরী ও মোনাফেকী আরো অপমানজনক এবং নিন্দনীয়ভাবে প্রকাশ করে দিতো। কোরআনের আয়াতও তাদের নিন্দা ভর্ৎসনা সহকারে বারংবার নাযিল হতো এবং রসূল (স.) ও মুসলমানদের তাদের সম্পর্কে সাবধান করে দিতো।

মোনাফেকদের আচরণ ও চক্রান্তের প্রভাব যে খুবই সুদূরপ্রসারী ছিলো, সে কথা কোরআনের মদীনায় নাযিল হওয়া অংশ থেকে বুঝা যায়। এ অংশটি এমন একটি দুরন্ত সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরে, যা রসূল (স.) ও মক্কার নেতাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সংঘাত স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য মক্কার দুই পক্ষের ভূমিকা ও তার ফলাফল মদীনায় দুই পক্ষের ভূমিকা ও ফলাফল থেকে ভিন্নতর ছিলো। কেননা, মদীনায় রসূল (স.)-এর কেন্দ্র ক্রমেই শক্তিশালী, তাঁর ক্ষমতা ক্রমেই সংহত এবং ইসলাম ক্রমেই প্রসার ও বিস্তার লাভ করতে থাকে। এখানে তিনি ছিলেন ক্ষমতাসীন ও পরাক্রান্ত শাসক, আর মোনাফেকদের না ছিলো কোনো সুসংগঠিত দল, না ছিলো কোনো খ্যাতিমান বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। উপরন্তু রসূল (স.)-এর পর্যায়ক্রমিক শক্তি বৃদ্ধি, ইসলামের বিকাশ ও বিস্তার এবং তার শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির প্রসারের সাথে সাথে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো তাদের দুর্বলতা, কমে যাচ্ছিলো তাদের জনশক্তি ও প্রভাব প্রতিপতি।

মোনাফেকদের ভূমিকা, বিশেষত সেই প্রাথমিক যুগের পটভূমিতে কতো মারাত্মক ও ক্ষতিকর ছিলো, তা বুঝার জন্যে এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, (১) মোনফেকদের যা কিছু শক্তি ও প্রতিপত্তি ছিলো, তার প্রধান উৎস ছিলো তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক তাদের গোত্রসমূহের জনগণের মনে তখনো অত্যন্ত শক্তভাবে বিরাজ করছিলো। (২) তারা তখনো বিশ্বাসঘাতক হিসাবে পুরোপুরিভাবে চিহ্নিত ও কলংকিত হয়নি। (৩) মদীনার গোত্রসমূহের সাধারণ জনতার মনে ইসলাম তখনো যথেষ্ট শক্তি নিয়ে বদ্ধমূল হয়নি। (৪) রসূল (স.) চারদিক থেকে ইসলামের ঘোরতর শত্রু মোশরেকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। (৫) বিশেষত মক্কাবাসী তখনো তাঁর কট্টরতম শত্রু ছিলো। আরব দেশের কেন্দ্রভূমিতে তাদের অবস্থান ছিলো। প্রতি মুহূর্তে তারা তাঁর ক্ষতি সাধনে এবং সাধ্যে কুলালে তাঁকে সমূলে ধ্বংস করার সুযোগ সন্ধানে তৎপর ছিলো। (৬) মদীনায় ও তার আশেপাশে ইহুদীরা শুরু থেকেই তাঁকে অস্বীকার এবং নিজেদের জন্যে অশুভ এবং অকল্যাণকর মনে করে আসছিলো। এক পর্যায়ে তারা প্রকাশ্যভাবেই তাঁর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে আরম্ভ করে। (৭) এই পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে ও মোনাফেকদের মধ্যে ইসলামের বিরোধিতা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানোর ব্যাপারে একাত্মতা, চেষ্টার ঐক্য এবং স্বাভাবিক মৈত্রী গড়ে ওঠে। এক কথায় বলা চলে, ইহুদীদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা, সমর্থন ও শক্তি অর্জন করা ছাড়া মোনাফেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এতোটা শক্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারতো না, এতোটা মারাত্মক নির্যাতনকারী বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারকের ভূমিকা পালন করতে পারতো না, যতোটা কার্যত করতে পেরেছিলো। আর রসূল (স.)-কে আল্লাহ তায়ালা পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও প্রতাপ দান করে তাদের ওপর বিজয়ী করা এবং তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার পূর্ব পর্যন্ত তাদের শক্তি কিছুমাত্র স্তিমিত হয়নি, তাদের দিক থেকে ভয়ভীতি মোটেই হ্রাস পায়নি।' (মুহাম্মাদ ইযযত দারুযার উক্ত গ্রন্থের ১৭৬ থেকে ২১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

তাফসীর

আয়াত ১-৮

সূরার শুরুতেই বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে মোনাফেকরা তাদের অন্তরে কুফরী পুষে রাখতো, মুখে ইসলামের ঘোষণা দিতো এবং রসূল (স.)-কে আল্লাহর রসূল বলে মিথ্যামিথ্যি কসম খেয়ে স্বীকৃতি দিতো, যাতে মুসলমানরা তাদের বিশ্বাস করে। এভাবে তারা তাদের এই কসম খাওয়াকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতো এবং এর আড়ালে তাদের প্রকৃত অবস্থা লুকিয়ে মুসলমানদের ধোকা দিতো।

মোনাফেকী চরিত্রের বিশ্লেষণ

'যখন মোনাফেকরা তোমার কাছে আসে তখন বলে, আমরা আপনাকে আল্লাহর রসূল বলে সাক্ষ্য দিচ্ছি। অথচ আপনি যে আল্লাহর রসূল সে কথা তো আল্লাহ জানেনই। আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মোনাফেকরা মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথকে ঢাল হিসাবে গ্রহণ করছে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তারা যে কাজ করে থাকে, তা কতো জঘন্য।'

তারা রসূল (স.)-এর কাছে আসতো এবং তাঁর সামনে তাঁর রেসালাতের পক্ষে মৌখিক সাক্ষ্য দিতো। এ দ্বারা সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রকাশ করা তাদের কাম্য ছিলো না। কেবল চলমান সমাজের ঘৃণা ও গণরোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা এরূপ করতো। মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের প্রকৃত মনোভাব গোপন করাই ছিলো তাদের আসল উদ্দেশ্য। তারা রসূল (স.)-এর রেসালাতের সাক্ষ্য দিতে এসেছে বলে যে উক্তি করতো, তা ছিলো তাদের

নির্জলা মিথ্যাচার। আসলে তারা এসেছিলো মুসলমানদের ধোকা দিতে এবং নিজেদের মনকে সান্ত্বনা দিতে। এজন্যে আল্লাহর রসূলের রেসালাত যে অকাট্য ও চরম সত্য, তা প্রথমে ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাক্ষ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মোনাফেকরা মিথ্যাবাদী।' এখানে এমন সূক্ষ্ম ও সতর্ক ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যা মোনাফেকদের বক্তব্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করার আগে রেসালাতকে সত্য প্রমাণ করা হয়েছে। অন্যথায় বাহ্যত প্রতীয়মান হতো যে, মোনাফেকরা যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে সেটাই মিথ্যা। অথচ সেটা বলা উদ্দেশ্য নয়। যা বলতে চাওয়া হয়েছে তা এই যে, রেসালাতের প্রতি ঈমান আনা সংক্রান্ত তাদের ঘোষণাটা মিথ্যা। তারা আন্তরিকভাবে এ ঘোষণা দেয় না এবং প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদ (স.)-কে রসূল বলে মানে না।

'তারা তাদের শপথকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে।' এ বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, যখনই তাদের প্রকৃত মনোভাব ফাঁস হয়ে যেতো, তাদের কোনো চক্রান্ত বা দুরভিসন্ধি জানাজানি হয়ে যেতো এবং মুসলমানদের মধ্যে তাদের সম্পর্কে কোনো খারাপ খবর প্রচারিত হতো, তখনই তারা কসম খেয়ে খেয়ে তা অস্বীকার করতো, যাতে সেসব গোপন তথ্য ফাঁস হওয়ার কুফল থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। এভাবে তারা তাদের শপথ বা কসমকে ঢাল বানিয়ে তার আড়ালে লুকাতো, যাতে মুসলমান সমাজের সাথে প্রতারণা অব্যাহত রাখা যায়। 'অতপর তারা আল্লাহর পথ থেকে ফেরাতো।' অর্থাৎ এই মিথ্যা শপথের সাহায্যে নিজেদেরও ফেরাতো, অন্যদেরও ফেরাতো। 'নিশ্চয় তারা খুবই জঘন্য কাজ করতো।' বস্তুত মিথ্যাচার, ধোকাবাজি ও জালিয়াতির মতো জঘন্য কাজ আর কী হতে পারে?

পরবর্তী আয়াতে মোনাফেকদের এই অবস্থার অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মিথ্যা ও শঠতাপূর্ণ কসম খাওয়া, আল্লাহর পথ থেকে ফেরানো ও জঘন্য কার্যকলাপের কারণ দর্শানো হয়েছে। সে কারণ এই যে, তারা ঈমান আনার পর এবং ইসলামকে জানা ও বুঝার পর কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে।

'এর কারণ এই যে, তারা প্রথমে ঈমান এনেছিলো, তারপর কাফের হয়েছে। ফলে তাদের হৃদয়ে সিল মেরে দেয়া হয়েছে। তাই এখন তারা আর বুঝতে পারে না।' (আয়াত-৩)

অর্থাৎ তারা ঈমান কী জিনিস তা জানতো, কিন্তু তা সত্তেও তারা ঈমান ছেড়ে কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। ঈমান কী জিনিস তা জানা এবং জানার পর কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন এমন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব, যার হৃদয়ে কিছুমাত্র উপলব্ধি, অনুভূতি অথবা জীবনীশক্তি আছে। জগত ও জীবন সম্পর্কে যার ইসলামী ধারণা বিশ্বাস, ইসলামী চেতনা-অনুভূতি আছে, যে ইসলামের আলোকোজ্জ্বল ও শীতল পরিবেশে জীবন ধারণ করেছে, সে কিভাবে কুফরীর কালো ও অশুভ পরিবেশে ফিরে যেতে পারে? এটা একমাত্র সে ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যার জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনা বিকৃত হয়ে গেছে, ফলে সে সত্য উপলব্ধি করতে পারে না এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে তা দেখতে পায় না। আয়াতে 'সিল মারা' বলতে চেতনা, রুচি ও বোধশক্তির এই বিকৃতিকেই বুঝানো হয়েছে, যার দরুন সত্যকে আর চেনা ও বুঝা সম্ভব হয় না।

৪ নং আয়াতে এই বিকৃত রুচি ও চেতনাসম্পন্ন মানুষের এক বিস্ময়কর এবং হাস্যকর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

'তুমি যখন তাদের দেখবে, তখন তাদের দেহ দেখে তুমি বিস্মিত হবে....' অর্থাৎ তাদের দেখে মনে হবে, তাদের যেন নিশ্চল নিথর দেহখানাই একমাত্র সম্বল, প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে

এমন কোনো সচেতন মানবীয় সত্ত্বা যেন তাদের নেই। যতোক্ষণ তারা চুপ থাকে ততোক্ষণ দর্শকদের চোখে তাদের নাদুস নুদুস দেহ বেশ চিত্তাকর্ষক লাগে। কিন্তু যখনই তারা কথা বলে অমনি মনে হয়, তারা একেবারেই তাৎপর্যহীন, চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন। তাদের কথা শুনে তোমার মনে হবে যেন তারা নিশ্চল, নিথর ও দেয়ালে হেলিয়ে রাখা কাঠ মাত্র।

এই নিথর নিস্তব্ধ জড়তা একদিকে তাদের আত্মোপলব্ধির ইংগিতবহ— যদি আগে তাদের কোনো আত্মা থেকে থাকে! অপরদিকে এক ধরনের সার্বক্ষণিক সতর্কতা এবং আতংকেরও ইংগিতবহ, যা আয়াতের নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে,

'তারা প্রতিটি ধ্বনিকে নিজেদের জন্যে বিপজ্জনক মনে করে।' অর্থাৎ যেহেতু নিজেদের সম্পর্কে তাদের এতোটুকু জানা আছে যে, তারা বর্ণচোরা মোনাফেক এবং মিথ্যে শপথ ও লোক দেখানোর পাতলা আবরণের আড়ালে আত্মগোপনকারী। তাই প্রতি মুহূর্তে তারা শংকিত থাকে যে, এই বুঝি তাদের সমস্ত গুপ্তভেদ ফাঁস হয়ে গেলো, এই বুঝি তাদের ভন্ডামির রহস্য উদঘাটিত হয়ে গেলো! আয়াতের উল্লিখিত বাক্যটির বর্ণনাভংগি থেকে মোনাফেকদের এরূপ একটি চিত্র ফুটে ওঠেছে যে, তারা যেন ভীত সন্ত্রস্ত মনে অনবরত চারপাশে তাকাতে থাকে এবং প্রতিটি শব্দ থেকেই তাদের মনে হতে থাকে, তাদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে কেউ বুঝি তাদের পাকড়াও করার জন্যে খোঁজাখুঁজি করছে।

নিজেদের পাপ ও অপরাধপ্রবণ মানসিকতার উপলব্ধি থেকে যখন তারা কাষ্ঠের মতো জড়তা ও স্থবিরতায় ভোগে, আর নিজেদের জান ও মালের ভয়ে যখন তারা বায়ুপ্রবাহে দোদুল্যমান বাঁশের মতো দুলতে থাকে, উভয় অবস্থাতেই তারা রসূল (স.) ও মুসলমানদের এক নম্বর দুশমন হিসাবে বিরাজ করে। এ কথাই বলা হয়েছে পরবর্তী বাক্যটিতে— 'তারা দুশমন, সুতরাং তাদের থেকে সাবধান হও।'

অর্থাৎ তারা আসল শত্রু। তারা গৃহশত্রু বিভীষণ। প্রকাশ্যভাবে বিরাজমান বহিশত্রুর চেয়েও তারা মারাত্মক।

লক্ষণীয় যে, এখানে তাদের থেকে 'সাবধান থাকতে' বলা হয়েছে। রসূল (স.)-কে বলা হয়নি যে তাদের হত্যা করো। বরঞ্চ একটি ভিন্নতর পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের সাথে আচরণ করা হয়েছে, যা উদারতা, বিচক্ষণতা ও তাদের চক্রান্ত থেকে মুক্তির পথনির্দেশক (শীঘ্রই এ ধরনের আচরণের একটি নমুনা তুলে ধরা হবে)।

'আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন তারা যেখানেই থাক না কেন।'

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন, তারা যেখানে যে অবস্থায়ই অবস্থান করুক না কেন। আল্লাহর পক্ষ থেকেই 'যুদ্ধ করুন' বলে যখন দোয়া করা হয়েছে, তখন বুঝতে হবে, যুদ্ধ পরিচালনার ফয়সালা হয়ে গেছে এবং সে ফয়সালা আর কেউ রুখতে বা বদলাতে পারবে না। কার্যত এটাই হয়েছিলো তাদের চূড়ান্ত পরিণতি।

মোনাফেক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই

পরবর্তী চারটি আয়াতে মোনাফেকদের এই দ্বিমুখী মানসিকতা, রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটা এবং সামনাসামনি মিথ্যা বলার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এগুলো মোনাফেকদের সুপ্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য। 'যখন তাদের বলা হয়, এসো, রসূল তোমাদের জন্যে ক্ষমা চাইবেন' .... একাধিক প্রাচীন তাফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতগুলো সবই নাযিল হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল প্রসংগে। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক বনুল মুসতালেক যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে নাযিল হওয়ার সেই পটভূমি বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

'৬ষ্ঠ হিজরীতে বনুল মুসতালেকের একটি জলাশয়ের কাছে এই ঘটনা ঘটে। যুদ্ধ শেষে রসূল (স.) যখন উক্ত জলাশয়ের পাশে অবস্থান করছেন, তখন মুসলমানদের একটি দল সে জলাশয়ে পানি আনতে গেলো। হযরত ওমরের সংগে ছিলো তাঁর একজন বেতনভুক ভৃত্য– বনু গেফার গোত্রের জাহজাহ ইবনে মাসউদ। সে তার ঘোড়া নিয়ে জলাশয়ে গেলো। সেখানে সিনান ইবনে ওয়াবার জুহানীর সাথে তার কথা কাটাকাটি হয়। অতপর তারা উভয়ে লড়াই বাধিয়ে বসে। সেনান ছিলো আনসারী অর্থাৎ মদীনার স্থানীয় অধিবাসী, আর জাহজাহ মক্কা থেকে আগত মোহাজের। প্রথমে সেনান চিৎকার করে ওঠলো, 'ওহে আনসারীরা, কে কোথায় আছো, আমাকে বাঁচাও।' অতপর জাহজাহ চিৎকার করলো, 'ওহে মোহাজেররা, কে কোথায় আছো, আমাকে রক্ষা করো।' মোনাফেকদের নেতা হিসাবে পরিচিত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল এতে মদীনার স্থানীয়দের পক্ষ নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠলো। তার সাথে তার স্বগোত্রীয় কয়েকজন ছিলো। তাদের মধ্যে যায়দ ইবনে আরকাম নামক একজন নবীন যুবক ছিলো। তাদের লক্ষ্য করে আবদুল্লাহ বললো, 'ওরা (মোহাজেররা) এ কান্ডটা ঘটিয়েই ছাড়লো? ওরা আমাদের দেশে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। এখন তো সংখ্যায়ও ওরা বিরাট এক গোষ্ঠী। আল্লাহর কসম, এই প্রবাসী কোরায়শদের ও আমাদের অবস্থা সেই প্রবাদ বাক্যের মতোই হতে যাচ্ছে, তা আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। প্রবাদে আছে, 'তোমার কুকুরটাকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটাতাজা বানাও, যেন সে একদিন তোমাকেই খেয়ে সাবাড় করে।' আল্লাহর কসম করে বলছি, এবার মদীনায় ফিরে গেলে সবলেরা দুর্বলদের সেখান থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে। তারপর সে তার আশপাশে জড়ো হওয়া স্বগোত্রীয়দের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এ সব তোমাদেরই কর্মফল। তোমরা ওদের তোমাদের এলাকায় থাকতে দিয়েছো। তাদের তোমাদের জমিজমা, সহায় সম্পদ ভাগ করে দিয়েছো। আল্লাহর কসম, তোমরা যদি তাদের সহায়তা না করতে এবং আশ্রয় না দিতে, তাহলে তারা অন্যত্র চলে যেতো।' যায়দ ইবনে আরকাম তার এ কথাগুলো শুনে রসূল (স.)-কে গিয়ে জানালো। তখন রসূল (স.) শত্রুদের সাথে বোঝাপড়া শেষ করে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁর কাছে ওমর ইবনুল খাত্তাবও ছিলেন। ওমর (রা.) বললেন, 'হে রসূল, উব্বাদ বিন বেশরকে আদেশ দিন ওকে (আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে) হত্যা করে ফেলুক। রসূল (স.) বললেন, 'ওহে ওমর! লোকেরা যখন বলবে মোহাম্মদ নিজের সহচরদের হত্যা করে, তখন কেমন হবে?' ওটা করা যাবে না। তুমি বরং লোকদের জানিয়ে দাও, অবিলম্বে এখান থেকে প্রস্থান করা হোক। অথচ রসূল (স.) সচরাচর এ রকম সময়ে কোথাও রওনা হতেন না। অগত্যা লোকেরা রওনা হলো। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন জানতে পারলো, যায়দ বিন আরকাম তার কথাগুলো রসূল (স.)-কে জানিয়ে দিয়েছে। তখন সে রসূল (স.)-এর কাছে ছুটে গেলো এবং কসম খেয়ে বলতে লাগলো, 'যায়দ যা বলেছে তা ঠিক নয়। আমি ওসব কথা বলিনি।' আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিজ গোত্রে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলো। উপস্থিত আনসারী সাহাবীরা বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ! যায়দ হয়তো বা ভুল শুনেছে। হয়তো বা এই ব্যক্তি যা বলেছে তা হুবহু মনে রাখতে পারেনি।' এভাবে তারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন ও তাকে রক্ষা করলেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, অতপর যখন রসূল (স.) রওনা হলেন, তখন ওসায়দ বিন হুযায়র নামক জনৈক আনসারী সাহাবী তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বললেন, 'হে রসূল! আপনি খুবই অসময়ে রওনা দিয়েছেন। ইতিপূর্বে আপনি কখনো এমন সময়ে কোথাও যাত্রা করতেন না।' রসূল (স.) বললেন, তোমাদের সংগী কী বলেছে শোননি ?

ওসায়দ, কোন্ সংগী হে রসূল!

রসূল (স.), আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।

ওসায়দ, সে কী বলেছে?

রসূল (স.), সে বলেছে, মদীনায় গেলে সবলেরা দুর্বলদের সেখান থেকে বের করে দেবে।

ওসায়দ, হে রসূল, আল্লাহর কসম, আপনি ইচ্ছা করলে এ ব্যাটাকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। কেননা, আপনি সবল আর সে দুর্বল। তবে হে রসূল, আপনি ওর প্রতি একটু উদারতা প্রদর্শন করুন। আল্লাহর কসম, তিনি আমাদের কাছে আপনাকে এমন সময়ে এনে দিয়েছেন, যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর গোত্র তাকে মুকুট পরিয়ে রাজা হিসাবে বরণ করে নেয়ার জন্যে উৎসবের আয়োজন করছিলো। এ জন্যে সে মনে করে আপনি তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন।

এরপর রসূল (স.) সদলবলে সন্ধ্যা পর্যন্ত আবার সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত এবং সকাল থেকে সূর্যের কিরণ প্রখর হওয়া পর্যন্ত এক টানা পথ চললেন। অতপর এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করলেন। প্রচন্ড ক্লান্তির কারণে তারা সেখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। রসূল (স.)-এর এই অসময়ের যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, তাঁর সফর সংগীদের মনে আগের দিন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কথা শুনে যে ক্ষোভ ও ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিলো, তা যেন তারা ভুলে যায় এবং তাদের মন অন্য বিষয়ে ব্যস্ত হয়।

ইবনে ইসহাক বলেন, যে সূরাটিতে আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সমতুল্য লোকদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। সূরাটি নাযিল হবার পর রসূল (স.) যায়দ ইবনে আরকামের কান ধরে (আদর করে) বললেন, 'এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে নিজের কান দিয়ে আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে।' ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ বিন উবাইর ছেলে আবদুল্লাহর কাছেও তার পিতার দুষ্কর্মের খবর পৌঁছে গেলো।

ইবনে ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর ছেলে আবদুল্লাহ রসূল (স.)-এর কাছে এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি শুনেছি, আপনি আমার পিতা আবদুল্লাহ সম্পর্কে যা জানতে পেরেছেন তার জন্যে তাকে হত্যা করতে চান। এটা যদি আপনি করতে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকেই আদেশ করুন। আমি তার মাথা আপনার কাছে নিয়ে আসি। আল্লাহর কসম, খাযরাজ গোত্র জানে, এ গোত্রে আমার চেয়ে অধিক পিতৃভক্ত কোনো লোক নেই। তথাপি আপনি আদেশ দিলে এ কাজ আমাকেই করতে হবে। কেননা, আমার আশংকা, আপনি যদি আমাকে ছাড়া আর কাউকে আদেশ দিয়ে এ কাজ করান, তাহলে আমি আমার পিতার হত্যাকারীকে চোখের সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে একদিন হয়তো হত্যা করে বসবো এবং একজন কাফেরের বদলায় মোমেনকে হত্যা করে জাহান্নামের কাঠ হবো।

রসূল (স.) বললেন, 'না, ওসবের দরকার নেই। আমরা বরঞ্চ তার প্রতি উদারতা দেখাতে থাকবো এবং যতোদিন সে আমাদের সাথে থাকে ততোদিন তার সাথে ভালো আচরণ করে যেতে থাকবো।' এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখনই কোনো অপকীর্তি ঘটাতো, অমনি তার গোত্রের লোকেরাই তাকে পাকড়াও করতো ও তিরস্কার করতো। তখন রসূল (স.) ওমর ইবনুল খাত্তাবকে ডেকে বলতেন, 'কেমন দেখছো ওমর ! আল্লাহর কসম, যেদিন তুমি ওকে হত্যা করতে চেয়েছিলে, সেদিন যদি হত্যা করতে, তবে ওর জন্যে পাহাড়ের চূড়াগুলো পর্যন্ত শিউরে ওঠতো, কিন্তু আজ আমি যদি সেসব পাহাড়ের চূড়াকে আদেশ দেই, তবে তারাই ওকে হত্যা করবে।'

এরপর যখন রসূল (স.)-এর সহযাত্রী মোজাহেদরা মদীনায় প্রবেশ করতে লাগলো, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর ছেলে আবদুল্লাহ মদীনার দ্বারপ্রান্তে নগ্ন তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকজন তার সামনে দিয়ে যেতে লাগলো। যখন তার পিতা আসলো, অমনি পুত্র বলে ওঠলো, থামুন! সে বললো, কী হয়েছে! পুত্র বললো, যতোক্ষণ রসূলুল্লাহ (স.) আপনাকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি না দেবেন, ততোক্ষণ আপনি প্রবেশ করতে পারবেন না। কেননা, তিনি সবল, আপনি দুর্বল। এই সময়ে রসূল (স.) পশ্চাদবর্তী বাহিনীর সাথে ছিলেন এবং কেউ পেছনে পড়ে রইলো কিনা, নিখোঁজ হলো কিনা, বা কারো কোনো সাহায্যের দরকার আছে কিনা, তার খোঁজখবর নিতে নিতে এখানে এসে পড়লেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁর কাছে স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তার পুত্র আবদুল্লাহ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তিনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেন না। রসূল (স.) তাকে অনুমতি দিলেন। তখন আবদুল্লাহ বললেন, 'ঠিক আছে। রসূল (স.) যখন আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন, তখন যেতে পারেন।'(১)

এখানে আমরা একবার সে সময়কার ঘটনাবলীর দিকে, একবার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দিকে এবং একবার কোরআনের বক্তব্যের দিকে। দৃষ্টি দিলে আমরা রসূল (স.)-এর জীবনাদর্শ, আল্লাহর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহর বিস্ময়কর পরিকল্পনার সাক্ষাত পাই।

অপরদিকে দেখতে পাই, মুসলিম সমাজে কিভাবে মোনাফেকরা অনুপ্রবেশ করে, কিভাবে তারা স্বয়ং রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় মুসলিম সমাজে প্রায় দশ বছর যাবত অবস্থান করে, অথচ তিনিও তাদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করেন না, আল্লাহও তাদের মৃত্যুর সামান্য আগে ছাড়া তাদের নাম পরিচয় প্রকাশ করেন না। যদিও রসূল (স.) তাদের কথার সুর শুনে, চালচলন, হাবভাব, গতিবিধি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি দেখেই তাদের চিনতেন। এর কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালা চান না মানুষেরা নিজেরাই একে অপরের মনের ওপর খবরদারী করুক। কেননা, মানুষের মনের উপর আল্লাহর একচ্ছত্র ও নিরংকুশ আধিপত্য অধিকার বিদ্যমান। তিনিই জানেন কার মনে কী আছে এবং তিনিই তার হিসাব নিকাশ নেবেন। মানুষের কর্তব্য হলো, অন্য মানুষের কেবল বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনায় আনা, আভ্যন্তরীণ অবস্থা নয়। মানুষ অন্য মানুষের ওপর নিজের ধারণা অনুযায়ী কোনো অভিযোগ আরোপ বা বিচার ফয়সালা করার অধিকারী নয়। এমনকি আমরা এও দেখতে পাই, আল্লাহ তায়ালা যখন রসূল (স.)-কে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মোনাফেকসুলভ আচরণকারী লোকগুলোর পরিচয় জানিয়ে দিয়েছেন, তখনও তিনি তাদের বাহ্যিক ইসলামী চালচলন ও ইসলামের ফরযসমূহ পালনরত থাকা অবধি তাদের মুসলিম সমাজ থেকে বহিষ্কার করেননি। এই সকল মোনাফেককে শুধু রসূল (স.) চিনতেন এবং তিনি মাত্র একজন সাহাবীকে তাদের পরিচয় জানিয়েছেন। এই সাহাবী ছিলেন হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)। সাধারণ মুসলমানদের কাছে এটা প্রকাশ করেননি। এমনকি হযরত ওমর (রা.) পর্যন্ত হোযায়ফার কাছে এসে নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন, রসূল (স.) তাঁকে মোনাফেক হিসাবে চিহ্নিত করেননি তো! হোযায়ফা শুধু বলতেন, 'হে ওমর! আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।' এর বেশী একটি কথাও বলতেন না। রসূল (স.)-কে কোনো মোনাফেকের জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছিলো। যখন রসূল (স.) কারো জানাযার নামায পড়া থেকে বিরত থাকতেন, কেবল তখনই

(১) উল্লেখ্য যে, এই যুদ্ধ থেকে ফেরার পরই হযরত আয়শার বিরুদ্ধে অপবাদ রচনার সেই কুখ্যাত ঘটনাটা ঘটে এবং তার প্রধান হোতা ছিলো এই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। -গ্রন্থকার

মুসলমানরা একজন মোনাফেককে চিনতে পারতেন। রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর হোযায়ফা যাকে যাকে মোনাফেক বলে জানতেন তাদের জানাযা পড়তেন না। আর হযরত ওমর (রা.) যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো জানাযার নামাযে হোযায়ফা (রা)-কে উপস্থিত না দেখতেন, ততোক্ষণ তিনিও সেই জানাযা পড়তেন না। হোযায়ফাকে দেখলেই নিশ্চিত হতেন, মৃত ব্যক্তি মোনাফেক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাকে না দেখলে সেখান থেকে নীরবে কেটে পড়তেন। মুসলিম সমাজের চরিত্র গঠন এবং তাদের সুষ্ঠু ইসলামী আচরণ ও নীতিমালা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা সুপরিকল্পিতভাবে এই রীতির প্রচলন করেছিলেন।

দ্বীনের কারণে পিতৃহত্যাও সহজ হয়ে যায়

আলোচ্য আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার উপলক্ষ এই ঘটনাটিতে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল রসূল (স.)-এর একেবারে কাছাকাছিই অবস্থান করতো এবং মুসলমানদের মধ্যেই থাকতো। ইসলামের সত্যতা ও রসূল (স.)-এর রেসালাতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তার সামনে অগণিত অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণ নিরন্তর উপস্থিত হতো। কিন্তু আল্লাহ তার হৃদয়কে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করলেন না। কেননা, এই মহান নেয়ামত আল্লাহ তার জন্যে বরাদ্দ করেননি। তার এই অমূল্য সম্পদ লাভের পথে একমাত্র অন্তরায় ছিলো তার মনের এই আক্ষেপ, রসূল (স.) মদীনায় আগমন করায় তার আওস ও খাযরাজের রাজা হওয়ার সাধ ধুলায় মিশে গেলো। মদীনায় ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটছিলো, অথচ সে ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত থেকে গেলো। পক্ষান্তরে তার ছেলে আবদুল্লাহ নিষ্ঠাবান ও অনুগত মুসলমানের এক মহিমান্বিত ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। নিজের পিতার কার্যকলাপ ও আচরণে তিনি দুঃখিত, লজ্জিত ও বিব্রত। তা সত্তেও একজন পিতৃভক্ত পুত্রের ন্যায় তার অন্তরে পিতার প্রতি ভালোবাসা সুপ্ত থাকে। যখন শুনলেন, তার পিতাকে রসূল (স.) হত্যা করতে চান, তখন তার মন পরস্পর বিরোধী আবেগে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ও দৃঢ়তার সাথে এই উভয় সংকট নিরসন করেন। তিনি ইসলামকে ভালোবাসেন, রসূলের আনুগত্য পছন্দ করেন এবং তাঁর আদেশ যদি তার পিতার বিরুদ্ধেও যায় তথাপি কামনা করেন, তা কার্যকর হোক। তবে অন্য কেউ উদ্যোগী হয়ে তার পিতাকে হত্যা করুক এবং তারপর তার সামনে দিয়ে বহাল তবিয়তে বিচরণ করতে থাকুক এটা তিনি বরদাশত করতে অক্ষম। তিনি আশংকা করেন, তেমনটি ঘটলে তার প্রবৃত্তি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসতে পারে এবং তিনি বংশীয় কৌলীন্য ও জিঘাংসার শয়তানের কাছে পরাভূত হতে পারেন। তাই তিনি তার মনের এই দ্বিমুখী টানাপড়েন থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে স্বীয় রসূল ও নেতার সাহায্য কামনা করেন। তিনি তাঁকে অনুরোধ করেন, যদি কাজটা তাঁর করতেই হয় তবে তিনি যেন তাকেই তার (পিতার হত্যার) আদেশ দেন। তিনি রসূল (স.)-কে আশ্বাস দেন, তিনি তাঁর আদেশ সর্বতোভাবে পালন করবেন এবং তার মাথা রসূল (স.)-এর দরবারে হাযির করবেন। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো অন্য কেউ যেন এ কাজ না করে এবং তিনি তার পিতৃহন্তাকে ঘোরাফেরা করতে দেখে হত্যা করে জাহান্নামী হতে বাধ্য না হন।

মানুষের মনে যে কি বিস্ময়কর ঈমান থাকতে পারে, এ ঘটনা থেকে তাও পরিষ্কারভাবে জানা যায়। এই তরুণ সাহাবী রসূল (স.)-এর সাথে সাক্ষাত করে পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দাবী জানান, যে কাজটি তার জন্যে সবচেয়ে কষ্টকর, তা অর্থাৎ তার পিতাকে হত্যা করার কাজ তাকেই অর্পণ করা হোক। কেননা, এ দ্বারা তিনি এর চেয়েও কষ্টকর ও মারাত্মক পরিণতি থেকে নিষ্কৃতি

পেতে চান। সেই পরিণতি হলো, মানবীয় দুর্বলতা ও ঝোঁকের বশে একজন কাফেরের বদলায় একজন মোমেনকে হত্যা করে অবধারিতভাবে জাহান্নামে যাওয়া।

আপন পিতার প্রতি মানবীয় দুর্বলতা ও অনুরাগের মোকাবেলা করতে যেয়ে তিনি বিস্ময়কর সত্যবাদিতা ও স্পষ্টভাষিতার পরিচয় দেন। তিনি বলেন, 'আমার চেয়ে পিতৃভক্ত ছেলে যে খাযরাজ গোত্রে নেই, তা গোটা খাযরাজ গোত্রের কাছে সুবিদিত।' অতপর তিনি স্বীয় নবী ও নেতার কাছে এই মর্মে সাহায্য চান যেন তিনি তাকে এই উভয় সংকট থেকে উদ্ধার করেন। অথচ ঘুণাক্ষরেও এ দাবী জানান না যে, তার পিতার হত্যার আদেশ প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করা হোক; বরং আদেশকে তিনি শিরোধার্য মেনে নিয়েছেন বরং তা কার্যকর হতেই হবে বলে দ্ব্যর্থহীন মত দিয়েছেন। যে বিষয়টা তিনি চেয়েছেন তা হচ্ছে, আদেশটি কার্যকর করার দায়িত্ব তাঁকেই দেয়া হোক এবং তিনি নিজেই তার মাথা কেটে আনবেন।

অন্যদিকে দয়া ও মহানুভবতার মূর্ত প্রতীক রসূল (স.) ঈমানী তেজোদ্দৃপ্ত এই যুবকের উভয় সংকট উপলব্ধি করে তাকে পরম উদারতা ও সহনশীলতা সহকারে জানান, 'আমরা বরং তার সাথে উদার আচরণ করবো এবং যতোদিন সে আমাদের সাথে থাকে, ততোদিন তার সাথে ভালো ব্যবহার করবো।' ইতিপূর্বে তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে এই বলে হত্যা থেকে বিরত রাখেন যে, 'হে ওমর! লোকেরা যখন বলাবলি করবে, মোহাম্মদ (সঃ) নিজের সহচরদের হত্যা করে, তখন কেমন হবে?'

এরপর রসূল (স.) অসময়ে যাত্রা করা এবং ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়ে একদিকে যেমন গভীর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন, অপরদিকে তেমনি আল্লাহর ইংগিতও কার্যকর করেন। এ পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম বাহিনীর মনোযোগ আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত বিদ্বেষের নোংরামি থেকে ভিন্ন দিকে ফেরানো। একজন আনসার যখন 'হে আনসাররা আমাকে বাঁচাও' এবং একজন মোহাজের 'হে মোহাজেররা আমাকে বাঁচাও' বলে চিৎকার দিয়েছিলো তখনই এই নোংরা আঞ্চলিক ও গোষ্ঠী বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছিলো। মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল আনসার ও মোহাজেরদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে দেয়ার যে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিলো, তা নস্যাৎ করে দেয়াও উক্ত পদক্ষেপের অন্যতম লক্ষ্য ছিলো। বস্তুত এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিলো গোটা মানব জাতির ইতিহাসে এবং আদর্শগত আন্দোলনের ইতিহাসে নযীরবিহীন। এ ঘটনার মধ্যে রসূল (স.) ও ওসায়দ ইবনে হোযায়র (রা.)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত কথাবার্তাও খুবই শিক্ষাপ্রদ। এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের মধ্যে একদিকে যেমন সে ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের মানসিক প্রস্তুতি নিহিত ছিলো, তেমনি এই ষড়যন্ত্রের হোতাকে প্রতিহত করার উদ্যোগও ছিলো। অথচ এ কাজটি সহজ ছিলো না। কেননা, ষড়যন্ত্রের হোতা নিজ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ করার পরও তাদের ওপর যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলো।

সর্বশেষে আরো একটি বিস্ময়কর দৃশ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তা হচ্ছে, মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-র ঈমানদার ছেলে আবদুল্লাহর দৃঢ়তা। আবদুল্লাহ নিজের তরবারি হাতে নিয়ে পিতাকে শহরে ঢুকতে না দেয়ার অভিপ্রায়ে মদীনার প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে গেলেন। কেননা, তার পিতা বলেছিলো, 'সবল দুর্বলকে মদীনা থেকে বের করে দেবে।' আবদুল্লাহ তার পিতার এই উক্তিকেই সত্য প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, যাতে সে নিশ্চিত হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (স.) যথার্থই সবল এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই দুর্বল। তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন, রসূল (স.) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে তার পিতাকে শহরে প্রবেশের অনুমতি না দেয়া

পর্যন্ত তিনি প্রবেশ করতে দেবেন না। তিনি অনুমতি দেবেন, তবেই সে প্রবেশ করবে। এভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হবে কে সবল এবং কে দুর্বল।

বস্তুত এ হচ্ছে সেই সর্বোচ্চ মান, যেখানে এই ব্যক্তিরা ঈমানের বলেই উন্নীত হয়েছিলেন। এই সর্বোচ্চ মানে উন্নীত হওয়ার পরও তারা মানুষই ছিলেন এবং তাদের মধ্যে মানবীয় দুর্বলতা মানবীয় ভাবাবেগ– সবই ছিলো। বস্তুত মানুষ যখন ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করে এবং পৃথিবীতে ইসলামের মানবরূপী চলমান প্রতীক হয়ে বিচরণ করে ও পানাহার ইত্যাদি করে, তখন ইসলামের সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে বাস্তব রূপটিই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

মোনাফেকদের আরো কিছু ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্য

এবারে আমরা দৃষ্টি দেবো উল্লিখিত ঘটনাবলীর বিবরণ সম্বলিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে। এই সূরার ৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর যখন তাদের বলা হয়, এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্যে ক্ষমা চাইবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদের দেখবে দাম্ভিকতার সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত।'

বস্তুত তারা তাদের মোনাফেকসুলভ অপতৎপরতা ও খারাপ কথাবার্তা যথারীতি চালিয়ে যায়, কিন্তু যখনই জানতে পারে, রসূল (স.)-এর কাছে তা ফাঁস হয়ে গেছে, তখন কাপুরুষতা প্রদর্শন করে, লজ্জা পেয়ে এবং কসম খেয়ে খেয়ে বলতে থাকে, আমি ওসব কথা বলিনি। এভাবে কসম ঢাল হয়ে তাদের রসূল (স.) ও মুসলমানদের রোষ থেকে রক্ষা করে। অতপর যখন কেউ বলে, 'এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, অথচ তখনো তারা রসূলের সম্মুখীন হওয়া থেকে নিরাপদ ছিলো, তখন তারা দাম্ভিকতার সাথে মাথা ঘুরিয়ে নেয়।'

একদিকে উপরোক্ত কাপুরুষতা ও লজ্জা, অপরদিকে এই দাম্ভিকতা ও মাথা ঘুরিয়ে নেয়া– এই দুটো হচ্ছে মোনাফেকদের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের আচরণ যদিও সচরাচর প্রভাবশালী ও গণ্যমান্য শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে, কিন্তু এই শ্রেণীর লোকেরা স্বভাবগতভাবে কিছুটা ভীরু এবং কাপুরুষও হয়ে থাকে। তারা মুসলমানদের ও তাদের নেতার মুখোমুখি হতে ভয় পায়। যতোক্ষণ মুখোমুখি হওয়ার আশংকা না থাকে ততোক্ষণ তারা অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করতে থাকে, আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফেরাতে থাকে এবং মাথা ঘুরিয়ে অবাধ্যতা প্রদর্শন করতে থাকে। কিন্তু যখনই তাদের নেতার মুখোমুখি হতে হয় অমনি কাপুরুষতা, লজ্জা ও কসম খাওয়া শুরু করে দেয়।

এ কারণে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা এবং এই ফয়সালার পর তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে কোনো লাভ নেই, সে কথা পরবর্তী আয়াতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

'তাদের জন্যে তুমি ক্ষমা চাও আর না চাও উভয়ই সমান, আল্লাহ তায়ালা তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তায়ালা ফাসেকদের সুপথ দেখান না।

অতপর যে ফাসেকীর কারণে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর এই চূড়ান্ত ফয়সালা কার্যকর হয়েছে, সেই ফাসেকীর একটি দিক তুলে ধরা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

'তারা হচ্ছে সেসব লোক, যারা জনগণকে বলে, আল্লাহর রসূলের কাছে অবস্থানকারীদের জন্যে অর্থ ব্যয় করো না, যতোক্ষণ না তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে যায় ......।

বস্তুত মোনাফেকরা যে কাল ও যে স্থানেরই অধিবাসী হোক না কেন, এ ধরনের কথা বলা তাদের চিরন্তন রীতি। এ ধরনের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তাদের মজ্জাগত নোংরা স্বভাবই পরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্য ও ঈমানের শত্রুরা চিরকাল ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্যে

মোমেনদের অনাহারে মারার অপকৌশল অবলম্বন করে। যেহেতু তারা নিজেদের ইতরসুলভ মানসিকতার কারণে খাদ্য ও জীবন যাপনের উপকরণকেই জীবনের সব কিছু মনে করে, সেহেতু এই উপকরণটির সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েই তারা মোমেনদের বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকে।

এই অস্ত্রটি দিয়েই কোরায়শ বনু হাশেমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো। পর্বতের উপত্যকার মধ্যে তাদের বন্দী করে ও বয়কট করে চাপ প্রয়োগ করেছিলো, যাতে তারা (বনু হাশেম) রসূল (স.)-এর সাহায্য করা থেকে বিরত হয় এবং তাঁকে মোশরেকদের কাছে হস্তান্তর করে।

আলোচ্য আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, রসূল (স.)-এর সাহাবীরা যাতে ক্ষুধা ও অনাহারের চাপে পড়ে তাঁকে ছেড়ে চলে যায়, সে জন্যে মোনাফেকরাও তাদের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র প্রয়োগ করতো। তারা যাতে অনাহারে কষ্ট পায়, সেজন্যে তাদের দান করা থেকে জনগণকে বিরত রাখতে চেষ্টা করতো।

এই অস্ত্র কমিউনিষ্টরাও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে থাকে। খাদ্য সরবরাহের জন্যে প্রচলিত রেশনকার্ড থেকে তাদের বঞ্চিত রাখে, যাতে তারা ক্ষুধায় মরে তো মরুক, নচেত আল্লাহকে অস্বীকার ও নামায ত্যাগ করুক।

তথাকথিত নামধারী মুসলিম দেশগুলোতেও এই অস্ত্রের প্রয়োগ চলছে। আল্লাহর দিকে আহবান ও ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে যারা ঠেকাতে চায়, তারা অকমিউনিষ্ট হলেও অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ, অনাহার চাপিয়ে দেয়া এবং কর্মসংস্থানে ও জীবিকা উপার্জনে বাধাদানের অপকৌশল অবলম্বন তারা করেই চলেছে।

এভাবে আবহমানকাল ধরে ইসলামের শত্রুরা এই ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে চলেছে। অথচ তারা অত্র আয়াতের শেষ অংশে বর্ণিত সত্যটি জানে না যে-

'আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সহায়-সম্পদ আল্লাহর, কিন্তু মোনাফেকরা তা বোঝে না।'

মুসলমানদের জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট এসব মুসলিম নামধারী মোনাফেকরাও আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজমান আল্লাহর সৃষ্ট জীবিকার অবারিত উৎস থেকেই নিজেদের জীবিকা উপার্জন করে থাকে। তারা নিজেরা নিজেদের জীবিকার স্রষ্টা নয়। অথচ তারাই কিনা অন্যের জীবিকা বন্ধ করতে সচেষ্ট। কতো মূর্খ কতো নির্বোধ তারা!

আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজমান জীবিকার উৎসগুলো যে আল্লাহর শত্রু ও বন্ধু নির্বিশেষে সকলেরই জীবিকার উৎস, সে কথা বলে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের প্রবোধ দিচ্ছেন এবং আল্লাহর শত্রুদের গৃহীত পাশবিক ও হীন কর্মপন্থার মোকাবেলায় টিকে থাকার জন্যে মোমেনদের মনোবল বৃদ্ধি করছেন। যে আল্লাহ তায়ালা তার দুশমনদের পর্যন্ত জীবিকা দিতে ভোলেন না, তিনি তার বন্ধুদের ভুলতে পারেন না। তিনি এত দয়ালু যে, তাঁর শত্রুদের পর্যন্ত জীবিকা থেকে বঞ্চিত করেন না ও না খাইয়ে রাখেন না। অথচ তিনি জানেন যে, তিনি যদি তাঁর বান্দাদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত করেন, তবে তারা নিজেদের জন্যে জীবিকা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তায়ালা এতোটা উদার যে, তাঁর শত্রুদের পর্যন্ত যে কাজে তারা সক্ষম নয়, সে কাজে বাধ্য করেন না। বস্তুত ভাতে পানিতে মারার কৌশলটি এমন অপকৌশল, যার কথা জঘন্যতম ইতর ও পাষন্ডতম লোক ছাড়া আর কেউ চিন্তাও করে না।

পরবর্তী আয়াতে মোনাফেকদের অপর একটি নিকৃষ্ট উক্তি তুলে ধরে তার সমালোচনা করা হয়েছে।

'তারা বলে, আমরা যদি মদীনায় ফিরে যাই তাহলে সবল সেখান থেকে দুর্বলকে তাড়িয়ে দেবে।'

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি কিভাবে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-র ছেলে আবদুল্লাহ এ কথাটা বাস্তবায়িত করেছেন এবং কিভাবে মদীনায় সবলের অনুমতি ছাড়া দুর্বল প্রবেশ করতে পারেনি।

'বস্তুত সমস্ত প্রতাপ ও সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহর, তাঁর রসূলের ও মোমেনদের। অথচ মোনাফেকরা তা জানে না।'

এখানে আল্লাহ তায়ালা নিজের পাশাপাশি তাঁর রসূল ও মোমেনদের কথা উল্লেখ করেছেন। এটা রসূল ও মোমেনদের জন্যে এক দুর্লভ সম্মানের প্রতীক। তিনি যেন বলছেন, 'এই তো আমরা, এ হচ্ছে সবল ও সম্মানিতদের পতাকা, এই হচ্ছে প্রতাপশালীদের সারি।' বস্তুত রসূল (স.) ও মোমেনদের নিজের পার্শ্বে রেখে তিনি মহাপ্রতাপান্বিত একটি শিবির স্থাপন করেছেন।

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সত্য কথাই বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা সকল সম্মান, শক্তি ও প্রতাপের উৎস হিসাবে মোমেনের হৃদয়ে বিদ্যমান ঈমানকেই চিহ্নিত করেছেন। এই সম্মান প্রতিপত্তি আল্লাহর সম্মান প্রতিপত্তি থেকেই উদ্ভূত। এ সম্মান ও প্রতিপত্তি কখনো কাউকে দুর্বল করে না, নিজেও দুর্বল হয় না। মোমেনের হৃদয় থেকে তা চরম সংকটজনক মুহূর্তেও দূরে সরে যায় না। কেবল দুর্বল ও দোদুল্যমান হতে পারে। এই দুর্বলতা ও দোদুল্যমানতা কাটিয়ে ওঠলে মোমেনের সম্মান, শক্তি, প্রতিপত্তি অটল ও স্থিতিশীল হয়ে যায়।

'অথচ মোনাফেকরা তা জানে না।'

তারা যখন এই সম্মান প্রতিপত্তির স্বাদ পায়নি এবং এর মূল উৎসের সাথে তাদের যোগাযোগ নেই, তখন তারা কেমন করেই বা তার কথা জানবে?

যে মোমেনদের আল্লাহ তায়ালা এভাবে নিজের কাতারে স্বীয় রসূলের সাথে স্থান দিয়ে সম্মানিত করেছেন, সেই মোমেনদের উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী কয়টি আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন এই উচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়, মোনাফেকসুলভ যাবতীয় চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হয় এবং সম্পদ ও সন্তান যেন তাদের এই উচ্চ মর্যাদা লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে না পারে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

রুকু ২

৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তানাদি যেন কখনো তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে দেয়, (কেননা) যারা এ কাজ করবে তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১০. আমি তোমাদের যা কিছু অর্থ সম্পদ দিয়েছি তা থেকে তোমরা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই, (কেননা সামনে মৃত্যু এসে দাঁড়ালে সে বলবে), হে আমার মালিক, তুমি যদি আমাকে আরো কিছু কালের অবকাশ দিতে তাহলে আমি তোমার পথে দান করতাম এবং (এভাবেই) আমি তোমার নেক বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যেতাম! ১১. কিন্তু কারো আল্লাহ নির্ধারিত 'সময়' যখন এসে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালা আর তাকে (এক মুহূর্তও) অবকাশ দেবেন না; তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) যা কিছু করছো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন।

তাফসীর

আয়াত ৯-১১

আল্লাহ বলেন,

'হে মোমেন ব্যক্তিরা! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে শিথিল করে না দেয়।' ....

মানুষের মন যখন জাগ্রত থাকে না, মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী তা জানে না এবং তার আত্মার সাথে সংগতিশীল একটি উচ্চতর উদ্দেশ্য যা তার সৃষ্টির পেছনে কার্যকর রয়েছে, তা যখন উপলব্ধি করে না, তখন মানুষের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি যথার্থই তাকে শিথিল ও উদাসীন করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা মানুষের আত্মার মধ্যে এমন একটি উচ্চাকাংখা ও উচ্চাভিলাষ সৃষ্টি করেছেন, যা তাকে তার মানবসুলভ শক্তি-সামর্থের সীমার মধ্যে অবস্থান করেই আল্লাহর নিজস্ব কিছু গুণ বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করতে উৎসাহ যোগায়। তাকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যেই প্রদান করা হয়েছে। এ জন্যে প্রদান করা হয়নি যে, সে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যাবে এবং যে উৎস থেকে সে নিজের মনুষ্যত্বের উপাদান সংগ্রহ করেছে সেই উৎসের সাথে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা, এই উদাসীনতা ও উক্ত উৎসের সাথে যাদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে, তারাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত। আর সবচেয়ে বড় যে ক্ষতির শিকার তারা হয়, তা হচ্ছে তাদের মনুষ্যত্ব লোপ পাওয়া। কেননা,

যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জন নির্ভর করে সেই উৎসের সাথে সংযোগ বহাল থাকার ওপর, যে উৎসের বলে মানুষ মানুষ হতে পেরেছে। আর এই মনুষ্যত্ব থেকে যে বঞ্চিত হয়েছে, সে যতো ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী হোক না কেন, সে সর্বতোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পরবর্তী একটি আয়াতেই আল্লাহর পথে দান করার বিষয়ে একাধিক পন্থায় চেতনা উজ্জীবিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আমি তোমাদের যা কিছু দান করেছি তা থেকে দান করো।' এখানে মানুষের সহায়-সম্পদের উৎস কী ও কোথায়, তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এসব সহায়-সম্পদ সেই আল্লাহরই দান যার ওপর তোমরা ঈমান এনেছো এবং যিনি তোমাদের দান করার আদেশ দিয়ে থাকেন।

অতপর বলা হয়েছে, 'তোমাদের মৃত্যু আসার আগেই..........' (দান কর) কেননা মৃত্যুর পর আর কিছুই মানুষের নিজের থাকে না, সবই অন্যকে দিয়ে আসে, অথচ আখেরাতের জন্যে তার কিছুই সঞ্চয় করা হয় না। এর চেয়ে বড় ক্ষতি ও নির্বুদ্ধিতা আর কিছু হতে পারে না।

অতপর সেই সময়ে সে এই বলে আফসোস করবে যে, 'আহা, দান করা ও সৎকর্মশীল হবার জন্যে যদি আরো একটু সময় পেতাম!' কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। কেননা, কোনো প্রাণীর মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে পড়লে আল্লাহ তায়ালা তা আর বিলম্বিত করেন না। আর তোমরা যা করো তা তো আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই জানেন।' সুতরাং নতুন করে সে পুণ্য সঞ্চয় করবেই বা কোথা থেকে?

মোনাফেকদের বৈশিষ্ট্য ও মোমেনদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র ও ছলচাতুরীর বর্ণনা দেয়ার পর এবং আল্লাহ তায়ালা যেভাবে মোমেনদেরকে মোনাফেকদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন তা উল্লেখ করার পর একটি মাত্র আয়াতে বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য খুবই প্রাসংগিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, ঈমানের দাবীসমূহ পূরণে তাদের আর চুপ করে বসে থাকা সংগত নয়, বরং সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত এবং মোমেনদের নিরাপত্তার একমাত্র উৎস যে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর স্মরণ থেকে মোটেই উদাসীন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা এই কোরআন দ্বারা মুসলমানদের চরিত্র গঠন করে থাকেন।

সূরা আত্ তাগাবুন

আয়াত ১৮ রুকু ২

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ① هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ② خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ④ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑤ ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করছে, (যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব (যেমন) তাঁর জন্যে, (তেমনি যাবতীয়) প্রশংসাও তাঁর জন্যে, তিনি সকল কিছুর ওপর প্রবল ক্ষমতাবান। ২. তিনিই তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, (এর পর) তোমাদের কিছু লোক মোমেন হলো আবার কিছু লোক কাফের থেকে গেলো; (আসলে) তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই দেখেন। ৩. তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাদের তিনি (মানুষের) আকৃতি দিয়েছেন, তাও আবার অতি সুন্দর করে তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন, তাঁর কাছেই (তোমাদের আবার) ফিরে যেতে হবে। ৪. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন, তিনি জানেন তোমরা যা কিছু গোপন করো আর যা কিছু প্রকাশ করো; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মনের কথাও জানেন। ৫. তোমাদের কাছে কি সেসব লোকের খোঁজ খবর কিছুই পৌঁছেনি যারা এর আগে (বিভিন্ন নবীর সময়ে) কুফরী করেছিলো, অতপর তারা (দুনিয়াতেই) নিজেদের কর্মফল ভোগ করে নিয়েছে, (পরকালেও) তাদের জন্যে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে। ৬. (এটা) এ কারণে যে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে যখনি আল্লাহর কোনো রসূল আসতো তখনি তারা

أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا ز فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ ط وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝٦ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ط قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝٧ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٨ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ط ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝٩ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝١٠

বলতো, (কতিপয়) মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দেবে? অতএব তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করলো এবং (ঈমানের পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো, অবশ্য আল্লাহ তায়ালার (তাদের কাছ থেকে) কিছুই পাওয়ার ছিলো না, আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন, তিনি চির প্রশংসিত। ৭. কাফেররা ধারণা করে নিয়েছে, একবার মরে গেলে কখনো তাদের পুনরুত্থিত করা হবে না; তুমি বলো, না– তা কখনো নয়; আমার মালিকের শপথ, অবশ্যই মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে আবার (কবর থেকে) ওঠানো হবে এবং তোমাদের (এক এক করে) বলে দেয়া হবে তোমরা কি কাজ করে এসেছো; আর আল্লাহ তায়ালার পক্ষে এটা অত্যন্ত সহজ কাজ। ৮. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল এবং আমি যে আলো তোমাদের দিয়েছি তার (বাহন কোরআনের) ওপর ঈমান আনো; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন। ৯. যেদিন তোমাদের (আগে পরের সমস্ত মানুষ ও জ্বিনকে) একত্র করা হবে, (একত্র করা হবে সে) মহাসমাবেশের দিনটির জন্যে– (যেদিন বলা হবে, হে মানুষ ও জ্বিন), আজকের দিনটিই হচ্ছে (তোমাদের আসল) লাভ লোকসানের দিন; (লাভের দিন তার জন্যে) যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তিনি (আজ) তার গুনাহ মোচন করে দেবেন এবং তাকে তিনি এমন এক (সুরম্য) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে; (আর) এটাই হচ্ছে পরম সাফল্য। ১০. (এটা লোকসানের দিন তাদের জন্যে,) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে (এদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত হচ্ছে), এরা সবাই জাহান্নামের অধিবাসী (হবে), সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; কতো নিকৃষ্ট সে আবাসস্থল!

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটি বিশেষত এর প্রথমাংশ মক্কী সূরার বিষয়বস্তুর সাথে গভীর সাদৃশ্যপূর্ণ, কেবলমাত্র শেষের কয়েকটি বাক্যে মদীনার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা প্রতিফলিত হয়।

'হে মোমেন ব্যক্তিরা' বলে সম্বোধন করার পূর্ব পর্যন্ত সূরার প্রথম ১৩টি আয়াতে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের বিবরণদান ও ইসলামী আদর্শকে অন্তরে বদ্ধমূল করার কাজটি অবিকল মোশরেক কাফেরদের লক্ষ্য করে নাযিল করা মক্কী সূরাগুলোর বর্ণনাভংগি অনুসারেই করা হয়েছে। এতে প্রাকৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী এবং অতীতের অবিশ্বাসীদের পরিণামও বর্ণনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কেয়ামতের দৃশ্যাবলীও তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া যে অকাট্য সত্য, তা প্রমাণিত হয়। এ সব বর্ণনাভংগি প্রমাণ করে যে, এ অংশটির লক্ষ্য হচ্ছে অবিশ্বাসী কাফেররা।

সূরার শেষাংশে সম্বোধন করা হয়েছে মোমেনদেরকে। কেননা, এ অংশের বাকরীতি মদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর মতোই। এতে আল্লাহর পথে ধন সম্পদ ব্যয় করতে এবং সম্পদ ও সন্তান সন্ততির মাধ্যমে বান্দাদের যে পরীক্ষা করা হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক হতে বলা হয়েছে, মদীনায় যে ধরনের জীবন পদ্ধতি গড়ে ওঠেছিলো, তার স্বাভাবিক দাবী অনুসারে মদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলোতে বারংবার এ জাতীয় সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। অনুরূপভাবে এতে মুসলমানদের ওপর আপতিত বিপদ আপদ ও দুঃখকষ্টে তাদের প্রবোধ দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর বা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করার আদেশ দেয়া হয়েছে। মাদানী সূরায় বিশেষত জেহাদের আদেশদান ও জেহাদ থেকে উদ্ভূত ত্যাগ তিতিক্ষা প্রসংগে এ সব বিষয় বার বার আলোচিত হয়ে থাকে।

কিছু কিছু রেওয়ায়াতে এ সূরাটিকে মক্কী বলা হয়েছে। তবে অন্যান্য রেওয়ায়াতে একে মাদানী বলা হয়েছে এবং এই মতটিকেই অগ্রগণ্য বলা হয়েছে। সূরাটির পারিপার্শ্বিক ও প্রথমাংশের বর্ণনাভংগি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমিও একে প্রথম প্রথম মক্কী সূরা মনে করতাম। কিন্তু পরে চূড়ান্ত বিবেচনায় একে মাদানী বলেই গ্রহণ করেছি। সূরার প্রথম ভাগে কাফেরদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা মাদানী সূরায় থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। হিজরতের পরেও মক্কার অথবা মদীনার পার্শ্ববর্তী কাফেরদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখা সম্ভব। তাছাড়া কোরআনের মাদানী অংশে যদি কখনো কখনো ইসলামী আকীদা বিশ্বাস নিয়ে নতুন করে আলোচনা করা হয়, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আর তা করতে গিয়ে কোরআনের সর্বাধিক প্রচলিত রীতি, অর্থাৎ মক্কী সূরায় অনুসৃত রীতি অনুসরণ করাই যে স্বাভাবিক, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাফসীর

আয়াত ১-১০

সূরার প্রথমাংশে (প্রথম বারটি আয়াতে) মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্ব প্রকৃতির আনুগত্য, মহান স্রষ্টার সাথে সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক এবং আল্লাহর কিছু কিছু গুণ, গুণবাচক নাম এবং প্রকৃতি ও মানব জীবনে তার প্রভাব আলোচিত হয়েছে।

মানুষ ও বিশ্ব প্রকৃতির সাথে তাওহীদের সম্পর্ক

'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহর গুণকীর্তন করে থাকে-----'

আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শের ইতিহাসে এতো প্রশস্ত, এতো সূক্ষ্ম আর কোনো আকীদা এবং আদর্শের সাথে মুসলমানদের কখনো পরিচয় ঘটেনি, যতোটা প্রশস্ত ইসলামের এই বিশ্বজোড়া

ধারণা। পৃথিবীতে আল্লাহর যতো নবী ও রসূল এসেছেন, তাঁরা সকলেই এই মতবাদ প্রচার করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা এক, তিনিই বিশ্বজগতের ও প্রতিটি সৃষ্টির স্রষ্টা এবং বিশ্বজগতে যা কিছু আছে তিনি তার সব কিছুরই রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক। এ মতবাদে আমরা কোনো সন্দেহ পোষণ করি না। কেননা, কোরআন এ মতবাদ সকল রসূলের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত করেছে। কোরআন ছাড়া অন্যান্য বিকৃত, পরিবর্তিত ও মনগড়া গ্রন্থে যা কিছু বলা হয়েছে তা ধর্তব্য নয়। অনুরূপভাবে যারা সার্বিকভাবে অথবা আংশিকভাবে কোরআনে বিশ্বাস করে না, অথচ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে লেখে, তাদের কথাও গ্রহণযোগ্য নয়। মূল ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে যা কিছু বিকৃতি ঘটেছে তা তার অনুসারীদেরই কারসাজি। এই কারসাজির কারণে মনে হয় যেন উক্ত আকীদায় নির্ভেজাল একত্ববাদ কখনো ছিলো না, অথবা প্রতিটি সৃষ্টির সাথে আল্লাহর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকা বা প্রতিটি সৃষ্টির ওপর আল্লাহর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য থাকার ধারণা গোড়াতেই ছিলো না। বস্তুত এই বিকৃতি ধর্মের আসল উপাদান নয়, এ হচ্ছে ধর্মের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট একটি বহিরাগত ধারণা। কেননা, প্রথম রসূল থেকে নিয়ে শেষ রসূল পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীন বা ধর্ম একই ছিলো এবং একই আছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের মূল আকীদার বিপরীত কোনো ধর্ম পৃথিবীতে নাযিল করবেন এটা একেবারেই অসম্ভব। অথচ ধর্মের নামে প্রচলিত কিছু বিস্তৃত বা মনগড়া বই কেতাবে এরূপ দাবী করা ও এরূপ ধারণা ব্যক্ত করা হয়ে থাকে।

অবশ্য আল্লাহর দ্বীনের মূলনীতি আগাগোড়া একই রকম ছিলো– এ কথা বলা দ্বারা এটা অস্বীকার করা হয় না যে, আল্লাহর সত্ত্বা, তাঁর গুণাবলী এবং বিশ্বজগতে ও মানবজীবনে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে ইসলামের (অর্থাৎ শেষ নবীর আনীত দ্বীনের) ধ্যানধারণা পূর্ববর্তী সকল নবীর আনীত আসমানী দ্বীনের ধ্যানধারণার চেয়ে অধিকতর প্রশস্ত, অধিকতর সূক্ষ্ম এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। শেষ নবীর নবুওতের প্রকৃতির সাথেও এ তত্ত্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর শেষ নবীর আনীত দ্বীন যে মানবীয় সুমতিকে সম্বোধন করে ও পথনির্দেশ দেয় এবং যার অভ্যন্তরে একত্ববাদের এই মতবাদ পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে, সেই মানবীয় সুমতির সাথেও এটি সংগতিশীল।

এই মতবাদ ও মতাদর্শের অন্যতম দাবী এই যে, মানুষের মন যেন সাধ্যমতো আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও বিশ্ব প্রকৃতিতে তাঁর দৃশ্যমান প্রভাব অনুভব করে, এর দৃশ্যমান নিদর্শনাবলীর সাহায্যে তা অন্তরের মধ্যেও উপলব্ধি করে, এই অসীম ক্ষমতা তার অনুভবযোগ্য নিদর্শনাবলীর মাঝে বেঁচে থাকে এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে যেন বিশ্বজগতের প্রতিটি জিনিসের ওপর নিরংকুশভাবে কর্তৃত্বশীল ও প্রতিটি জিনিসের রক্ষক হিসাবে দেখতে পায়, চাই তা যতো বড় বা ছোটো জিনিস হোক না কেন।

এই তাওহীদী মতাদর্শের আরো দাবী এই যে, মানুষের মন যেন সর্বক্ষণ সচেতন, আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীত এবং আল্লাহর পুরস্কারের আশায় আশান্বিত থাকে। জীবনের প্রতিটি কাজে সে যেন আল্লাহর ক্ষমতা, পরাক্রম, তদারকী ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং তাঁর ওপর পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল থাকে। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ সম্পর্কে এবং তাঁর নৈকট্য সম্পর্কে সচেতন থাকে।

এর আরো দাবী এই যে, মানুষ যেন অনুভব করে, গোটা সৃষ্টিজগত স্বীয় স্রষ্টার দিকে মনোযোগী রয়েছে, তাঁর তাসবীহ করছে ও তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলছে। তাহলে সে নিজেও তাঁর দিকে মনোযোগী থাকবে, তাঁর তাসবীহ করবে ও তাঁর অনুগত থাকবে। এ কারণেই এবং এই অর্থেই তাওহীদী মতাদর্শ প্রকৃতপক্ষে একটি মহাজাগতিক মতাদর্শ। তা ছাড়া আরো যে যে অর্থে

একে মহাজাগতিক মতাদর্শ বলা হয়েছে, তার একটি সূরা হাশরের শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহর তাসবীহ করে। কর্তৃত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই।'

অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহর দিকেই মনোনিবিষ্ট হয়ে আছে এবং তাঁর প্রশংসার সাথে গুণকীর্তন করে। গোটা সৃষ্টিজগত তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। তিনিই যে সব কিছুর মালিক, তা প্রতিটি জিনিসই অনুভব করে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং প্রশংসিত এবং সমগ্র সৃষ্টিজগত থেকে নিরন্তর তাঁর পবিত্রতা ঘোষিত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় মানুষ যদি এই বিশ্বজগত থেকে পৃথক ও ভিন্ন মত তথা কুফরীর পথ অবলম্বন করে গুনাহগার, অবাধ্য ও খোদাদ্রোহী হয় এবং আল্লাহর অনুগত না হয় ও প্রশংসা না করে, তা হলে সে একেবারেই কোণ্ঠাসা ও একাকী হয়ে এ বিশ্বজগত থেকে সে বহিষ্কারযোগ্য হয়ে যাবে।

'তিনি সর্ববিষয়ের ওপর শক্তিমান।'

বস্তুত এখানে আল্লাহর সীমাহীন অবাধ ক্ষমতার কথাই বলা হয়েছে। কোরআন এই সত্যটি মোমেনের হৃদয়ে বদ্ধমূল করতে চায়, যাতে সে আশস্ত হয় যে, সে যখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে, তখন এক সীমাহীন ক্ষমতাসম্পন্ন সত্ত্বার ওপর নির্ভর করে। সেই অসীম ক্ষমতাধর সত্ত্বা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, কোনো বাধাবন্ধন মানেন না। আর আল্লাহর এই অসীম ক্ষমতা এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি জিনিস কর্তৃক তাঁকে প্রশংসা ও তাঁর গুণকীর্তন করার বিষয়টি বিশ্বাস করা সেই বৃহত্তর ঈমানী ও তাওহীদী মতাদর্শেরই অংশ বিশেষ।

আল্লাহর প্রশংসা সহকারে গুণকীর্তনকারী বিশাল বিশ্বজগতের মাঝে যে মানুষ বাস করে, সে কিন্তু কখনো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয় আবার কখনো হয় অবিশ্বাসী। মানুষ একাই এ ধরনের দ্বৈত ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বিষয় নিয়েই পরবর্তী আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতপর তোমাদের কেউ হয় মোমেন, কেউ হয় কাফের। ...'

মানুষের আবির্ভাব, কাফের হওয়া অথবা মোমেন হওয়ার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা, সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই এই উভয় ধরনের ক্ষমতালাভ, আর এই ক্ষমতার কারণে তার ওপর ঈমান আনার দায়িত্ব অর্পণ— এই সবই আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে সংঘটিত হয়েছে। ঈমান আনার দায়িত্বটা যথার্থই একটি বিরাট দায়িত্ব। কিন্তু এই দায়িত্ব অর্পণের সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই সৃষ্টিকে ভালো ও মন্দের মধ্য থেকে একটি নির্বাচন করার ক্ষমতা দান করে সম্মানিত করেছেন। এরপর তাকে ভালো ও মন্দ বাছাই করার এমন একটি মাপকাঠি দিয়েও সাহায্য করেছেন, যা দিয়ে সে নিজের কাজ ও চিন্তাধারাকে পরিমাপ করতে এবং তার কোন্‌টি সঠিক ও কোন্‌টি বেঠিক তা নির্ণয় করতে পারে। সেই মাপকাঠি হলো আল্লাহর দ্বীন, যা তিনি স্বীয় নবী রসূলদের ওপর নাযিল করেছেন। এভাবে তিনি তাকে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সাহায্য করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মানুষের ওপর মোটেই যুলুম করেননি।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে,

'তোমরা যা করো তার ওপর আল্লাহর দৃষ্টি রয়েছে।'

অর্থাৎ মানুষ যাই করে, যাই ভাবে বা চিন্তা করে, সব কিছু তাঁর নখদর্পণে। সুতরাং তার সাবধান হওয়া উচিত এবং এই মহান ও সূক্ষ্ম দ্রষ্টার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে কাজ করা উচিত।

মানুষের প্রকৃতি ও অবস্থান সংক্রান্ত এই মতাদর্শ ইসলামী চিন্তাধারার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এই বিশ্বজগতের মানুষের অবস্থান কোথায়, তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা কতোটুকু এবং বিশ্ব-স্রষ্টার কাছে তার দায়দায়িত্বই বা কী, সে সম্পর্কে এখানে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন পথনির্দেশ রয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে এক মহাসত্যের সন্ধান দেয়া হয়েছে, সে মহাসত্য বিশ্বজগতের প্রকৃতির অভ্যন্তরেই সুপ্ত রয়েছে। আকাশ ও পৃথিবী এই মহাসত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মানব সৃষ্টি যে আল্লাহর কী অনুপম ও নিপুণ শিল্প এবং এই সৃষ্টিকেও যে একদিন আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে, সে কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতটিতে,

‘তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সত্যের ভিত্তিতেই সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের আকৃতি প্রদান করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে চমকপ্রদ বানিয়েছেন। তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।’

আয়াতের প্রথমাংশে ‘তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন’– এই উক্তিটির মাধ্যমে মোমেনের চেতনায় একথা বদ্ধমূল করা হচ্ছে যে, সত্য এই বিশ্বজগতের অস্তিত্বের মধ্যেই বিরাজ করছে। ওটা বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা কোনো বস্তু নয় এবং কোনো নিষ্প্রয়োজন বস্তুও নয়। বরং সত্যের ওপরই গোটা সৃষ্টিজগতের ভিত্তি। যিনি এই সত্য বর্ণনা করছেন তিনি হচ্ছেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এবং একমাত্র তিনিই জানেন, আকাশ ও পৃথিবীর ভিত্তি কিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর মানুষ সত্যের ওপর অবিচল হবার প্রেরণা পায়, যার ওপর তার দ্বীন প্রতিষ্ঠিত এবং যার ওপর তার আশপাশের গোটা প্রকৃতি ও বিশ্ব নিখিল প্রতিষ্ঠিত। আর এই সত্য প্রকাশিত না হয়েই পারে না, চিরস্থায়ী না হয়েই পারে না এবং বাতিলের ফেনা অপসৃত হয়ে তা স্থিতিশীল হতে বাধ্য।

এ আয়াতে দ্বিতীয় যে সত্য বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, ‘তিনিই মানুষের আকৃতি দিয়েছেন এবং আকৃতিকে চমকপ্রদ বানিয়েছেন।’ এ উক্তি দ্বারা মানুষকে বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহর কাছে সে পরম সম্মানিত এবং তার আকৃতিকে সুন্দর বানিয়ে তিনি তার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। শুধু যে দৈহিকভাবেই তাকে সুঠাম ও সুন্দর বানিয়েছেন তা নয়, বরং তাকে চেতনা ও বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়েও সুষম এবং সুন্দর বানিয়েছেন। এ জন্যেই মানুষ দৈহিক গঠনে যেমন পৃথিবীর সবচেয়ে পূর্ণাংগ প্রাণী, তেমনি চেতনা ও আত্মিক যোগ্যতার দিক দিয়েও সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর প্রাণী। আর এ জন্যে তাকেই পৃথিবীর খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং এই সুপরিসর রাজ্যের ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে, যা কিনা তার নিজের তুলনায় অতীব বিশাল ও প্রকান্ড!

মানুষের গোটা সত্ত্বা অথবা তার কোনো একটি অংগের নির্মাণ কৌশলের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় যে, এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও পূর্ণাংগ মানের সৌন্দর্য বজায় রাখা হয়েছে। যদিও এক এক আকৃতির সৌন্দর্য এক এক রকমের হয়ে থাকে, কিন্তু এর পরিকল্পনা অত্যন্ত চমৎকার ও পূর্ণাংগ। তাই মানুষ এদিক দিয়ে দুনিয়ার সকল প্রাণীর সেরা। ‘তার দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে।’ অর্থাৎ সকল সৃষ্টিকেই ফিরে যেতে হবে। এমনকি স্বয়ং মানুষকেও এবং এই বিশ্বজগতকেও। এ বিশ্বজগত ও মানুষ আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারেই জন্ম লাভ করেছে আবার তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। বস্তুত তিনি অনাদি ও অনন্ত। প্রতিটি জিনিসের আদিতেও তিনি, অন্তেও তিনি। তিনি অনন্ত অসীম।

এরপর চতুর্থ আয়াতে আল্লাহর সীমাহীন জ্ঞানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা প্রতিটি জিনিসের ওপর পরিব্যাপ্ত। মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সবই তিনি জানেন। বলা হচ্ছে,

'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে এবং তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো বা গোপন করো, তা সবই তিনি জানেন। তিনি অন্তরের গোপন কথাও জানেন।'

এই সত্যটি মোমেনকে তার প্রভু সম্পর্কে পরিচিত হতে সাহায্য করে। সে জানতে পারে যে, আল্লাহর চোখ থেকে সে কিছুই লুকাতে পারে না। আল্লাহর কাছ থেকে কোনো কিছুই সে গোপন করতে পারে না। এমন কি তার নিয়ত বা ইচ্ছা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা জানেন ও দেখতে পান।

এ ধরনের তিনটি আয়াতই মানুষের নিজের ও গোটা জগতের পরিচয়, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক কি, তাঁর সাথে কি রকম আচরণ করা উচিত এবং প্রতিটি কাজে তাঁকে কিভাবে ভয় করা উচিত তা উপলব্ধি করার জন্যে যথেষ্ট।

মানুষকে নবী রসূল হিসেবে পাঠানোর তাৎপর্য

সূরার দ্বিতীয় অংশে আল্লাহর রসূল ও কেতাবকে প্রত্যাখ্যানকারী এবং মানুষ কিভাবে রসূল হতে পারে এই প্রশ্ন উত্থাপনকারী অতীতের কাফেরদের প্রসংগ উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কার মোশরেকরাও প্রশ্ন তুলতো যে, মানুষ কিভাবে রসূল হয়। আর এ প্রশ্ন তুলে আল্লাহর দ্বীনের যে দাওয়াত রসূল দিতেন, তা অস্বীকার করতো। বলা হচ্ছে, 'ইতিপূর্বে যারা কুফরী করেছে তাদের খবর কি তোমাদের কাছে আসেনি? তারা তাদের কর্মফল ভুগেছে। অধিকন্তু তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। ....'

এখানে 'তোমাদের' সর্বনামটি দ্বারা খুব সম্ভবত মক্কার মোশরেকদের সম্বোধন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি সম্পর্কে তাদের সাবধান করা হয়েছে এবং অনুরূপ পরিণতি থেকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে প্রশ্নের মাধ্যমে প্রকারান্তরে এ কথাই বলা হয়েছে যে, অতীতের কাফেরদের কুফরীর শাস্তি ভোগ করার বৃত্তান্ত জানার পরও তোমাদের হুঁশ হয়নি। তাদের ইতিহাসের দিকে মক্কার মোশরেকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রশ্নের উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা তারা অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত সেসব কাফের জাতির কিছু কিছু কাহিনী জানতো এবং পরস্পরকে অবহিত করতো। উত্তর ও দক্ষিণে ভ্রমণ কালে তাদের পরিত্যক্ত এলাকাগুলো দিয়ে তাদের চলাচলও করতে হতো। বিশেষত আদ, সামুদ ও লূতের জাতিগুলোর কথা তারা জানতো এবং তাদের পরিত্যক্ত স্থানও তারা চিনতো।

কোরআন তাদের ইহকালীন পরিণতির সাথে আখেরাতের অবধারিত শাস্তির কথাও উল্লেখ করছে। সে বলছে, 'অধিকন্তু তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'

অতপর যে কারণে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তির যোগ্য হয়েছে সেই কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'এর কারণ এই যে, যখনই তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে রসূল আসতো, তখনই তারা বলতো, কী ব্যাপার! একজন মানুষ আমাদের হেদায়াত করছে! মক্কার মোশরেকরাও অবিকল এই আপত্তিই রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে তুলে ধরতো। নবুওত ও রেসালাতের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতই এই আপত্তি তোলা হতো। আসলে নবীরা যে বিধানের দিকে আহবান জানান, তা মানুষের জন্যে আল্লাহর রচিত বিধান। তাই এ বিধান বাস্তবে একজন মানুষের জীবনেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন, যাতে অন্যরা সাধ্যমত তার অনুকরণ করতে পারে। কিন্তু নবুওতের এই ভূমিকার কথা তারা জানে না বলেই উক্ত আপত্তি তুলে থাকে। নবী যদি মানুষ না হয়ে অন্য কিছু হতেন, তাহলে তিনি সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক থাকতেন। ফলে সাধারণ মানুষের

কাছে নবীর জীবন কোনো বাস্তব অনুকরণযোগ্য আদর্শ হতে সক্ষম হতো না, আর মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সেই আদর্শের বাস্তবায়নও সম্ভব হতো না। মানুষের মধ্য থেকে নবী প্রেরণে আপত্তি তোলার আরো একটা কারণ হলো, মানুষের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে মোশরেকদের অজ্ঞতা। আকাশ থেকে পাওয়া বার্তাকে একজন মানুষ যতোটা অনায়াসে অন্য মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে, তাদের প্রস্তাব অনুসারে কোনো ফেরেশতা নিযুক্ত হলে এ কাজটা অতো সহজে করতে পারতো না। তাকে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বার্তা ফেরি করে বেড়াতে হতো। মানুষের ভেতরে আল্লাহর যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়েছে, তার বদৌলতে সে আল্লাহর বার্তা গ্রহণ ও পূর্ণাংগভাবে তা অন্যের কাছে পৌঁছানোর– এক কথায় রেসালাতের পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করে। এটা গোটা মানব জাতির জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি বিশেষ মর্যাদা। আল্লাহর কাছে মানুষের এই মর্যাদার কথা যে জানে না, কেবল সে-ই এ ব্যাপারটা অস্বীকার করতে পারে। বস্তুত রেসালাতের দায়িত্ব পালন করার সময়ে একজন মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বায় আল্লাহর রূহ ফুঁকে দেয়ার প্রকৃত মর্মই বাস্তব রূপ লাভ করে থাকে। মানুষের মধ্য থেকে নবীর আবির্ভাবে আপত্তি তোলার আরো একটা কারণ হলো; অহংকারবশত মানুষ রসূলের অনুসরণ করতে মোশরেকদের অসম্মতি। ভাবখানা এই যে, এতে যেন সেসব মূর্খ অহংকারীর সম্মানের হানি ঘটে। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টি নবী হলে তার আনুগত্য করাতে যেন কোনো সম্মান হানি হয় না। কেবল নিজেদের মধ্য থেকেই কেউ নবী বা রসূল হয়ে এলে তার আনুগত্য করায় যতো সম্মান হানি হয়।

এ কারণেই মোশরেকরা নবুওত অস্বীকার করলো। অথচ তাদের কাছে এর পেছনে কোনো সুস্পষ্ট যুক্তি ছিলো না, ছিলো কেবল অহংকার ও মূর্খতা। এই অহংকার ও মূর্খতার দরুনই তারা শেরক ও কুফরীর পথ বেছে নিলো।

'আল্লাহ তায়ালা তাদের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। আল্লাহ তায়ালা তো চিরদিনই স্বয়ংসম্পূর্ণ, চিরপ্রশংসিত।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাদের ঈমান ও আনুগত্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তিনি তো কখনোই তাদের কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। এই হচ্ছে তাদের সংবাদ, যারা ইতিপূর্বে কুফরী করেছে, অতপর তাদের কর্মফল ভুগেছে। আর এই হচ্ছে তাদের ইহ-পরকালীন শাস্তি ভোগের কারণ। এ সংবাদ জানার পর নতুন করে আবার কেন লোকেরা কুফরী করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে? একই ধরনের পরিণাম ভোগ করার জন্যেই কি এ ধৃষ্টতা?

কেয়ামত অস্বীকারকারীদের করুণ পরিণতি

এরপর শুরু হচ্ছে সূরার তৃতীয় অংশ। এটা আসলে দ্বিতীয় অংশেরই পরিপূরক। এখানে যারা আখেরাতে পুনরুত্থান অস্বীকার করেছে তাদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এটা সুবিদিত কথা যে, রসূল (স.)-এর আমলের মোশরেকরা এটা অস্বীকার করেছিলো। এ অংশে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে. তিনি যেন আখেরাতে পুনরুত্থানের বিষয়টি আবারো জোর দিয়ে ঘোষণা করেন। এ অংশে কেয়ামতের দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে এবং কাফের ও মোমেনদের কী পরিণাম হবে তাও দেখানো হয়েছে। সেই সাথে তাদের ঈমান ও আনুগত্যের দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং জীবনে যা কিছুই ঘটুক, তা আল্লাহর ওপর সমর্পণ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, কাফেররা ধারণা করেছে যে, তাদের কখনো পুনরুজ্জীবিত করা হবে না। 'তুমি বলো, আল্লাহর কসম, অবশ্য অবশ্যই তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে........ আল্লাহর ওপরই সকল নির্ভরকারীর নির্ভর করা উচিত।'

শুরুতেই কাফেরদের উক্তিকে 'ধারণা' বলে আখ্যায়িত করে প্রথম বিবরণেই তা মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতপর রসূলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি যেন আল্লাহর কসম খেয়ে জোর দিয়ে বলেন, আখেরাত অকাট্য ও অবধারিত। বস্তুত আল্লাহর রসূল আল্লাহর নামে কসম খেয়ে যে কথা বলেন, তার চেয়ে অকাট্য সত্য আর কিছু হতে পারে না। বলা হয়েছে, 'তুমি বলো, হাঁ আল্লাহর কসম, তোমরা অবশ্য অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হবে, অতপর তোমরা যা যা করেছো তা তোমাদের জানানো হবে।' কেননা, কোনো কৃতকর্মই বৃথা ও নিষ্ফল যাবে না। তার কিছু না কিছু ফলাফল থাকবেই, আর আল্লাহ তায়ালা তাদের চেয়েও তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে বেশী ওয়াকেফহাল। তাই কেয়ামতের দিন তিনি তাদের সেসব কৃতকর্ম অবহিত করবেন। 'আর এ কাজ আল্লাহর কাছে সহজ।' কেন সহজ হবে না, তিনি তো আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় গোপন এবং প্রকাশ্য বিষয় জানেন, সকলের মনের কথাও জানেন। তিনি সর্বশক্তিমান।

অতপর তাদের আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও রসূলের কাছে নাযিলকরা আলোর প্রতি ঈমান আনার আহবান জানানো হয়েছে। আলো হচ্ছে এই কোরআন এবং কোরআনে আলোচিত মহান সত্য ধর্ম, কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হওয়া গ্রন্থ বিধায় মূলতই একটি আলোর প্রদীপ আর আল্লাহ তায়ালা নিজেই আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি। কোরআন তার প্রভাবের দিক দিয়েও আলোর মশাল। কেননা, সে মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করে।

আর ঈমানের দাওয়াতের শেষে উপসংহারে তাদের এই বলে সতর্ক করেছে যে, তারা আল্লাহর কাছ থেকে কিছুই লুকাতে পারবে না। 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সকল কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত।'

এই আহবানের পর পুনরায় কেয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরে বলা হচ্ছে,

'যেদিন তোমাদের সমবেত হওয়ার দিনের জন্যে একত্র করা হবে, সেই দিনই হবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার দিন।'

কেয়ামতের দিনকে সমবেত হবার দিন বলার কারণ এই যে, সকল যুগের সকল সৃষ্টিকে এই দিন একত্রিত করা হবে। সেদিন ফেরেশতারাও একত্রিত হবে। ফেরেশতাদের সংখ্যা যে কত, তা আল্লাহ তায়লা ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে একটি হাদীস দ্বারা এ সম্পর্কে একটি ধারণা করা যায়। আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, 'আমি যতো কিছু দেখতে পাই, তোমরা ততো কিছু দেখতে পাওনা। আমি যতো কিছু শুনতে পাই তোমরা ততো কিছু কিছু শুনতে পাও না। আকাশ বিলাপ করছে এবং তার বিলাপ করার কথাও বটে। সমগ্র আকাশের প্রতি চার আংগুল পরিমাণ জায়গায় একজন করে ফেরেশতা আল্লাহর সামনে সাজদারত রয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি যতো কিছু জানি তা যদি তোমরা জানতে, তবে কম হাসতে ও বেশী কাঁদতে। এমনকি বিছানার ওপরে স্ত্রীদের সাথে তোমরা আমোদ ফুর্তি পর্যন্ত করতে না। তোমরা পাহাড় পর্বতে গিয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে, বস্তুত আমার মনে চায়, আমি যদি একটা গাছ হয়ে সবাইকে রক্ষা করতে পারতাম।' (তিরমিযী)

যে আকাশের চার আংগুল পরিমাণ জায়গাও অন্তত একজন ফেরেশতা থেকে খালি নেই, তাও এত বিশাল ও প্রকান্ড যে, তার কোনো সীমা পরিসীমা মানুষের জানা নেই। এই আকাশে আমাদের সূর্যের মতো এক একটি সূর্য মহাশূন্যে উড়ন্ত এক একটি ধূলিকণার মতো ক্ষুদ্র। এতে মানুষের কল্পনা ফেরেশতাদের প্রকৃত সংখ্যার কাছাকাছি যেতে পারে কিনা ভেবে দেখার বিষয়।

এতদসত্ত্বেও এই বিপুল সংখ্যক ফেরেশতা কেয়ামতের দিন আল্লাহর অগণিত সৃষ্টির যে সমাবেশ হবে, সে সমাবেশের একটি অংশ মাত্র হবে।

এই সমাবেশেরই একটি দৃশ্যপটে 'তাগাবুন' সংঘটিত হবে। তাগাবুন এসেছে 'গাবান' ধাতু থেকে। গাবান অর্থ ক্ষয়ক্ষতি, তাগাবুন অর্থ হচ্ছে পরস্পরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ও নিজে লাভবান হওয়ার প্রতিযোগিতা। মোমেনদের জান্নাতের অগাধ সম্পদ লাভ করা ও কাফেরদের তা থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে যাওয়ার দৃশ্য এ শব্দ থেকে ফুটে ওঠেছে। বস্তুত এ হলো দুটো পরস্পর বিরোধী পরিণতি। সেখানে প্রতিযোগিতা হবে এক দল কর্তৃক নিজে সব কিছু পাওয়ার এবং অপর দলকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করার। সেখানে মোমেনরা হবে সফলকাম আর কাফেররা হবে ব্যর্থ ও পরাজিত। সুতরাং এটা এই দৃশ্যমান ও চলমান অর্থে তাগাবুন তথা লাভবান ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার প্রতিযোগিতা, পরবর্তী দুটি আয়াতে এর ব্যাখ্যা লক্ষণীয়,

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন.................... '

ঈমান আনয়নের আহবানকে পূর্ণতা দানের আগে তাকদীর বা অদৃষ্টের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভংগি কী ও হৃদয়ের হেদায়াত লাভে আল্লাহর প্রতি ঈমানের কার্যকারিতা কতটুকু, পরবর্তী আয়াতগুলোতে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٢﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

রুকু ২

১১. আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত (কোনো) বিপদই আসে না; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন; আর আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছেন। ১২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, তোমরা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে (জেনে রেখো), আমার রসূলের দায়িত্ব (হচ্ছে আমার কথাগুলো) সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। ১৩. আল্লাহ তায়ালা (মহান সত্তা), তিনি ছাড়া কোনোই মাবুদ নেই, অতএব প্রতিটি ঈমানদার বান্দার উচিত সর্ববিষয়ে তাঁর ওপরই নির্ভর করা। ১৪. হে ঈমানদার লোকেরা, অবশ্যই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মাঝে তোমাদের (কিছু) দুশমন রয়েছে, অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো, অবশ্য তোমরা যদি (তাদের) অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদের মাফ করার নীতি অবলম্বন করো, তবে আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১৫. তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি হচ্ছে (তোমাদের জন্যে) পরীক্ষা মাত্র; (আর এ পরীক্ষায় কামিয়াব হতে পারলে) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার কাছে মহাপুরস্কার রয়েছে। ১৬. অতএব তোমরা সাধ্য মোতাবেক আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তোমরা (রসূলের আদেশ) শোনো এবং (তাঁর) কথামতো চলো, আল্লাহর দেয়া ধন সম্পদ থেকে (তাঁরই উদ্দেশে) খরচ করো, এতে তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণ রয়েছে; যে ব্যক্তিকে তার মনের লোভ লালসা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে (সে এবং তার মতো) লোকেরাই হচ্ছে সফলকাম।

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ঋণ দাও– উত্তম ঋণ, তাহলে (দুনিয়া ও আখেরাতে) তিনি তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তিনি তোমাদের (গুনাহ খাতা) মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা বড়োই গুণগ্রাহী ও পরম ধৈর্যশীল, ১৮. দেখা-অদেখা (সব কিছুই) তিনি জানেন, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর

আয়াত ১১-১৮

'কোনো বিপদই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সংঘটিত হয় না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তায়ালা তার হৃদয়কে হেদায়াত দান করেন, আর আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে অবগত।'

ভালো মন্দ সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়

এখানে এ বিষয়টি আলোচনার পটভূমি শুধু এটাই যে, সূরার এ অংশটির সূচনাতেই ঈমানের আহবান জানানো হয়েছে। এখানে বুঝানো হয়েছে, যে ঈমানের আহবান জানানো হয়েছে, তা প্রতিটি জিনিসের কৃতিত্ব বা দায়দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহকেই দিয়ে থাকে এবং এইরূপ বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করে যে, ভালোমন্দ যাই হোক, কেবলমাত্র আল্লাহর অনুমতিক্রমেই সংঘটিত হয়ে থাকে। এই সত্য মেনে না নিলে ঈমানই আনা হয় না। জীবনের শুভ-অশুভ যাবতীয় ঘটনার মুখোমুখি হবার সময় এটাই হয়ে থাকে মোমেনের যাবতীয় আবেগ অনুভূতির ভিত্তি ও উৎস।

এমনও হতে পারে যে, এই সূরা নাযিল হবার সময় বাস্তবিকপক্ষে মোমেনদের ও মোশরেকদের মধ্যে এমন কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো, যা এই সূরার বা সূরার এই আয়াতের পটভূমি হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

তবে পটভূমি যাই হোক, ইসলাম মোমেনের বিবেকে যে ঈমানী ভাবধারার সৃষ্টি করে, এটি তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সে প্রতিটি ঘটনায় ও প্রতিটি তৎপরতায় আল্লাহর হাত সক্রিয় দেখতে পায় এবং তার লাভ লোকসান বা সুখ দুঃখ যাই অর্জিত হোক, তাতে তার মন শান্ত, নিশ্চিন্ত, স্থির ও অবিচল থাকে। দুঃখ ও ক্ষয়ক্ষতি হলে ধৈর্যধারণ করে, আর সুখ শান্তি অর্জিত হলে শোকর করে। কখনো কখনো এর চেয়েও উচ্চতর মানে উন্নীত হয়ে সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থাতেই শোকর আদায় করে। সুখের ন্যায় দুঃখেও সে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত দেখতে পায়। কেননা, দুঃখে বা বিপদে তার আত্মশুদ্ধি ও গুনাহ মাফ হওয়ার সুযোগ লাভ হয়ে থাকে এবং সওয়াবের পাল্লা উভয় অবস্থায়ই ভারী দেখতে পায় অথবা উভয় অবস্থায়ই সঠিক কল্যাণ দেখতে পায়।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে রসূল (স.) বলেন,

'মোমেনের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন ধরনের। আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে যে ফয়সালাই করেন, তা তার জন্যে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। তার ওপর যদি বিপদ আপদ আসে, তবে সে ধৈর্যধারণ করে এবং সেটা তার জন্যে কল্যাণকর হয়। আর যদি সুখশান্তি আসে তবে সে শোকর আদায় করে এবং সেটাও তার জন্যে কল্যাণকর হয়। এমন অবস্থা মোমেন ছাড়া আর কারো হয় না।'

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার হৃদয়কে সুপথে চালিত করেন।'

কোনো কোনো প্রাচীন তাফসীরকার এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, আল্লাহর অদৃষ্ট বা তাকদীরে ঈমান আনা ও তার কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই হৃদয়ের এই সুপথপ্রাপ্তি বা হেদায়াত অর্জিত হয়। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা তার হৃদয়কে পরিপূর্ণ হেদায়াত দান করেন। আল্লাহর গোপন তথ্যের সন্ধান দেন এবং তাকে সকল জিনিস ও ঘটনাবলীর মূল উৎস অবহিত করেন। ফলে সে ঘটনাবলীর প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। তাই সে নিশ্চিন্ত ও স্থির থাকে। অতপর পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করে। ফলে ক্রুটিপূর্ণ আংশিক জ্ঞানের আর কোনো প্রয়োজন তার থাকে না।

এ জন্যে আয়াতের শেষাংশে মন্তব্য করা হয়েছে,

'আল্লাহ তায়লা সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।'

বস্তুত আল্লাহর জ্ঞানেরই একটা অংশের সন্ধান তিনি দিয়ে থাকেন যাকে হেদায়াত করতে চান তাকে। এ জন্যে শর্ত হচ্ছে বিশুদ্ধ ঈমান। ঈমান বিশুদ্ধ হলে সকল পর্দা অপসৃত হয়ে কিছু কিছু গোপন তত্ত্ব উদঘাটিত হয়।

অতপর পরবর্তী আয়াতে ঈমানের দাওয়াতেরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহর আনুগত্য ও রসূলের আনুগত্যের আহবান জানানো হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও রসূলের আনুগত্য করো। কিন্তু যদি তা না করো তবে জেনে রেখো, আমার নবীর দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচারের অতিরিক্ত কিছু নয়।'

যারা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে, তাদের পরিণতি কী হয়েছে তা ইতিপূর্বে জানানো হয়েছে, আর এখানে বলা হচ্ছে যে, রসূল (স.) একজন প্রচারক ছাড়া আর কিছু নন। তিনি যখন প্রচার করেছেন তখন তাঁর দায়িত্ব পালন শেষ হয়েছে। এরপর যারা অস্বীকার করেছে তাদের ফলাফল পাওয়াটাই শুধু বাকী।

স্ত্রী, পুত্র, পরিজন যেন তোমাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত না করে

পরবর্তী আয়াতে তাদের প্রত্যাখ্যান করা তাওহীদতত্ত্ব এবং আল্লাহর সাথে মোমেনদের কিরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, আর আল্লাহর ওপরই মোমেনদের নির্ভর করা উচিত।'

বস্তুত তাওহীদ বিশ্বাসই ঈমানের ভিত্তি। আর এর দাবী এই যে, একমাত্র আল্লাহর ওপরই মোমেনের তাওয়াক্কুল করা চাই। এটাই মোমেনের হৃদয়ে ঈমানী চেতনার কার্যকারিতার স্বাক্ষর।

এই আয়াতকে মোমেনদের প্রতি পরবর্তী সম্বোধনের ভূমিকা বলা যেতে পারে। সূরার পূর্ববর্তী অংশের সাথে পরবর্তী অংশের এটাই যোগসূত্র।

শেষাংশে মোমেনদের নিজ স্ত্রী, সন্তান ও সহায় সম্পদের অগ্নিপরীক্ষা সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে এবং তাদের আল্লাহর ভয়, নেতার আনুগত্য ও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে এবং কৃপণতা থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলা হয়েছে। এ সব নির্দেশ মেনে চললে তাদের জীবিকা বৃদ্ধি, গুনাহ মাফ, ও সার্বিক কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সর্বশেষে প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ে আল্লাহর নির্ভুল জ্ঞান, তাঁর ক্ষমতা ও পরাক্রম এবং বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতার কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'হে মোমেন ব্যক্তিরা! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে তোমাদের শত্রু রয়েছে। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান হও। ....

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, মক্কাতে ইসলাম গ্রহণকারী কিছু লোক মদীনায় রসূল (স.)-এর কাছে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু তাদের স্ত্রীরা ও সন্তানেরা তাদের যেতে বাধা দেয়। পরে যখন তারা মদীনায় যায়, দেখতে পায় যে, অন্য যারা আগে এসেছে তারা ইসলামে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করে ফেলেছে। তাই তারা (ক্রুদ্ধ হয়ে) নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের শাস্তি দিতে চায়। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন যে, 'তোমরা যদি ক্ষমা করে দাও তবে আল্লাহও ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।'

তবে কোরআনের আলোচ্য আয়াত উক্ত আংশিক ঘটনার তুলনায় ব্যাপকতর তাৎপর্যবহ। কেননা, এ আয়াতে স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, তা পরবর্তী আয়াতে উচ্চারিত সন্তান সন্ততি ও ধনসম্পদ সংক্রান্ত সতর্কবাণীর মতোই। পরবর্তী আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, 'তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি হচ্ছে তোমাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ।' স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে শত্রু রয়েছে এই সতর্কবাণী মানব জীবনের একটি নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে ইংগিত করছে।

বস্তুত স্ত্রীরা ও সন্তানেরা কখনো কখনো আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয়। অনুরূপভাবে তারা মোমেনকে তার ঈমানের দাবী পূরণে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে, যখন তা তাকে আল্লাহর পথে জেহাদকারীর ন্যায় ঝুঁকির সম্মুখীন করে তোলে। আল্লাহর পথে জেহাদকারীকে অনেক ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ কোরবানী স্বীকার করতে হয়। এতে সে নিজে ও তার পরিবার নিদারুণ অভাব এবং দারিদ্রেরও সম্মুখীন হয়। কখনো সে নিজের আর্থিক কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু তার স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থিক অনটন সহ্য করতে পারে না। ফলে হয় কৃপণতার আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর পথে ব্যয়ে ইতস্তত করে, নচেৎ কাপুরুষতা প্রদর্শন করে, যাতে পরিবার পরিজনের শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রাচুর্যের ঘাটতি না হয়। এভাবে পরিবার পরিজন তার শত্রুতে পরিণত হয়। কেননা, তারা তাকে কল্যাণ থেকে এবং তার মানব জন্মের মূল উদ্দেশ্য পূরণ থেকে ফিরিয়ে রাখে। কখনো কখনো তারা প্রত্যক্ষভাবেও বাধা দিতে পারে এবং ভিন্ন মতাবলম্বী হয়ে তার পথ রোধ করতে পারে। এটাও শত্রুতার ভিন্ন রূপ, আর এ সবই মোমেনের জীবনে সব সময় ঘটে থাকে।

এ কারণে এই জটিল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মোমেনদের সাবধান করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অতপর সন্তান সন্ততি ও ধনসম্পদকে ফেতনা হিসাবে উল্লেখ করে পুনরায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

এখানে ফেতনা শব্দের দুই অর্থ, প্রথমত এই যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সন্তান সন্ততি ও ধনসম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করতে চান। তাই তোমরা সাবধান হয়ে যাও এবং পরীক্ষার সময়ে আল্লাহর প্রতি একাগ্র হও। স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণকে আগুনে পুড়িয়ে খাদ বের করে ও খাঁটি স্বর্ণ বানায়, তেমনি আল্লাহ বান্দাকে সন্তান ও ধনসম্পদের পরীক্ষা দ্বারা খাঁটি বান্দায় পরিণত করেন।

দ্বিতীয়ত, এই সব ধনসম্পদ এবং সন্তান সন্ততি তোমাদের গুনাহ ও আল্লাহর নাফরমানীর মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারে। কাজেই সতর্ক হও যেন এই ফেতনা তোমাদের আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে না পারে।

এই উভয় অর্থই নিকটতর এবং গ্রহণযোগ্য।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, একদিন রসূল (স.) খোতবা দিচ্ছিলেন। এই সময়ে হাসান ও হোসাইন এলো। তাদের গায়ে লাল দুটো জামা ছিলো। তারা চলছিলো এবং আছাড় খাচ্ছিলো। রসূল (স.) মেম্বর থেকে নামলেন এবং তাদের উভয়কে তুলে নিজের সামনে এনে রাখলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন, তোমাদের সন্তান সন্ততি ও ধন সম্পদ ফেতনা স্বরূপ। এই শিশু দুটিকে দেখলাম আছাড় খেতে খেতে হেঁটে চলেছে। আমি ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না। খোতবা বন্ধ করে তাদের তুলে আনলাম। চিন্তার বিষয় যে, নিজের মেয়ের ছেলে দুটিকে নিয়ে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স.)-এর অবস্থা যখন এরূপ, তখন ব্যাপারটা সত্যই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং মানুষের হৃদয়ে যে ভাবাবেগ ও স্নেহমমতা সৃষ্টি করেছেন, তা যাতে তাকে সীমা অতিক্রম করতে প্ররোচিত না করতে পারে, সে জন্যে এই সতর্কবাণী ছিলো অত্যন্ত জরুরী। তা না হলে মোমেনের শত্রু যতোটা ক্ষতি করতে পারে, এই মায়ামমতা ততোটাই ক্ষতি করতে পারতো।

এ জন্যেই ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির ফেতনা এবং সন্তান ও স্ত্রীদের পক্ষ থেকে প্রচ্ছন্ন শত্রুতা সম্পর্কে সাবধান করার পর আল্লাহর কাছে যে পুরস্কার রয়েছে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দুনিয়াতে বান্দার জন্যে ফেতনা তো রয়েছেই, তবে আল্লাহর কাছে তার জন্যে পুরস্কারও রয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে মোমেনদের সাধ্যমতো আল্লাহর ভয় ও আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে,

'সুতরাং তোমরা যতোটা সম্ভব আল্লাহকে ভয় করো এবং শ্রবণ করো ও আনুগত্য করো......... ।'

যতোটা সম্ভব' এই কথাটার মধ্যে বান্দাদের প্রতি আল্লাহর স্নেহমমতা এবং বান্দার আনুগত্য ও আল্লাহ ভীতির শক্তি সামর্থ কতখানি, তা ফুটে ওঠেছে। বোখারী ও মুসলিমে আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূল (স.) বলেছেন, আমি যখন তোমাদের কোনো কাজের আদেশ করি, তখন তোমরা যতোটা পারো করবে, আর যখন কোনো কিছু থেকে নিষেধ করি তখন তা পরিহার করবে।' এ থেকে বুঝা গেলো যে, আদেশের আনুগত্যের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। তাই তা যতোটা সম্ভব করতে হবে, কিন্তু নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরিভাবেই মেনে চলতে হবে।

অতপর তাদের দান করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যে উত্তম সম্পদ দান করো।'

বস্তুত মোমেনরা নিজেদের কল্যাণের জন্যেই দান করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন উত্তম সম্পদ দান করে। এভাবে তিনি দান করা সম্পদকে দানকারীদের জন্যেই কল্যাণকর বলে আখ্যায়িত করছেন। সেই সাথে তিনি মনের সংকীর্ণতা ও কৃপণতাকে আর একটি অনিবার্য পরীক্ষা হিসাবে আখ্যায়িত করেন। যে ব্যক্তি কৃপণতা থেকে রক্ষা পায় সে যথার্থই সৌভাগ্যশালী। এ জিনিস থেকে রক্ষা পাওয়া আল্লাহর অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যারা নিজের মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা পায় তারাই সফলকাম হয়।'

অতপর আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'তোমরা যদি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তাহলে তিনি তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন। আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত শোকর আদায়কারী ও ধৈর্যশীল।'

ভাবলে অবাক হতে হয় যে, আল্লাহ কতো মহৎ। কতো উদার! তিনিই বান্দাকে সৃষ্টি করেন, জীবিকা দেন, অতপর যা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত তা দান করতে বলেন, দান করলে তাকে ঋণ হিসাবে আখ্যায়িত করেন, তার প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধি করেন, অতপর তার জন্যে শোকরও করেন। যে বান্দাকে তিনি সৃষ্টি করেন ও জীবিকা দেন, তার কাছে শোকর জ্ঞাপন করেন। আর বান্দা শোকর আদায়ে ভুল করলে তাতে ধৈর্যধারণ করেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাঁর নিজের গুণাবলী দ্বারা শিক্ষা দেন কিভাবে আমাদের ক্রটি ও দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠতে পারি, কিভাবে ক্রমাগত উর্ধ্বে ওঠতে পারি এবং কিভাবে নিজেদের ক্ষুদ্র ও সীমিত শক্তির আওতায় তাঁর অনুকরণ করতে পারি। তিনি তো তাঁরই সৃষ্ট আত্মা মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। এভাবে তাকে সর্বদা সাধ্যমতো উচ্চতর মানে উন্নীত হবার অভিলাষী বানিয়েছেন। এজন্যে উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত হবার সুযোগ সব সময় তার জন্যে উন্মুক্ত থাকে, যাতে সে পর্যায়ক্রমে সাধ্যমতো উন্নতির উচ্চতর মার্গে আরোহণের চেষ্টা করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়।

সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সেই গুণের উল্লেখ করেছেন যা দিয়ে তিনি মানুষের অন্তর্যামী হয়েছেন। বলেছেন,

'তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছু জানেন, তিনি মহাপরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞানী।'

বস্তুত প্রতিটি জিনিস আল্লাহর জ্ঞানের কাছে উন্মুক্ত, তার কর্তৃত্বাধীন, তাঁর বিচক্ষণতা এবং দক্ষতা দ্বারা পরিচালিত ও পরিকল্পিত। মানুষের এমনভাবে জীবন যাপন করা কর্তব্য, যাতে প্রতি মুহূর্তে সে উপলব্ধি করে যে, আল্লাহর চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে, তাঁর কর্তৃত্ব তার ওপর বিরাজমান এবং তিনি নিজ নিপুণ কৌশল দ্বারা দৃশ্য অদৃশ্য সবকিছুর ব্যবস্থাপনা করছেন। হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকা আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও আনুগত্য বহাল থাকার জন্যে যথেষ্ট।

সূরা আত্ তালাক

আয়াত ১২ রুকু ২

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ج

وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ج لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ

يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ

ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝ فَاِذَا بَلَغْنَ

اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ

عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ط ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. হে নবী (তোমার সাথীদের বলো), যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দাও (বা দিতে ইচ্ছা করো), তখন তাদের ইদ্দতের (অপেক্ষার সময়টুকুর) প্রতি (লক্ষ্য রেখে) তালাক দিয়ো, ইদ্দতের যথার্থ হিসাব রেখো এবং (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের মালিক প্রভু, ইদ্দতের সময় (কোনো অবস্থায়ই) তাদের নিজেদের বসতবাড়ি থেকে বের করে দিয়ো না, (এ সময়) তারা নিজেরাও যেন তাদের ঘর থেকে বের হয়ে না যায়, তবে যদি তারা কোনো জঘন্য অশ্লীলতা (-জাতীয় অপরাদ) নিয়ে আসে (তাহলে তা ভিন্ন কথা, ইদ্দতের ব্যাপারে) এগুলোই হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা; যে ব্যক্তি আল্লাহর এ সীমারেখা অতিক্রম করে, সে (মূলত এটা দ্বারা) নিজের ওপরই নিজে যুলুম করলো; তুমি তো জানো না এর পর আল্লাহ তায়ালা হয়তো (পুনরায় তোমাদের মাঝে সহৃদয়তার কোনো) একটা পথ বের করে দেবেন। ২. অতপর যখন তারা তাদের (ইদ্দতের) সেই নির্ধারিত সময়ে (-র শেষে) উপনীত হয়, তখন তাদের হয় সম্মানজনক পন্থায় (বিয়ে বন্ধনে) রেখে দেবে, না হয় সম্মানের সাথে তাদের আলাদা করে দেবে এবং (উভয় অবস্থায়ই) তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে তোমরা সাক্ষী বানিয়ে রাখবে, (সাক্ষীদেরও বলো), তোমরা শুধু আল্লাহর জন্যেই (এ) সাক্ষ্য দান করবে; যারা আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান আনে, তাদের সবাইকে

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ

لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ

نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ

لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ

عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا

এর দ্বারা উপদেশ দেয়া হচ্ছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে (সংকট থেকে বের হয়ে আসার) একটা পথ তৈরী করে দেন, ৩. এবং তিনি তাকে এমন রেযেক দান করেন যার (উৎস) সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই; যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের কাজটি পূর্ণ করেই নেন; আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি জিনিসের জন্যেই একটি পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন। ৪. তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যারা ঋতুবতী হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের (ইদ্দতের) ব্যাপারে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে (তোমরা) জেনে রেখো, তাদের ইদ্দতের সময় হচ্ছে তিন মাস, (এ তিন মাসের বিধান) তাদের জন্যেও, যাদের এখনও ঋতুকাল শুরুই হয়নি; গর্ভবতী নারীর জন্যে ইদ্দতকাল হচ্ছে তার সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত; (বস্তুত) কেউ যদি আল্লাহকেই ভয় করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালাও (বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দিয়ে) তার জন্যে তার প্রত্যেক ব্যাপার সহজ করে দেন। ৫. (তালাক ও ইদ্দতের ব্যাপারে) এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আদেশ, যা তিনি (মেনে চলার জন্যেই) তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন; অতপর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে, তিনি তার গুনাহখাতাকে (তার হিসাব থেকে) মুছে দেবেন এবং তিনি তার পুরস্কারকেও বড়ো করে দেবেন। ৬. (ইদ্দতের এ সময়ে) তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী তাদের সে ধরনের বাড়িতে থাকতে দিয়ো, যে ধরনের বাড়িতে তোমরা নিজেরা থাকো, কোনো অবস্থায়ই তাদের ওপর সংকট সৃষ্টি করার মতলবে তাদের কষ্ট দিয়ো না; আর যদি তারা সন্তানসম্ভবা হয়, তাহলে (ইদ্দতের নিয়ম অনুযায়ী) তারা সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাদের খোরপোষ দিতে থাকো, (সন্তান জন্মদানের পর) যদি তারা তোমাদের

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ۝ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

সন্তানদের (নিজেদের) বুকের দুধ খাওয়ায়, তাহলে তোমরা তাদের পারিশ্রমিক আদায় করে দেবে এবং (এ পারিশ্রমিকের অংক ও সন্তানের কল্যাণের ব্যাপারটা) ভালোভাবে নিজেদের মধ্যে ন্যায়সংগত পন্থায় সমাধান করে নেবে, যদি তোমরা একে অন্যের সাথে জেদ করো, তাহলে অন্য কোনো মহিলা এ সন্তানকে দুধ খাওয়াবে; ৭. বিত্তশালী ব্যক্তি তার সংগতি অনুযায়ী (স্ত্রীদের) খোরপোষ দেবে; আবার যে ব্যক্তির অর্থনৈতিক সংগতি সীমিত করে রাখা হয়েছে সে ব্যক্তি ততোটুকু পরিমাণই খোরপোষ দেবে যতোটুকু আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করেছেন; আল্লাহ তায়ালা যাকে যে পরিমাণ সামর্থ দান করেছেন তার বাইরে কখনো (কোনো) বোঝা তার ওপর তিনি চাপান না; (আল্লাহর ওপর নির্ভর করলে) আল্লাহ তায়ালা (তাকে) অচিরেই অভাব অনটনের পর সচ্ছলতা দান করবেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এটি সূরা তালাক। এ সূরায় আল্লাহ তালাকের বিধিসমূহ বর্ণনা করেছেন। সূরা বাকারায় তালাকের কিছু বিধি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে যে সব বিধি বাদ পড়েছে, তা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে। তালাক পরবর্তী অবস্থা সংক্রান্ত কিছু পারিবারিক বিষয়ও এতে আলোচিত হয়েছে। যে তালাক আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী কার্যকরি হয়, সেই তালাকের উপযুক্ত সময় কোন্‌টি, তাও এতে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দতের সময়ে তালাক দাও।'

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর নিজ বাড়ীতে তথা তাকে তালাকদানকারী স্বামীর বাড়ীতেই থাকতে হবে। এটা তার অধিকারও এবং কর্তব্যও। সে ইদ্দতের ভেতরে সেখান থেকে বের হবে না, আর প্রামাণ্যভাবে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া ছাড়া তাকে সেখান থেকে বের করাও যাবে না।

ইদ্দত পেরিয়ে যাওয়ার পর তার সে বাড়ী থেকে বের হওয়ার অধিকার থাকবে, যাতে সে নিজের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কেননা, ইদ্দতের মধ্যে তার স্বামী স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তাকে দেয়া তালাক প্রত্যাহারও করেনি, তাকে স্ত্রী হিসাবে পুনর্বহালও করেনি। এই তালাক প্রত্যাহার ও স্ত্রী হিসাবে পুনর্বহালের উদ্দেশ্য যদি তার ক্ষতি করা, তাকে কষ্ট দেয়া এবং তার পুনর্বিবাহের পথ রোধ করা হয়, তা হলে সেটা অবশ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। বলা হয়েছে, 'যখন তাদের ইদ্দত পূর্ণ হবে তখন তাদের হয় স্বাভাবিকভাবে পুনর্বহাল করো, নতুবা ভালোভাবে বিচ্ছিন্ন করে দাও।' তবে পুনর্বহাল করাই হোক আর বিচ্ছিন্ন করাই হোক– 'দুজন সাক্ষীর সামনে তা করতে হবে।'

সূরা বাকারায় ঋতুবতী স্ত্রীর ইদ্দতের মেয়াদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই মেয়াদ হচ্ছে তিন ঋতু অথবা তিনটি ঋতুমুক্ত সময়। এ ব্যাপারে ফেকাহবিদদের মতভেদ রয়েছে। আর এখানে এই মেয়াদ বর্ণনা করা হয়েছে যাদের ঋতুর চির অবসান হয়ে গেছে এবং যেসব অপ্রাপ্তবয়স্কা কিশোরীর জন্যে, এখনো যাদের আদৌ রজস্রাব শুরুই হয়নি। বলা হয়েছে, 'তোমাদের স্ত্রীদের

মধ্যে যারা আর ঋতুবতী হবার আশা করে না, তাদের ব্যাপারে তোমরা সন্দিহান হলে তাদের ইদ্দত তিন মাস, আর যারা এখনো ঋতুবতী হয়নি, তাদেরও ইদ্দত তিন মাস।'

আর গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত বর্ণনা করা হয়েছে 'সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।'

অতপর তালাকপ্রাপ্তার বাসস্থান ও সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার ভরণ পোষণ সংক্রান্ত বিধি সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'যে বাসস্থানে তোমরা নিজেরা বসবাস করে আসছো এবং যা তোমাদের কাছে সহজলভ্য, সেই বাসস্থানেই তাদের (তালাক দেয়া স্ত্রীদের) থাকতে দাও।'

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভূমিষ্ঠ সন্তানের দুধ খাওয়া সংক্রান্ত বিধি– 'তারা যদি তোমাদের জন্যে তোমাদের সন্তানদের দুধ খাওয়ায়, তাহলে তাদের পারিশ্রমিক দাও .....।'

অতপর ভরণ পোষণ ও পারিশ্রমিক সংক্রান্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে– 'যার যেমন সাধ্য আছে তার তেমন ভরণ পোষণ দেয়া উচিত ...।'

এভাবে সূরার আয়াতগুলো তালাক ও তৎসংক্রান্ত প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধান দিয়েছে এবং তালাকের পরিণতিতে বিধ্বস্ত পরিবারটির পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বিধি ঘোষণা করেছে।

সূরাটি অধ্যয়ন করে পাঠক বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হয়ে পারে না। কেননা, এতে তালাকজনিত পরিস্থিতি ও তার ফলাফল সংক্রান্ত বহু সংখ্যক বিধি তুলে ধরার পাশাপাশি সতর্কবাণী ও আশ্বাসবাণী, প্রতিটি বিধির সাথে সাথে মন্তব্য, এই বিষয়টির সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর শক্তি ও পরাক্রমের সংযোগ, আল্লাহর আদেশ লংঘনকারীদের ব্যাপারে এবং আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের ব্যাপারে আল্লাহর শাশ্বত নীতি, বারংবার সদাচার, উদারতা, পারস্পরিক সন্তোষ ও সম্মতি, অপরের জন্যে ত্যাগ স্বীকার, কল্যাণকর কাজের আকাংখা পোষণ করার পুন পুন নির্দেশ প্রদান এবং সৃষ্টি করা ও জীবিকা বিতরণ করা আর অভাব ও প্রাচুর্যের ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনার বিস্ময়কর সমাবেশ ঘটেছে।

তালাক সংক্রান্ত আলোচনা প্রসংগে এত বিপুল সংখ্যক মহাজাগাতিক তত্ত্বের উল্লেখ দেখে মানুষ মাত্রেই অভিভূত না হয়ে পারে না। এখানে ব্যক্তিগতভাবে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করা হলেও এটা আসলে সকল মুসলমানের জন্যে সাধারণ নির্দেশ। রসূল (স.)-কে ব্যক্তিগতভাবে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য হলো বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি করা। প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধির এই বিশদ বিবরণ, এই বিধিসমূহ মেনে চলার জন্যে জোর তাগিদদান, এ বিধির বাস্তবায়নে আল্লাহর ভয় ও আল্লাহ সচেতনতার পথ অবলম্বন এবং সদাচারে উদ্বুদ্ধকরণ ও অসদাচার থেকে সতর্কীকরণের জন্যে এতো দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে যে, এ দ্বারা মনে হয় এটাই পরিপূর্ণ ইসলাম। বস্তুত এ বিষয়টি নিয়েই কোরআন বিস্তারিত আলোচনা করে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের কাজটি তদারক করে থাকে। এতে আল্লাহভীরু লোকদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, একজন মোমেনের পক্ষে যতোটা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হওয়া সম্ভব, ততোটাই উচ্চ মর্যাদায় তাকে উন্নীত করা হবে। পক্ষান্তরে যারা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত এবং যারা স্ত্রীদের ক্ষতি সাধনে তৎপর, তাদের কঠোরতম শাস্তির হুমকি প্রদান করা হয়েছে। সদাচার, উদারতা ও নম্র আচরণকারীদের জন্যে উত্তম পুরস্কার ও কল্যাণময় প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পড়ার সময় পাঠকের সামনে উল্লিখিত বক্তব্যগুলো পরিস্ফুট হবে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো।' .... 'এ হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা লংঘন করে, সে নিজের ওপর যুলুম করে।' ...... 'তুমি জানো না হয়তো পরবর্তীকালে আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছু সংঘটিত করবেন।' ..... 'দু'জন সৎ সাক্ষী

রাখো এবং আল্লাহর জন্যে সাক্ষ্য স্থাপন করো।' ...... ' এ হচ্ছে তাদের জন্যে উপদেশ, যারা আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতে বিশ্বাস করে।' ...... 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে একটা বহির্গমন পথ তৈরী করে দেন এবং সে কল্পনাও করতে পারে না এমন উপায়ে তাকে জীবিকা দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ তায়ালাই তার জন্যে যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নিজ লক্ষ্যে উপনীত হন। আল্লাহ তায়ালা সব জিনিসের জন্যেই একটা পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।' .... 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে তার কাজ সহজ করে দেন।' ..... 'এ হচ্ছে তোমাদের কাছে নাযিল করা আল্লাহর বিধান। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ মাফ করে দেন এবং তাকে উত্তম প্রতিদান দেন।' ....'আল্লাহ তায়ালা কঠিন অবস্থার পর সহজ অবস্থার উদ্ভব করবেন।'

এরপর তার সামনে নিম্নোক্ত হুমকিও আসে– 'অতীতে বহু জনপদের অধিবাসীরা তাদের প্রতিপালকের ও তাঁর রসূলদের আদেশ অমান্য করেছে। ফলে আমি তাদের কাছ থেকে কঠোরভাবে হিসাব নিয়েছি এবং তাদের নিকৃষ্টতম শাস্তি দিয়েছি। ফলত তারা তাদের কর্মফল ভোগ করেছে এবং তাদের শেষ ফল ছিলো দুর্গতি। আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

এরপরই সর্তবাণী উচ্চারিত হয়েছে উল্লিখিত ভয়াবহ পরিণতি থেকে। রসূল ও তাঁর সাথে কেতাবরূপী আলোকবর্তিকা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা যে নেয়ামত দান করেছেন তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বিরাট পুরস্কারের আশ্বাসও দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'অতএব হে ঈমানদার বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে স্মরণিকা নাযিল করেছেন আর রসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াতগুলো স্পষ্ট করে পড়ে শোনান, যাতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে আসতে পারেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন– যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরদিন বসবাস করবে। আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে চমৎকার জীবিকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'

এরপর পাঠক সর্বশেষ যে উক্তিটি পাঠ করে তা হচ্ছে, মহাজাগতিক প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত গুরুগম্ভীর ঘোষণা, 'আল্লাহ হচ্ছেন তিনি, যিনি সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন, আর পৃথিবী থেকেও অনুরূপ সাতটি। এ সবের মাঝেই আল্লাহর বিধান নাযিল হয়। যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে শক্তিমান এবং আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান।'

এ সব কিছুই তালাকের বিধানের উপসংহার স্বরূপ। এভাবে আমরা এই ধাঁচের একটি পূর্ণাংগ সূরা দেখতে পাই, যা পারিবারিক জীবনের এই বিশেষ অবস্থা, তা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমন্বয় ও সমাধান এবং জাগতিক ও মানসিক ক্ষেত্রে ঈমানের তত্ত্বগুলোর সাথে তার সংযোগ সাধনের ওপর কেন্দ্রীভূত। এটা ধ্বংসাত্মক অবস্থা, গঠনমূলক অবস্থা নয়। একটি পরিবারের ধ্বংস বা গঠন প্রক্রিয়া একটি রাষ্ট্রের ধ্বংস বা গঠন প্রক্রিয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

এর একাধিক তাৎপর্য রয়েছে।

এর সর্বপ্রথম তাৎপর্য হলো ইসলামী বিধানে পরিবারের গুরুত্ব সংক্রান্ত।

ইসলাম মূলত একটি পারিবারিক বিধান। পরিবার হচ্ছে মানুষের আশ্রয়স্থল ও মাথা গোঁজার ঠাঁই। এর আওতায়ই মানুষ স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি, সৌজন্য, সৌহার্দ, পরিচ্ছন্নতা, পরস্পরকে আগলে রাখা ও পরস্পরের দুর্বলতা ঢেকে রাখার প্রশিক্ষণ পায়। এই পরিবেশেই মানুষের শৈশবের সূচনা ও যৌবনের উদ্ভব হয়। এখান থেকেই সঞ্চারিত হয় মমতার আবেগ ও পারস্পরিক একাত্মতার বন্ধন।

এ কারণেই কোরআনের বিভিন্ন স্থানে পারিবারিক সম্পর্ককে এমন স্বচ্ছভাবে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে যে, তা থেকে সহানুভূতি ও আত্মীয়তার বন্ধন স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন সূরা 'আররূমে' আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে বাস করতে পারো, আর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে দয়া ও মমতার সৃষ্টি করেছেন।' সূরা 'আল বাকারায়' বলা হয়েছে, 'তারা তোমাদের জন্যে পোশাক স্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্যে পোশাক স্বরূপ।' এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, পরিবার হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সংযোগ সেতু, স্থিতি ও বসবাসের সংযোগ সেতু, দয়া ও সহানুভূতির সংযোগ সেতু এবং দুর্বলতা আগলে রাখা ও সদাচারের সংযোগ সেতু। এ আয়াত দুটির ভাষা থেকেই স্নেহ-মমতার ভাব ফুটে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে সেই সম্পর্ক ও সম্বন্ধের পূর্ণাংগ চিত্রই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা ইসলাম পরিবারের ন্যায় দয়ামায়ার বন্ধনে আবদ্ধ অটুট মানবীয় সংগঠনটির ওপর ফরয করে দিয়েছে। একই সাথে এই মানবীয় সংগঠনটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে মনুষ্য জীবনের সম্প্রসারণ। ইসলাম এই সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বানায় এবং এর দাবী ও চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সূরা বাকারার নিম্নোক্ত উক্তিতে এই ভাবধারা সুস্পষ্ট। যথা, 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত।' সংখ্যাধিক্য ও উর্বরতার বিষয়টি এ উক্তিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ইসলাম এই আশ্রয়স্থল বা প্রতিপালনস্থলকে নিজের সার্বিক প্রযত্ন ও তত্ত্বাবধানে লালন এবং সংরক্ষণ করে, আর ইসলামের সার্বিক প্রকৃতি অনুসারে এ ক্ষেত্রে সে শুধু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকে না, বরং আইনগত সংস্থাসমূহ আইনগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা দিয়েও তাকে সংহত করে।

কোরআন ও সুন্নাহতে পরিবারের প্রতিটি অবস্থা সংক্রান্ত আইনগত বিধিসমূহে, সংশ্লিষ্ট নীতিগত নির্দেশাবলীতে, এতদসংক্রান্ত মন্তব্যসমূহে এবং এ বিষয়টি সরাসরি আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করার মধ্যে যে জিনিসটি পরিলক্ষিত হয় এবং যে জিনিসটি পূর্ণাংগভাবে উপলব্ধি করা যায়, তা হলো, ইসলামী বিধি ব্যবস্থায় পরিবার অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ও আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এ বিষয়টি এই সূরাতে যেমন বিদ্যমান, তেমনি অনান্য সূরাতেও বিদ্যমান। সূরা নেসায় আল্লাহর ব্যাপারে ও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ব্যাপারে একই সাথে সতর্ক থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে। সূরা নেসার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মানব জাতি, তোমাদের সেই প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একই মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, একই মানুষ থেকে তার জোড়ও সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। যে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তোমরা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকো, তাঁকে ও রক্ত সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়দের ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।' অনুরূপভাবে সূরা বনী ইসরাঈলে ও অন্যান্য সূরায় একই সাথে আল্লাহর এবাদাত ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ দেয়া হয়েছে। সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে, 'তোমার প্রতিপালক স্থির করেছেন যে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো এবাদাত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।' সূরা লোকমানেও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার নির্দেশ একই সাথে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আমার শোকর করো এবং তোমার পিতামাতারও।'

পরিবারকে এই সর্বোচ্চ গুরুত্বদান প্রকৃতপক্ষে পরিবারের ভিত্তিতে গোটা মানব জাতিকে গড়ে তোলার খোদায়ী পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, মানব জাতির প্রথম ভিত্তিমূল হবে আদম (আ.) ও তদীয় স্ত্রীর পরিবার এবং সেই পরিবার থেকে বহু সংখ্যক মানুষের সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তায়ালা মাত্র কয়েকজন মানুষ থেকে এক সাথে লক্ষ লক্ষ

মানুষ সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু এই সৃষ্টির জীবনে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকবে এটাই ছিলো আল্লাহর প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। পরিবারকে তিনি এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন তার সামগ্রিক জীবনধারা পরিবারের প্রতিটি সদস্যের স্বভাব প্রকৃতি, সহজাত যোগ্যতা প্রতিভা এবং তার ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলীকে বিকশিত করে এবং তার জীবনে পরিবারের গভীরতম প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অতপর এই একই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে পৃথিবীতে প্রেরিত আল্লাহর সর্বশেষ বিধান ইসলামী বিধানের প্রতি। এই বিধান মানব জাতির প্রথম সৃষ্টির সাথে সমন্বিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছুই সৃষ্টি হয়, তার সাথে মানব সৃষ্টির একই রকম সংযোগ ও সমন্বয় রয়েছে।

আলোচ্য সূরায় এবং কোরআনের সর্বত্র দাম্পত্য ও পারিবারিক সম্পর্ককে এত গুরুত্ব দেয়ার দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, ইসলামী বিধান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে সর্বোচ্চ পবিত্রতার মর্যাদা দিয়েছে। সে পবিত্রতা স্বয়ং আল্লাহর সাথে সংযোগের মহিমায় ভাস্বর। ইসলামী বিধান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে শুধু যে সর্বোচ্চ পবিত্রতায় মন্ডিত করতে চায় তা নয়, বরং তাকে আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও চেতনাগত পরিচ্ছন্নতাদানের জন্যে পরিবারকে উপলক্ষ হিসাবে গ্রহণ করতে চায়। পৌত্তলিক আকীদা বিশ্বাস পোষণকারীরা পরিবার সম্পর্কে ঠিক এর বিপরীত মনোভাব পোষণ করতো। বিকৃত ধর্মের অনুসারীরাও আল্লাহর সৃষ্ট স্বভাব ধর্মের পরিপন্থী মনোভাব পোষণ করতো।

'ইসলাম মানুষের প্রকৃতির দাবীকে প্রতিহত বা প্রত্যাখ্যান করে না এবং তা খারাপ বা অপবিত্রও মনে করে না। সে শুধু একে শৃংখলাবদ্ধ ও পরিশীলিত করে এবং পাশবিক স্তর থেকে উন্নীত করে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়, যেখানে তা বহু সংখ্যক মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সদাচারের উৎসে পরিণত হয় এবং যৌন সম্পর্ককে এতটা উন্নত মানবিক চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে, যে দৈহিক মিলনকে তা মানসিক, আন্তরিক ও আত্মিক মিলনে, এক কথায় দুইটি মানুষের মিলনে রূপান্তরিত করে। এ দুটি মানুষের জীবন, আশা আকাংখা, দুঃখবেদনা ও ভবিষ্যত ভাগ্য হয় সম্পূর্ণ অভিন্ন। ভাবী বংশধরের মধ্যেও সেই একই ভাবধারা প্রতিফলিত হয় যা কিনা একই গৃহে জন্ম গ্রহণ করে এবং যার রক্ষণাবেক্ষণ করে সেই গৃহেরই সন্তানেরা।' (তাফসীর ফী যিলাল কোরআন, ১৮শ পারার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

ইসলাম বিয়েকে চরিত্রের পবিত্রতা, সততা ও উৎকর্ষ নিশ্চিত করার পন্থা ও মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করে। ব্যক্তি বিশেষের জন্যে যখন অর্থাভাব বিয়ে করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তখন গোটা মুসলিম সমাজকে আহ্বান জানায় তার সদস্য পুরুষ ও মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে । সূরা নূরে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের অবিবাহিত স্বাধীন পুরুষ ও মেয়েদের এবং বিবাহযোগ্য দাসদাসীদের বিয়ে দাও। তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদের সম্পদশালী বানিয়ে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা তো সব কিছু জানেন ও সব কিছু শোনেন। আর যারা বিয়ে করার আর্থিক সংগতি রাখে না, তারা যেন আল্লাহর অনুগ্রহে অভাব থেকে উদ্ধার না পাওয়া পর্যন্ত চরিত্রের হেফাযত করে।' ইসলামী পরিভাষায় বিয়ের আর এক নাম এহসান– যার শাব্দিক অর্থ হলো সংরক্ষণ। মোমেনদের মনে এ বিষয়টা চিরদিন বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, বিয়ে ছাড়া জীবন যাপন করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না– চাই তা যত ক্ষুদ্র সময়ের জন্যেই হোক না কেন। রসূল (স.)-এর কন্যা ফাতেমার (রা.) এন্তেকালের অব্যবহিত পর হযরত আলী (রা.) যখন বিয়ে করার জন্যে তাড়াহুড়া করেন, তখন এই বলে তার ব্যাখ্যা দেন, 'আমার আশংকা হয় যে, আমাকে বিপত্নীক অবস্থায় আল্লাহর সাথে দেখা করতে হবে।' এ থেকে বুঝা যায়, বিয়ে একজন মোমেনের কাছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সিঁড়িরূপে গণ্য একটি এবাদাত বিশেষ।' আর এ কারণে দাম্পত্য সম্পর্কও তার বিবেকের দৃষ্টিতে আল্লাহর এবাদাতের ন্যায় পবিত্র।

সূরা তালাক ও অনুরূপ অন্যান্য সূরার বক্তব্যের তৃতীয় তাৎপর্য এই যে, এ দ্বারা ইসলামী বিধানের বাস্তবতা এবং মানুষ ও পার্থিব জীবনের প্রতি তার স্বভাবসুলভ আচরণ প্রমাণিত হয়। সেই সাথে এও প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মানবতাকে অত্যন্ত সম্মানজনক স্তরে পৌঁছিয়ে দিতে চায়, আর সেটা করতে চায় তার সহজাত যোগ্যতা ও জীবনের বাস্তব সমস্যাবলীর মধ্য দিয়েই। এ জন্যে বিবেকনির্ভর এই বিষয়টি সম্পর্কে সে শুধু আইন জারি করেই ক্ষান্ত হয় না। শুধু উপদেশ দেয়াকেও যথেষ্ট মনে করে না; বরং মানব সত্ত্বার ও জীবনের বাস্তবতার মোকাবেলায় সে এই দুটিকেই কাজে লাগায়।

দাম্পত্য সম্পর্কের মূল কথা হলো স্থিতি ও স্থায়িত্ব। ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্কের স্থিতি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে পারে এমন সব ক'টি উপকরণ সরবরাহ করে, আর এ উদ্দেশ্যেই সে বিয়ে ও দাম্পত্য সম্পর্ককে এবাদাতের মর্যাদা দেয়। যে নর নারী দারিদ্রের কারণে বিয়ে করতে পারে না, তাদের সে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সাহায্য করে। দাম্পত্য প্রেম প্রণয় যাতে স্থায়ী হয় এবং পথেঘাটে ও বাজারে রূপের প্রদর্শনী করার দিকে মন যাতে আকৃষ্ট না হয়, সে জন্যে বিপথগামিতা ও উচ্ছৃংখল আচরণ প্রতিরোধকারী বিধিনিষেধ (পর্দার বিধান) আরোপ করে। একই উদ্দেশ্যে সে ব্যভিচার ও ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের বিরুদ্ধে দন্ডবিধি জারি করে। কোনো গৃহে বহিরাগতের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ ও গৃহের অভ্যন্তরেও পরিবারের সদস্যদের একে অপরের শয়নকক্ষে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে গৃহকে নিরাপদ, পবিত্র ও কলুষমুক্ত করে।

সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ককে সুশৃংখল বানায় এবং গৃহ ব্যবস্থাপনা দম্পতির যে সদস্য অধিকতর যোগ্য ব্যবস্থাপক তার নিয়ন্ত্রণে সোপর্দ করে, যাতে তা অরাজকতা, উচ্ছৃংখলতা ও বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে রক্ষা পায়। আবেগ উদ্দীপক উপদেশ প্রদান ও আল্লাহভীতির চেতনা সৃষ্টি ছাড়াও আরো যতো রকম নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব, তা প্রদান করে ইসলাম পরিবারকে সর্বপ্রকার দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে।

কিন্তু মানব জীবনের বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, সকল রকমের নিশ্চয়তা ও উপদেশাবলী সত্তেও কখনো কখনো এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকে, যা দাম্পত্য সম্পর্কের ধ্বংস ও বিনাশ অনিবার্য করে তোলে। এ ধরনের পরিস্থিতি বাস্তবানুগভাবে মোকাবেলা না করে উপায় থাকে না। এ ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হয় এবং তা অস্বীকার করে কোনো লাভ হয় না। কেননা, দাম্পত্য জীবন যাপন তখন একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা বৃথা ও ভিত্তিহীন হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলাম কখনো পবিত্র দাম্পত্য সম্পর্ককে নিয়ে এতো ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে না যে, প্রথম সুযোগেই এবং দাম্পত্য কলহের প্রথম ধাক্কাতেই তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। সে বরঞ্চ এ সম্পর্ককে মযবুত করে এবং সর্বাত্মক চেষ্টার পর নিরাশ হওয়া ছাড়া তাকে ধ্বংস হতে দেয় না।

ইসলাম পুরুষকে আহবান জানায়, 'স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো। তাদের যদি তোমাদের অপছন্দ হয়, তবে এমন কোনো কোনো জিনিস তোমাদের অপছন্দ হবে, যাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন।' এভাবে ইসলাম চরম অপ্রীতিকর অবস্থায়ও ধৈর্য সহনশীলতার পথে পুরুষদের পরিচালিত করে এবং অপছন্দনীয় নারীর মধ্যেও কল্যাণের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রাখে। বস্তুত অপছন্দনীয় স্ত্রীদের মধ্যেও যে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে কোনো কল্যাণ রাখেননি, সে কথা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না। আর তা যখন কেউ বলতে পারে না, তখন কল্যাণকে হারানো কিভাবে সমীচীন হতে পারে? অপছন্দের মনোভাব পরিবর্তন করা,

তার কুফল প্রতিরোধ করা এবং ভালোবাসা ও অনুরাগ পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে এর চেয়ে অলংকার সমৃদ্ধ ভাষা আর হতে পারে না। যা হোক, পরিস্থিতির যদি এতোদূর অবনতি ঘটে যে, পছন্দ অপছন্দের স্তর পেরিয়ে বিদ্রোহ ও ঘৃণার পর্যায়ে উপনীত হয়, তাহলেও ইসলাম প্রথম চোটেই তালাকের দিকে ধাবিত হয় না। সে বরঞ্চ তৃতীয় পক্ষের শুভাকাংখীদের জন্যে চেষ্টা তদবীর ও আপোষ মীমাংসার একটা সুযোগ রাখা অপরিহার্য মনে করে। সূরা নেসায় বলা হয়েছে, 'তাদের মধ্যে তোমরা যদি অ-বনিবনার আশংকা করো, তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন সালিস এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সালিস পাঠাও। তারা দুজনে যদি সংশোধন কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে বনিবনা সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা তো সর্ববিষয়ে জ্ঞানী ও অবগত।' .... আর কোনো স্ত্রীলোক যদি নিজের স্বামীর পক্ষ থেকে উপেক্ষা ও দাম্ভিকতার আশংকা করে, তা হলে তারা নিজেদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করিয়ে নিলেও মন্দ হয় না। আপোষই সর্বোত্তম।'

কিন্তু এই মধ্যস্থতার সুযোগ যদি না পাওয়া যায়, তাহলে ব্যাপারটি গুরুতর হতে বাধ্য। সে ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল রাখার চেষ্টাও ব্যর্থ হবে। জোর-জবরদস্তিতে ব্যর্থতা আরো প্রকট আকার ধারণ করবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের কাছে অপছন্দনীয় হওয়া সত্তেও বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটানো বিজ্ঞতার পরিচায়ক। মনে রাখতে হবে যে, তালাক আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত হালাল বস্তু।

অতপর যদি স্বামী তালাক দেয়ার সিদ্ধান্তই নেয়, তাহলেও যখন ইচ্ছা তখন তালাক দেয়া যায় না। ইসলামী রীতি এই যে, তালাক দিতে হবে এমন অবস্থায়, যখন স্ত্রী ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করেছে, কিন্তু পবিত্রতার এই মেয়াদে এখনো স্বামীর সাথে সহবাস সংঘটিত হয়নি। এই মেয়াদটিতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয় যে, ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়ে যাবে। এমনকি উভয়ের মন পাল্টেও যেতে পারে এবং আল্লাহ তায়ালা উভয় বিবাদীকে আপোষ রফায় উদ্বুদ্ধ করে দিতেও পারেন। ফলে, তালাক হয়তো আর সংঘটিতই হবে না।

আর যদি তালাক সংঘটিত হয়েও যায়, তবে এর পরই আসে ইদ্দতের মেয়াদ। ইদ্দত হচ্ছে ঋতুবতী ও সন্তান ধারণে সক্ষম মহিলার জন্যে তিনটি পবিত্রাবস্থা, আর এখনো রজস্রাব হয়নি এমন অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের জন্যে এবং আর কখনো সন্তান হবে না এমন মহিলার জন্যে তিন মাস। আর গর্ভবতীদের জন্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত। এই ইদ্দকালে যদি ভালোবাসার আবেগ পুনরুত্থিত হয়, তবে তালাকের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করারও অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহালের ইচ্ছা জাগ্রত হতে পারে।

কিন্তু এতো সব ব্যবস্থা সত্তেও বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া অনিবার্য হয়ে দেখা দিতে পারে, যার মোকাবেলায় ইসলামকে বাস্তবানুগ কর্মপন্থা অবলম্বন করা জরুরী হয়ে পড়তে পারে এবং সে জন্যে তাকে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতির জন্যেই তালাকের বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়েছে, যা এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম জীবন সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত বাস্তবানুগ। সেই সাথে সে মানুষকে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যেতে উচ্চতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষলাভে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে।

এই সূরার সামগ্রিক বক্তব্য– যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উদ্বুদ্ধকরণ, সতর্কীকরণ, খুঁটিনাটি বিধি ও মন্তব্য ইত্যাদি। এ সবের চতুর্থ তাৎপর্য এই যে, এগুলো মুসলমানদের সমাজে উদ্ভূত সেসব পরিস্থিতির মোকাবেলা করে, যা ছিলো জাহেলিয়াতের গ্লানিময় উত্তরাধিকার। নারীরা যে দুর্দশা ও বিকৃতির শিকার ছিলো, তার প্রতিকারের জন্যে এতো সব খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত বিধি দেয়া হয়েছিলো, যার ফলে নারীদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার, দাম্পত্য জীবনে কোনো অরাজকতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও নরনারীর সম্পর্কের ব্যাপারে আর কোনো পশ্চাদমুখী ধ্যানধারণার অবকাশ থাকেনি। (তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন, ৪র্থ ও ২১শ পারা দ্রষ্টব্য)।

এ পরিস্থিতি শুধু আরব উপদ্বীপেই বিরাজ করতো না। তৎকালীন গোটা বিশ্বেরই অবস্থা ছিলো এরূপ। পৃথিবীর সকল অঞ্চলে তখন নারীর অবস্থা ছিলো ক্রীতদাসীর মতো বা তার চেয়েও খারাপ। উপরন্তু নরনারীর যৌন সম্পর্ককে একটা নোংরামি হিসাবে দেখা হতো এবং নারীকে দেখা হতো এই নোংরামির প্ররোচনাদানকারী শয়তানরূপে।

বিশ্বব্যাপী এই শোচনীয় মানবেতর অবস্থা থেকে নারীকে ও দাম্পত্য সম্পর্ককে মুক্ত করে ইসলাম সেই অত্যুচ্চ মানে উন্নীত করেছিলো, যার বর্ণনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। নারীকে সে এমন সম্মান মর্যাদা, নিরাপত্তা ও অধিকার দান করেছিলো, যা তার কপালে ইতিপূর্বে আর কখনো জোটেনি। এখন নারী শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে কেউ মাটিতে জ্যান্ত পুঁতে ফেলে না, কেউ তার দিক থেকে অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নেয় না। এখন তাকে কেউ তার বিনা অনুমতিতে বিয়ে করতে চায় না, চাই সে কুমারী কিংবা অকুমারী যা-ই হোক না কেন। এখন গৃহবধূ হলে সে আইনসংগত অধিকারের চেয়েও অনেক বেশী অধিকার ও মর্যাদাসম্পন্ন। আর তালাকপ্রাপ্তা হলেও তার অনেক অধিকার, যার বিবরণ এই সূরায়, সূরা বাকারায় এবং অন্যান্য সূরায় রয়েছে।

ইসলাম নারীর অধিকার নিশ্চিত করার জন্যে এতো সব আইন রচনা এজন্যে করেনি যে, আরব দেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নারীরা তাদের মানবেতর অবস্থা উপলব্ধি করে বিক্ষুব্ধ ছিলো অথবা নারীদের এই পরিস্থিতি দেখে পুরুষরা অসন্তুষ্ট ছিলো, কিংবা নারী অধিকার সংরক্ষণের জন্যে কোনো আন্তআরব বা আন্তর্জাতিক নারী সংস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠেছিলো। কিংবা নারীরা কোনো পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলো, বা নারীদের পরিস্থিতি উন্নয়নে কোনো আন্দোলন শুরু হয়েছিলো। এটা ছিলো পৃথিবীবাসীর জন্যে আল্লাহর দেয়া অযাচিত বিধান ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ন্যায়বিচার। এটা ছিলো আল্লাহর এই ইচ্ছার প্রতিফলন যে, মানুষের জীবন বিরাজমান মানবেতর অবস্থা থেকে উন্নীত হোক, দাম্পত্য সম্পর্ক জাহেলী যুগের নোংরামি থেকে পবিত্র হোক, একই মানবসত্ত্বা থেকে উদ্ভূত দম্পতি মানবসুলভ মর্যাদা ও অধিকার অর্জন করুক।

কারণ এ হচ্ছে আল্লাহর মহান ও মহিমান্বিত দ্বীন। এ দ্বীনকে কেবল সে ব্যক্তিই অগ্রাহ্য করতে পারে, যার বিবেক বিকৃত ও বিনষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে মানব রচিত বিধান কেবল সে ব্যক্তিই গ্রহণ করতে পারে, যে দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় এবং আপন কু-প্রবৃত্তির গোলামী করে।

এই প্রাসংগিক আলোচনা যা এই পারার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট থেকে এবং ইসলামী সমাজ গঠনের বিষয় থেকে অনেক বেশী দূরে অবস্থান করে না– এখানেই শেষ হচ্ছে। অতপর সূরায় আলোচিত বিধিসমূহ নিয়ে আমরা একে একে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। সূরায় আলোচিত বিধিসমূহ আমাদের আলোচিত সংক্ষিপ্তসার থেকে ভিন্ন। এগুলো জীবন্ত, চলন্ত, উদ্দীপনাময় ও প্রেরণাময় বিষয়। এ সব বিধান ফেকাহর গ্রন্থাবলীতে অধ্যয়ন করা ও কোরআনে অধ্যয়ন করার মূল পার্থক্য এখানেই নিহিত।

তাফসীর

আয়াত ১-৭

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দত পর্যন্ত তালাক দিয়ো .... (আয়াত-১)

তালাক সংক্রান্ত কিছু বিধান

এ হচ্ছে প্রাথমিক স্তর। এ হচ্ছে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে প্রদত্ত প্রথম বিধি। প্রথমে 'হে নবী' বলার পরক্ষণেই স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, বিধিটা ব্যক্তিগতভাবে শুধু রসূলের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাই বলা হয়েছে, 'তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে ....' এ দ্বারা প্রকারান্তরে এই বিধির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিধিটা গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ব্যক্তিগতভাবে নবীর কাছে প্রেরণ করা হয়েছে যেন তিনি অন্যদেরকে তা অবহিত করেন। 'যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দত পর্যন্ত তালাক দিয়ো।'– এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসংগে সহীহ বোখারী শরীফে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

'হযরত ওমরের পুত্র আবদুল্লাহ হযরত ওমরকে জানালেন যে, তিনি স্বীয় স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিয়েছেন। হযরত ওমর ব্যাপারটা রসূল (স.)-কে জানালে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, তার উচিত তালাক প্রত্যাহার করা এবং স্ত্রীকে বহাল রাখা, যতোক্ষণ না সে পবিত্র হয়, অতপর পুনরায় ঋতুবতী হয় ও তারপর পুনরায় পবিত্র হয়। এরপর যদি তার তালাক দিতেই ইচ্ছা হয়, তাহলে তাকে স্পর্শ না করেই তালাক দেবে। এই হচ্ছে সেই ইদ্দত, যা পালন করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন।'

মুসলিম শরীফেও এই হাদীস এসেছে। তার ভাষা এরূপ, 'এই হচ্ছে সেই ইদ্দত, যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা ইদ্দত পর্যন্ত তালাক দাও।'

এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, তালাক দেয়ার জন্যে সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। স্ত্রী ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পর বিনা সহবাসেই তালাক দিতে হবে। অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, তালাক দেয়ার আরো একটা বৈধ অবস্থা আছে। সেটি হলো, সুস্পষ্ট গর্ভ ধারণকালীন অবস্থা। একটা নির্দিষ্ট মেয়াদে এ কাজটি সীমিত করার পেছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা এই যে, প্রথমত মনে তালাকের খেয়াল উদিত হওয়ার মুহূর্তে যে উত্তেজনা বিরাজ করছিলো, তালাকের ঘোষণা বিলম্বিত হলে সেই উত্তেজনা প্রশমিত হবার আশা করা যায়। তা ছাড়া তালাকের পূর্বে স্ত্রী গর্ভবতী কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হবার সুযোগ পাওয়া যায়। স্বামী যদি জানতে পারে যে, তার স্ত্রী গর্ভবতী, তা হলে তালাক দেয়া থেকে বিরতও থাকতে পারে, কিন্তু গর্ভাবস্থা জানার পরেও যদি সে তালাকের ব্যাপারে এগিয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে, গর্ভবতী হলেও স্ত্রীকে তালাক দিতে সে বদ্ধপরিকর। তাই সহবাসবিহীন পবিত্রাবস্থার শর্তারোপের উদ্দেশ্য হলো গর্ভাবস্থা না থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। আর গর্ভাবস্থা স্পষ্ট হওয়ার শর্তারোপের উদ্দেশ্য হলো গর্ভ থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

পরিবার নামক ভবনের দৃশ্যমান ভগ্নদশা মেরামত করা ও তার ওপর আরো কুড়াল চালনা ঠেকানোর জন্যে এটি হলো প্রাথমিক চেষ্টা।

এর অর্থ এটা নয় যে, এই সময়ে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে না। তালাক যখনই দেয়া হোক তা কার্যকর হবে (এটা অধিকাংশ ফেকাহবিদদের অভিমত। কারো কারো মতে এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যতীত তালাক কার্যকরই হবে না)। তবে আল্লাহর দৃষ্টিতে তা হবে ঘৃণিত কাজ।

রসূল (স.)-এর দৃষ্টিতে তা হবে ধিকৃত কাজ। এ বিধি মোমেনের বিবেককে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধৈর্যধারণ ও আত্মসংবরণে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে যথেষ্ট। নির্দিষ্ট সময় এলে আল্লাহ যা চান তাই হবে।

'আর ইদ্দত গণনা করো।'

কেননা, ইদ্দত গণনা না করলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর অপেক্ষার মেয়াদ প্রলম্বিত এবং ইদ্দতের পরেও তার বিয়ে ঠেকিয়ে তার ক্ষতি সাধন করা হতে পারে। আবার ইদ্দতের মেয়াদ কমে গিয়ে গর্ভাবস্থা সন্দেহযুক্ত হয়ে যেতে পারে এবং তাতে গর্ভস্থ সন্তানের পিতৃপরিচয় নিয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে। গণনার মাধ্যমে সঠিক সময় নির্ণয়ের নির্দেশ থেকে বুঝা যায় যে, বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এটি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন ও সঠিক হিসাব দাবী করেন। 'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। স্ত্রীরা সুস্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত না হলে তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না, আর তাদেরও বেরিয়ে যাওয়া উচিত নয়।'

প্রথমোক্ত সম্বোধনের পর এটা প্রথম হুঁশিয়ারী। স্ত্রীদের গৃহ থেকে বের করার নিষেধাজ্ঞা জারির আগে এটাই প্রথম সর্তকবাণী এবং আল্লাহকে ভয় করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপমূলক নির্দেশ। গৃহ যদিও স্বামীর, কিন্তু 'স্ত্রীদের গৃহ' বলার উদ্দেশ্য হলো ইদ্দতকালে তাদের বসবাসের অধিকার নিশ্চিত করা। বর্ণিত আছে, যে অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা যাবে তা ব্যভিচারও হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যভিচারের শরীয়ত বিহিত শাস্তি কার্যকর করার জন্যে তাকে বের করতে হবে। আবার তা স্বামীর লোকদের কষ্ট দেয়া বা তালাকপ্রাপ্তা হয়েও স্বামীর বিরুদ্ধে উদ্ধত আচরণ ও কষ্টদায়ক আচরণও হতে পারে। কারণ, তালাকদত্তাকে স্বামীর বাড়ীতে থাকতে দেয়ার নির্দেশের পেছনে এই সদুদ্দেশ্য সক্রিয় ছিলো যে, হয়তো বা তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। হয়তো বা পুরনো প্রেম ভালোবাসা পুনরুজ্জীবিত হবে অথবা অতীতের সুখময় স্মৃতি আবার জেগে ওঠবে। তালাকের কারণে স্বামী দূরে থাকলেও উভয়ে উভয়ের দৃষ্টিপথে থাকবে, ফলে তা স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপনের সময় যেমন আবেগের সঞ্চার করতো, তেমনি আবেগের সঞ্চার করে বসতে পারে, কিন্তু যদি স্বামী গৃহে বাস করা কালেও সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, কিংবা তার লোকজনকে জ্বালাতন করে, অথবা তার সাথে খারাপ আচরণ করে, তাহলে আর সম্পর্ক উন্নয়ন, উত্তম ভাবাবেগ জাগ্রত হওয়া ও প্রেম-ভালোবাসার পুনরুজ্জীবনের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে ইদ্দতকালে তাকে স্বামীর বাড়ীতে থাকতে দেয়ার কোনো সার্থকতা নেই। কেননা, তার স্বামীর সান্নিধ্যে অবস্থান তাদের সম্পর্ক আরো ছিন্ন করবে। পুনরুজ্জীবিত করবে না।

'এ হচ্ছে আল্লাহর সীমানা। আল্লাহর সীমানা যে লংঘন করে সে নিজের ওপরই যুলুম করে।'

এ হচ্ছে দ্বিতীয় হুঁশিয়ারী। বস্তুত আল্লাহর এ আদেশ তদারকদারী আল্লাহ তায়ালা নিজেই। আল্লাহ তায়ালা নিজেই যে বিধির তদারক করছেন, তা লংঘন করার ধৃষ্টতা কোন্ মোমেন দেখাবে? এ রকম ধৃষ্টতার পরিণতি ধ্বংস ও বিনাশ ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালার আদেশ লংঘন করে সে আল্লাহর আযাব ভোগ করার যোগ্যতা অর্জন করে। এটাই তার নিজের ওপরে যুলুম করার তাৎপর্য। সে তার স্ত্রীকে যুলুম করে নিজের আযাব ডেকে আনে। এটাই তার নিজের ওপর যুলুম। কেননা, তার স্ত্রী ও সে একই আদমের সন্তান। কাজেই যে কাজে স্ত্রীর ওপর যুলুম হয়, সে কাজে স্বয়ং স্বামীর ওপরও যুলুম হয়।

'তুমি জানো না হয়তো আল্লাহ তায়ালা এরপর নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটাবেন।'

এটি একটি তাৎপর্যপূণ আভাস। বস্তুত আল্লাহর ইদ্দত পালনের আদেশদান এবং স্ত্রীদের স্বগৃহে বাস করতে দেয়ার আদেশদানের পেছনে আল্লাহর কী পরিকল্পনা ও কোন্ প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য

নিহিত রয়েছে কে জানে? স্পষ্টতই মনে হয়, এর পেছনে কোনো আশার হাতছানি রয়েছে। হতে পারে পুরো ব্যাপারটাই কল্যাণময়। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যেতে পারে এবং অসন্তোষ ও রাগ সন্তোষে পরিণত হতে পারে। আল্লাহর অদৃশ্য পরিকল্পনা সব সময় চলমান, পরিবর্তনশীল ও ঘটনাবহুল। আল্লাহর আদেশ ও পরিকল্পনার কাছে আত্মসমর্পণই সর্বোত্তম কাজ। তাঁর ভয়ে ভীত থাকাতেই সঠিক কল্যাণ নিহিত।

মানুষের মন প্রায়ই বর্তমানকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, বর্তমানের সমস্যা ও পরিস্থিতিতেই সে নিমজ্জিত থাকে। ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে সাধারণত তার কোনো ধারণা থাকে না। বর্তমানের কারাগারেই সে আবদ্ধ থাকে। সে ভাবে যে, বর্তমানই চিরস্থায়ী এবং এটাই সব সময় তার সংগে লেগে থাকবে। এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক কারাগার, যা প্রায়ই চেতনাকে নিশ্চল ও বিকল করে দেয়।

অথচ এ ধারণা সত্য নয়। আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য সব সময় সক্রিয়। সব সময় পরিবর্তনশীল এবং সব সময় মানুষ যা কল্পনাও করতে পারে না তাই সংঘটিত হয়ে থাকে। সংকীর্ণতার পর আনে প্রশস্ততা এবং সংকটের পর আনে সমাধান। আল্লাহ তায়ালা প্রতিদিনই ভিন্ন ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকেন। সে কাজ প্রথমে অদৃশ্য থাকে। অতপর তা তিনি জনসমক্ষে প্রকাশ করেন।

আল্লাহ তায়ালা চান এই সত্য মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল থাকুক, যাতে তারা সর্বদা সেই জিনিসের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে, যা তিনি প্রতিনিয়ত সংঘটিত করে চলেছেন, যাতে পরিস্থিতি পরিবর্তনের আশার দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকে, যাতে তাদের মন সব সময় আশান্বিত থাকে এবং শুধুমাত্র বর্তমানের কারাগারে বন্দী না থাকে। প্রতিটি নবাগত মুহূর্তে মানুষ যা ভাবতেও পারে না তাই সংঘটিত হতে পারে। এ কথাই বলা হয়েছে আয়াতের শেষাংশে, 'তুমি জান না হয়তো বা আল্লাহ তায়ালা তারপর নতুন কিছু সংঘটিত করতে পারেন।'

সূরার দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াত লক্ষণীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, অতপর স্ত্রীরা যখন তাদের ইদ্দত পূরণ করবে, তখন হয় তাদের ভালোভাবে রেখে দাও, নচেত ভালোভাবে বিচ্ছিন্ন করে দাও ....'

এ হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায় এবং এই দ্বিতীয় পর্যায়ের করণীয় কী তাও এখানে বলে দেয়া হয়েছে। ইদ্দত পূরণ করা বলতে বুঝায় ইদ্দতের মেয়াদ শেষ করা। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর যে কয়েক প্রকারের ইদ্দতের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেই ইদ্দতের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার আগে স্বামীর তালাক প্রত্যাহারের অধিকার রয়েছে। আর তালাক প্রত্যাহারই হচ্ছে স্ত্রীকে বহাল রাখা। স্বামীর এ অধিকারও আছে যে, ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তালাকের সিদ্ধান্তে অটল থাকা। এটা করলে স্ত্রী চূড়ান্তভাবে তার বিয়ে বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং নতুন স্ত্রী হিসাবে তাকে নতুনভাবে বিয়ে না করা পর্যন্ত সে স্বামীর জন্যে হালাল হবে না। আর স্ত্রীকে বহাল রাখুক বা বিচ্ছিন্ন করে দিক– উভয় অবস্থায় তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করার জন্যে স্বামীকে আদেশ দেয়া হয়েছে। তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীর ক্ষতি করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন ইদ্দত শেষ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তালাক প্রত্যাহার করলো, অতপর পুনরায় দ্বিতীয় তালাক দিলো, পুনরায় একই কায়দায় তৃতীয় তালাক দিলো, যাতে তাকে অবিবাহিতা অবস্থায় দীর্ঘ সময় কাটাতে হয়। অথবা তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেয়ার জন্যে তালাক প্রত্যাহার করলো এবং স্ত্রী যাতে মুক্তিপণ দিয়ে তার কাছ থেকে অব্যাহতি পেতে সচেষ্ট হয়, সে জন্যে চক্রান্ত করলো। এই সূরা নাযিল হবার সময় উক্ত উভয় প্রকারের অবস্থারই সৃষ্টি হতো। আসলে মানুষের মনে যখনই আল্লাহভীতির অভাব দেখা দেয়, তখনই উক্ত দুই রকমের যুলুম চলে। দাম্পত্য জীবনের স্থায়িত্ব কিংবা বিচ্ছেদ–

উভয় অবস্থায়ই ইসলামের বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালিত হওয়ার প্রধান গ্যারান্টি হলো এই আল্লাহভীতি। অনুরূপভাবে তাকে গালিগালাজ, তিরস্কার, ধিক্কার, কটুবাক্য বর্ষণ ও ক্রোধ ইত্যাদির মাধ্যমে নির্যাতন করতেও নিষেধ করা হয়েছে। হৃদয়ের ভালোবাসা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এই সম্পর্কটা টিকিয়েও রাখতে হবে সহৃদয়তার সাথে। আর অবসান ঘটাতে হলে তাও ঘটাতে হবে সৌজন্যের মধ্য দিয়ে। কেননা, স্ত্রী এক সময় স্বামীর কাছে ফিরেও আসতে পারে। সুতরাং এমন কোনো তিক্ত স্মৃতি রেখে দেয়া উচিত নয়, যা তার প্রত্যাবর্তনের পর সম্পর্ক কলুষিত করে তুলবে। তা ছাড়া ইসলাম মানুষের মুখ ও মনকে যে ভদ্রতা শিক্ষা দেয়, তার দাবীও এই যে, যাই করা হোক ভদ্রজনোচিতভাবে ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে করতে হবে।

বিচ্ছেদ অথবা তালাক প্রত্যাহার যেটাই ঘটুক তাতে দুজন সৎলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেই হবে, যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে। কেননা, লোকেরা হয়তো তালাকের খবর জেনেছে, কিন্তু তালাক প্রত্যাহারের খবর জানতে পারেনি। তেমনটি হলে নানা রকমের সন্দেহ ছড়িয়ে পড়বে এবং নানা রকম গুজব রটবে। ইসলাম চায় মানুষের মনে ও মুখে দাম্পত্য সম্পর্কের প্রশ্নে পূর্ণ স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা বিরাজ করুক। কিছু কিছু ফেকাহ শাস্ত্রকারের মতে তালাক প্রত্যাহার বা বিচ্ছেদ সাক্ষী ছাড়াও কার্যকরি হয়ে যায়। অন্যদের মতে হয় না। তবে বিচ্ছেদ অথবা প্রত্যাহার উভয়টির পরে বা সাথে সাথে সাক্ষ্য নেয়া যে জরুরী, সে ব্যাপারে দ্বিমত নেই।

আদেশ দেয়ার পর এর সাথে সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। বলা হয়েছে, 'আল্লাহর জন্যে সাক্ষী সংগ্রহ করো।'

বস্তুত তালাকের পুরো ঘটনাটা তো আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এতে সাক্ষী সাবুদ আল্লাহরই জন্যে। তিনিই এর আদেশ দিচ্ছেন। সাক্ষ্য কেমন টেকসই তাও তিনিই পর্যবেক্ষণ করছেন এবং এর প্রতিফলও তিনিই দেবেন। এই সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে যা কিছু তৎপরতা সংঘটিত হবে, তা আল্লাহর সাথেই হবে, স্বামী, স্ত্রী বা জনগণের সাথে নয়।

'এ উপদেশ দেয়া হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতে বিশ্বাসী।' তালাক সংক্রান্ত এই সকল নির্দেশ আখেরাতে ও আল্লাহতে যারা বিশ্বাসী, তাদের ওপরই জারি করা হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তিনি তাদের এমন নির্দেশ দিচ্ছেন যা তাদের জন্যেই উপযোগী। আল্লাহর ওপর ও আখেরাতের ওপর তাদের ঈমান যদি সত্যিকার ঈমান হয়ে থাকে, তাহলে এ উপদেশ দ্বারা তারা উপকৃত হবে ও শিক্ষা গ্রহণ করবে। এটা তাদের ঈমানের ও ঈমানের দাবীর সত্যতা যাচাইয়ের কষ্টিপাথর।

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে একটা মুক্তির পথ বের করেন এবং সে কল্পনাও করতে পারে না এমন উপায়ে তাকে রেযেক দান করেন।'

'মুক্তির পথ' দ্বারা বুঝানো হয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের সংকীর্ণতা অশান্তি থেকে মুক্তির পথ। আর কল্পনাও করতে পারে না এমন উপায়ে রেযেক দেয়া দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যে রেযেকের আশা করা যায় না এবং যে রেযেক উপার্জন করার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা নেয়া হয় না। এটা একটা সাধারণ ব্যাপার ও চিরন্তন সত্য। কিন্তু এটিকে তালাকের বিধানের সাথে যুক্ত করে বুঝানো হয়েছে যে, এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যখন আল্লাহভীরু লোকেরা আল্লাহকে ভয় করে চলে, তখন এ সত্য অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত হয়। এটি এমন এক ক্ষেত্র, যেখানে বিবেক ও চেতনা যেমন নির্ভুল নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা পালন করে, তেমন আর কোনো শক্তি করে না। এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহর ভয় ও বিবেকের সচেতনতা ছাড়া এই স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করার আর কোনো উপায় নেই।

'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করেই ছাড়েন।'

দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছলচাতুরী ও চক্রান্তের সুযোগ খুবই প্রশস্ত এবং তার উপায়ও অনেক রয়েছে। এমনকি এ ক্ষেত্রে ছলচাতুরী থেকে বাঁচার চেষ্টা করলেও কখনো কখনো আরেক ধরনের ছলচাতুরীর শিকার হতে হয়। তাই এখানে এই মর্মে ইংগিত করা হচ্ছে যে, সম্ভাব্য ছলচাতুরী থেকে বাঁচার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল তথা নির্ভর করা উচিত। কেননা, আল্লাহর ওপর যে তাওয়াক্কুল করে তার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। আর আল্লাহ তায়ালা যে সিদ্ধান্ত নেন তা করেই ছাড়েন। তিনি যা স্থির করেন তা বাস্তবায়িত না হয়ে যায় না। তিনি যা চান তা কার্যকর হওয়া অবধারিত। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের অর্থই হচ্ছে এমন মহাশক্তিধর সত্ত্বার ওপর তাওয়াক্কুল করা, যিনি নিজের ইচ্ছা অবশ্যই কার্যকর করেন।

কথাটা তালাক প্রসংগে বলা হলেও সকল ব্যাপারেই তা প্রযোজ্য। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনে আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিশুদ্ধ ধারণা এবং বিশ্বাস সৃষ্টি করা। তবে তালাক প্রসংগে এ কথাটা বলা বিশেষ তাৎপর্যবহ।

'আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি জিনিসের জন্যে একটা মাত্রা নির্ধারণ করেছেন।' অর্থাৎ সব কিছুরই নির্দিষ্ট পরিমাণ, সময়, স্থান, পরিবেশ, পরিস্থিতি, সমস্যা, ফলাফল ও কারণ রয়েছে। কোনো কিছুই কাকতালীয় বা আকস্মিক নয়– চাই তা মহাবিশ্বের কোনো জিনিস হোক, অথবা মানুষের সত্ত্বার অভ্যন্তরের কিছু হোক। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার ওপর ইসলামী চিন্তাধারার একটা বিরাট অংশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত (সূরা ফোরকানে 'তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তার একটা পরিকল্পনা ও মাত্রা নির্ধারণ করেছেন আর সূরা কামারে আমি প্রতিটি জিনিসকে একটি মাত্রা অনুসারে সৃষ্টি করেছি'– এই দুটি বাক্যের পর্যালোচনা প্রসংগে এ বিষয়টি সবিস্তার ব্যাখ্যা করেছি)। তবে এই মৌলিক ও চিরন্তন সত্য এখানে উল্লেখ করা দ্বারা একে আল্লাহর নির্ধারিত তালাক ও তার সময়, ইদ্দত ও তার মেয়াদ, সাক্ষ্য ও সাক্ষ্য প্রদানের সাথে যুক্ত করেছে। আর এই বিধিগুলো যে সৃষ্টিজগতে কার্যকর আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধানের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেটাই এই উক্তির মর্মার্থ।

'আর তোমাদের মধ্য হতে যে সকল মহিলা এই মর্মে নিশ্চিত হয়েছে যে, তাদের আর রজস্রাব হবে না, তাদের ব্যাপারে তোমরা সন্দিহান হয়ে থাকলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস ...'

এ আয়াতে সেসব মহিলার ইদ্দতের মেয়াদ বর্ণনা করা হয়েছে, যারা অ-ঋতুবতী, যারা গর্ভবতী, যাদের (বয়োবৃদ্ধা হওয়ার কারণে) রজস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে এবং যারা অপ্রাপ্ত বয়স্কা অথবা কোনো রোগে আক্রান্ত থাকার কারণে এখনো ঋতুবতী হয়নি। সূরা বাকারায় যে মেয়াদ বর্ণনা করা হয়েছে তা শুধু ঋতুবতীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেটি হলো তিনটি রজস্রাবকাল অথবা তিনটি রজস্রাবমুক্ত কাল। এ ব্যাপারে ফেকাহবিদদের মতভেদ রয়েছে। পক্ষান্তরে যে মহিলার রজস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে অথবা এখনো রজস্রাব হয়নি, তার ইদ্দতের হিসাব কিভাবে হবে সে ব্যাপারে অস্পষ্টতা থেকে গিয়েছিলো। তাই এ আয়াত এসে সেই অস্পষ্টতা দূর করে দেয় এবং উভয় শ্রেণীর মহিলার ইদ্দত তিন মাস স্থির করে। কারণ যে ঋতু দিয়ে ঋতুবতীদের ইদ্দত হিসাব করা হয়, তা থেকে এই দুজনই মুক্ত। আর গর্ভবতীদের ইদ্দত স্থির করা হয়েছে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত, চাই তালাকের পর সেই সময়টা দীর্ঘস্থায়ী হোক বা ক্ষণস্থায়ী হোক। যদিও প্রসবোত্তর স্রাবের ৪০টি রাতও পবিত্রতা অর্জনের মেয়াদ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে, কিন্তু সেটা ইদ্দতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, সন্তান প্রসবের পর জরায়ুর পবিত্র হওয়া সুনিশ্চিত। তাই আর কোনো কিছুর জন্যে

অপেক্ষা করার দরকার নেই। আর যেহেতু তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার তালাকদাতা স্বামী থেকে সন্তান প্রসবের সাথে সাথেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাই এরপর আর অপেক্ষা করার কোনো সার্থকতাও নেই। কারণ, এরপর বিয়ে দোহরানো ছাড়া আর সাবেক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। আল্লাহ তায়ালা যখন প্রতিটি জিনিসের মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তখন কোনো সার্থকতা ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ হতে পারে না।

এতো গেলো সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ। এরপরই আসছে বিবেক ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় মন্তব্য ও উপদেশ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে সংযত আচরণ করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে তার কাজ সহজ করে দেন।'

মানুষের দায়িত্ব পালন সহজ হয়ে যাক এটাই মানুষের সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আল্লাহ তায়ালা যদি তার কোনো বান্দার কাজকর্ম সহজ করে দেন, তবে এটা তার জন্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত। এতে তার সকল কষ্ট দূর হয়ে যায়। আর আজীবন এমন কষ্টহীন জীবন যাপনের উল্লেখ দ্বারা তাকে তালাকের ব্যাপারেও সহজ সরল পথ অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

এরপর এরশাদ হচ্ছে,

'এ হচ্ছে আল্লাহর বিধান, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন।'

এখানে এই বিধানের উৎস সম্পর্কে সতর্ক করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, এটা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন এবং যারা এর প্রতি ঈমান এনেছে তাদের কাছে নাযিল করেছেন। তারা যদি এ বিধান মেনে চলে তবেই তাদের ঈমানের যথার্থতা প্রমাণিত হবে এবং তাদের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে।

এরপর পুনরায় তাকওয়া ও খোদাভীরুতার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বিষয়টি আলোচনার শুরু থেকেই ক্রমাগত তাকওয়ার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে,

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ মাফ করবেন এবং তাকে বিরাট পুরস্কার দেবেন।'

প্রথমে কাজ সহজ করার ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে, তারপর গুনাহ মাফ এবং সর্বশেষে বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এ অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ওয়াদাই বটে। এটা একটা সর্বাত্মক সিদ্ধান্ত এবং সর্বব্যাপী প্রতিশ্রুতি। তবে তালাকের বিষয়টির ওপরও এর প্রভাব পড়ে এবং এটা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর অনুগ্রহ সম্পর্কে মনকে সচেতন করে তোলে। আল্লাহ তায়ালা যখন বান্দার কাজ সহজ করে দেন, তাকে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কারের আশ্বাস দেন, তখন তার কাজে কোনো জটিলতার সৃষ্টি কিভাবে হতে পারে?

তালাকপরবর্তী সমস্যা ও তার সমাধান

পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে,

'তোমরা যেখানে বাস করো সেখানেই তাদের (ইদ্দতকালে) বাস করতে দাও .....।'

ইদ্দতকালে স্ত্রীকে গৃহে অবস্থান করতে দেয়া ও খোরপোষ দেয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার উপসংহার টানা হয়েছে এই দুটি আয়াতে। আল্লাহর আদেশ এই যে, তাদের স্বামীর অনুরূপ বাসস্থানে বসবাস করার সুযোগ দিতে হবে। তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রাখা চলবে না। তাদের আর্থিক সামর্থের অতিরিক্তও কিছু ব্যয় করা লাগবে না। সংকীর্ণ স্থানে বাস করতে দেয়া বা বাস করাকালীন দুর্ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীর ক্ষতি সাধন করা যাবে না। গর্ভবতীদের ব্যাপারে বিশেষভাবে

খোরপোষের উল্লেখ করা হয়েছে- যদিও প্রত্যেক ইদ্দত পালনকারিণীর ভরণ পোষণই বাধ্যতামূলক। গর্ভবতীদের খোরপোষের উল্লেখ করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, গর্ভের মেয়াদ দ্বারাই খোরপোষের মেয়াদ কম বা বেশী নির্ধারিত হবে। সন্তান প্রসব পর্যন্তই খোরপোষ দিতে হবে। কেননা, ওটাই তার ইদ্দতের শেষ সীমা।

এরপর সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মাকে বিনা পারিশ্রমিকে এ কাজ করতে বাধ্য করেনি। শিশুটি তো স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সন্তান। সুতরাং সে যতোদিন তাকে দুধ খাওয়াবে, ততোদিন পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার তার রয়েছে। ইসলামী বিধানে এটা মায়ের প্রতি প্রদত্ত সর্বোচ্চ সুবিধা। এই সাথে সে পিতামাতা উভয়কে এই শিশু সম্পর্কে হিতাকাংখী থাকতে ও তার কল্যাণ নিশ্চিত হয় এমনভাবে তার সাথে আচরণ করতে এবং পরস্পর পরামর্শ করতে আদেশ দিয়েছে। কেননা, সে তাদের উভয়ের কাছে আমানত। তাদের দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার খেসারত যেন শিশুকে দিতে না হয়। কেননা, এই ব্যর্থতার দায় দায়িত্ব তো তার ওপর পড়ে না।

এ হচ্ছে আল্লাহর সেই সহজ সরল ব্যবস্থা, যার দিকে তিনি স্বামী-স্ত্রী উভয়কে আহবান জানান, কিন্তু তারা উভয়ে যদি অনমনীয় হয় এবং দুধ খাওয়ানো ও তার পারিশ্রমিক দানের ব্যাপারে একমত না হয়, তা হলেও কিছু আসে যায় না। শিশুর অধিকার সর্বাবস্থায় নিশ্চিত ও সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তাকে অন্য কেউ দুধ খাওয়াবে।' অর্থাৎ তারা যখন অমনীয় থেকেছে এবং শিশুর প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছে, তখন অন্য কেউ যদি এ কাজে এগিয়ে আসে, তবে মায়ের তাতে বাধা দেয়ার কোনো অধিকার থাকবে না।

এরপর খোরপোষের পরিমাণ কী হবে, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যে পরিমাণ সহজসাধ্য হবে এবং সহযোগিতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে, সেটাই হবে খোরপোশের ন্যায়সংগত মাত্রা। স্বামীরও যুলুম করা চাই না, স্ত্রীরও বাড়াবাড়ি করা চাই না। আল্লাহ তায়ালা যাকে সচ্ছলতা দিয়েছেন, তার উচিত উদারভাবে ব্যয় করা- চাই তা স্ত্রীর দৈনন্দিন খোরপোষের ব্যাপারেই হোক, বসবাসের সুযোগের ব্যাপারেই হোক কিংবা দুধ খাওয়ানোর পারিশ্রমিকের ব্যাপারেই হোক। আর যে ব্যক্তি সচ্ছল নয়; বরং অভাবপীড়িত, তার ওপর কোনো চাপ নেই। তার সাধ্যের বাইরে খোরপোষ দিতে আল্লাহ তায়ালা বলেননি। আল্লাহই হচ্ছেন দাতা। তিনি না দিলে কেউ সম্পদ লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া বিত্ত বৈভব লাভের আর কোনো উৎস নেই। তাঁর কোষাগার ছাড়া আর কোনো কোষাগার নেই। 'আল্লাহ তায়ালা কোনো প্রাণীকে তাঁর দেয়া জিনিসের বাইরে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেন না।'

অতপর উভয়কে আশ্বাসবাণী শুনাচ্ছেন,

'আল্লাহ তায়ালা অচিরেই জটিলতার পরে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করবেন।'

এ থেকে বুঝা গেলো যে, সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা এবং জটিলতার পর স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল। তাই স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উচিত সব কিছুতে আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা এবং তাঁকেই ভয় করা। কেননা, দেয়া বা না দেয়ার নিরংকুশ ও একচ্ছত্র ক্ষমতা তাঁরই। তাঁর হাতেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য ও জটিলতা, দারিদ্র্য ও সচ্ছলতা এবং সুখ ও দুঃখ।

এ পর্যন্ত এসে তালাক ও তার ফলশ্রুতিজনিত সকল অবস্থা সংক্রান্ত বিধিবিধান সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে একটা সুস্পষ্ট সমাধান পাওয়া গেছে। তালাকবিধ্বস্ত গৃহের আর কোনো সমস্যা অবশিষ্ট নেই। মানুষের মনে যেসব কুপ্ররোচণা সচরাচর এসে থাকে এবং মানুষের ভদ্রতা, সৌজন্য

ও সহৃদয়তা প্রদর্শনে অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে, তাও এ আলোচনার মাধ্যমে দূর করা হয়েছে। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী সন্তানকে দুধ পান করাক বা না করাক, তার প্রতি সহৃদয়তা ও উদারতা প্রদর্শন এবং তাকে ইদ্দতকালে আবাসিক সুবিধা ও খোরপোষ দিতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর এ সব সুবিধা দিলে অভাব অনটন, আর্থিক সংকট ও অর্থ বিনাশ ঘটতে পারে এরূপ আশংকা যেমন স্বামীর মন থেকে দূরীভূত করা হয়েছে, তেমনি স্ত্রীর মন থেকেও দরিদ্র সাবেক স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ কম বা নিম্নমানের পাওয়াজনিত ক্ষোভ এবং সচ্ছল সাবেক স্বামীর কাছ থেকে অধিকতর অর্থপ্রাপ্তির লোভ দূর করা হয়েছে। নিশ্চিত আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহভীরু মানুষের অভাব ও কষ্টের পর সচ্ছলতা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসবে অকল্পনীয় উপায়ে, অভাবনীয় উৎস থেকে রেযেক আসবে এবং দুনিয়ার রেযেকের পর আখেরাতের বিরাট পুরস্কার ও গুনাহ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে।

অনুরূপভাবে যে তীব্র কলহ কোন্দল, মনোমালিন্য, রাগ ও ক্ষোভ হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে দম্পতিকে তালাকের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলো, সেই ক্ষোভ ও দুঃখও দূর করা হয়েছে। আল্লাহর রহমতের আশা জাগিয়ে তুলে, তাঁর সন্তোষ লাভের কামনা বাসনা উজ্জীবিত করে এবং তাকওয়া ও আল্লাহভীতির চেতনা সৃষ্টি করে তার মনকে নতুন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করা হয়েছে।

তালাক উপদ্রুত দম্পতির মনের এই সার্বিক চিকিৎসা ও এই পুন পুন উচ্চারিত আশ্বাসবাণী দ্বারা সেই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের একমাত্র গ্যারান্টি।

বস্তুত বিবেকের সচেতনতা ও হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন আল্লাহভীতি ছাড়া আর কোনো জিনিস এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম নয়। নচেত শুধু আইনের বাধাই যদি একমাত্র বাধা হতো, তাহলে দম্পতির মধ্যে যতক্ষণ তিক্ততা অব্যাহত থাকতো, ততোক্ষণ পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা থেকে তাদের কেউ ঠেকাতে পারতো না। এ আলোচনায় এমন কিছু নির্দেশিকাও রয়েছে, যাতে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী উদার মনোভাব সৃষ্টি হয়। যেমন ক্ষতি না করার নির্দেশ। বলা হয়েছে, 'স্ত্রীদের ক্ষতি সাধন করো না।' এই একটি মাত্র নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে এমন বহু প্রকারের কষ্টদায়ক আচরণ রোধ করা হয়েছে, যা নিছক একটি আইন দ্বারা রোধ করা যেতো না, তা সে যতো ব্যাপক ভিত্তিক আইনই হোক না কেন। এ নির্দেশের ভিত্তি হলো আবেগ অনুভূতি জাগ্রত করা, সকল গোপনীয় বিষয়ে পরিজ্ঞাত আল্লাহর ভীতি সঞ্চার করা এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহভীরু লোকদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা স্মরণ করিয়ে দেয়া। বিশেষত জীবিকার ব্যাপারে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যার উল্লেখ বিভিন্ন ভংগিতে বার বার করা হয়েছে। কেননা, জীবিকার বিষয়টিই তালাকজনিত মানসিক জটিলতা নিরসনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

কখনো কখনো এমনও হয়ে থাকে যে, স্বামী স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অথচ তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা সুপ্ত থাকে। সামান্য একটু উজ্জীবনী শক্তির পরশ পেলেই তা আবার জেগে ওঠে। এই উজ্জীবনী শক্তি হচ্ছে উঁচু মানের সহৃদয় ব্যবহার, যা ইসলাম মুসলিম জাতিকে শিক্ষা দিতে চায়।

আলোচনার এ পর্বটি শেষ হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা সেসব লোকের বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছেন, যারা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আদেশ অমান্য করেছে এবং অত্যন্ত শোচনীয় পরিণতি ভোগ করেছে, আর যেসব মোমেন বান্দা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আদেশের অনুগত, তাদের পুরস্কৃত করার ওয়াদাও ঘোষণা করেছেন।

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا
وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ
آمَنُوا ۚ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ
مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۖ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

রুকু ২

৮. কতো জনপদের মানুষরাই তো নিজেদের মালিক ও তাঁর রসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো, অতপর আমি তাদের কাছ থেকে (সে জন্যে) কঠিন হিসাব আদায় করে নিয়েছি এবং আমি ওদের কঠোর শাস্তি দিয়েছি। ৯. এরপর তারা ভালো করেই তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করলো, মূলত তাদের কাজের পরিণাম ফল (ছিলো) চরম ক্ষতি। ১০. আল্লাহ তায়ালা (পরকালে) তাদের জন্যে এক কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন, অতএব (হে মানুষ), তোমরা যারা জ্ঞানসম্পন্ন, তোমরা যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে তাঁর উপদেশবাণী নাযিল করেছেন, ১১. (তিনি আরো পাঠিয়েছেন) তাঁর রসূল, যে তোমাদের আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনায়, যাতে করে সে (রসূল) তোমাদের সেসব লোকদের– যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (হেদায়াতের) আলোতে নিয়ে আসতে পারে; তোমাদের যে কেউই আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তাকেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (এমন এক জান্নাতে), যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; এমন লোকের জন্যে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা উত্তম রেযেকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ১২. আল্লাহ তায়ালা– যিনি এ সাত আসমান ও তাদের অনুরূপ সংখ্যক যমীন সৃষ্টি করেছেন; (আবার) উভয়ের মাঝখানে (যা কিছু আছে তাদের জন্যে) তাঁর নির্দেশ জারি হয়, যাতে করে তোমরা একথা অনুধাবন করতে পারো, (আকাশ পাতালের) সকল কিছুর ওপর তিনিই (একক) ক্ষমতাবান এবং তাঁর জ্ঞান (এ সৃষ্টিলোকের) প্রতিটি বস্তুকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

তাফসীর

আয়াত ৮-১২

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বহু জনপদ তাদের প্রতিপালকের ও রসূলের আদেশ অমান্য করেছে। ফলে, আমি তাদের কাছ থেকে কঠিন হিসাব নিয়েছি এবং ভয়ংকর শাস্তি দিয়েছি .....।'

এ আয়াত কটিতে একাধারে সতর্কবাণী উচ্চারণ, ঈমান আনার তাওফীক দিয়ে আল্লাহ তায়ালা যে অনুগ্রহ করেছেন, তা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং আখেরাতে তার জন্যে প্রতিদান দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে। আখেরাতের এই প্রতিদান যে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সম্মানজনক জীবিকা, সে কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর অবাধ্য ও রসূলের আদেশ অমান্যকারীকে পাকড়াও করা ও শাস্তি দেয়া আল্লাহর চিরন্তন রীতি। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর পাকড়াও, তার শাস্তি ও তাঁর নাফরমান বান্দাদের শোচনীয় পরিণতির বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। অতপর তৃতীয় আয়াতে এই ভয়াবহ পরিণামকে কিছুটা বিলম্বিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সবের উদ্দেশ্য হলো বিষয়টি পাঠকের মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করা, এটা কোরআনের একটা স্থায়ী রীতি।

রসূলদের আহবান উপেক্ষাকারী জাতির পরিণতি

এই সতর্কবাণী পাঠ করে ক্ষণেকের জন্যে আমরা যদি দাঁড়াই, তাহলে দেখতে পাবো যে, যখনই কোনো জনপদ আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের না-ফরমানী করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে একে একে শাস্তি দিয়েছেন। আমরা দেখতে পাই যে, এই সতর্কবাণীকে এখানে তালাক ও তদসংশ্লিষ্ট বিধিসমূহের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে তালাক ও তার বিধি আল্লাহর এই শাশ্বত রীতির সাথে সংযুক্ত হয়েছে। আর এই সংযুক্তি দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তালাকের ব্যাপারটা শুধু পরিবার ও দম্পতির সমস্যা নয়, বরং এটা গোটা মুসলিম উম্মাহর সমস্যা। গোটা মুসলিম জাতি এ সমস্যার জন্যে দায়ী। এটি শরীয়তসম্মতভাবে সমাধান করা গোটা মুসলিম উম্মার কর্তব্য। শরীয়তবিরোধী পন্থায় এই সমস্যা অথবা অনুরূপ অন্য কোনো সমস্যার সমাধান করা আল্লাহর বিধানের বিরোধিতারই নামান্তর। এ কাজ যে ব্যক্তিরা করবে আল্লাহর কাছে শুধু তারাই অপরাধী হবে না, বরং যে জনপদ বা যে জাতির লোকেরা এ কাজ করবে, সেই জনপদ ও সেই জাতি সামগ্রিকভাবে আল্লাহর কাছে দায়ী হবে। এটা হবে গোটা জাতির সামগ্রিকভাবে আল্লাহর বিধান ও আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করার নামান্তর। কেননা, ইসলাম এসেছে এ জন্যে যে, তা পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত করা হবে এবং গোটা মানব জীবনের ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো বিধি লংঘন করবে, চাই তা তার ব্যক্তিগত জীবনেই হোক না কেন, সে তার গোটা জাতি বা গোটা জনপদকে আল্লাহর সেই শাস্তির দিকে ঠেলে দেবে, যে শাস্তি আবহমানকাল ধরে আল্লাহদ্রোহী জাতিগুলো ভোগ করে এসেছে।

সেই আল্লাহদ্রোহী জাতিগুলো বা জনপদগুলো নিজেদের অপকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে এবং তাদের পরিণতি হয়েছে ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংস। এ ক্ষয়ক্ষতি ও শাস্তি তাদের শেষ বিচারের আগে এই পৃথিবীতেই ভোগ করতে হয়েছে। আল্লাহর বিধান লংঘন করার এ শাস্তি আমরা আমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোকেও ভোগ করতে দেখেছি। অরাজকতা, ধ্বংস, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, বিজাতির যুলুম শোষণ, নিরাপত্তাহীনতা ও অশান্তি, স্থিতিহীনতা ও অনিশ্চয়তা ইত্যাদির আকারে তারা আল্লাহর এ আযাব ভোগ করেছে। আমরা শুধু অতীতে নয়, বর্তমানেও প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জাতিকে এরূপ আযাব ভোগ করতে দেখছি। আর এ আযাবই শেষ নয়, এ ছাড়া আখেরাতের আযাবও নির্ধারিত

রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

ইতিপূর্বে সূরা সাফ্‌ফে আমি বলেছি যে, ইসলাম একটা সামগ্রিক ও সামাজিক বিধান। একটি বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থা সহকারে মুসলমানদের সমাজকে গড়ে তোলাই তার লক্ষ্য। তাই গোটা মুসলিম সমাজের ওপরই ইসলামের বিধিবিধান পালন করার দায়িত্ব অর্পিত। সে যদি তা লংঘন করে, তবে লংঘনের যে পরিণতি অন্যান্য জাতি ভোগ করেছে, তা তাকেও ভোগ করতে হবে।

আর এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে সাবধান করতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলছেন, হে মুসলিম জাতি, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে একটা স্মরণিকা নাযিল করেছেন।' আল্লাহ তায়ালা এই স্মরণিকাকে রসূলের সত্ত্বার মাধ্যমে বাস্তবায়িত করেছেন। তাই পরবর্তী আয়াতে তাঁর কথা এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেন তিনি নিজেই এই স্মরণিকা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'একজন রসূল, যিনি তোমাদের সামনে আল্লাহর আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে পড়ে শোনান।'

এখানে একটি তাৎপর্যময় অকাট্য সত্য কথা বলা হয়েছে। সে কথাটা এই যে, প্রথমত আল্লাহর কাছ থেকে আগত এই স্মরণিকা মুসলিম জনতার কাছে এসেছে পরম সত্যবাদী রসূলের মাধ্যমে। আল্লাহর রসূল এর বিন্দুবিসর্গও গোপন করেননি।

দ্বিতীয়ত, রসূলের ব্যক্তিত্ব নিজেই একটি স্মরণিকায় পরিণত হয়েছে। তিনি এ স্মরণিকার তথা কোরআনের বাস্তব চিত্র। কোরআন দ্বারা গঠিত তাঁর এই সত্ত্বা স্বয়ং বাস্তব কোরআনের রূপ ধারণ করেছে। তিনি কোরআনের জীবন্ত চিত্র। রসূল (স.) বাস্তবিকপক্ষেই তদরূপ ছিলেন। হযরত আয়েশাও একথাই বলেছেন, 'তাঁর চরিত্র ছিলো হুবহু কোরআন।' তাঁর অন্তরে কোরআন সার্বক্ষণিকভাবে বিদ্যমান থেকে প্রতিমুহূর্তে কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে, তা শিক্ষা দিতো, আর তিনি নিজে বাস্তব কোরআন হয়ে তদরূপ জীবন যাপন করতেন।

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের ইসলামের পথে চালিত করে যে নেয়ামত দান করেছেন, তাদের জান্নাত প্রদানের ওয়াদা করে সেই নেয়ামত ও অনুগ্রহ আরো বর্ধিত করেছেন। আর স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এই জান্নাত হচ্ছে মোমেনের জন্যে সর্বোত্তম জীবিকা। তার সাথে পার্থিব জীবিকার কোনো তুলনা হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে চমৎকার জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন।' বস্তুত দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় জায়গায় তিনিই একমাত্র জীবিকাদাতা। তবে তাঁর দেয়া এক জীবিকার চেয়ে আর এক জীবিকা উত্তম। তিনি কাকে কোন্ জীবিকা দেবেন সেটা তিনিই নির্ধারণ করেন। এভাবে তিনি দুনিয়ার জীবিকার চেয়ে জান্নাতের জীবিকার শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ইংগিত করেন।

আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ত

সর্বশেষ আয়াতে পুনরায় সেই প্রাকৃতিক তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে। অতপর সূরার বিষয়বস্তু, তাতে বর্ণিত বিধিবিধান ও নির্দেশাবলীকে আল্লাহর জ্ঞান, শক্তিমত্তা ও পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা তার বিশাল সৃষ্টিজগতে প্রতিফলিত। সর্বশেষ আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা যিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর মধ্যেই তাঁর বিধান নাযিল হয়, যাতে তোমরা নিশ্চিতভাবে জানো যে, আল্লাহ সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান এবং তাঁর জ্ঞান সকল জিনিসের ওপর পরিব্যাপ্ত।'

সাত আকাশ যে কী জিনিস, কেমন জিনিস, কেমন তার আকৃতি ও আয়তন, তা আমরা জানি না। অনুরূপভাবে সাত পৃথিবী সর্ম্পকেও আমরা অজ্ঞ। আমরা যে পৃথিবীকে জানি, সেটা এ সাতটি

পৃথিবীরই একটি হতে পারে আর বাকীগুলোর সন্ধান হয়তো কেবল আল্লাহই জানেন। আয়াতে যে 'মিছলাহুন্না' অর্থাৎ 'অনুরূপ ' শব্দটি রয়েছে, তা দ্বারা এ কথাও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে যে, এই পৃথিবী ও আকাশ গঠনে বৈশিষ্ট্যে একই জাতের পদার্থ। তবে সর্বাবস্থায় মনে রাখতে হবে যে, এই আয়াতে যেসব জিনিসের নামোল্লেখ করা হয়েছে, সে সব আমাদের জানা ও পরিচিত জিনিস হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কেননা, এই বিশ্ব নিখিলের সব জিনিস আমাদের জ্ঞানের আওতাভুক্ত নয়। তাই কোনো নির্দিষ্ট জিনিস দেখিয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, কোরআন এই জিনিসটার কথাই বলতে চেয়েছে। গোটা বিশ্বজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৃষ্টির রহস্য যদি কখনো মানুষ অকাট্যভাবে ও সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারে, তবে তখনই অনুরূপ কথা বলতে পারে, কিন্তু সেরূপ নিশ্চিত জ্ঞান তো কখনো তার আয়ত্তে আসবে না। তবে এই বক্তব্য দ্বারা আমরা কেবল মনস্তাত্ত্বিকভাবে উপকৃত হতে পারি এবং বিশ্ব নিখিল সম্পর্কে একটা বিশুদ্ধ বিশ্বাস বা ঈমান গড়ে তুলতে পারি।

'সাতটি আকাশ ও অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবী' কথাটার মধ্য দিয়ে এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে যে ইংগিত দেয়া হয়েছে, তাতে হৃদয়কে স্রষ্টার এমন এক বিশাল সৃষ্টির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার বিশালত্বের সামনে এই গোটা পৃথিবীও নিতান্ত ক্ষুদ্র। পৃথিবীতে সংঘটিত তালাক বা বিয়ের মতো তুচ্ছ ও নগণ্য কিছু ঘটনা আর স্বামীর দেয়া কিছু টাকা অথবা স্ত্রীর ছেড়ে দেয়া কিছু টাকার দাবী তাঁর সামনে কিছুই নয়।

এই সাত আকাশ ও সাত পৃথিবীর মাঝেই নাযিল হয় আল্লাহর বিধান । তালাক সংক্রান্ত আলোচ্য বিধানও তার আওতাভুক্ত । সুতরাং মানবীয় ধ্যানধারণা মানদন্ডের বিচারেও এই বিধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর এ বিধান লংঘন করা সেই মহাজাগতিক বিধান লংঘন করার মতোই গুরুতর, যে বিধান আকাশ, পৃথিবী, আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতারা এবং আকাশ ও পৃথিবীর অপরাপর সৃষ্টিও মেনে চলে। এ বিধান স্বয়ং আল্লাহর রসূল এনেছেন এবং এ দ্বারা পৃথিবীবাসীকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছেন। এ বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা অত্যন্ত অন্যায় ও দুর্ভাগ্যজনক, যা কোনো বুদ্ধিমান মোমেনের কাজ হতে পারে না।

এ বিধান আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে নাযিল হয়ে মোমেনের হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান। সুতরাং তাঁকে তাঁর ঈপ্সিত কাজ থেকে কোনো কিছু ফিরিয়ে রাখতে বা বাধা দিতে পারে না। তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞান রাখেন। সুতরাং তাঁর বিশাল রাজ্যের কোনো জিনিস এবং এই বিশাল রাজ্যের অধিবাসীদের অন্তরের অন্তস্তলে লুকানো কোনো জিনিস তাঁর জ্ঞানের আওতাবহির্ভূত নয়।

এই বক্তব্যটির দুটো সূক্ষ্ম তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত, যে আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত, তিনিই এই বিধানগুলো পালনের আদেশ দিয়েছেন। মানুষের সকল অবস্থা, সমস্যা, স্বার্থ, সুবিধা অসুবিধা ও যোগ্যতা অযোগ্যতা তাঁর জানা। এ সব তাঁর জানা বলেই তিনি এ বিধান নাযিল করেছেন। সুতরাং এগুলো অনুসরণ করার ব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্রও আপত্তি থাকা উচিত নয়। কেননা, তা সর্বজ্ঞ আল্লাহর রচিত বিধান।

দ্বিতীয়ত, এই বিধানগুলো মানা মানুষের বিবেক ও চেতনার ওপর নির্ভরশীল। কেননা, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন, এই সত্যই বিবেকের সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট। যে আল্লাহ তায়ালা মানুষের মনের কোণে লুকানো বিষয়ও জানেন, তাঁর ভয় ছাড়া আর কোনো জিনিস দ্বারা যেখানে কোনো লাভ হয় না, সেখানে আল্লাহর সর্ববিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও সর্বশক্তিমান হওয়ার বিষয়টি জানাই মানুষের সততার শ্রেষ্ঠ গ্যারান্টি।

সূরা আত্ তাহরীম

আয়াত ১২ রুকু ২

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبۡتَغِىۡ مَرۡضَاتَ اَزۡوَاجِكَ ؕ

وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ۝ قَدۡ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ اَيۡمَانِكُمۡ ۚ وَاللّٰهُ مَوۡلٰٮكُمۡ ۚ

وَهُوَ الۡعَلِيۡمُ الۡحَكِيۡمُ ۝ وَاِذۡ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعۡضِ اَزۡوَاجِهٖ حَدِيۡثًا ۚ

فَلَمَّا نَبَّاَتۡ بِهٖ وَاَظۡهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيۡهِ عَرَّفَ بَعۡضَهٗ وَاَعۡرَضَ عَنۡۢ بَعۡضٍ ۚ فَلَمَّا

نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتۡ مَنۡ اَنۡۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِىَ الۡعَلِيۡمُ الۡخَبِيۡرُ ۝ اِنۡ

تَتُوۡبَاۤ اِلَى اللّٰهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوۡبُكُمَا ۚ وَاِنۡ تَظٰهَرَا عَلَيۡهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. হে নবী, আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন তা তুমি (কসম করে) নিজের ওপর কেন হারাম করছো, তুমি কি (এর মাধ্যমে) তোমার স্ত্রীদের খুশী কামনা করতে চাও? (তেমন কিছু হলে আল্লাহর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো, কারণ) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমার আধার ও পরম দয়ালু। ২. আল্লাহ তায়ালা তো তোমাদের শপথ থেকে রেহাই পাবার জন্যে (কাফফারার) একটা পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, (মূলত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র সহায়, তিনিই সর্বজ্ঞ, তিনিই প্রজ্ঞাময়। ৩. যখন (আল্লাহর) নবী তার স্ত্রীদের একজনকে (একান্ত) চুপিসারে কিছু একটা কথা বললো এবং সে (তা অন্যদের কাছে) প্রকাশ করে দিলো, আল্লাহ তায়ালা তার এ বিষয়টা নবীকে (ওহীর মাধ্যমে) জানিয়ে দিলেন, (তখন) রসূল কিছু কথা (গোপনীয়তা প্রকাশকারী স্ত্রীকে) জানিয়ে দিলো, (আবার) কিছু কথা এড়িয়েও গেলো। অতপর নবী যখন তার সে স্ত্রীর কাছ থেকে (সমগ্র বিষয়টা) জানতে চাইলো, তখন সে বললো, আপনাকে এ খবরটা কে জানালো; নবী বললো, আমাকে জানিয়েছেন (সেই মহান আল্লাহ তায়ালা), যিনি সর্বজ্ঞ ও সম্যক জ্ঞাত। ৪. (যে দু'জন স্ত্রী এর সাথে জড়িত, নবী তাদের উভয়কে ডেকে বললো,) তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করে নাও—কেননা তোমাদের উভয়ের মন অন্যায় ও বাঁকা পথের দিকে (কিছুটা) ঝুঁকে পড়েছিলো (তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন), আর যদি তোমরা উভয়ে তার বিরুদ্ধে একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা করো (তাহলে জেনে রাখো), আল্লাহ তায়ালাই তাঁর (নবীর) সহায়,

مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ④ عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ⑤ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ⑥ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ⑦

তাছাড়াও তাঁর সাথে রয়েছে জিবরাঈল (ফেরেশতা) ও নেককার মুসলমানের দল, এরপরও আল্লাহর সমগ্র ফেরেশতাকুল তার সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। ৫. (আজ) নবী যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তার মালিক তোমাদের বদলে এমন সব স্ত্রী তাকে দিতে পারেন, যারা তোমাদের চাইতে হবে উত্তম, যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বস্ত, ফরমাঁবরদার, অনুশোচনাকারী, অনুগত, রোযাদার, (হতে পারে তারা) কুমারী, (হতে পারে) অকুমারী। ৬. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবার পরিজনদের (জাহান্নামের সেই কঠিন) আগুন থেকে বাঁচাও, তার জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর, (সে) জাহান্নামের (প্রহরা যাদের) ওপর (অর্পিত), সেসব ফেরেশতা সবাই হচ্ছে নির্মম ও কঠোর, তারা (দন্ডাদেশ জারি করার ব্যাপারে) আল্লাহর কোনো আদেশই অমান্য করবে না, তারা তাই করবে যা তাদের করার জন্যে আদেশ করা হবে। ৭. (সেদিন অস্বীকারকারীদের তারা বলবে,) হে কাফেররা, আজ তোমরা (দোষ ছাড়ানোর জন্যে) কোনো রকম অজুহাত তালাশ করো না; (আজ) তোমাদের সে বিনিময়ই দেয়া হবে যা তোমরা দুনিয়ায় করে এসেছো।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আল্লাহ তায়ালা যখন ইসলামকে সমগ্র মানব জাতির সর্বশেষ ও বিজয়ী জীবন ব্যবস্থা হিসাবে চালু করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন একে তিনি পূর্ণাংগ ও সর্বব্যাপী জীব ন ব্যবস্থায় পরিণত করলেন, তাকে মানুষের যাবতীয় শক্তি, ক্ষমতা, যোগ্যতা ও প্রতিভার পরিপূরক বানালেন এবং সেই সাথে পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফার জন্যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক সম্মানিত সৃষ্টির জন্যে যে ধরনের, যে পর্যায়ের ও যে মানের যোগ্যতা এবং প্রতিভা আবশ্যক, সেই ধরনের যোগ্যতা ও প্রতিভা মানুষকে দান করলেন।

শুধু তাই নয়, ইসলামকে তিনি স্বাভাবিকভাবে জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা দান করলেন, তাকে একই সাথে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও উচ্চতা দান করলেন। কোনো গঠনমূলক শক্তিকে তিনি নিষ্ক্রিয় করেননি এবং কোনো কার্যকর যোগ্যতাকে তিনি দমন করেননি। তিনি বরঞ্চ সকল শক্তি ও ক্ষমতাকে সক্রিয় করেছেন এবং সকল সুপ্ত যোগ্যতা ও প্রতিভাকে জাগ্রত করেছেন। সেই সাথে সামনে এগিয়ে যাওয়া ও উর্ধ্বে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতার

মাঝে সমন্বয় সাধন ও ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। আর এ কাজ এমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন, যাতে পার্থিব জীবনে অবস্থান করেই আত্মা আখেরাতের সুখ সম্ভোগের যোগ্যতা অর্জন করে এবং নশ্বর পৃথিবীতে বসেই পারলৌকিক জগতের অবিনশ্বর জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর নাযিল করা জীবন ব্যবস্থাকে এরূপ বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত করার ফয়সালা করলেন, তখন তিনি নিজের রসূল হিসাবেও এমন একজন মানুষকে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিলেন যিনি এই জীবন ব্যবস্থার যাবতীয় গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও মূর্ত প্রতীক। যাঁর মধ্যে সকল মানবীয় ক্ষমতা ও প্রতিভা পূর্ণতা লাভ করেছে, যাঁর শারীরিক গঠন সুদৃঢ় ও নিখুঁত, যাঁর চেতনা সদা জাগ্রত, যাঁর অনুভূতি নির্ভুল এবং যিনি সকল অনুভবযোগ্য জিনিসকে সুষ্ঠুভাবে ও পূর্ণাংগভাবে অনুভব করেন। একই সাথে যিনি প্রগাঢ় দয়া, সহানুভূতি, স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসার অধিকারী, যিনি অত্যন্ত জীবন্ত ও সরস মেযাজের অধিকারী, তীব্র সংবেদনশীল, সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন, উদার ও দৃঢ়চেতা, যিনি আপন প্রবৃত্তির গোলামী করার পরিবর্তে প্রবৃত্তির ওপর প্রভুত্ব করেন, তাকে বশে রাখেন। সর্বোপরি যিনি এমন একজন নবী, যাঁর অন্তরাত্মা মহাজাগতিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, যাঁর হৃদয় মেরাজের শক্তিতে শক্তিমান, আকাশ থেকে যাঁকে সম্বোধন করা হয়, যিনি মহান আল্লাহর জ্যোতি দেখতে পান এবং বাহ্যিক আকৃতিসমূহের আড়াল থেকে যাঁর স্বভাব বিশ্ব চরাচরের অন্যান্য বস্তুর স্বভাবের সাথে একাকার হয়ে যায়, ফলে পাথরও তাঁকে সালাম করে, খেজুরের মৃত ডালও তাঁর কাছে কাঁদে এবং তাঁর পায়ের তলে পড়ে ওহুদ পর্বতও কাঁপে। অতপর তাঁর সত্ত্বায় এই সকল শক্তি ভারসাম্যপূর্ণভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে তার সত্ত্বা ঠিক সেই আদর্শের ন্যায় ভাবসাম্যপূর্ণ হয়ে যায়, যে আদর্শ তাঁর জন্যে মনোনীত করা হয়েছে।

অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই রসূলের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে তাঁর উম্মত এবং সমগ্র মানব জাতির জন্যে একটা উন্মুক্ত গ্রন্থে পরিণত করেছেন। এই উন্মুক্ত গ্রন্থে উক্ত আদর্শের আকৃতি ও তার বাস্তব প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। তাই রসূলের জীবনে তিনি কোনো গুপ্ত রহস্য লুকায়িত রাখেননি; বরং তার বিভিন্ন দিক তিনি কোরআনে তুলে ধরেন। সাধারণ মানুষের জীবনে যেসব জিনিস সচরাচর পরস্পর থেকে লুকিয়ে রাখা হয়, তাও প্রকাশ করে দেন। এমনকি মানবীয় দুর্বলতার সেই দিকগুলোও আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করে দেন, যা নিয়ে অন্য মানুষ ঘাঁটাঘাঁটি করার কোনোই প্রয়োজন বোধ করে না। তথাপি আল্লাহর রসূলের জীবনের এসব দিক জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার ইচ্ছাটাই যেন পরিলক্ষিত হয় কোরআনের বিভিন্ন সূরায়।

আসলে রসূলের ব্যক্তিত্বে কোনো গোপনীয় জিনিসই নেই। তাঁর গোটা জীবন, গোটা সত্ত্বা, গোটা ব্যক্তিত্বই তো ইসলামের দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্যে। সুতরাং তাঁর জীবনের একটা দিক তিনি কেনই বা লুকিয়ে রাখবেন, আর কেনই বা তা লুকিয়ে থাকবে? রসূলের জীবন হচ্ছে ইসলামী আকীদা ও আদর্শ বাস্তবায়নের নিকটতম দৃশ্যমান ক্ষেত্র। তিনি পৃথিবীতে এসেছেনই এজন্যে যে, নিজের সত্ত্বায় ও জীবনে এই আদর্শ প্রয়োগ করে দেখিয়ে দেবেন, যেমন তিনি নিজের কথা ও নির্দেশাবলীর মাধ্যমে তা প্রচার করে থাকেন। এটাই ছিলো রসূলের আগমন ও আবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

রসূল (স.)-এর সাহাবীদের আল্লাহ তায়ালা এজন্যে উত্তম পুরস্কার দান করেন যে, তাঁরা রসূলের জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি ঘটনাবলী শুধু সংরক্ষণই করেননি; বরং অনাগতকালের

মানব জাতির কাছেও তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন ও হস্তান্তর করেছেন। ফলে রসূল (স.)-এর দৈনন্দিন জীবনের ছোট-বড় কোনো ঘটনাই লিপিবদ্ধ হওয়া ও হস্তান্তরিত হওয়া থেকে বাদ পড়েনি। রসূল (স.)-এর জীবন বা রসূলের জীবনে ইসলামী আদর্শের সকল খুঁটিনাটির বাস্তবায়ন এভাবে লিপিবদ্ধ করা আল্লাহর গৃহীত সিদ্ধান্তেরই একটা অংশ ছিলো। তাই বলা যায়, কোরআনে ও হাদীসে রসূলের জীবনের যতোটুকু লিপিবদ্ধ হয়েছে তা সার্বিকভাবে সমগ্র মানব জাতির জন্যে এক অনন্য ও চিরস্থায়ী সম্পদ। এ সম্পদ কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে।

আলোচ্য সূরার শুরুতে রসূল (স.)-এর ঘরোয়া জীবনের একটি অংশ তাঁর মহান সহধর্মিণীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের সাথে স্বয়ং রসূল (স.)-এর পারস্পরিক সম্পর্কের কিছু উত্তেজনাপূর্ণ দিক এবং রসূলের ও মুসলিম জাতির জীবনে এসব উত্তেজনার প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। অধিকন্তু রসূল (স.)-এর ঘরোয়া জীবনে ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর আলোকে মুলসলিম জাতিকে প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশাবলীতেও তার যে প্রতিফলন ঘটেছে, তাও এই সূরায় আলোচিত হয়েছে।

এই সূরায় যে ঘটনাবলীর প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে, তার সঠিক সময়কাল নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে এ সংক্রান্ত রেওয়ায়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে অন্তত এটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এসব ঘটনা ঘটেছে যয়নব বিনতে জাহশের সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ে হওয়ার পর।

এই প্রসংগে রসূল (স.)-এর স্ত্রীদের ঘটনাবলী ও তাঁর ঘরোয়া জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে তা এই সূরায় বর্ণিত উক্ত ঘটনাবলী সংক্রান্ত উক্তিসমূহ উপলব্ধি করতে সহায়ক হবে। এই সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরার ব্যাপারে আমি ইমাম ইবনে হাযমের গ্রন্থ 'জাওয়ামেউস্ সীরাহ' ও ইবনে হেশাম প্রণীত সীরাত সংক্রান্ত গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছি। তবে উদ্ধৃতির মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যও করেছি।

রসূল (স.)-এর প্রথমা স্ত্রী হচ্ছেন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলেদ (রাঃ)। তাঁর সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ে হয় রসূলের বয়স যখন ২৫ (মতান্তরে ২৩ বছর)। খাদীজার বয়স তখন ৪০ বছর বা তারও বেশী। তিনি হিজরতের তিন বছর আগে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জীবদ্দশায় রসূল (স.) আর কাউকে বিয়ে করেননি। মৃত্যুকালে খাদীজার বয়স ৫০ ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

খাদীজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর রসূল (স.) সওদা বিনতে যামআকে বিয়ে করেন। তিনি তেমন রূপবতীও ছিলেন না, বয়সেও যুবতী ছিলেন না। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী ও সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম সাকরাত বিন আমরের স্ত্রী ছিলেন এবং স্বামীর ইন্তেকালের পর বিধবা অবস্থায় তাঁর সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ে হয়।

এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কন্যা আয়েশাকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্কা। তাই হিজরতের পরে ছাড়া তাঁর সাথে রসূল (স.) দাম্পত্য জীবন শুরু করেননি। রসূলের স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র কুমারী এবং অন্য সকল স্ত্রী অপেক্ষা তাঁকেই তিনি বেশী ভালোবাসতেন। বর্ণিত আছে যে, বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিলো ৯ বছর এবং রসূল (স.)-এর সাথে তিনি দাম্পত্য জীবন কাটান ৯ বছর ৫ মাস। এরপর রসূল (স.) ইন্তেকাল করেন।

এরপর রসূল (স.) বিয়ে করেন হযরত ওমরের কন্যা হাফসাকে। তিনি কুমারী ছিলেন না। হযরত ওমর প্রথমে তাকে আবু বকর ও পরে ওসমানের সাথে বিয়ে দিতে ছিয়েছিলেন, কিন্তু তারা উভয়ে অসম্মতি জানান। এ সময় রসূল (স.) ওমরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর মেয়ের জন্যে তিনি আবু বকর ও ওসমানের চেয়েও উত্তম বর জুটিয়ে দেবেন। অতপর তিনি নিজেই তাকে বিয়ে করেন।

এরপর তিনি বিয়ে করেন যয়নব বিনতে খোযায়মাকে। তার প্রথম স্বামী হারেস বিন আবদুল মোত্তালেবের পুত্র ওবায়দা বদর যুদ্ধে নিহত হয়। তিনি রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় মারা যান। কারো কারো মতে, রসূল (স.)-এর পূর্বে তাঁর স্বামী ছিলেন আবদুল্লাহ বিন জাহশ আল আসাদ– যিনি ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। সম্ভবত এটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য।

ওহুদ যুদ্ধে আহত ও পরে সে কারণে শাহাদাত বরণকারী আবু সালামার বিধবা স্ত্রী উম্মে সালামাকেও রসূল (স.) বিয়ে করেন। তিনি আবু সালামার পরিত্যক্ত সন্তানদেরও নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

আপন ফুফাতো বোন পরমা সুন্দরী যয়নব বিনতে জাহশকেও রসূল (স.) বিয়ে করেন। ইতিপূর্বে তিনি তাকে নিজের মুক্ত গোলাম ও পালক পুত্র যায়দ বিন হারেসার সাথে বিয়ে দেন। কিন্তু তাদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় যায়দ তাকে তালাক দেন। ২২তম পারায় সূরা আহযাবে আমি তার ঘটনা বর্ণনা করেছি। এই মহিলা রসূল (স.)-এর নিকটাত্মীয় ও পরমা সুন্দরী ছিলেন বিধায় হযরত আয়েশা তাঁকে নিজের কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন।

অতপর তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ সালের মাঝামাঝির দিকে বনুল মোস্তালেক যুদ্ধের পর পরাজিত ইহুদী গোত্র বনুল মোস্তালেকের সরদার হারেসের কন্যা জুয়ায়রিয়াকে বিয়ে করেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুসারে হযরত আয়েশা বলেন, রসূল (স.) যখন বনুল মোস্তালেকের যুদ্ধবন্দীদের সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করেন, তখন জুয়ায়রিয়া সাবেত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাস অথবা তার এক চাচাতো ভাইয়ের ভাগে পড়েন। জুয়ায়রিয়া তার মনিবের কাছ থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে নিজের মুক্তির পক্ষে সম্মতি আদায় করেন। রূপে গুণে অসাধারণ এই মহিলাকে যেই দেখতো, সেই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে যেতো। তিনি নিজের মুক্তির জন্যে মুক্তিপণ সংগ্রহে সাহায্য চাইতে রসূল (স.)-এর কাছে আসেন। হযরত আয়েশা বলেন, এই মহিলাকে আমার ঘরের দরজার ওপর দাঁড়ানো দেখামাত্রই আমি তাকে অবাঞ্ছিত মনে করেছিলাম। ভেবেছিলাম, তার মধ্যে যে চিত্তাকর্ষক রূপ-গুণ আমি দেখছি, রসূল (স.)-ও তা দেখবেন। যা হোক, মহিলা রসূল (স.)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আমি গোত্রপতি হারেস বিন আবী সেরারের কন্যা। আমি কী বিপদে আছি তা আপনার অজানা নয়। আমি তো সাবেত বিন কায়সের ভাগে পড়েছিলাম। কিন্তু তাকে আমি মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দিতে সম্মত করেছি। এই মুক্তিপণ সংগ্রহে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। রসূল (স.) বললেন, এর চেয়ে উত্তম কোনো প্রস্তাবে তুমি কি আগ্রহী? তিনি বললেন, সেটি কী? রসূল (স.) বললেন, আমি তোমার মুক্তিপণ দিয়ে দেবো এবং তোমাকে বিয়ে করবো। জুয়ায়রিয়া বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আমি রাযি। রসূল (স.) বললেন, মুক্তিপণ আমি দিয়ে দিয়েছি।

এরপর হোদায়রিয়ার সন্ধির পর রসূল (স.) আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবাকে বিয়ে করেন। তিনি মুসলমান হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। সেখানে তার স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে যায় ও তাকে ত্যাগ করে। রসূল (স.) তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে তাঁকে মোহরানা দিয়ে দেন। অতপর তিনি সেখান থেকে মদীনায় চলে আসেন।

খায়বর বিজয়ের পর তিনি বিয়ে করেন বনু নযীরের সরদার হুওয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সুফিয়াকে। তিনি ছিলেন কেনানা ইবনে আবিল হাকীকের স্ত্রী। এই ব্যক্তিও বিশিষ্ট ইহুদী নেতা ছিলো। এই মহিলার সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ের পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে ইসহাক বলেন, সুফিয়া ও অপর এক যুদ্ধবন্দিনীকে রসূল (স.)-এর কাছে আনা হয়। তারা উভয়ে যখন নিহত একদল লাশের কাছে যাচ্ছিলো তখন সফিয়ার সহযাত্রী মহিলাটি মাথায় ধুলো ছিটিয়ে মুখ চাপড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদা শুরু করলো। তা দেখে রসূল (স.) বললেন, 'তোমরা এই শয়তান মহিলাটিকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। আর সফিয়াকে তার পেছনে রাখতে বললেন এবং তার গায়ের ওপর নিজের চাদর রাখলেন। তা দেখে সাহাবীরা বুঝতে পারলেন, রসূল (স.) সফিয়াকে নিজের জন্যে পছন্দ করেছেন। উক্ত ইহুদী মেয়েটিকে দেখে রসূল (স.) বেলালকে বললেন, হে বেলাল! এই দুই মহিলার সাথে তুমি যখন তাদের গোত্রের নিহত লোকদের লাশের স্তূপ দেখছিলে, তখন কি তোমার ভেতর থেকে দয়ামায়া ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো?

এরপর তিনি বিয়ে করেন মায়মুনা বিনতুল হারেসকে। তিনি খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের খালা। রসূল (স.)-এর পূর্বে তার স্বামী ছিলো আবু রুহম বিন আবদুল উয্যা। এই মহিলাই রসূল (স.)-এর সর্বশেষ স্ত্রী।

এভাবে দেখা যায় যে, প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে রসূল (স.)-এর বিয়ের পেছনে একটা সুনির্দিষ্ট ঘটনা ও কারণ ছিলো। যয়নব বিনতে জাহশ ও জুয়ায়রিয়া বিনতুল হারেস ব্যতীত অন্য স্ত্রীরা বয়সে যুবতীও ছিলেন না কিংবা তেমন আকর্ষণীয় রূপবতীও ছিলেন না। হযরত আয়েশা (রা.) রসূল (স.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছাড়া যে দু'জন স্ত্রী যুবতী ও রূপবতী ছিলেন (যয়নব ও জুয়ায়রিয়া), তাদের নিজেদের পেছনে অন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ সক্রিয় ছিলো। অবশ্য তাদের দু'জনের মধ্যে যে চিত্তাকর্ষক উপাদানটি ছিলো তা আমি অস্বীকার করছি না। এ ধরনের মানবীয় উপাদানগুলো রসূল (স.)-এর জীবনে যে থাকতে পারে সে কথা অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। এ সব উপাদান কোনো দূষণীয় জিনিস নয় যে, রসূল (স.)-এর জীবনে তার উপস্থিতির কথা অস্বীকার করে রসূলের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হবে, আর রসূলের দুশমনদের জন্যে তার উপস্থিতির অভিযোগ তোলা আনন্দদায়ক হবে। রসূল (স.)-কে তো মানুষ হিসাবেই মনোনীত করা হয়েছে। তবে উচ্চতর ও মহত্তর মানুষ হিসাবে। বস্তুত তিনি আসলেই উচ্চতর ও মহত্তর মানুষ ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে যাবতীয় মানবীয় ভাবাবেগ মাত্রাভেদে বিদ্যমান ছিলো।

নিজ গৃহে নিজ স্ত্রীদের সাথে তিনি রসূল ও মানুষ হিসাবেই জীবন যাপন করেছেন। এভাবেই তিনি সৃজিত হয়েছেন এবং তাঁকে অকুণ্ঠভাবে একথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, 'আমার প্রতিপালক মহা পবিত্র। আমি একজন মানুষ ও রসূল ছাড়া তো আর কিছু নই।'

স্ত্রীদের কাছ থেকে তিনি আনন্দ উপভোগ করতেন এবং তাদেরও আনন্দ দিতেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসূল (স.) যখন তাঁর স্ত্রীদের কাছে একান্তে মিলিত হতেন, তখন তিনি হতেন সবচেয়ে কোমল, বিনয় ও উদার মানুষ, তিনি থাকতেন সদা হাসিমুখ। তবে তিনি যে তাদের আনন্দ দিতেন এবং আনন্দ পেতেন, সেটা ছিলো নেহাতই তাঁর হৃদয় থেকে উদ্ভূত, তাঁর সুন্দর স্বভাব ও সদাচারজনিত এবং তাঁর উদার সদয় ও মহৎ আচরণই ছিলো তার উৎস। তাঁদের বৈষয়িক জীবনে কিন্তু ভোগবিলাসের চিহ্নমাত্র ছিলো না; বরং তা ছিলো অনেকাংশে নিছক মৌলিক প্রয়োজন পূরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমনকি যখন বিজয়ের পর বিজয় অর্জিত হতে থাকে এবং মুসলমানরা 'গনীমত' (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) এবং 'ফায়' (বিনা যুদ্ধে বিজিত অঞ্চলে অধিকৃত সহায় সম্পদ) দ্বারা বিপুলভাবে সমৃদ্ধশালী হয়, তখনো এরূপ অবস্থা অব্যাহত ছিলো। ইতিপূর্বে সূরা আহযাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলের স্ত্রীরা তাঁর কাছে সংসারের ব্যয়নির্বাহে আরো একটু প্রশস্ততা ও সচ্ছলতার আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু এই আবেদনের ফলে তারা এক অভাবনীয় সংকটে পড়েছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের দুটো জিনিসের মধ্য থেকে যে কোনো একটি গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। একদিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল ও আখেরাতের সুখ, অপরদিকে পার্থিব ভোগের উপকরণ ও রসূলের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হওয়া, কিন্তু রসূলের সহধর্মিণীরা আল্লাহ তায়ালা, রসূল ও আখেরাতকেই গ্রহণ করে নেন।

তবে রসূল (স.)-এর পরিবারের সেই নবুয়ত-প্রভাবিত পরিবেশে জীবন যাপনের উদ্দেশ্য এটা ছিলো না যে, তাঁর অথবা তাঁর স্ত্রীদের মন থেকে যাবতীয় মানবীয় আবেগ-অনুভূতির বিলোপ সাধন করতে হবে। বস্তুত এরূপ পরিস্থিতিতে কোনো পরিবারের স্ত্রীদের মধ্যে যে ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব থাকা স্বাভাবিক, তা তাঁদের মধ্যেও ছিলো। ইতিপূর্বে হযরত আয়েশার এ বর্ণনা আমি উদ্ধৃত করেছি যে, জুয়ায়রিয়াকে দেখে তাঁর রূপগুণে রসূলুল্লাহ (স.) মুগ্ধ হয়ে যেতে পারেন এই আশংকায় আয়েশা দেখামাত্রই তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কার্যতও তার আশংকা সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। অনুরূপভাবে, আয়েশা সফিয়ার সাথে সম্পৃক্ত তার একটি ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বললাম, 'সফিয়ার যা অবস্থা!' 'অর্থাৎ তার বেঁটে আকৃতি সম্পর্কে টিপ্পনী কেটেছিলাম। রসূল (স.) বললেন, তুমি এমন একটা কথা বলেছো, 'যা সমুদ্রের বিশাল পানিরাশিতে মিশিয়ে দিলেও তা দূষিত হয়ে যাবে।' হযরত আয়েশা আরো বর্ণনা করেছেন, সূরা আহযাবের এ আয়াত যখন নাযিল হল, যাতে রসূলের স্ত্রীদের দুটি জিনিসের একটি গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে, তখন তিনি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে গ্রহণ করে নিলেন এবং রসূল (স.)-কে অনুরোধ করলেন যেন তিনি যা গ্রহণ করেছেন তার কথা অন্যান্য স্ত্রীকে না জানান। এই অনুরোধের উদ্দেশ্য কি তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। রসূল (স.) বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা আমাকে ধিক্কারদাতা হিসাবে পাঠাননি। আমাকে পাঠিয়েছেন সহজভাবে যাবতীয় শিক্ষা দেয়ার জন্যে। কোনো স্ত্রী যদি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কোন্‌টি গ্রহণ করেছো, তাহলে আমি তাকে এই খবরটি জানিয়ে দেবো।'

নিজের সম্পর্কে বর্ণিত হযরত আয়েশার এই বর্ণনাগুলো তাঁর অন্তর্নিহিত সত্যনিষ্ঠা ও ইসলামী শিক্ষার প্রেরণা থেকে উদ্ভূত। এগুলো অন্যান্য মহিলাদের জন্যেও দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং এরূপ আদর্শ পারিবারিক জীবনেও যে মানবিক পরিবেশ অনিবার্যভাবে বিরাজ করে তা ফুটিয়ে তোলে। এ

বর্ণনাগুলো থেকে আরো জানা যায় যে, রসূল (স.) তাঁর উম্মতকে যেমন ইসলামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে রেসালাতের দায়িত্ব পালন করতেন, তিনি তাঁর পরিবারেও তদ্রূপ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে রেসালাতের দায়িত্ব পালন করতেন।

যে ঘটনা উপলক্ষে সূরা তাহরীমের প্রথমাংশ নাযিল হয়েছে, তা রসূল (স.) ও তাঁর স্ত্রীদের জীবনে সংঘটিত বহু সংখ্যক ঘটনার অন্যতম। এ ঘটনা সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে, আমি সূরার তাফসীরে যথাস্থানে তা উল্লেখ করবো।

এই ঘটনা উপলক্ষে এবং এতে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীদ্বয়কে যে তাওবার আহবান জানানো হয়েছে, সে উপলক্ষে এ সূরায় সাধারণভাবে তাওবা এবং পরিবার পরিজনকে ইসলামী প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দোযখ থেকে বাঁচানোর আহবান জানানো হয়েছে। অনুরূপভাবে দোযখে কাফেররা কিরূপ দুর্দশায় নিপতিত হবে, তারও একটি দৃশ্য এ সূরায় দেখানো হয়েছে। আর সূরার উপসংহার টানা হয়েছে হযরত নূহ ও হযরত লূতের স্ত্রীদ্বয়কে মুসলিম পরিবারের ভেতর কাফেরের দৃষ্টান্ত এবং ফেরাউনের স্ত্রীকে কাফের পরিবারে মোমেনের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে। অনুরূপভাবে সর্বশেষে উল্লেখ করা হয়েছে ইমরানের স্ত্রী মরিয়মের প্রসংগ– যিনি নিজের পবিত্রতা বজায় রেখেছিলেন, আল্লাহর আত্মা থেকে ফুৎকার লাভ করেছিলেন, আল্লাহর বাণী ও তাঁর গ্রন্থকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং যিনি আল্লাহর অনুগত ছিলেন।

প্রথম পাঁচটি আয়াত যথা 'হে নবী, কেন তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্যে নিজের ওপর হারাম করে নাও যা আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্যে হালাল করেছেন............' এর নাযিল হওয়ার কারণ প্রসংগে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে হযরত আয়েশা থেকে ইমাম বোখারী যে হাদীস বর্ণনা করেন তা নিম্নরূপ,

হযরত আয়শা বলেন, রসূল (স.) যয়নব বিনতে জাহশের গৃহে মধু পান করতেন এবং তার কাছে রাত্র যাপন করতেন। এ কারণে আমি ও হাফ্সা স্থির করলাম যে, আমাদের দু'জনের কারো কাছে যখনই রসূল (স.) আসবেন, অমনি তাঁকে বলা হবে, আপনি কি 'মাগাফীর' খেয়েছেন। আমি তো আপনার কাছ থেকে মাগাফীরের ঘ্রাণ পাচ্ছি (মাগাফীর সুস্বাদু অথচ দুর্গন্ধযুক্ত এক ধরনের খাদ্যদ্রব্য)। পরে রসূল (স.) তাদের একজনের কাছে এলে সেই স্ত্রী তাঁকে উক্তরূপ কথা বললেন। রসূল (স.) জবাব দিলেন, 'কই, না তো! মাগাফীর নয়, আমি যয়নব বিনতে জাহশের কাছে মধু খেতাম। তবে আর খাবো না। আমি শপথ করেছি, তুমি আর কাউকে এ কথা জানিও না।' এভাবে রসূল (স.) একটা হালাল জিনিসকে নিজের ওপর হারাম করে নিলেন।

মনে হয় রসূল (স.) যে স্ত্রীকে এ কথা বলেছিলেন, তিনি তাঁর সহযোগী অপর সতীনের কাছে কথাটা ফাঁস করে দিয়েছিলেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে বিষয়টা জানিয়ে দিলেন। অতপর রসূল (স.) তাঁর সেই স্ত্রীর কাছে ফিরে গেলেন এবং তিনি তার সতীনের কাছে যা যা বলেছেন, তা খানিকটা উল্লেখ করলেন। নিজের স্বভাবগত ভদ্রতার খাতিরে তিনি সব কথার উল্লেখ করলেন না। কেবল দুই সতীনের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরলেন, যাতে সে স্ত্রী বুঝতে পারেন যে, রসূলুল্লাহ সব কিছু জেনে ফেলেছেন। রসূল (স.)-এর মুখে তাদের দুই সতীনের গোপন সংলাপের বিষয়বস্তু শুনে স্ত্রী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে কে অবহিত করলো?' সম্ভবত তিনি ভেবেছেন অপর সতীনই তাঁকে অবহিত করেছেন।

কিন্তু রসূল (স.) তাকে জবাব দিলেন, 'মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা আমাকে অবহিত করেছেন।' অর্থাৎ আমি সেই উৎস থেকে এ তথ্য জেনেছি, যে উৎস সব কিছুই জানেন। এ দ্বারা রসূল (স.) এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, যে স্ত্রীর সাথে রসূল (স.) কথা বলেছেন, শুধু সেই স্ত্রী নয়, বরং রসূল নিজেও তাদের গোপন সলাপরামর্শ ও পরবর্তী সংলাপের কথা পুরোপুরি জানেন।

এই ঘটনা ও এর মাধমে যে গোপন সলাপরামর্শের তথ্য উদঘাটিত হলো, তার ফল দাঁড়ালো এই যে, রসূল (স.) রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে কসম খেয়ে বললেন যে, এক মাসের মধ্যে কোনো স্ত্রীর কাছেও ঘেঁষবেন না। এই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রসূল (স.) তাঁর স্ত্রীদের সকলকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরপর এই পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। রসূল (স.)-এর ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং রসূল (স.) স্বীয় স্ত্রীদের কাছে ফিরে যান। তবে এ সম্পর্কে আরো বিশদ বিবরণ রয়েছে, যা বর্ণনা করার পূর্বে আমি এ সংক্রান্ত অপর হাদীসটির উল্লেখ করতে চাই।

হযরত আনাস (রা.) থেকে নাসাঈ বর্ণনা করেন, রসূল (স.)-এর একজন দাসী ছিলো, যার সাথে তিনি মাঝে মাঝে রাত্র যাপন করতেন। হযরত আয়েশা ও হাফ্সা তার বিরুদ্ধে রসূল (স.)-কে এতো ক্ষেপিয়ে তোলেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি উক্ত দাসীকে নিজের ওপর হারাম করে নেন। এ কারণেই নাযিল হয়, 'হে নবী, তুমি নিজের স্ত্রীদের খুশী করার জন্যে হালালকে হারাম করছো কেন?'

ইবনে জারীর ও ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রসূল (স.) হাফ্সার গৃহে স্বীয় পুত্র ইবরাহীমের মাতা মারিয়ার সাথে রাত্রি যাপন করেন। এতে হাফ্সা এতো রেগে যান যে, মারিয়াকে অপমান করতে উদ্যত হন। তখন রসূল (স.) হাফসাকে প্রতিশ্রুতি দেন ও শপথ করেন যে, তিনি মারিয়াকে পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু এ বিষয়টি কারো কাছে প্রকাশ না করার জন্যে হাফসাকে আদেশ দেন। কিন্তু হাফসা বিষয়টি আয়েশার কাছে ফাঁস করে দেন। এ বিষয়টি আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

উল্লিখিত হাদীস দুটি বর্ণিত উভয় ঘটনাই সত্য হয়ে থাকতে পারে। তবে সম্ভবত শেষোক্ত ঘটনাটাই আলোচ্য আয়াত কয়টির ভাষার সাথে অধিকতর সংগতিশীল। রসূল (স.)-এর এতো বেশী রেগে যাওয়া যে, তার পরিণামে স্ত্রীদের সকলকে একযোগে তালাক দিতে উদ্যত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত গড়াতে পারে, এর সাথে এই শেষোক্ত ঘটনাই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। নাযুকতা ও স্পর্শকাতরতার বিচারে এই ঘটনাই এতোটা গুরুতর রূপ ধারণ করার কথা। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনা অধিকতর নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত। বাস্তবে এটা সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয় এবং রসূল (স.)-এর পরিবারে বিদ্যমান জীবন মানের আলোকে এই ঘটনা এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করা বিচিত্র কিছু নয়। প্রকৃত ব্যাপার কী ছিলো, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

এরপর আলোচনায় আসা যাক 'ঈলা' অর্থাৎ স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে রসূলের শপথ গ্রহণ প্রসংগে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আহমাদ যে হাদীস বর্ণনা করেন, তাতেই এ ঘটনার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ হাদীসে ইসলামী সমাজের একটি দিকের চিত্রও ফুটে ওঠে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.)-এর যে দুই স্ত্রী সম্পর্কে সূরা তাহরীমের এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো যে, 'তোমাদের উভয়ের অন্তর আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে তোমরা যদি

তাওবা করো, তবে তো ভালোই হয়', সেই দুজন স্ত্রী কে কে, এ কথা আমি হযরত ওমরের কাছে জিজ্ঞেস করার জন্যে অনেক দিন যাবত ব্যাকুল ছিলাম এবং সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। অবশেষে একবার হযরত ওমর (রা.) হজ্জে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে হজ্জ আদায় করতে গেলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মোমেনীন, রসূল (স.)-এর সেই দু'জন স্ত্রী কে কে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেছেন যে, 'তোমাদের উভয়ের আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে তোমরা যদি তাওবা করো, তবে তো ভালোই হয়?' হযরত ওমর (রা.) বলেন, 'কী আশ্চর্য! হে ইবনে আব্বাস, (যুহরীর মতে, হযরত ওমর তাঁর এই প্রশ্ন অপছন্দ করেছিলেন, তবে তার কাছে কোনো তথ্য গোপন করেননি।) তারা হচ্ছে আয়েশা ও হাফসা।' এরপর হযরত ওমর পুরো ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, আমরা কোরায়শ বংশীয়রা নারীদের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতাম, কিন্তু আমরা যখন মদীনায় গেলাম, তখন সেখানে এমন এক সমাজ দেখলাম, যে সমাজে নারীর কর্তৃত্ব চলতো। আমাদের মহিলারাও তাদের কাছ থেকে স্বামীদের ওপর কর্তৃত্ব চালানো শিখতে লাগলো। আওয়ালীতে উমাইয়া ইবনে যায়দের পল্লীতে আমার বাড়ী ছিলো। একদিন আমি আমার স্ত্রীর ওপর রেগে গেলাম। সে আমার সাথে তর্ক করতে লাগলো। আমি তার এরূপ তর্ক করায় খুবই বিরক্তি প্রকাশ করলাম। সে বললো, তর্ক করায় তুমি বিরক্ত হচ্ছো কেন? রসূল (স)-এর স্ত্রীরাও তাঁর সাথে তর্ক করে থাকে এবং তাদের কেউ কেউ তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সাথে কথা বলে না। অতপর আমি হাফসার কাছে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে তর্ক করো এবং তোমাদের কেউ কি তাঁর সাথে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কথা বন্ধ করে থাকে? সে বললো, হাঁ। আমি বললাম, এরূপ যে করে সে ধ্বংস হবেই। তোমাদের কেউ কি ভাবেও না যে, আল্লাহর রসূল যার ওপর রাগান্বিত হন, তার ওপর আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রাগান্বিত হতে পারেন এবং সে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে? খবরদার, রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে তর্ক করবে না, তাঁর কাছে কিছুই চাইবে না, আমার ধন-সম্পদ যা কিছু আছে তা থেকে তোমার যা মনে চায় চেয়ে নিয়ো। তোমার সতিন যদি তোমার চেয়ে বেশী সুন্দরী এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে বেশী প্রিয় হয়ে থাকে, (হযরত আয়েশার দিকে ইংগিত করে) তবে সে জন্যে মনোক্ষুণ্ন হয়ো না।

আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী ছিলো। সেই প্রতিবেশী ও আমি পালাক্রমে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে যেতাম। একদিন সে যেতো, একদিন আমি যেতাম এবং যেদিন যে ওহী নাযিল হতো, পালাক্রমে তার খবর সে আমাকে জানাতো আর আমি তাকে জানাতাম। আমরা বলাবলি করতাম, যে, গাসসান গোত্র আমাদের ওপর হামলা করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। একদিন আমার উক্ত প্রতিবেশী রাতের বেলা এসে আমার দরজায় করাঘাত করলো এবং ডাকলো। আমি তার সামনে বেরিয়ে এলাম। সে বললো, সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে! আমি বললাম কি হয়েছে? গাসসানীরা এসে গেলো নাকি? সে বললো, না, তা নয়। তবে তার চেয়েও ভয়ংকর ও সাংঘাতিক ব্যাপার। রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। আমি সংগে সংগে বললাম, হাফসার সর্বনাশ হয়ে গেলো। এ ঘটনা ঘটবে, তা আমি জানতাম। পরদিন ফজরের নামাযের অব্যবহিত পর আমি হাফসার কাছে গেলাম। দেখলাম সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রসূল (স.) কি

তোমাদের তালাক দিয়েছেন? সে বললো, জানি না। তিনি এই তো এই পানকক্ষে আমাদের সংগ বর্জন করে অবস্থান করছেন। সংগে সংগে আমি এক কৃষ্ণকায় তরুণের কাছে এলাম। তাকে বললাম, ওমরের জন্যে অনুমতি চাও (অর্থাৎ রসূলের কাছ থেকে সাক্ষাতের অনুমতি এনে দাও)। তরুণ ভেতরে প্রবেশ করলো। অতপর বেরিয়ে এসে বললো, আপনার কথা রসূলের কাছে বলেছি। কিন্তু তিনি কিছুই বলেননি। আমি তখন মসজিদে নববীর মেম্বরের কাছে গেলাম। দেখলাম, সেখানে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে বসে আছে। তাদের কেউ কেউ কাঁদছে। আমি সেখানে কিছুক্ষণ বসলাম, কিন্তু আমার ভেতরকার আবেগ উত্তেজনা আমাকে অস্থির করে তুললো। আমি তাই পুনরায় সে তরুণটির কাছে এলাম এবং আবারো বললাম, ওমরের জন্যে অনুমতি এনে দাও। এবারও সে ভেতরে গিয়ে ফিরে এসে জানালো, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাক্ষাতের অনুমতি দানের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আমি আবারও মেম্বরের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে কাটালাম। অতপর আবেগ উত্তেজনার বশে আবারো সে তরুণের কাছে গেলাম এবং অনুমতি চাইতে অনুরোধ করলাম। এবারও সে আগের মতো জানালো, রসূলুল্লাহ (স.) নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আমি অগত্যা ফিরে যেতে উদ্যত হলাম। আমি রওনা হতেই পেছনে থেকে উক্ত তরুণ ডাক দিলো। সে বললো, আপনাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। ভেতরে যান। আমি ভেতরে গেলাম এবং রসূলুল্লাহ (স.)-কে সালাম করলাম। দেখলাম তিনি একটি বালুভর্তি বিছানায় শুয়ে আছেন এবং সে জন্যে তাঁর শরীরে দাগ হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আপনি স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? তিনি মাথা তুলে আমাকে বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার! ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কোরায়শ বংশীয়রা নারীদের ওপর পুরুষদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতাম, কিন্তু মদীনায় এসে দেখলাম, এখানকার পুরুষদের ওপর তাদের স্ত্রীদের কর্তৃত্ব বিরাজ করছে। এখানকার মহিলাদের দেখাদেখি আমাদের মহিলারাও কর্তৃত্ব ফলানো শিখেছে। একদিন আমার স্ত্রীর ওপর আমি রাগ করেছিলাম। সে আমার সাথে তর্ক জুড়ে দিলো। আমি তার তর্ক করায় বিরক্তি প্রকাশ করলাম। সে বললো, আমার তর্ক করায় তুমি বিরক্ত হচ্ছো কেন! আল্লাহর কসম, রসূলের স্ত্রীরাও তাঁর সাথে তর্ক করে। এমনকি তাদের কেউ কেউ তাঁর সাথে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কথা বন্ধ রাখে। এ কথা শুনে আমি বললাম, যে মহিলা এমন কাজ করে তার সর্বনাশ হবে। তোমরা কি ভাবো না যে, আল্লাহর রসূলের ক্রোধের কারণে তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা ক্রুদ্ধ হতে পারেন এবং এতে তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে? এ কথার পর রসূলুল্লাহ (স.) মুচকি হাসলেন । আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাফসার কাছে গিয়েছিলাম, তাকে বলেছি যে, তোমার কোনো সতিন যদি তোমার চেয়ে বেশী সুন্দরী হয় এবং রসূলের কাছে তোমার চেয়ে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না। রসূলুল্লাহ (স.) আবারও মুচকি হাসলেন। আমি বললাম, আমি কি আশ্বস্ত হতে পারি ইয়া রাসূলাল্লাহ?' তিনি বললেন, হাঁ। তখন আমি বসলাম। আমি ঘরের ভেতরে চতুর্দিকে তাকালাম। সেখানে রসূল (স.)-এর গাম্ভীর্যপূর্ণ অবস্থান ছাড়া আর কোনো দর্শনীয় বস্তু আমার চোখে পড়লো না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে সচ্ছলতা দান করেন। আল্লাহ তায়ালা তো পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যকেও সচ্ছলতা দান করেছেন। অথচ তারা আল্লাহর এবাদাত করে না। এ সময় রসূলুল্লাহ (স.) ওঠে

বসলেন এবং বললেন, হে খাত্তাবের ছেলে, তুমি কি সন্দেহের মধ্যে আছো? তারা তো এমন জাতি, যাদের দুনিয়ার জীবনেই সকল সুখ শান্তি নগদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্যে ক্ষমা চান। ....রসূল (স.) স্বীয় স্ত্রীদের ওপর এতো বেশী রুষ্ট হয়েছিলেন যে, এক মাসের মধ্যে তাদের কাছে যাবেন না বলে কসম খেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তিরস্কার করেন (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ীও যুহরীর সূত্রে একই ভাষায় এই হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

সীরাত গ্রন্থসমূহে এ ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া গেছে, তা এখানে বর্ণনা করা হলো। এবার আমি সূরাটির তাফসীরে মনোনিবেশ করছি।

তাফসীর

আয়াত ১-৭

সূরাটি শুরু হয়েছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রসূলকে নিম্নোক্ত তিরস্কারের মাধ্যমে,

রাগ অনুরাগ মিলিয়ে স্ত্রীদের সাথে প্রিয় নবীর সম্পর্ক

'হে নবী! আল্লাহ যে জিনিস তোমার জন্যে হালাল করেছেন, তা নিজের স্ত্রীদের মনস্তুষ্টির জন্যে হারাম করো কেন?...............'

এ অত্যন্ত কার্যকর ও তাৎপর্যময় তিরস্কার। মোমেনের জন্যে এটা বৈধ হতে পারে না যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্যে যে ভোগ্যদ্রব্য বৈধ করা হয়েছে, তা সে নিজের ওপর অবৈধ করে নেবে। রসূল (স.) অবশ্য মধু অথবা মারিয়াকে শরয়ী পরিভাষা অনুসারে নিজের ওপর হারাম করেননি। কেবল নিজে তা ভোগ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে ওহীযোগে তিরস্কার করে জানিয়ে দেয়া হলো যে, আল্লাহ তায়ালা যে জিনিস হালাল করেছেন, কারো সন্তুষ্টির জন্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করাও বৈধ নয়। 'আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াশীল'- এ কথা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজেকে বঞ্চিত করাটা একটা শাস্তিযোগ্য কাজ, যদিও তাকে এ জন্যে দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। এটি একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত।

আয়াতের ভাষা থেকে বুঝা যায়, রসূল (স.) কসম খেয়েছিলেন। তাই বলা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা এই কসম থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে কাফফারা দেয়া ফরয করেছেন। কোনো অন্যায় কাজের কসম খেলে এভাবে কাফফারা দিয়ে তা থেকে ফিরে যাওয়াই উত্তম। 'তিনি তোমাদের সহায় ও অভিভাবক।' তাই তিনি তোমাদের দুর্বলতায় ও কষ্টে তোমাদের সাহায্য করেন। আর এ জন্যেই কষ্ট থেকে রেহাই দেয়ার জন্যে কসম থেকে উদ্ধার পাওয়ার বিধান দিয়েছেন। 'আর তিনি মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়'। সুতরাং তিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্মত আইন বিধান রচনা করেন। তোমাদের শক্তি সামর্থের সাথে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা তোমাদের জন্যে উপযোগী ও কল্যাণকর, তারই নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কাজেই তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা ছাড়া আর কোনো কিছু নিজেদের ওপর নিষিদ্ধ করো না। আর তিনি যা হালাল করেছেন তা ছাড়া আর কোনো জিনিস নিজেদের জন্যে হালাল করে নিয়ো না। পূর্ববর্তী নির্দেশের সাথে এ মন্তব্য অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এরপর উল্লেখ করা হয়েছে রসূলের সংলাপের কথা। এই সংলাপের বিষয়বস্তু কি ছিলো তারও উল্লেখ এখানে করা হয়নি, আর তার বিস্তারিত বিবরণও দেয়া হয়নি। কেননা, এই বিষয়বস্তু

গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং তা তার কোনো স্থায়ী উপাদানও নয়। স্থায়ী উপাদান হচ্ছে এর তাৎপর্য ও ফলাফল। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'স্মরণ করো , যখন নবী তার জনৈকা স্ত্রীকে একটি কথা গোপনে বললেন।'

একমাত্র কোরআনের উক্তি থেকেই আমরা জানতে পারি, মানব জাতির ইতিহাসের সে বিস্ময়কর মুহূর্তটির একটি দৃষ্টান্ত সম্পর্কে। সেই মুহূর্তটিতে মানুষ নিছক আল্লাহর সাথে একান্তে মিলিত হয়, আর আল্লাহ তায়ালা তার কাজে প্রকাশ্যে ও সবিস্তারে হস্তক্ষেপ করেন। আমরা এ থেকে আরো জানতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে তাঁর দুই স্ত্রীর মাঝে তাঁর সেই গোপন কথা সম্পর্কে যে সলাপরামর্শ হয়েছে, তা জানিয়ে দিয়েছেন এবং রসূল (স.) যখন সেই স্ত্রীর কাছে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন শুধু সে কথাটার একাংশের প্রতি ইঙ্গিত দেয়াই যথেষ্ট মনে করেছেন। বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। আর তিনি উক্ত স্ত্রীকে তাঁর জ্ঞানের আসল উৎস কি তা জানিয়ে দিয়েছেন,

'অতপর যখন সে স্ত্রী তা ফাঁস করে দিলো......... সে বললো, আমাকে জানিয়েছেন মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহর সীমাহীন জ্ঞান ও অবগতির উল্লেখ এখানে গোপন ফন্দিফিকির এবং সলাপরামর্শের বেলায় অত্যন্ত কার্যকর ও তাৎপর্যময় ইংগিত। এ দ্বারা প্রশ্নকারীকে এই পরম সত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যা হয়তো সে ভুলে গিয়েছিলো অথবা তা থেকে উদাসীন হয়ে গিয়েছিলো। এ ইংগিত দ্বারা মানুষের মনকে সাধারণভাবেও এই সত্যটির বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যা প্রতিবার কোরআন পাঠ করার সময় তার সামনে উদ্ভাসিত হয়।

মুসলিম নারীদের গুণ বৈশিষ্ট্য

পরবর্তীতে আয়াতে সম্পূর্ণ নতুনভাবে বক্তব্য রাখা হয়েছে। অতীতে সংঘটিত একটি ঘটনার বিবরণদান থেকে বক্তব্যের ধারা পরিবর্তন করে উভয় মহিলাকে এমনভাবে সম্বোধন করা হয়েছে যেন এটা বর্তমানের কোনো ব্যাপার।

'আল্লাহর দিকে তোমাদের উভয়ের মন ঝুঁকে যাওয়ার কারণে তোমরা যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করো, তা হলে তো ভালোই। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো, তা হলে জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা, জিবরীল ও সৎকর্মশীল মোমেনরা তাঁর বন্ধু। তদুপরি ফেরেশতারাও তাঁর সাহায্যকারী।'

এই আয়াতের শুরুতে রয়েছে উক্ত উভয় স্ত্রীকে তাওবার দিকে আহবান– যাতে তাদের অন্তর আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত ও আকৃষ্ট হয়, যা কিনা আল্লাহ তায়ালা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো। আর এই আহবানের পরেই রয়েছে এক ভয়ংকর হুশিয়ারী ও প্রচন্ড আক্রমণাত্মক বক্তব্য।

এই প্রচন্ড আক্রমণাত্মক বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, রসূল (স.)-এর অন্তরে এ ঘটনা কতো গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলো, যার কারণে রসূলের সহায়ক ও অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ তায়ালা এবং জিবরীল, সৎকর্মশীল মোমেনদের ও সাধারণ ফেরেশতাদের দেখানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো, যাতে রসূল (স.)-এর মন সান্ত্বনা ও প্রশান্তি লাভ করে এবং সে বিব্রতকর ঘটনার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। নিসন্দেহে ঘটনাটা রসূল (স.)-এর অনুভূতিতে এতো প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে, আয়াতের এই হুশিয়ারী ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য তার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। এটা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিলো তা হয়তো আমরা এই আয়াতের ভাষা থেকে এবং

উপরোক্ত হাদীসে হযরত ওমরের প্রতিবেশীর বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি। হযরত ওমর (রা.) যখন জিজ্ঞেস করলেন, গাসসানীরা এসে গেলো নাকি? তখন সে প্রতিবেশী বললেন, ব্যাপারটা তার চেয়েও সাংঘাতিক। গাসসান ছিলো সিরিয়ার অভ্যন্তরে আরব উপদ্বীপের সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত রোম সাম্রাজ্যের ক্রীড়নক একটি রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের আক্রমণ সে সময়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার ছিলো, কিন্তু অপর ব্যাপারটি ছিলো মুসলমানদের কাছে অধিকতর গুরুতর। মুসলমানরা উপলব্ধি করতো যে, মহানবীর হৃদয়ের স্থিরতা ও তাঁর গৃহের শান্তি সবকিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর হৃদয়ের অশান্তি ও পারিবারিক অস্থিরতা মুসলিম জাতির জন্যে রোম সাম্রাজ্যের পদলেহী গাসসানীদের আক্রমণের চেয়েও মারাত্মক। বস্তুত মুসলমানদের এই বিবেচনা ও উপলব্ধি আল্লাহর বিবেচনার সাথে সমন্বিত ছিলো এবং তা সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল ছিলো।

অনুরূপভাবে পরবর্তী আয়াতের তাৎপর্য, রসূল (স.) তাঁর বর্তমান স্ত্রীদের তালাক দিলে তাদের স্থলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নতুন যে স্ত্রীদের দিতে পারেন, তাদের গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মাত্র দু'জন থাকলেও সকল স্ত্রীদের হুমকির আওতাভুক্ত করা থেকে বুঝা যায় যে, রসূল (স.)-এর পারিবারিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার যে অপরিসীম গুরুত্ব মুসলমানরা উপলব্ধি করেছিলেন, তাতে বিন্দুমাত্রও ভুল ছিলো না। পরবর্তী আয়াতের ভাষা দেখুন,

'তিনি যদি তোমাদের তালাক দেন, তা হলে তাঁর প্রতিপালক তাঁকে অচিরেই তোমাদের স্থলে তোমাদের চেয়েও উত্তম স্ত্রীদের দান করবেন, যারা হবে আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আদেশের অনুসারী, ঈমানদার, বিনয়ী, তাওবাকারিণী, এবাদাতকারিণী, ভ্রমণকারিণী, কুমারী ও অকুমারী।'

এই গুণাবলী অর্জনের জন্যে পরোক্ষভাবে ও ইংগিতে রসূলের স্ত্রীদের আহবান জানানো হয়েছে।

প্রথমটি হচ্ছে ইসলাম। অর্থাৎ ইসলামের বিধানের অনুসরণ ও আনুগত্য। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঈমান, যা মানুষের হৃদয়কে সংগঠিত ও সজীব করে। এই গুণটি পূর্ণতা ও বিশুদ্ধতা অর্জন করলে তা থেকেই ইসলামের জন্ম হয়। তৃতীয় গুণটি হলো 'কুনুত', অর্থাৎ বিনয়। এ দ্বারা হৃদয়ের আনুগত্য বুঝানো হয়েছে। চতুর্থ গুণ তাওবা। তাওবা হলো নিজের গুনাহের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া ও আল্লাহর অনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। পঞ্চম গুণ এবাদাত। এটি হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রক্ষার উপকরণ এবং তাঁর দাসত্বের অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। আর ৬ষ্ঠ গুণ হলো ভ্রমণ। এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, আল্লাহর সৃষ্টির রাজ্যে বিচরণ তথা আল্লাহর অতুলনীয় সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তাভাবনা ও ধ্যান করা। আর এ সব গুণসহ তারা কুমারী এবং অকুমারীও হতে পারে, যেমন বর্তমান স্ত্রীরা উভয় প্রকারের রয়েছে।

এটা বর্তমান স্ত্রীদের প্রতি হুমকিস্বরূপ। তাদের চাতুর্যপূর্ণ কলাকৌশলের দরুন রসূল (স.)-এর মনে যে বিরূপ প্রভাব পড়েছিলো, তা দূর করার জন্যে এ হুমকির প্রয়োজন ছিলো। অন্যথায় রসূল (স.) কোনো ক্ষুদ্র কারণে রেগে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না।

এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর তাঁকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে লক্ষ্য করে এতে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, তার ফলে রসূল (স.)-এর মন শান্ত হয়। মুসলমানদের সর্বাধিক ভক্তিভাজন এই পরিবারটিতে সাময়িক দুর্বিপাকের পর শান্তি ও স্থিতি ফিরে আসে। এ দ্বারা আসলে এই পরিবারকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে, আল্লাহর যমীনে তাঁর বিধান কায়েমে

এই পরিবারের ভূমিকার যথাযোগ্য মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং এ পরিবারের সদস্যদের মনোবল বহাল করা হয়েছে ।

এই হচ্ছে সেই মহান ব্যক্তির পারিবারিক জীবনের একটি দৃশ্য, যিনি একটি জাতি ও একটি রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন, অথচ তাঁর পূর্বে কেউ এ কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেনি এবং এ কাজের পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়নি, এমন একটি জাতি গঠন করতে তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যে জাতি আল্লাহর বিধান তার সর্বশেষ ও পূর্ণাংগ রূপ সহকারে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং এমন একটি আল্লাহভীরু ও আল্লাহভক্ত সমাজ বাস্তবরূপে প্রতিষ্ঠিত করবে, যা মানব জাতির সকল দুঃখ যন্ত্রণা প্রশমিত করবে। এই ছিলো একজন অতীব মহৎ, উদার, মর্যাদাবান ও মহানুভব মানুষের বাস্তব জীবনের একটি চিত্র, যিনি একই সাথে একজন মানুষ হিসাবে ও একজন নবী হিসাবে জীবন যাপন করে গেছেন। এ দুই ধরনের জীবন যাপনে তাঁর ভেতরে কোথাও কোনো পার্থক্য, ভেদাভেদ, শূন্যতা বা সামঞ্জস্যহীনতার সৃষ্টি হয়নি। কেননা, তিনি একজন মানুষ রসূল হবেন এবং মানব জাতির জন্যে আল্লাহর সর্বশেষ খোদায়ী বিধান বা সর্বশেষ খোদায়ী বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হবেন, এটাই ছিলো আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত।

এ বিধান ছিলো পূর্ণাংগ বিধান, যা নাযিল হয়েছিলো পূর্ণাংগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রসূলের ওপর। এ বিধানের অনুসরণ করলে মানুষ যে প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়, তার কোনো গঠনমূলক গুণ, শক্তি বা প্রতিভা ও যোগ্যতা নিষ্ক্রিয় বা অবদমিত হয় না, এটাই এ বিধানের পূর্ণতার লক্ষণ। বরঞ্চ এ বিধান মানুষকে মার্জিত ও পরিশীলিত করে, তাকে সুসভ্য করে এবং তার মনুষ্যত্বের লালন ও বিকাশ সাধন করে, আর তাকে তার উৎকর্ষের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করায়।

বস্তুত ইসলামকে যারা বুঝে শুনে পালন ও অনুসরণ করেছে, ইসলাম তাদের জীবনকে তার বাস্তব ও জীবন্ত নমুনায় পরিণত করেছে। রসূল (স.)-এর বাস্তব জীবন ছিলো যাবতীয় মানবীয় অভিজ্ঞতা, মানবীয় চেষ্টা সাধনা এবং সহজাত মানবীয় দুর্বলতা ও পূর্ণতার সমাবেশ, কিন্তু এতদসত্তেও তাতে মিশ্রণ ঘটেছিলো আল্লাহর দিকে আহবানের সুমহান বৈশিষ্ট্যের । এ বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণের বদৌলতে তাঁর সত্ত্বা পূর্ণতার সোপানসমূহ একে একে অতিক্রম করেছিলো, যা তাঁর পরিবার পরিজন ও নিকটতম মানুষের জীবনে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। রসূলের এই পূর্ণাংগ জীবন ছিলো সফল চেষ্টা সাধনার বাস্তব অনুকরণীয় আদর্শ। যারা তাঁকে বাস্তব ও সহজ অনুকরণীয় আদর্শ বা নমুনা হিসাবে পেতে চাইতো, তারা তাঁকে প্রতিনিয়ত দেখতো ও অনুপ্রাণিত হতো। তিনি যদি কোনো অবাস্তব ও কাল্পনিক জগতে বিচরণকারী ব্যক্তিত্ব হতেন, তাহলে তাঁর জীবন কেউ অনুসরণও করতে পারতো না, তা দেখে কেউ অনুপ্রাণিতও হতো না।

মানব জাতির জন্যে প্রেরিত আল্লাহর সর্বশেষ বিধানকে এরূপ পূর্ণাংগ ও সর্বাত্মক বিধানে পরিণত করা, এমন এক ব্যক্তিকে রসূল হিসাবে মনোনীত করা, যিনি এ বিধানকে বাস্তব ও কার্যকর বিধানে পরিণত করে দেখিয়ে দেবেন এবং এই রসূলের জীবনকে এমন একটি উন্মুক্ত পুস্তকে পরিণত করা, যাকে সবাই পড়তে পারবে ও এক প্রজন্ম আরেক প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করতে পারবে।এ কাজগুলোর পেছনে নিহিত আল্লাহর মহৎ উদ্দেশ্যসমূহ এভাবেই সার্থকতা লাভ করেছিলো।

নিজেকে ও নিজের পরিবারকে আগুন থেকে বাঁচাতে হবে

মুসলমানদের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাতকারী এই ঘটনার আলোকে কোরআন পরবর্তী আয়াতে মোমেনদের তাদের পারিবারিক জীবনে ইসলামের শিক্ষা, প্রেরণা ও উপদেশদানের মাধ্যমে পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যে নির্দেশ দিয়েছে। সেই সাথে দোযখের কিছু দৃশ্য ও সেখানে কাফেরদের শোচনীয় দুর্দশার কিছু চিত্রও তুলে ধরেছে। আর ইতিপূর্বে নবীর দুজন স্ত্রীকে তাওবার আহবান জানানোর সূত্র ধরে পরবর্তী আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরও তাওবা করার আহবান জানিয়েছে এবং তাওবাকারীদের জন্যে অপেক্ষমাণ জান্নাতের দৃশ্য তুলে ধরেছে। অতপর নবী (স.)-কে কাফের ও মোনাফেক উভয় গোষ্ঠীর সাথে জেহাদে লিপ্ত হওয়ার আদেশ দিয়েছে। এসব মিলেই তৈরী হয়েছে সূরার দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। পরবর্তী কটি আয়াত লক্ষ্য করুন,

‘হে মোমেনরা! তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবার পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও ...... তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!’

প্রত্যেক মোমেনের ওপর তার নিজের ও তার পরিবার পরিজনের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর এবং গুরুতর দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। তাদের সকলের জন্যেই রয়েছে দোযখের ঝুঁকি। মোমেনের কর্তব্য এই দোযখ থেকে নিজে বাঁচা ও পরিবার পরিজনকে বাঁচানো। দোযখে রয়েছে ভয়ংকর লেলিহান আগুন, ‘যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।’ সেখানে মানুষ ও পাথর একই রকম হীনতা, নিকৃষ্টতা ও অবমাননার সাথে নিক্ষিপ্ত ও দগ্ধীভূত হবে, কোনো রকম সুবিবেচনা ও সুদৃষ্টি মানুষের কপালে জুটবে না। এ কথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, যে আগুন পাথর দিয়ে জ্বালানো হয় তা কতো সাংঘাতিক ও ভয়াবহ আগুন হয়ে থাকে, আর সেই পাথরের সাথে একইভাবে দোযখের জ্বালানি হবে যে মানুষ, সে মানুষ কতো তুচ্ছ ও কতো অপমানিত। আর এই দোযখে বিদ্যমান বা তার সাথে সংশ্লিষ্ট সব কিছুই ভয়ংকর। ‘তার ওপর থাকবে নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর ফেরেশতারা।’ অর্থাৎ যে ধরনের আযাব দেয়ার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত থাকবে, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্মমতা হিংস্রতা দিয়েই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। ‘আল্লাহর আদেশ তারা অমান্য করে না বরং যা আদেশ করা হয় তাই তারা করে।’ অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ মান্য করা যেমন তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তেমনি আল্লাহর আদেশ পালন করার সামর্থও তাদের অপর বৈশিষ্ট্য। তারা তাদের স্বভাবগত নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা সহকারে দোযখের ভয়ংকর আগুন প্রজ্বলনের দায়িত্বে নিয়োজিত । আর মোমেনের কর্তব্য হলো এই আগুন থেকে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে রক্ষা করা। এই আগুন থেকে আত্মরক্ষার ও পরিবার রক্ষার সুযোগ তার এখনই। দুনিয়ার জীবন শেষে এ সুযোগ থাকবে না। তখন আর ওযর আপত্তিতে কাজও হবে না, যেমন কাজ হবে না কাফেরদের ওযর আপত্তিতে।

‘হে কাফেররা, আজ ওযর আপত্তি পেশ করো না। আজ তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল ভোগ করানো হবেই।’ কেননা, কেয়ামতের দিন ওযর আপত্তি পেশ করার দিন নয়– ওটা কর্মফল পাওয়ার দিন। কাফেররা দোযখের উপযুক্ত কাজ করে এসেছে বলে দোযখই তাদের অবধারিত ঠিকানা।

কিন্তু মোমেনদের কী হবে? তারা কিভাবে দোযখের আগুন থেকে নিজেদের ও নিজেদের আপনজনদের বাঁচাবে? আল্লাহ তায়ালা তাদের এর পথ বাতলে দিচ্ছেন এবং তাদের জন্যে আশার প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন এই বলে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۞ يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۞ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۞ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ

রুকু ২

৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (নিজেদের গুনাহ খাতার জন্যে) আল্লাহর দরবারে তাওবা করো– একান্ত খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় (এর ফলে) তোমাদের মালিক (আল্লাহ তায়ালা) তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং এর বিনিময়ে (পরকালে) তিনি তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন (সুরম্য) জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে (সুপেয়) ঝর্ণাধারা, সেদিন আল্লাহ তায়ালা (তাঁর) নবী এবং তার সাথী ঈমানদারদের অপমানিত করবেন না, (সেদিন) তাদের (ঈমানের) জ্যোতি তাদের সামনে ও তাদের ডান পাশ দিয়ে (বিচ্ছুরিত হয়ে এমনভাবে) ধাবমান হবে (যে, সর্বদিক থেকেই তাদের এ আলো পর্যবেক্ষণ করা যাবে), তারা বলবে, হে আমাদের মালিক, আমাদের জন্যে আমাদের (ঈমানের) জ্যোতিকে (জান্নাতের জ্যোতি দিয়ে আজ তুমি) পূর্ণ করে দাও, তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান। ৯. হে নবী, তুমি কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো এবং তাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করো; (কেননা) তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; আর তা (হচ্ছে) এক নিকৃষ্ট ঠিকানা। ১০. আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে নূহ ও লূতের স্ত্রীদের উদাহরণ পেশ করছেন; তারা দুজনই ছিলো আমার দু'জন নেক বান্দার স্ত্রী, কিন্তু তারা উভয়েই সে দু'জন বান্দার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অতএব আল্লাহর (আযাব) থেকে তারা কোনোক্রমেই এদের বাঁচাতে পারলো না, বরং (তাদের ব্যাপারে আল্লাহর) হুকুম (ঘোষিত) হলো, তোমরা (আজ) প্রবেশ করো জাহান্নামের আগুনে, যারা এখানে প্রবেশ করেছে তাদের সবার সাথে। ১১. (একইভাবে) আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্যে ফেরাউনের স্ত্রীকে

قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴿١٢﴾

(অনুকরণযোগ্য) এক উদাহরণ হিসেবে পেশ করেন, (সে প্রার্থনা করেছিলো) হে মালিক, জান্নাতে তোমার পাশে তুমি আমার জন্যে একখানা ঘর বানিয়ে দিয়ো, আর (দুনিয়ার এ ঘরেও) তুমি আমাকে ফেরাউন ও তার (যাবতীয়) কর্মকান্ড থেকে বাঁচিয়ে রেখো, তুমি আমাকে উদ্ধার করো এ যালেম সম্প্রদায় (-এর যাবতীয় অনাচার) থেকে। ১২. (আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্যে আরো দৃষ্টান্ত পেশ করছেন) এমরানের মেয়ে মারইয়ামের, যে (আজীবন) তার সতীত্ব রক্ষা করেছে, অতপর (একদিন) আমি আমার (সৃষ্ট) রূহগুলো থেকে একটি (রূহ) তার মধ্যে ফুঁকে দিলাম, সে তার মালিকের কথা ও তাঁর (প্রেরিত) কেতাবসমূহের ওপর পুরোপুরিই বিশ্বাস স্থাপন করেছে; (সত্যিই) সে ছিলো আমার একান্ত অনুগত বান্দাদেরই একজন!

তাফসীর

আয়াত ৮-১২

'হে মোমেনরা, আল্লাহর কাছে খাঁটিভাবে তাওবা করো। অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন............'

এই হচ্ছে বাঁচার পথ। খাঁটি তাওবা, যা হৃদয়কে খাঁটি ও খালেস বানায়, অতপর তা তাকে আর ধোকা দেয় না ও প্রবঞ্চিত করে না।

তাওবা হচ্ছে খারাপ কাজ থেকে ফিরে আসা ও বিরত থাকার নাম। এর শুরু হয় অনুশোচনা দিয়ে এবং শেষ হয় সৎ কাজ ও আনুগত্যের মাধ্যমে। এই পরিপূর্ণ তাওবার মধ্য দিয়েই হৃদয় গুনাহের কলুষমুক্ত হয় এবং মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে। এটাই হচ্ছে 'তাওবাতুন নাসূহ' তথা খাঁটি তাওবা, যা হৃদয়কে ক্রমাগত সতর্ক করে এবং কখনো আর গুনাহের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে দেয় না। তাওবা যখন এমনই (পাপ থেকে পুরোপুরি নিবৃত্ত হওয়া, আর কখনো পাপের ধারে-কাছেও না যাওয়া), তখন আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা দ্বারা সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তাওবাকারীদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যেদিন মোমেনদের গুনাহ মাফ করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সেদিন কাফেরদের এমনভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন যে, তাদের কোনো প্রকার ওযর-বাহানা করার সুযোগ পর্যন্ত দেবেন না বলে কিছু আগেই বলা হয়েছে। সেদিন আল্লাহ তাঁর নবী ও মোমেনদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না।

'আল্লাহ তায়ালা নবী ও মোমেনদেরকে অপমানিত করবেন না'- এ কথাটা মোমেনদের বিশেষভাবে সম্মানিত ও আশান্বিত করেছে। সেই অপমানের দিন যারা সম্মানিত হবে তাদের মধ্যে নবী (স.)-এর সাথে মোমেনদের একত্রিত করে এই বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মোমেনদের জন্যে সেদিন এমন এক আলো প্রস্তুত রাখা হবে, যা তাদের সামনে ও ডানে চলতে থাকবে। সেই ভয়ংকর দুর্যোগময় দিনে এই আলো দ্বারা তাদের চেনা যাবে, প্রচন্ড ভিড়ের

মধ্যে এ আলো দ্বারা তারা পথের সন্ধান পাবে এবং পরিশেষে এ আলো তাদের সামনে ও ডানে চলতে চলতে জান্নাতে গিয়ে পৌঁছবে।

সেদিন সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তারা আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের আলোকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদের তুমি রক্ষা করো। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।' সেই কঠিন দিনে যখন মুখ নির্বাক ও অন্তর নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, তখন তাদের এই দোয়া শেখানো প্রকৃতপক্ষে দোয়াটি কবুল হওয়ারই আলামত । আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের এ দোয়া শেখাবেন এই জন্যে যে, তিনি এ দোয়া কবুল করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন। সারকথা এই যে, আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের যে সম্মান ও আলো দান করবেন, তার ওপর এই দোয়া তাঁর একটি বাড়তি নেয়ামত ও অনুগ্রহ ।

যে মোমেন এতো সব নেয়ামত ও অনুগ্রহে সিক্ত হবে, তার আবার মানুষ ও পাথরের জ্বালানি দ্বারা প্রজ্বলিত দোযখের সাথে কিসের সম্পর্ক?

যে পুরস্কার ও শাস্তির উল্লেখ করা হলো, তার উভয়টিই আগুন থেকে নিজেকে ও পরিবার পরিজনকে রক্ষা করার ব্যাপারে মোমেনের দায়িত্ব কতখানি, তা স্পষ্ট করে বলে দেয়। তাকে বেহেশতের অফুরন্ত নেয়ামত লাভের যোগ্য করতেই বা এ দুটির ভূমিকা কী, তাও জানিয়ে দেয়।

রসূল (স.)-এর পরিবারে সংঘটিত ঘটনার পটভূমিতে চিন্তা করলে আমরা আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারি।

নিজেকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করা এবং নিজের অন্তরকে সংশোধন করার ন্যায় নিজের পরিবার-পরিজনকে সঠিক পথে পরিচালিত করাও মোমেনের দায়িত্ব। সূরা তালাকে যেমন আমি বলেছি, ইসলাম শুধু ব্যক্তির নয়, পরিবারেরও জীবন বিধান। তাই পরিবারের প্রতি মোমেনের দায়িত্ব কী, তাও সে নির্ধারণ করে। মুসলিম পরিবার আসলে মুসলিম দল বা সংগঠনের ভিত্তি। এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ছোট বড় প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত হয় জীবন্ত ইসলামী সমাজ।

এক একটি মুসলিম পরিবার ইসলামের এক একটি দুর্গস্বরূপ। এই দুর্গ ভেতর থেকে অত্যন্ত মযবুত ও দুর্ভেদ্য থাকা চাই। তাতে কোথাও যদি ফাঁক বা ফাটল থেকে থাকে, তবে সে রকম প্রতিটি ফাটলে একজন মুসলমান পাহারাদার থাকা চাই, যাতে কেউ তা ভেদ করতে না পারে। অনুরূপভাবে ভেতর থেকেও যেন কেউ দুর্গের দেয়াল ভাংতে না পারে, তার ব্যবস্থা থাকা চাই।

মোমেনের দায়িত্ব ও কর্তব্য এই যে, যেন ইসলামের দাওয়াত সর্বপ্রথম তার পরিবারের কাছে পৌঁছায় এবং এভাবে ইসলামের এই দুর্গটিকে নিরাপদ করে ও তার ফাটলগুলো বন্ধ করে। এ কাজটি সম্পন্ন করার আগে দূরের কারো কাছে দাওয়াত পৌঁছানো তার দায়িত্ব নয়।

পরিবার নামক এই দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণে মুসলিম মায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। শুধু মুসলিম মাতাই এই দুর্গের নিরাপত্তা বিধানে যথেষ্ট নয়। ছেলেমেয়েদের গঠন করতে পিতা ও মাতা উভয়েরই প্রয়োজন। শুধুমাত্র একদল পুরুষ দ্বারা ইসলামী সমাজ গঠনের চেষ্টা বৃথা। এ সমাজে মুসলিম মহিলাদেরও প্রয়োজন রয়েছে। তারাই নতুন প্রজন্মের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী। আর এই নতুন প্রজন্ম হচ্ছে ভবিষ্যতের বীজ ও ফল দুটোই।

এ জন্যে কোরআন পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যেই নাযিল হতো। কোরআন পরিবার গঠন ও ইসলামী বিধানের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতো, আর এ কারণেই মোমেনদের একদিকে যেমন নিজেদের দায়িত্ব অর্পণ করতো, অপর দিকে তেমনি অর্পণ করতো তাদের পরিবারের দায়িত্বও।

এ দায়িত্বই অর্পণ করা হয়েছে 'হে মোমেনরা তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও'– এই কথাটা বলার মধ্য দিয়ে।

মুসলিম স্ত্রীদের অপরিহার্য্য আদর্শ

যারা মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকেন, এ বিষয়টি তাদের খুব ভালোভাবে হৃদয়ংগম করা দরকার। এ ব্যাপারে প্রথম চেষ্টা নিয়োজিত করতে হবে নিজ গৃহের প্রতি তথা নিজের স্ত্রী, মাতা পিতা, সন্তান সন্ততি ও সকল আত্মীয়-স্বজনের প্রতি। মুসলিম নারীকে মুসলিম পরিবার গঠনের সর্বাত্মক সুযোগ দিতে হবে। আর যে ব্যক্তি মুসলিম পরিবার গঠন করতে চাইবে, তাকে সর্বপ্রথম নিজের জন্যে খাঁটি মুসলমান স্ত্রী খুঁজতে হবে। নচেৎ মুসলিম সমাজ গঠনের কাজ অনেক বেশী বিলম্বিত হয়ে যাবে এবং মুসলিম সমাজরূপী দুর্গের প্রাচীরে প্রচুর ফাটলের সৃষ্টি হবে।

ইসলামের সূচনাকালে ইসলামী পরিবার গঠন করার কাজটি এ যুগের চেয়ে অনেক বেশী সহজ ছিলো। কেননা, মদীনায় একটা ইসলামী সমাজ বিদ্যমান ছিলো এবং সে সমাজের ওপর ইসলামের নিরংকুশ কর্তৃত্ব বিরাজ করতো। মানব জীবন সম্পর্কে ইসলামের যে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা রয়েছে এবং সেই চিন্তাধারা থেকে যে আইন কানুন ও বিধিবিধান রচিত হয়, তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলো গোটা সমাজ ব্যবস্থা। নারী পুরুষ নির্বিশেষে গোটা জাতির কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল এবং আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের নির্দেশ। ওহীর মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত নাযিল হতো, সেটাই হতো সর্বশেষ, চূড়ান্ত ও অকাট্য সিদ্ধান্ত। এই সমাজ বিদ্যমান থাকা এবং তার চিন্তাধারা ও মতাদর্শ মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত থাকার কারণে নারীর পক্ষে ইসলামের বিধান অনুসারে নিজের জীবন গড়া সহজ ছিলো। পুরুষের পক্ষেও স্ত্রী ও সন্তানদের ইসলামের বিধান অনুসারে পরিচালিত করা এবং তদনুসারে জীবন যাপন করার উপদেশ দেয়া সহজ ছিলো।

আজকে আমরা এক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অবস্থান করছি, এক সর্বব্যাপী জাহেলী সভ্যতার অধীনে জীবন যাপন করছি। এ সভ্যতার অধীন সমাজ, সংস্কৃতি, আইন, নৈতিকতা, চালচলন, আচার আচরণ সব কিছুই জাহেলিয়াত থেকে উদ্ভূত।

এই জাহেলী সমাজের সাথেই তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে আজকের নারী সমাজকে। যখনই কোনো নারী ইসলামী নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করতে চায়, তখন সে এই জাহেলী সমাজের পক্ষ থেকে দুঃসহ চাপের সম্মুখীন হয়॥ চাই সে স্বতস্ফূর্তভাবে ইসলামের প্রেরণায় উজ্জীবিত হোক, অথবা তার স্বামী, ভাই বা পিতা তাকে ইসলামের দিকে পথনির্দেশ করে থাকুক।

সেকালে নারী পুরুষ নির্বিশেষে গোটা সমাজ ইসলামের অনুসারী ছিলো। আর আজকের যুগে পুরুষরা এমন এক আদর্শের অনুসরণ করে, যার কোনো অস্তিত্ব বাস্তব জগতে নেই (অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের আকারে যে ইসলামের অস্তিত্ব নেই তার অনুসরণ করে)। আর এই আদর্শের কট্টর বিরোধী সমাজের চাপের মুখে নারী সমাজ দিশাহারা। বস্তুত সমাজ ও তার প্রচলিত কৃষ্টির চাপ পুরুষের কাছে যতো প্রবল ও তীব্রভাবে অনুভূত হয়, নারীর কাছে অনুভূত হয় তার চেয়ে বহুগুণ বেশী।

এ কারণে এ সমাজ পুরুষের দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। প্রথমত তার দায়িত্ব দোযখ থেকে নিজেকে বাঁচানো, অতপর তার পরিবার পরিজনকে বাঁচানো।

তাই তাকে এই দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। তাহলে প্রথম মুসলিম সমাজে একজন পুরুষ এই দায়িত্ব পালন করার জন্যে যতোটা চেষ্টা সাধনা করতো, সে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী চেষ্টা সাধনা করবে, আর ঠিক তখনই যে ব্যক্তি ইসলামী পরিবার গঠনে ইচ্ছুক, তার কর্তব্য হবে

সর্ব প্রথমে এই দুর্গের প্রহরী হিসাবে এমন একজন উপযুক্ত মহিলাকে খুঁজে বের করা, যার চিন্তাধারা ইসলামেরই হুবহু অনুসারী। আর এটা করতে গেলে তাকে অনেক ত্যাগ ও কোরবানী দিতে হবে। তাকে সমাজের চোখ ধাঁধানো সংস্কৃতি এবং আধুনিকা নারীর মিথ্যা ছলনা বিসর্জন দিয়ে ধর্মপ্রাণ নারীর সন্ধান করতে হবে, যে তাকে ইসলামী পরিবার গঠনে ও ইসলামের দুর্গ নির্মাণে সাহায্য করবে। আর মুসলিম পিতারা যদি ইসলামের পুনরুজ্জীবন চান, তবে তাদের কর্তব্য হবে নব্য প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারদান এবং নিজেকে ও পরিবারকে দোযখ থেকে বাঁচানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে আহবান জানিয়েছেন তাতে সাড়া দান।

এই প্রসংগে একটি কথার পুনরাবৃত্তি করতে চাই এবং তা হচ্ছে এই যে, ইসলামের স্বাভাবিক দাবী হলো এমন একটি দল বা সমাজ গঠন করা, যা হুবহু ইসলামের অনুগত হবে এবং যে সমাজে ইসলামের বাস্তব অস্তিত্ব প্রচলিত ও প্রতিফলিত হবে। ইসলাম রচিতই হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, একটি দল বা সমাজ এমন প্রতিষ্ঠিত হবে, যার আকীদা, মতবাদ ও মতাদর্শ, আইন ও বিধান এক কথায়, তার গোটা জীবনের বিধানই হবে ইসলাম আর এমন একটি সমাজই ইসলামী আদর্শকে ইসলাম বিরোধী সমাজের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।। (সূরা সাফফের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

ইসলামী সমাজের গুরুত্ব কতোখানি, উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। এই সমাজেই মুসলিম নারী ও মুসলমান তরুণী বসবাস করে। ইসলামের নিরাপত্তা বেষ্টনীর কল্যাণেই সে বিদ্যমান জাহেলী সমাজের চাপ থেকে রক্ষা পায়। ইসলামী মতাদর্শের দাবী এবং প্রতিষ্ঠিত জাহেলী সমাজের রীতিনীতির টানাপড়েনে তার আবেগ-উদ্দীপনা হারিয়ে যায় না।

তাকে জীবনসংগিনী হিসাবে পেয়ে মুসলিম যুবক ইসলামের দুর্গ গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং সেই দুর্গের ভিত্তিতে গঠন করে ইসলামী শিবির।

বস্তুত এমন একটি ইসলামী সমাজ বা সংগঠন সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত জরুরী, যার সদস্যরা ইসলামের আনুগত্যের জন্যে পরস্পরকে উপদেশ দিতে ও সাবধান করতে থাকে, যে সমাজ ও সংগঠন ইসলামের চিন্তা চেতনা, নীতি ও চরিত্র, ধ্যান ধারণা ও চালচলনের লালন, বিকাশ সাধন ও সংরক্ষণ করে এবং তার দিকে বিভ্রান্ত জাহেলী সমাজকে ইসলামের বাস্তব নমুনা দেখিয়ে আহবান জানায়, যাতে সে অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোতে আসার প্রেরণা পায় এবং শেষ পর্যন্ত একদিন আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী বংশধর জাহেলিয়াত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ইসলামের ছায়ার নিচে আশ্রয় নেয়।

প্রথমে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার স্বার্থেই রসূল (স.)-কে ইসলামের ও মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। বলা হচ্ছে,

'হে নবী, কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো এবং তাদের ওপর কঠোরতা প্রয়োগ করো। তাদের বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা নিকৃষ্ট ঠিকানা।'

ইতিপূর্বে মোমেনদেরকে যে নিজেদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার আলোকে বিবেচনা করলে এ আয়াতটিতে প্রদত্ত মোনাফেক ও কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নির্দেশ তাৎপর্যবহ। পূর্বের আয়াতে যে খাঁটি তাওবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা তাদের গুনাহ মাফ করাতে ও জান্নাতে প্রবেশ করাতে সক্ষম, তার পরিপ্রেক্ষিতেও এ আদেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

যে সমাজে দোযখের আগুন থেকে বাঁচা ও বাঁচানোর সাধনা চলে, সে সমাজকে বাইরে থেকে আগ্রাসী কাফেররা ও ভেতর থেকে গৃহশত্রু বিভীষণ মোনাফেকরা অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবে, সেটা হতে দেয়া যায় না। এ সমাজকে তাই অত্যাচারী ও নৈরাজ্যবাদীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা অপরিহার্য।

লক্ষণীয় যে, আয়াতে কাফের ও মোনাফেকদের একই সমতলে সমবেত করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ও কঠোরতা প্রয়োগ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, ইসলামী শিবিরকে হুমকি দেয়া, ধ্বংস করা ও ছিন্নভিন্ন করার ব্যাপারে তারা একই রকম ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা দোযখের আগুন থেকে বাঁচার সংগ্রামেরই পর্যায়ভুক্ত এবং রসূল (স.) ও মোমেনদের পক্ষ থেকে দুনিয়ার জীবনে নিষ্ঠুর কঠোর আচরণ পাওয়া তাদের প্রাপ্য নগদ শাস্তি, আর আখেরাতে তাদের শাস্তি হলো জাহান্নাম। এভাবে সূরার এ অংশটির আয়াতগুলো যেমন পরস্পরের সাথে সুসমন্বিত, তেমনি তা পূর্ববর্তী অংশের সাথেও সার্বিকভাবে সমন্বিত।

কাফেরদের পরিবারে মুসলমান এবং মুসলমানদের পরিবারে কাফের স্ত্রী

এরপর শুরু হচ্ছে সূরার তৃতীয় পর্ব। মনে হয়, এটি সরাসরি প্রথম পর্বেরই উপসংহার। কেননা, এই পর্বে নবীর পরিবারে কাফের স্ত্রী এবং কাফের পরিবারে মোমেন স্ত্রীর প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহ কাফেরদের উদাহরণ দিয়েছেন নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দ্বারা। তারা আমার দু'জন সৎ বান্দার অধীন ছিলো। অতপর তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো..........'

এখানে বিশ্বাসঘাতকতার তাফসীর প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীর দাওয়াতী কাজের বিরোধিতা করার মাধ্যমে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো- ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। নূহের স্ত্রী নূহের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো তৎকালীন কাফের জনগোষ্ঠীর মতোই। আর লূতের স্ত্রী তার জাতির চরিত্র জানা সত্ত্বেও তাদের লূতের কাছে আগত অতিথিদের সংবাদ জানাতো।

ফেরাউনের স্ত্রী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি ফেরাউনের প্রাসাদে বসেই ঈমান এনেছিলেন। সম্ভবত তিনি হযরত মূসার পূর্ববর্তী অন্য কোনো নবীর দাওয়াতে ঈমান আনয়নকারী জাতির অবশিষ্টাংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইতিহাসে এ কথাও লিপিবদ্ধ আছে যে, সম্রাট চতুর্থ আমনাহুনাব- যিনি মিসরে একক উপাস্য প্রতিষ্ঠা করেন, তার প্রতীক হিসাবে সূর্যের প্রতিকৃতি স্থাপন করেন এবং নিজেকে 'ইখনাতুন' নামকরণ করেন, তার মাতা সাধারণ মিসরীয়দের থেকে আলাদা ধর্মের অনুসারী ছিলেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ এই মহিলার দিকেই ইংগিত করেছেন, না তিনি মূসা (আ)-এর সমকালীন ফেরাউনের স্ত্রী এবং এই ফেরাউন উক্ত আমনাহুনাব ছাড়া অন্য কেউ কিনা, তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

এখানে ফেরাউনের স্ত্রীর ব্যক্তিগত পরিচয় নির্ণয়ের জন্যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান চালানো জরুরী নয়। কোরআন এখানে একটি স্থায়ী তত্ত্বের উল্লেখ করেছে, যা ব্যক্তি পরিচয়ের উর্ধ্বের জিনিস। ব্যক্তি এখানে উক্ত তত্ত্বের উদাহরণ মাত্র।

নিজেকে ও পরিবার পরিজনকে দোযখ থেকে রক্ষা করার নির্দেশদানের পর ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত তত্ত্ব বর্ণনা এখানে উদ্দেশ্য। অন্য কথায় বলা যায়, রসূল (স.)-এর স্ত্রীদের বিশেষভাবে ও মুসলমানদের স্ত্রীদের সাধারণভাবে এ কথাই বলা হয়েছে যে, সবার আগে তারা যেন নিজেদের দোযখ থেকে রক্ষা করেন। তারা সর্বাগ্রে তাদের নিজেদের সম্পর্কেই দায়ী, নবীর

স্ত্রী হওয়া বা কোনো নেককার মোমেন বান্দার স্ত্রী হওয়ার কারণে তাদের ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে না।

নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর কথাই ধরা যাক। 'তারা আমার বান্দাদের মধ্য থেকে দু'জন সৎ বান্দার অধীনে থাকতো। কিন্তু তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। কিন্তু আল্লাহর কাছে জবাবদিহি থেকে তারা অব্যাহতি পেলো না। তাদের বলা হলো, যারা যারা দোযখে প্রবেশ করছে, তাদের সাথে তোমরাও প্রবেশ করো।'

সুতরাং ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে এবং আদর্শের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে কোনো আপোষ, সুপারিশ বা সম্মান প্রদর্শনের অবকাশ নেই, এমন কি নবীদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও নয়।

অপরদিকে রয়েছে ফেরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ। ফেরাউনের প্রাসাদে কুফুর এবং আল্লাহদ্রোহিতার সয়লাবও তাকে নিজের মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি ফেরাউনের প্রাসাদে বাস করেও তার গোমরাহী থেকে আত্মরক্ষা করেছেন এবং নিজের বসবাসের জন্যে আল্লাহর কাছে চেয়েছেন জান্নাতের একটি ঘর। তিনি ফেরাউনের সাথে নিজের সম্পর্ক অগ্রাহ্য করে তার কবল থেকে আল্লাহর কাছে নিষ্কৃতি চেয়েছেন। তার অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার কারণে তার কার্যকলাপ দ্বারা তিনি কোনোভাবে প্রভাবিত হয়ে বসেন কিনা সেই আশংকায় তার কার্যকলাপ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। ফেরাউনের গোটা জনগোষ্ঠী থেকেও তিনি নিষ্কৃতি চেয়েছেন, যদিও তাদের মধ্যেই তাঁকে অবস্থান করতে হতো।

ফেরাউনের স্ত্রীর দোয়া ও তার বলিষ্ঠ নীতি দুনিয়ার সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ বিত্তবৈভবের মোহত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । তখনকার দিনে ফেরাউনের স্ত্রী দুনিয়ার সকল রাজা মহারাজার চেয়েও ঐশ্বর্যশালিনী ছিলেন। ফেরাউনের প্রাসাদে তিনি যা চাইতেন তাই ভোগ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তার ওপর ঈমানকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই বিপুল বিত্তবৈভবকে তিনি শুধু যে ত্যাগ করেছেন তাই নয়; বরং তাকে নোংরা ও অপবিত্র জিনিস ভেবে তা থেকে আল্লাহর পানাহ এবং নিষ্কৃতি চেয়েছেন।

তিনি ছিলেন এক দোর্দন্ড প্রতাপশালী বিশাল সাম্রাজ্যের একজন মহীয়সী নারী। আর এটা আল্লাহর আর একটি অতি বড় অনুগ্রহ। কেননা, আমি আগেই বলেছি যে, সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ও ধ্যানধারণা সম্পর্কে নারী অপেক্ষাকৃত অধিক সচেতন ও স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। তবে এই মহিলা একেবারেই একাকিনী বিরাজমান সমাজ, রাজপ্রাসাদ, রাজা, রাজকীয় পারিষদবর্গ এবং রাজকীয় প্রতাপ সব কিছুর চাপ অগ্রাহ্য করে একমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ তুললেন এবং এই আগ্রাসী কুফরী শক্তির পতন কামনা করলেন।

এত সব বাধাবিপত্তি, চাপ ও বন্ধন অগ্রাহ্য করে আল্লাহর প্রতি সম্পর্ক ও আনুগত্যকে একনিষ্ঠ ও অটুট করার যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, তা অত্যন্ত উঁচুস্তরের দৃষ্টান্ত। এ কারণেই আল্লাহর এই অমর ও অক্ষয় গ্রন্থে তাঁর নাম স্থান পেয়েছে। এটি সেই গ্রন্থ যার প্রতিটি শব্দ মহান আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হয়ে মহাবিশ্বের কোণে কোণে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে।

'আর ইমরানের কন্যা মারইয়াম'.......... তিনিও আজন্ম আল্লাহর একনিষ্ঠ অনুগত বাঁদী। তাঁর কাহিনী আল্লাহর অন্যান্য সূরায় বর্ণনা করেছেন। এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা ও সতীত্বের উল্লেখ করেছেন এই বলে যে, 'যে নিজের লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত করেছে।' অর্থাৎ পাপিষ্ঠ ইহুদীরা তার ওপর যে অভিযোগ আরোপ করেছে, তা থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত প্রমাণিত করেছেন। 'অতপর আমি তার মধ্যে নিজের আত্মার একাংশ ফুঁকে দিলাম।' ঈসা (আ.)

এই ফুঁকেরই একটি অংশ ছিলেন। হযরত ঈসার কাহিনী সূরা মারইয়ামে যেখানে সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু আলোচ্য আয়াতটির উদ্দেশ্য মারইয়ামের পবিত্রতা, তাঁর পরিপূর্ণ ঈমান ও আনুগত্যের চিত্র তুলে ধরা, তাই এখানে সে বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করছি না। 'আর সে (মারইয়াম) তাঁর প্রতিপালকের সমস্ত বাণী ও তাঁর কেতাবগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করেছিলো এবং সে ছিলো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।'

ফেরাউনের স্ত্রীকে ইমরানের কন্যা মারইয়ামের সাথে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দ্বারা বুঝা যায় ফেরাউনের স্ত্রী আল্লাহর কাছে কতো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, যার বদৌলতে তিনি মারইয়ামের সাথে উল্লেখের যোগ্যা হয়েছিলেন। আগেই উল্লেখ করেছি যে, তাঁর এই মহত্ত্ব ও উচ্চ মর্যাদার একমাত্র কারণ তাঁর জীবনের স্বতন্ত্র ঈমানী বৈশিষ্ট্য। এরা দুজন সতী, ঈমানদার, সচ্চরিত্র ও অনুগত মহিলার দৃষ্টান্ত। এ দুজনের দৃষ্টান্তকে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-এর স্ত্রীদের সামনে এবং পরবর্তী সকল প্রজন্মের মোমেন নারীদের সামনে তুলে ধরেছেন। সূরার শুরুতে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, সেই প্রসংগক্রমেই এ দুই মহীয়সী নারীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহারে বলতে চাই, শুধু এই সূরাটিই নয়, বরং এই সমগ্র পারাটিই মহানবী (স.)-এর জীবনের একটি জীবন্ত অধ্যায়, যা কোরআন নিজস্ব ভংগিতে তুলে ধরেছে। কোরআনের এই ভংগি স্বয়ং আল্লাহর নির্বাচিত। মানুষের কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা কোরআনের ন্যায় এমন নিপুণ ভংগিতে সেই সময়কার ঘটনা তুলে ধরতে পারে না। কোরআনের বর্ণনা অধিকতর ব্যাপকধর্মী। একটি ঘটনা ব্যবহার করে সে এমন একটি নিরেট সত্য তুলে ধরে, যার অবস্থান এ ঘটনা এবং তার স্থান ও কালের অনেক উর্ধ্বে, তার চেয়ে অনেক ব্যাপক, স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী। এটাই কোরআনের বৈশিষ্ট্য।

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্‌র
সূরা আন নাহ্‌ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্‌ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড
সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন-এর সম্মানিত ডাইরেক্টর

মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ী

রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত

বর্তমান সময়ের ৫টি মূল্যবান সীরাত গ্রন্থ

বিশ্ব সীরাত প্রতিযোগিতায় প্রায় ১২শ' পান্ডুলিপির মধ্যে

প্রথম পুরস্কার বিজয়ী গ্রন্থ

'আর রাহীকুল মাখতূম'

ঐতিহাসিক প্রামাণ্যচিত্র 'দ্যা ম্যাসেজ' ছবির কাহিনীর বাংলা রূপান্তর

'মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম'

প্রিয় নবীর ব্যক্তি জীবনের অনুপম সংগ্রহ

'তিনি চাঁদের চেয়ে সুন্দর'

প্রিয় নবীর সুন্নতের অনুশাসনগুলোর বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী বই

'সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান'

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাধিক

নির্ভরযোগ্য জীবনী গ্রন্থ

'সীরাতে ইবনে কাছীর'